সূচী।

(বর্ণানুক্রমিক।)

"THE BOY'S OWN PAPER."] [4, Bouverie Street, London, E.C.

TRESPASSING.

(*Drawn for the "Boy's Own Paper" by* HAROLD C. EARNSHAW.)

বালক

২য় বর্ষ।] জানুয়ারী, ১৯১৩। [১ম সংখ্যা।

স্বর্ণসূত্র।

রূপক আখ্যান।

এখানে আর কিছুই নাই, কেবল গাছের পর গাছের সারি অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে,—এটি একটী মহারণ্য। এই মহারণ্যে কুমার পরেশসিংহ পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। পরেশসিংহ এখনও খুব ছেলেমানুষ,—মহারাজ প্রবরসিংহের বড় আদরের ছেলে। সে নীলরঙের মখমলের শল্মা-চুম্‌কীর কাজ করা কুর্ত্তা ও পায়জামা পরিয়া রহিয়াছে, তাহার কোমরে একটী সোণার কোমরবন্ধও বাঁধা আছে, এবং তাহার রেশমের মত নরম কোঁক্‌ড়ান কাল-কুচকুচে চুলগুলি তাহার গোলাপের মত লাল-টুক্‌টুকে মুখখানি—পাৎলা মেঘে যেমন চাঁদ ঢাকে তেমনই—ঢাকিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তাহার হাত ও মুখ আঁচড়াইয়া এবং তাহার পোষাক খোঁচে জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে, ঠিক করিতে না পারিয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া হয়রান্ হইতেছে। কখন সে এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো ঝোপ-ঝোড়ের মাঝদিয়া চলিতেছে, কখন সেই বনের মধ্যে যে একটু মাঠ পাওয়া যাইতেছে, তাহা পার হইতেছে, কখনও পাহাড়ে উঠিতেছে, এবং কখনও বা সেই অরণ্যের ছোট ছোট নদীনালাগুলি অতি-কষ্টে পার হইতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার বুকে বেশ ভরসা ছিল, সে মনে মনে বলিতেছিল,—"পথ আমি খুঁজে যদি বা'র না করি তো, কি ব'লেছি!" কিন্তু দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার আঁধারে যখন আঁধার বন আরও আঁধার হইয়া উঠিল, পাখীরা বাসায় ফিরিয়া কিচিরমিচির করিয়া শেষে চুপ হইয়া গেল, তখন পরেশের সব ভরসাই যেন উবিয়া গেল, সে ক্ষুধার্ত্ত, শ্রান্ত ও ভীত হইয়া বার বার "বাবা," "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল; আর বলিতে লাগিল, "হায়, আমার সোণার সূতোগাছা আমি কেন হারিয়ে ফেল্লুম!" বনের আঁধার পরেশের মনেও যেন ঢুকিল,—সে কাঁদিয়া ফেলিল। কে সান্ত্বনা দিবে? গাছের পাতার সরসর-শব্দে এবং নদীর জলের কুল্‌কুল্-আওয়াজেও যেন কত কান্না-মাখান রহিয়াছে। পাখীদের আনন্দের গান আর প্রাণ মাতাইতেছে না, তাহার বদলে দাঁড়-কাকগুলা থাকিয়া থাকিয়া বিকট কা-কা-শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। বড় বড় শকুনিগুলাও তাহার মাথার উপরে ঘুরিতেছে; তাহারা সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া কোন একটা উঁচু গাছে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে।

তবু পরেশ পথ চলিতেই থাকিল। সূর্য্য একবার বড় বড় গাছের উপরকার পাতাগুলি সোণাদিয়া ঝিক্‌মিকাইয়া দিয়া অস্ত গেল। পাখীরা ঘুমাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বন এমনই নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল যে, পরেশ আপনার পায়ের শব্দ বনময় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, শুনিতে পাইল। আর চলিতে চলিতে যখন সে থামিতে লাগিল, তখন সে নিজের বুকেরই ঢ়প্‌ঢ়প্-আওয়াজ শুনিতে পাইতে লাগিল। সকাল-অবধি সে একটীও মানুষের মুখ বা কোন ঘর-বাড়ীর ছায়াপর্য্যন্ত দেখে নাই।

হঠাৎ ঝড় আরম্ভ হইল। আকাশে কালো কালো মেঘ জমা হইতে লাগিল। পরেশ কি করে?—একটা প্রকাণ্ড

অশ্বত্থগাছের তলায় গিয়া তুইহাতদিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিল; কি করিতে হইবে, তা' সে প্রথমে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না; পরে বনের বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে সে সেই গাছের উপর উঠিয়া রাত কাটাইতে মনস্থ করিল। গাছে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময়ে, সে শুনিল, কে যেন চীৎকার করিয়া গান গায়িতেছে। মনদিয়া শুনিয়া এবং পাতার ফাঁকের ভিতরদিয়া তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল, একটী ছোক্‌রা, দেখিলে বোধ হয় তাহার অপেক্ষা বয়সে বড়, বুনো জানোয়ারের চামড়ার তৈয়ারী বিশ্রী মোটা ও লোমশ কুর্ত্তা-পায়জামা পরিয়া একপাল গাই তাড়াইতে তাড়াইতে আসিতেছে। তাহার মাথায় ভাল্লুকের চামড়ার যে টুপীটা পরিয়াছে, তাহার ভিতরহইতে জট-পাকান খানিকটা কটা চুল তাহার তুই-গালের উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সে একগাছা ছোট ও মোটা 'বাড়ি'দিয়া একটা কালো গাইকে একঘা মারিয়া বলিল,—"হাদে, সিধে, সিধে!" আর একটা গাইকে চীৎকার করিয়া বলিল,— "চ'লে চল, গতর আর নড়ে না যে।"

তাহার পর, উচ্চৈঃস্বরে বন প্রতিধ্বনিত করিয়া এই গানটি গায়িতে লাগিল,—

(জংলা—খেমটা।)

গাইগুলো তাড়িয়ে নে ঝট্ যাই ছুটে;
এর চেয়ে মজা আর কোন্ মিঞা লুটে?
ধুয়া—শুনচ তো, বড়মিঞা, শোন কাণ ক'রে খাড়া,
হি হি হি হি হি হি হিঃ, হা হা হা হা হা হা হাঃ!
ফল-পাকড়টা পাই,
ছুরি দে ছাড়িয়ে খাই;
আমি তো এখানে নাই, যদি, হুঁ হুঁ, জুটে!
ধুঃ—শুনচ তো, বড়মিঞা, ইত্যাদি—
কষ্টে চাইলে দিল্ ভর,
করি গাই মার ধর;
গাঁ গাঁ গাঁ চেঁচিয়ে তারা ল্যাজ তুলে ছুটে!
দিই যদি জোরে তাড়া,
কাণগুলো করে খাড়া;
ছুড়ে ছুড়ে ঠ্যাঙ্ অই ঢিবিটায় উঠে!
ধুঃ—শুনচ তো, বড়মিঞা, ইত্যাদি—

গীতশেষে সেই পরুষপ্রকৃতি রাখাল-বালক চীৎকার করিয়া বলিল,—"কোঁৎকা খাবার তরে মন করিস্ নাকি? হাদে, গরু, বেয়ে চল্।"—শীঘ্রই গরুর পাল লইয়া রাখাল পরেশসিংহের চোকের আড়াল হইল। তখনও তাহার গানের ধুয়া—"শুনচ তো, বড়মিঞা!"—শুনা যাইতেছিল। পরেশ, হয় তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে, নয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কাহারও বাড়ীতে যাইতে মনস্থ করিল; তাই সে গাছে না চড়িয়া যেদিকে সেই ছোক্‌রার গান শুনা যাইতেছিল, সেই দিকে ছুটিয়া চলিল, এবং সত্বরই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

পরেশসিংহকে দেখিয়া বন্যস্বভাব রাখাল-বালক বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল, বলিয়া উঠিল,—"আরে কেরে তুই? কোত্থেকে আস্‌ছিস্? যা'বি কোথায়?" পরেশ বলিল,—"আমি বনে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।"

রাখাল-বালক—"কা'র কাছে? বাবার?"

পরেশ—"বাবা কে?"

রাখাল-বালক "আরে, সেইত আমাদের মুনিব, সর্দ্দার, মোড়ল।"

পরেশ "রাত হ'য়ে পড়ছে, আমি এখন কোন জায়গায় থাক্‌তে পেলেই বাঁচি! তবে তুমি যদি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতে পার, তা'হ'লে আমি তোমায় বক্‌শিশ্ দোব।"

রাখাল-বালক তাহার "বাড়ি"টার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমার বাবা, তাঁর নাম কি?"

পরেশ—"এই দেশের রাজা আমার বাবা।"

রাখাল—"বাবাই তো এই দেশের রাজা। আবার রাজা কে? ছোক্‌রা, মিথ্যেকথা বলছো কেন?"

পরেশ। আমি সত্য কথাই বল্‌ছি।

রাখাল-বালক পরেশের কথায় কাণ না দিয়া তাহার আপাদমস্তক খর নজরে দেখিতে লাগিল। তাহার পর বলিল,—"আমাকে আগেই বক্‌শিশ্ দাও, তোমার ঐ কোমরবন্ধটা যদি তুমি আমাকে দাও, তা'হ'লে আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দোব।"

পরেশ। এটি আমার বাবা আমাকে দিয়েছেন, তাই এটি আমি কাউকে দিতে পারি নে। আজ আমার ভারি লোক্‌সান হয়েছে—ভাল কথা মনে পড়েছে, তুমি আজ একগাছি সোণার সুতো কোথাও গাছে লট্‌কান আছে, দেখেছ?

রাখাল। সোণার সুতো?—সে কি? আমি তো এই গাইগুলোকে ছাড়া সকালথেকে আর কিছুই দেখি নি। যা'ক ও কথা, শুনচ, তোমার ও কোমরবন্ধটা আমাকে দাও। দাও, দাও, ঝট্ করে দিয়ে ফেল, নয়ত দেখেছ এই কোঁৎকা!—এর বাড়ি এমন দোব যে, মাথা ফেটে দোফাঁক হ'য়ে যাবে।

এই বলিয়া সে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া "বাড়ি" উঁচাইয়া পরেশের কাছে আগাইয়া আসিল।

পরেশ। সরে যা' ব'ল্‌ছি, আমায় ছুঁস্‌নে।

রাখাল। ছোঁব না? ছোঁব না? কেন, তোকে ভয় ক'রবো না কি? দেখিচিস্ মুষল! এটা তোর ওই কোঁক্‌ড়ান চুলের মধ্যে বসিয়ে দিলে কেমন হ'বে?

এই বলিয়া দুষ্ট রাখাল-বালক সেই বাড়িগাছটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ক্রমে ক্রমে পরেশের কাছে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

"এই এক, এই দুই—যেই আমি তিন ব'লব, অম্‌নি যদি তুই কোমরবন্ধটা খুলতে সুরু না করিস্, তা' হ'লে আমি একটু কষ্ট ক'রে ওটা নিজেই খুলে নোব, আর তোকে এখানে ছেড়ে

চ'লে যা'ব—বাঘের, গরুর গোস্তর চেয়ে, তোর মাসটাই লাগ্‌বে ভাল। এক—দুই—"

পরেশ। পাজি, ডাকাত, তোকে এই কোমরবন্ধটা দেওয়ার চেয়ে আমি শেষপর্য্যন্ত তোর সঙ্গে লড়ে ম'রব। দেখ্, ভাল চাস্ তো সরে যা' বল্‌ছি।

"এই তিন" চীৎকার করিয়া ঐ কথা বলিয়া সে তাহার মোটা বাড়িগাছটা তুলিয়া পরেশের মাথালক্ষ্য করিয়া মারিল। কিন্তু পরেশ মুহূর্ত্তমধ্যে একপাশে সরিয়া যাওয়াতে সে আঘাত তাহাকে লাগিল না, এবং সেই দুর্দ্দান্ত বালক সাবধান হইতে না হইতেই তড়িৎগতিতে পরেশ তাহাকে ল্যাঙ মারিয়া ঘাসের উপরে ফেলিয়া দিয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল। রাখালবালক পরেশের হাত ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার হাতহইতে বাড়ি-গাছটা খসিয়া পড়িল, পরেশ তাহা মুঠাইয়া রাখাল বালকের মাথার উপরে ধরিয়া বলিল,—"তুই যদি দিব্যি করিস্ যে, আমাকে আর কিছু কর্‌বি না, তা'হ'লে আমি তোকে ছেড়ে দোব; নইলে তোকেই আমি বাঘের মুখে ফেলে রেখে যা'ব।"

রাখাল-বালক বলিল,—"দেখ্‌ছি, তোমার গায়ের জোর আমার চেয়ে বেশী। গলা ছেড়ে দাও, গলা ছেড়ে দাও, নইলে আমি দম্‌বন্ধ হ'য়ে মারা যাই। আমি দিলেশা ক'রছি, তোমাকে পথ দেখিয়ে দোব।"

পরেশ। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস না করলেও, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌লুম। ওঠ।

রাখাল-বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপীটা তুলিয়া মাথায় দিল; কিন্তু পরেশ তাহাকে তাহার বাড়ি-গাছটা ফিরাইয়া দিল না। বলিল,—"তুমি আমাকে কারু বাড়ী দেখাইয়া না দিলে, এটা ফেরৎ পা'বে না।"

রাখাল-বালক মুখ-ভারি করিয়া বলিল,—"এস।"

পরেশ। তোমার নাম কি?

রাখাল-বালক। আমি সড়কীদিয়ে একটা চিতেবাঘ মেরেছিনু ব'লে, লোকে আমাকে চিতু চিতু ব'লে ডাকে।

পরেশ। চিতু, তুমি আমাকে খুন ক'রতে এসেছিলে কেন?

চি। আমার ঐ কোমরবন্ধটা দেখে বড় লোভ হ'য়েছিল।

প। কিন্তু খুন-ডাকাতি যে মহাপাপ।

চি। লোকে আমার কাছে যা' পায়, কেড়ে নেয়, তা'দের এই গাইগুলোকে যদি আমি না দেখি, তবে তারা কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবে?—খুনই ক'রে ফেল্‌বে।

প। চিতু, তোমার ঈশ্বরকে ভয় করা উচিত।

চি। ঐ নামটা শুন্‌লেই আমার গা কাঁপে। বাবার রাগ হ'লেই, সে ঐ নামটা করে। কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত ওটা যে কি, তা'ত বুঝতে পারলুম না।

প। বল কি, চিতু? তোমার বাপ-মা তোমাকে ঈশ্বরের কথা বলেন নি? বলেন নি যে, তিনিই তোমাকে, আমাকে, সব জিনিস তৈরি করেছেন, তিনি আমাদের ভালবাস্‌তে, ভালবাসা পেতে, আর ন্যায়বান্ দেখ্‌তে চান?

চি। আমার মাও নাই, বাপও নাই; ভাইও না, বোনও নাই। ঈশ্বর কে, আমি ত জানি নে। এই গাইগুলো ছাড়া কে আর আমার ওপর মায়া করে?

পরেশ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল,—"আহা, বেচারা! ভারি দুঃখের কথা ত! এই নাও, আমার কাছে যে একটী মোহর আছে, তা তোমায় দিলুম। আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, আমার আর তোমার ওপর রাগ নেই।"

এই বলিয়া পরেশ চিতুকে একটা মোহর দিল।

চিতু তখন আনন্দসূচক একপ্রকার শব্দ করিয়া আবার "শুনচ তো, বড়মিঞা!"—গান জুড়িয়া দিল।

সে তাহার খস্‌খসে হাতের চেটোর উপর মোহরটা রাখিয়া একপ্রকার আপন মনেই বলিয়া উঠিল,—"আর তো আমাকে কেউ মোহর দিতে চাই নি।"—তাহার পর, সে পরেশকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা ভাঙালে ক'গণ্ডা পয়সা পা'ব?"

পরেশ একটু হাসিয়া উহার মূল্য কত, তাহা তাহাকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিল; শুনিয়া রাখাল-বালক অবাক্ হইয়া গেল, এবং উহাদিয়া কি কি কিনিবে, ভাবিতে লাগিল। শেষে সে সাব্যস্ত করিল যে, উহাদিয়া "রোহিণীর হাটে" গিয়া একটী ভাল গাই কিনিয়া আনিবে। অতঃপর সে মোহরটা লুকাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল; অবশেষে সে তাহা তাহার টুপীর মধ্যে লুকাইয়া কতক নিশ্চিন্ত হইল। পরে, পরেশের উদ্দেশে বলিল,—"ঐ যে গড়টা দেখছেন, ঐ যে, যেটা পাহাড়ের মত আকাশে যেন মিলিয়ে গেছে। দশ-বার-ক্রোশের মধ্যে কেবল ঐ বাড়ীটাই আছে। আমরা ওখানে শিগ্‌গিরই গিয়ে পঁউচোব।" তাহার পর, কেহ না শুনিতে পায়, এমনই চুপি চুপি বলিল,—"ওখানে গিয়ে, আমার কথাটা শুনবেন, বাবার কাছথেকে, যত ঝট্‌পট্ পারবেন, সরে পড়বার চেষ্টা করবেন, কারণ—" এই বলিয়া সে যেন কোন গুপ্তকথা জানে তাহা বুঝাইবার জন্য কেমন একরকম করিয়া চোক মট্‌কাইতে লাগিল।

পরেশ। কেন? তা'হ'লে কি হবে?

চিতু। কিছু হ'বে না, কিছু হ'বে না। তবে চিতুর কথাটা শুন্‌বেন। বাবাকে বল্‌বেন আপ্‌নি ভিখিরী। কোমরবন্ধটা জেবের ভেতর লুকিয়ে রাখ্‌বেন। তার সঙ্গে থাক্‌তে পিতিজ্ঞে করবেন, কিন্তু সুবিধে পেলেই ফুস্ ক'রে সরে পড়বেন। তার চোকে ধুলো দেবেন, আমি তাই করি।

পরেশ। আমি তা' কখন করি না। কে যেন আমায় সর্ব্বদা বলে, যা'ই হ'ক না কেন—

"মিথ্যে কইলে, মুখ কালো ;
তার চাইতে মরা ভাল !"

চিতু। হা হা হা! বাবার সঙ্গে দিনকতক থাকৃতেন তো টের পেতেন। সে আপনাকে আর এক ছড়া শিখিয়ে দেবে!

পরেশ। চিতু, তুমি যদি আমার সঙ্গে একবাড়ীতে থাক, তা'হ'লে আমি বড় খুসী হ'ব। আমি তোমাকে খুব ভালবাসবো, তুমি যা'তে ভাল হতে পার, সে উপায় ব'লে দোব। আর ঈশ্বর, যিনি ঐ ওখানে থাকেন, ওঁর কথাও বলবো।

মেঘ গুড়্‌গুড়্ করিতে লাগিল। চিতু বলিল,—"ঐ শোন! ওকি ঈশ্বর কথা কইচেন?"

পরেশ উত্তর করিল,—"হাঁ উনিই কথা কইচেন। তুমি যদি শোন্‌বার চেষ্টা কর, তা' হ'লে তুমি শুন্‌তে পাবে যে, তিনি কেমন ধীরমধুরস্বরে তোমার সঙ্গে কইচেন।"

চিতু বলিল,—"আমি তা কখন শুনি নি; কিন্তু আমি আর থাকৃতে পাচ্ছি না। গাইগুলো সব কোথায় ছোট্‌কে যা'বে; একটা কালো গাই আছে, সেটা বড় পাজি, অন্য গাইগুলোকে ছোট্‌কে দেয়। রাজকুমার, এখন চিতুকে বাড়িগাছা দিন, আমার আর কিছু নাই।"

পরেশ। এই নাও, ভরসা করি আজথেকে তুমি আর এটার কোন মন্দ ব্যবহার ক'রবে না। চিতু, তুমি কি ভাল হ'তে চেষ্টা করবে? কর যদি, তা'হ'লে তুমি সুখী হ'বে।

চিতু। হুঁ, আমি গাইগুলো নিয়ে যখন বাড়ী পঁউচই, আর বাবা আমাকে মারে না, তখন আমি সুখী হই। আমি তবে চল্লুম। আপনি যে আমায় মোহরটা দিয়েচেন, তা' কাউকে ব'লবেন না। তারা জা'নতে পা'রলে কেড়ে নেবে।

সে গাইগুলার খোঁজ করিতে বনের ভিতর ঢুকিয়া গেল। পরেশ তাহার "শুনচ তো, বড়মিঞা"—গানের সুর ক্রমে ক্রমে দূরে গিয়া মিলাইয়া গেল, শুনিতে পাইলেন। আবার ভয়ানক শব্দে মেঘগর্জ্জন করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। তাহাতে পরেশ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। গড়ের উপরে এখন একটি বাতি জ্বলিয়া উঠিল, তাহার আলোক-লক্ষ্য করিয়া পরেশ ছুটিয়া চলিল। ছুটিতে ছুটিতে সে ভাবিতে লাগিল,—"বেচারা চিতুর চেয়ে আমার স্বভাব ঢের মন্দ, কারণ কি করা উচিত, তা আমি জানি, তবুও তা করি নি। চিতু যে মধুর স্বর শুন্‌তে পায় না, আমি তা' শুন্‌তে পেয়েও কাণ দিই নি। বাবা, বাবা, তোমার কথা আমি কেন শুনি নি!"

(ক্রমশঃ।)

"বিদ্যাসাগর"-বৃত্তি।
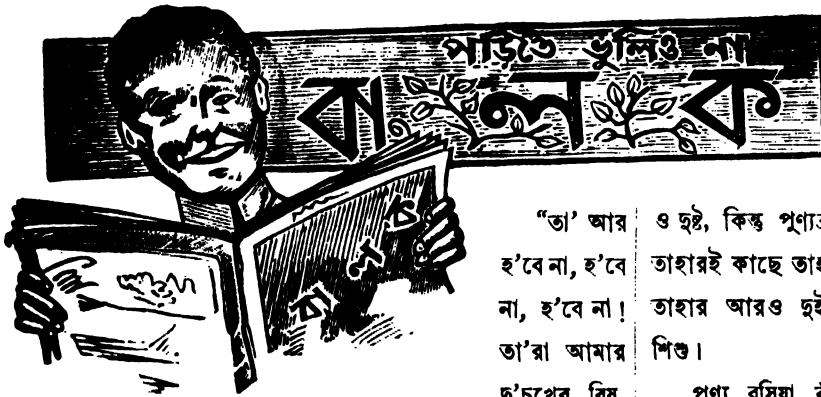
"তা' আর হ'বে না, হ'বে না, হ'বে না! তা'রা আমার দু'চখের বিষ, আমিও তা'দের দু'চখের বিষ।"—এই কথাকয়টি বলিয়া পুণ্যব্রত তাহাদের বাড়ীর পড়িবার ঘরের মেঝিয়ায় শুইয়া দুইহাতদিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল, তাহার দুই-চক্ষুদিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। পরে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল,—"ওমা, মাগো, তুমি কোথায় গেছ?"

পুণ্যব্রতের বয়স নয়বৎসরমাত্র, একবৎসর হইল তাহার মা ইহসংসারত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতার সে-ই একমাত্র পুত্র-সন্তান, তা'ছাড়া তাহার চারিটী ভগিনী আছে। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সত্যবতীর বয়স এখন সতেরবৎসর, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে এখন শ্বশুরবাড়ী রহিয়াছে। তাহার মধ্যমা ভগিনী স্নেহলতার বয়স এখন বারোবৎসর, সে স্বভাবতঃ একটু দুর্ব্বল ও দুষ্ট, কিন্তু পুণ্যব্রতের সঙ্গে তাহার বড় ভাব, পুণ্যব্রত কেবল তাহারই কাছে তাহার সব মনের কথা খুলিয়া বলে। তাহার পর, তাহার আরও দুইটি যমজ ভগিনী আছে,—তাহারা এখন বড় শিশু।

পুণ্য বসিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময়ে স্নেহ হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"ওমা, তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? কি হয়েছে, রে পুণ্?"

"মেজদি', তুই আবার এখানে এলি কেন? যা' চ'লে যা'! সে কথা তোকে আমি বল্‌তে পারব না; সে কথা যে শুন্‌বে, সেই আমাকে ঘেন্না করবে। কাল আমাকে ইস্কুলথেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু আমি সে কাজ করি নি। মা যদি এ সময়ে বেঁচে থাকৃতেন, তা'হ'লে আমার নাম কে কা'টত, তা' দে'খতুম!"

এই বলিয়া ছেলেমানুষ পুণ্য তাহার মরা মায়ের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইল।

স্নেহ মুহূর্ত্তছই চুপ করিয়া পুণ্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—"পুণু, ভাই আমার, কেঁদো না, কেঁদো না—ওঠ, কি হয়েছে বল ত?"

পুণ্য উঠিয়া বসিল, স্নেহকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মেজদি', আমি কি কখনও মিথ্যে কথা বলেছি? আমি অনেক সময় হাঙ্গামে পড়েছি, কিন্তু আমি কখন মিথ্যে কথা বলি নি—ব'লেছি কি, মেজদি'?"

স্নেহ। না; বাবা সবচেয়ে তোমার কথাই বিশ্বাস করেন।

পুণ্য। মেজদি', হয়েছে কি, শোন্। তুইত জানিস, আমি আমাদের ইস্কুলের জুনিয়ার ক্রিকেট-টীমের কাপ্তেন আর ট্রেসারার, টাকা-পয়সা আমার কাছে থাকে। আমার ত'বিলে কিছুটাকা—কুড়ি টাকা দশ-আনা কম পড়ে, এখন সবাই বল্ছে যে, আমিই ঐ টাকা নিয়েছি। সেদিন আমার কাছে আবার ঠিক কুড়ি-টাকা দশ-আনাই ছিল; ছেলেরা বলে, আমি যে ঐ টাকা-চুরি ক'রেছি, আমার নিজের ঐ কুড়ি-টাকা দশ-আনাই তা'র প্রমাণ। হেড্‌মাষ্টারম'শায় আমায় আজপর্য্যন্ত সময় দিয়েছেন, যদি আমি দোষ-স্বীকার না করি, তা'হ'লে ইস্কুলথেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু আমি চুরি করি নি, আমি কি ব'লব, আমি চুরি করেছি?

স্নেহ জানিত, তাহারা কেহই বাবার নিকটহইতে জলপানির পয়সা বড় বেশি পায় না। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু তুই কুড়ি-টাকা দশ-আনা কোত্থেকে পেলি?"

পুণ্য। তা' আমি তোকেও ব'লতে পা'রব না, মেজদি'। কিন্তু এ টাকা ক্লাবের নয়, আমি রোজগার করেছি।

স্নেহের মুখ গম্ভীর হইল। এ বড় সন্দেহের কথা; তাহার ছোট ভাইএর কাছে আগে একটা আধুলিও ছিল না, কিন্তু যে দিন ক্লাবের টাকা-চুরি গেল, সেই দিনই তাহার কাছে ঠিক ২০৷৵০ই কোথাহইতে আসিল? সে পুণ্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই বাবাকে একথা বলতে পা'রবি?"

পুণ্য। না, না বাবাকেও বল্‌তে পা'রব না। তবে মা থাক্‌লে ব'লতুম্, বাবা সে কথা বুঝ্‌তে পা'রবেন না।

এমন সময়ে পিসি-মা ডাকিলেন,—"পুণ্, মেজ্‌কী, ভাত খেসে।"

তাহা শুনিয়া পুণ্য বলিল,—"মেজদি', তুই কাউকে কিছু বলিস্ নি, আমিই ব'লব।"

ভাত খাইতে বসিয়া স্নেহ ও পুণ্য কেহই কিছু খাইতে পারিল না। তাহা দেখিয়া পিসি-মা বলিলেন, "স্নেহ, আর চারটী ভাত খা'না, মা! দিন দিন রোগা হাড় হো'য়ে যাচ্ছিস্—পেট ভ'রে চাট্টি ভাতও যদি না খাবি, তবে শরীর সা'রবে কিসে?"

স্নেহ। না, পিসি-মা, আর আমি খেতে পাচ্ছি না। আমার বড় মাথা ধরেছে।

পিসি। ঐ, তবেই হ'য়েছে! অসুখ কর আর কি। কাল সমস্তটা দিন পাড়াময় টো টো ক'রে বেড়ালি। মানা কল্লুম, শুন্‌লি না; ঘরে যখন ফিরে এলি, তখন মুখে যেন কালী মেড়ে গেছে। এখন আর কি ক'রবি? যা' শীগ্‌গির শীগ্‌গির শুগে যা'।

স্নেহ একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। সে যে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তা' সত্য, কিন্তু কাল পাড়া বেড়াইয়া তাহার মাথা ধরে নাই। বলিল,—"হ্যাঁ, পিসি-মা, আজ আমি একটু পরেই শুতে যাব।"—তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়াছে।

২

বৈঠকখানাহইতে পুণ্যের পিতা হাঁকিলেন, "রোগো (চাকরের নাম), পুণ্যকে একবার আমার কাছে ডেকে দেত।"—এই বলিয়া তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একখানা চিঠি পড়িতে লাগিলেন।

পুণ্য তখন আঁচাইতেছে, রগু আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, বাবু তোমায় একবার ডাক্‌ছেন।"

পুণ্য তাড়াতাড়ি কুল্‌কুচি করিয়া, কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিতে মুছিতে পিতার কাছে উপস্থিত হইল।

"পুণ্য!"

"বাবা।"
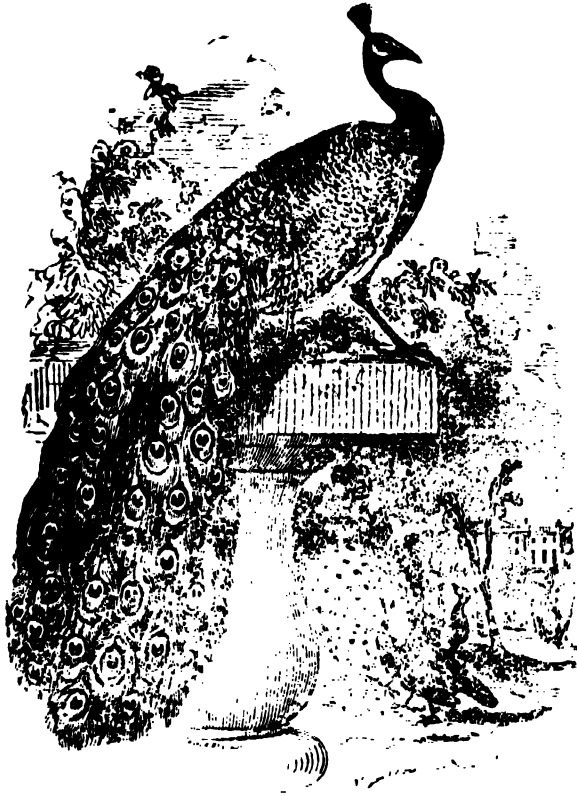
"এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ।" এই বলিয়া পুণ্যের পিতা তাহার হস্তে সেই চিঠিখানি দিলেন। পুণ্য কম্পিতহস্তে চিঠিখানি লইল। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, তাহার বাবা তাহার দিকে এখন বড় খর নজরে দেখিতেছেন। চিঠিখানিতে এই কথাগুলি লেখা ছিল,—

"মহাশয়,

আপনাকে এই চিঠিখানি লিখিতে হইতেছে বলিয়া, আমি বড় দুঃখিত। এই স্কুলের জুনিয়ার ক্রিকেট-টীমের আপনার ছেলে ট্রেজারার। ঐ টীমের তহবিলহইতে ২০।৶০ কম পড়িয়াছে। আপনার ছেলেকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলে যে, সে সে বিষয়ে কিছুই জানে না। কিন্তু তাহার পকেটেই ২০।৶০ পাওয়া যায়। ঐ টাকা সে কোথাহইতে পাইয়াছে, বলিতে চাহে না। একটা কৈফিয়ৎ পাওয়া দরকার, নতুবা আমি উহার নাম কাটিয়া দিতে বাধ্য হইব। ইতি—

বশম্বদ

এস্, সি, বোস্,

হেড মাষ্টার।"

পুণ্য চিঠিখানা পড়িয়া ফিরাইয়া দিল।

পিতা। এখন কি বল, পুণ্য ?

পুত্র। আমি টাকা নিই নি ; আমার কাছে ২০।৶০ আছে, কিন্তু আমি কি ক'রে তা' পেয়েছি, তা' ব'লতে পারব না, বাবা।

পুণ্যের পিতার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সন্তানদের উপর বিশ্বাস করিতে ভাল বাসিতেন এবং তাহা করিয়া এযাবৎ তিনি সুফলই পাইয়াছেন।

তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"কি বলিস্ রে! আমার কাছেও বল্‌তে পা'রবি নি ?"

পুণ্য। না, বাবা।

পিতা। তা' বেশ! তবে নাম-কাটা যা'ক ; আমি কি ক'রব?

পুণ্যের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

পিতা। আচ্ছা, এখন যাও। পড়বার ঘরে গিয়ে যতক্ষণ না আমি যাই, ততক্ষণ পড়্‌গে।

পুণ্য দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। পড়িবার ঘরে গিয়া কিন্তু সে টেবিলে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে দেখে নাই যে, সেই ঘরে তাহার পিসিমাও বসিয়া শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন। পুণ্যেরা খ্রীষ্টিয়ান।

পুণ্য কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার মনে বকিতে লাগিল,—"মা— মাগো, তোমার কথা রাখ্‌তে পারলুম না ; সব উল্টো-পাল্টা হ'য়ে গেল। মা, একবার ফিরে এসো, মা।"

পিসি বলিলেন,—"পুণ্য, ওঠ, ওঠ। বেটাছেলের অমন ক'রে কাঁদ্‌তে আছে কি ?—ছি!"

পুণ্য মুখ তুলিয়া দেখিল।

"পিসিমা, তুমি এখানে, আমি তা' দেখি নি। সে কথা শুন্‌লে তুমিও হয়ত মনে করবে যে, আমি দুষী—সবাই তাই মনে ক'রবে।"

পুণ্য কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাপারখানা পিসিমাকে জানাইল। শেষে সে রাগিয়া উঠিয়া বলিল,—"আচ্ছা দেখে নেবো—কেমন হেড্‌মাষ্টার—কেমন সব ছেলে। এর শোধ তু'লবই তু'লব।"

পিসি বলিলেন,—"তোমার মা বেঁচে থাক্‌লে, 'শোধ তু'লব' এ কথাটা কি মুখে আনতেন, পুণ্য ?"

"মা? না, মা বেঁচে থাক্‌লে আমি সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারতুম, যে কথা আমি কাউকে ব'লছিনে, সে কথা কেবল মা-ই বুঝ্‌তে পার'তেন।"

"তোমার কি হেড্‌মাষ্টার আর ক্লাবের ছেলেদের ওপর বড় রাগ হয়েছে, পুণ্য ?"

"রাগ হবে না ? আমি কক্‌খোনো তা'দের ক্ষমা ক'রব না। বড় দুঃখ দিয়েছে।"

পিসিমা মেজের কাছে গিয়া একটুক্‌রা কাগজে কালীদিয়া কি লিখিলেন। তাহার পর, তাহা মুড়িয়া পুণ্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "পুণ্য, একটা উপায়ে তুমি তাদের ওপর শোধ তুল্‌তে পার, সে উপায়টা বড় চমৎকার।"

তাহার পর, তিনি সে ঘরহইতে চলিয়া গেলেন, যাইবার সময়ে আস্তে আস্তে দরজা ভেজাইয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে, পুণ্য কাগজখানা খুলিয়া পড়িল, লেখা আছে—"আমার ভ্রাতা আমার নিকটে অপরাধ করিলে, কতবার আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ?—সত্তরগুণ সাতবারপর্য্যন্ত।"

পুণ্য আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"ক্ষমা ক'রব! ইস! কক্‌খোনো না—কক্‌খোনো না!"

৩

সেইদিন সন্ধ্যার পর, পুণ্যের পিতা—প্রিয়ব্রত বাবু—তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সদু, (সৌদামিনী) তোমার সঙ্গে আমার গুটিকতক কথা আছে, এখন তোমার সময় হ'বে কি ?"

"হ্যাঁ হ'বে, দাদা, এখন আমি কিছুই কচ্ছি না।" দুইজনে বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন। প্রিয়বাবুর মানসিক উদ্বেগের নিদর্শনসকল তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিতে লাগিল। শেষে তিনি বলিলেন,—

"আমি পুণ্যের সম্বন্ধে ক'টা কথা বল্‌তে চাই। সে কি তোমায় কিছু ব'লেছে? এর আগে আমি তা'র কথায় কখনও সন্দেহ করি নি, আজই বা করি কেন? সে যে ঐ টাকা নেয় নি, তা' সে বেশ জোর ক'রেই ব'লছে; কিন্তু তা'র কাছে যে টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে, তা' সে কোত্থেকে পেয়েছে, কিছুতেই ভা'ঙছে না।"

সৌদামিনী বলিলেন,—"আমিও জোর ক'রে সে কথাটা

জা'নবার চেষ্টা করি নি। সে বলে, এক তা'র মার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে সে কথা বল'তে পারে না।"

"তবে, আমি এখন ওকে নিয়ে কি করি! ইস্কুলে ত নাম কেটে দিলে, ওর তো একটা কিছু করা চাই?"

"স্নেহকে আমি যেমন পড়াই, ওকেও পড়া'ব। দু'জনের মধ্যে বয়সের তফাৎ তত নাই, আর পুন্যুকে আমি একদিন না দেখ্‌লে, তুমি তো জান, দাদা, আঁধার দেখি। তাই, বোধ হয়, আমার তত্ত্বাবধানে থাক্‌লে, ওর ভালই হ'বে।"

"তাই কর, সদু, তুমিই ওকে কিছুদিন পড়াও। ডাক্তার ব'লছিল ছেলেটার শরীরটা তত ভাল নাই, এইজন্যে এখন আমি ওকে কোন বোর্ডিংএ দিতে পা'র'ছি না।"

নয়টা বাজিলে, সৌদামিনী শুইতে গেলেন। তিনি ছেলেদের লইয়া শুইতেন। পুণ্য ঘুমায় নাই, বিছানার উপর বসিয়া চারিদিকে পাগলের মত চাহিয়া দেখিতেছে।

"আমি নিই নি, স্যার! মিথ্যে কথা! মা, মাগো, তুমি কেন আমায় ছেড়ে চ'লে গেছ?"

"পুনু, এখনও বকবক্ কচ্চিস কেন, বাবা? নিস্ নি ত, নিস্ নি। কে বলছে তুই নিয়েচিস্? শুয়ে পড়, শো, ঘুমো, আর রাত জাগে না, ঢের রাত হয়েছে।"

"আমি চুরি করি নি, স্যার! এ আমার নিজের টাকা।"

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন হইলেন। পুণ্যের কাছে গিয়া তাহার গা ছুঁইয়া দেখেন, খুব জ্বর হইয়াছে, তাই সে ভুল বকিতেছে।

তিনি ছুটিয়া প্রিয়বাবুর কাছে গেলেন। বলিলেন,—"দাদা, এখন গিয়ে দেখি, পুনুর খুব জ্বর, সে ভুল ব'ক্‌ছে। আজ আবার স্নেহর শরীরটাও ম্যাজ্‌ম্যাজ্ ক'র্‌ছে।"

ঐ কথা শুনিবামাত্রই প্রিয়বাবু ভগিনীর সহিত তাড়াতাড়ি ছেলেদের শুইবার ঘরে আসিলেন। তখনও পুণ্য বিছানার উপর বসিয়াছিল। তাহার পিতাকে আসিতে দেখিয়া বড়ই কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল,—"স্যার, আমার নাম কেটে দেবেন না; আমি টাকা-চুরি করি নি।"

তাহার পিতা দৃঢ়ভাবে আদেশ করিলেন, "পুণ্য, শোও, আর ব'সে থেক না।" পরে বলিলেন,—"ডাক্তার ঠিক ব'লেছিল, ছেলেটার অসুখই ক'রেছে। সদু, সরকারকে একবার ডাক্তারের কাছে পাঠাও।"

সৌদামিনী তাহাই করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই সরকার ডাক্তারকে লইয়া উপস্থিত হইল। রামসদয়বাবু এই পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক। তিনি পুণ্যকে দেখিয়াই মাথা নাড়িলেন। আপন মনে বলিলেন,—"ম্যালেরিয়ার মত ঠেক্‌ছে, আর ইস্কুলের ব্যাপারটা মাথাটাও একটু খারাপ করেছে।"

পুণ্য শুইয়াছিল, আব একবার উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল,—"স্যার, আমার নাম কেটে দেবেন না; আমি টাকা-চুরি করি নি।"

ডাক্তার বলিলেন,—"ভয় কি, পুনু, সব ঠিক হ'য়ে যা'বে। খাও দিনি এইটে, খেয়ে শুয়ে পড়, বুঝেছ?"

এই বলিয়া ডাক্তার পকেটহইতে একটি শিশি বাহির করিয়া তাহাহইতে একদাগ ঔষধ পুণ্যকে পান করাইয়া দিলেন।

পুণ্য শান্তভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িল। বালিশে মাথা দিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল,—সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময়ে, সৌদামিনী বলিলেন,—"ডাক্তার-বাবু, স্নেহকেও একবার দেখুন। ওরও শরীরটা আজ ভাল ঠেক্‌ছে না।"

ডাক্তার গিয়া দেখিলেন, তাহারও ম্যালেরিয়া, তবে আজ ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই।

৪

সমস্ত রাতই পুণ্য বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতে ও ভুল বকিতে লাগিল। কখন স্নেহের কথা বলে, কখন পিসিমার কথা বলে, কখন "বিদ্যাসাগর-বৃত্তির" কথা তুলে, আর মাঝে মাঝে "স্যার, আমার নাম কেটে দেবেন না, আমি টাকা-চুরি করি নি"—এই কথা বলিতে থাকে।

ডাক্তার ও প্রিয়বাবু সমস্ত রাত তাহার কাছে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে প্রিয়বাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কেমন দেখ্‌ছেন?"

ডাক্তার "হুঁ" "হাঁ" করিতে থাকেন, বড় কিছু বলেন না। শেষে বলিলেন,—"কাল ব'লব; তবে ম্যালেরিয়া জ্বর, বিশেষ ভয়ের কারণ কি?"

(পরসংখ্যায় সমাপ্য।)

কেন?

১। **দুধ টকিয়া যায় কেন?** দুধের জীবাণুগুলা বড় হইতে পাইলেই দুধ টকিয়া যায়। দুধ জাল দিয়া যদি কোন কিছুতে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে যতই বাসী হউক না কেন, সবরকম জলহাওয়ায় ঠিক থাকিবে। কারণ দুধ জাল দিলে দুধের সব জীবাণু—এমন কি যে জীবাণুগুলা দুধ টকায়, সেগুলা-পর্য্যন্ত—মরিয়া যায়। বাতাসে যদি বেশী তাপ ও তড়িৎ থাকে, তাহা হইলে জীবাণুগুলি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। জীবাণুগুলি উদ্ভিজ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উদ্ভিজ্জ তাপ ও তড়িৎসংযোগে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে।

২। **দর্জ্জির আঙ্গুস্তানার মাথা ফাঁক থাকে কেন?** দর্জ্জিদের অনেক মোটা মোটা কাপড় তাড়াতাড়ি সেলাই করিতে হয়, বলিয়া তাহারা আঙ্গুস্তানার মাথা-দিয়া ছুঁচ না ঠেলিয়া গা-দিয়া ঠেলে, এইজন্য তাহাদের আঙ্গুস্তানার মাথা ঢাকা রাখিবার দরকার হয় না।

কোম্বাটোর-কৃষি-কলেজ। *

[Agricultural Journal of Indiaর একটী প্রবন্ধ-অবলম্বনে সম্পাদকের সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে লিখিত।]

বালকের অনেক পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন যে, কৃষি-বিদ্যার বিজ্ঞানানুমোদিত ও সুপ্রণালী-শুদ্ধ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; অতীতকালে ও বর্ত্তমানে কৃষিকর্ম্ম যে প্রকারে চলিয়াছে ও চলিতেছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ চলিলেই প্রচুর হইবে। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, এইরূপ একটি বিষয়ে মনুষ্যেরা কৃষীবলকুলের পরম্পরাগত ও অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের প্রচুর পরিমাণে অধিকারী হইয়াছে তথাপি সেই জ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সংযোগ-সাধন করিলে যে, অধিকতর সুফল ফলিতে পারে, তাহা প্রভূত পরিমাণে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কোম্বাটোর-নামক স্থানে যে একটি সরকারী কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। এই কলেজ বিগত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাসে যথারীতি খোলা হয়, ইহাতে এক্ষণে ৬০ জন ছাত্রের স্থান-সংকুলান হয়। ইহাতে যত ছাত্রের স্থান-সংকুলান হয়, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক বালক ভর্ত্তি হইতে আসে, সেইজন্য কলেজের অধ্যক্ষ সবিশেষ সতর্কতাপূর্ব্বক আবেদন-কারীদের মধ্যহইতে ষাইটজন ছাত্রকে বাছিয়া লন। কলেজ-গৃহটি যে কি সুগঠিত ও সুন্দর, তাহা চিত্রটিতে একবার কটাক্ষপাত

কোম্বাটোর-কৃষি কলেজ

করিলেই, বুঝিতে পারা যায়। অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ কলেজ-মন্দিরেই বাস করিয়া থাকেন। ঐ কলেজ-সদনে কেবল যে শ্রেণী-কক্ষগুলিই আছে, তাহা নহে, বিজ্ঞানবিষয়ক কলেজসমূহে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিদ্বারায় সুসজ্জিত যেমন পরীক্ষাগার থাকে, এই কৃষিকলেজেও তেমনি আছে। আমরা এই বিজ্ঞানাগারগুলিরও চিত্র দিলাম, এইস্থানে বিদ্যার্থীরা রসায়ন, উদ্ভিজ্জবিদ্যা ও প্রাণিতত্ত্ব-শিক্ষা করে।
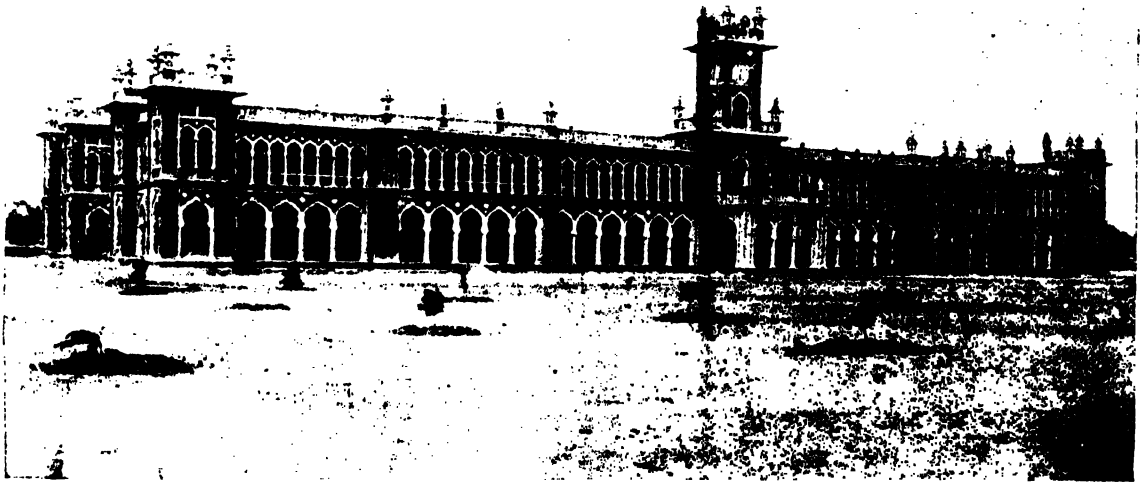
সেইজন্যই এক্ষণে সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই কৃষি-কলেজাবলী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ঐ সমস্ত কলেজে গিয়া, চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থীরা যেমন মেডিক্যাল কলেজে গিয়া চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষা করে, তেমনই কৃষি-বিদ্যা-শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে কৃষিবিদ্যা-শিক্ষা করিতে পারে। কৃষির উপর ভারতের ভবিষ্যোন্নতি এতটা পরিমাণে নির্ভর করিতেছে যে, ঐ বিদ্যার উন্নতিকল্পে ভারতের নানাস্থানে কি কি করা হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য হয়ত বালকের অনেক পাঠকই আগ্রহ ও ঔৎসুক্যপ্রকাশ করিবেন।

বর্ত্তমান নিবন্ধে আমারা মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত

কিন্তু কৃষিবিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে, ছাত্রদিগের হাতে-কলমে কাজ করিয়া ঐ বিদ্যাটি শিক্ষা করা উচিত। চিকিৎসা বিদ্যার্থীরা যদি কেবল পুঁথিগত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে লব্ধ

* এই সচিত্র প্রবন্ধটির চিত্রগুলিও Agricultural Journal of Indiaর সম্পাদকের অনুমতিক্রমে উক্ত পত্রিকাহইতে গৃহিত হইয়াছে

বিদ্যালাভ করিয়া তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষা বড়ই অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, ফলে রোগিনিবাসের রোগীদিগের কক্ষে কক্ষে গিয়া যেমন তাহাদের অভিজ্ঞতা-সমন্বিতা ও কার্য্যকরী-শিক্ষা-লাভ করিতেই হয়, তেমনই কৃষিবিদ্যার্থীদিগকেও ক্ষেত্রে গিয়া হাতেকলমে কাজ শিখিতে হয়। এইজন্য কোম্বাটোর কৃষি-কলেজের সহিত সংলগ্ন কিঞ্চিদূর্দ্ধ ১৩৭১ বিঘাপরিমিত একটি ক্ষেত্র আছে, সেখানে সকলপ্রকার কৃষিকার্য্য চলিয়া থাকে। কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা হয়। বিভিন্ন ফসলের নিমিত্ত বিভিন্নপ্রকৃতির ভূমি আবশ্যক, একই প্রকারের জমীতে সব ফসলেরই চাষ করা যায় না। এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৩৫ বিঘারও কিছু

কোম্বাটোর কৃষি-কলেজ (প্রিন্সিপালের বাঙ্গালা হইতে যেরূপ দেখা যায়)।

জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় পরীক্ষাগার

বেশী জমী একটি পুষ্করিণীহইতে নালা কাটিয়া জল আনিয়া আদ্র রাখা হইয়াছে, কিঞ্চিদধিক ৩৭২ বিঘা-পরিমিতা ভূমি "কালামাটী"-পূর্ণা, উহাতে শালগম ও তুলা বেশ জন্মে, এবং কিছুবেশী ৭৮০

উদ্ভিজ্জবিদ্যাসম্বন্ধীয় পরীক্ষাগার।
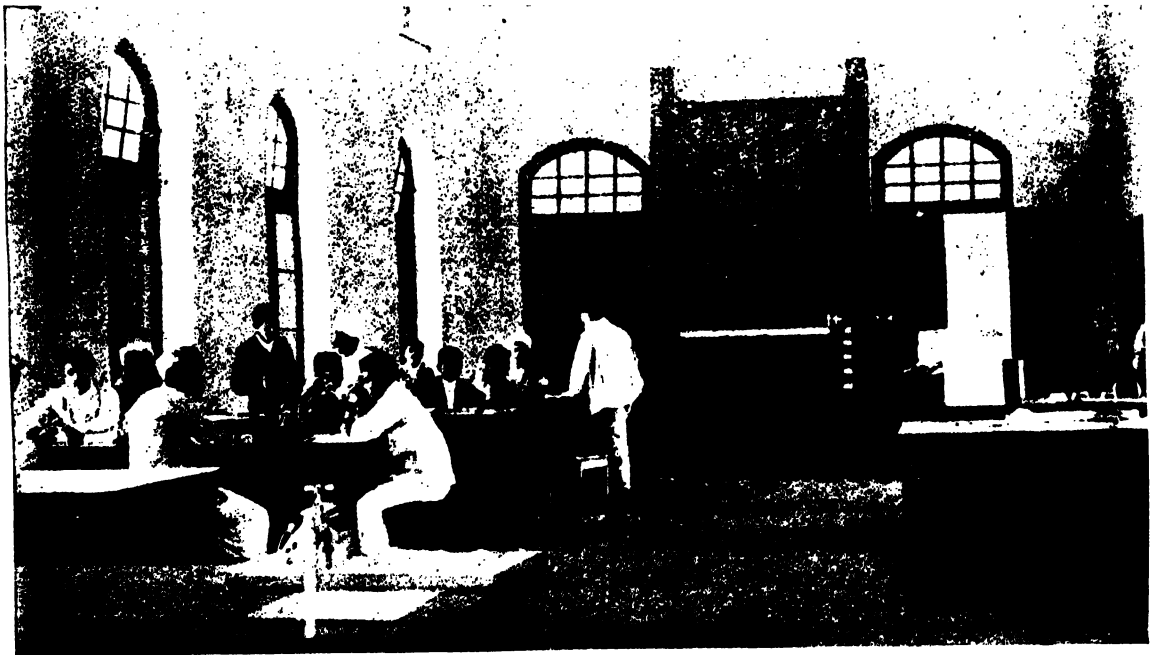
বিঘা-পরিমিতা ভূমি "রাঙামাটী"-পূর্ণা, উগার কিয়দংশে কলেজ গৃহাবলী স্থাপিত, কিয়দংশে রবিশস্য জন্মে, এবং কিয়দংশে বাগ-বাগিচা আছে। অর্থাৎ ঐ কৃষি-কলেজের ভূমিতে কিছু উৎপন্ন করিতে চাহিলে, ইঁদারাহইতে জল 'পাটাইয়া' চাষ করা যাইতে পারে, ঐরূপে চাষ করাই ঐ জেলার বিশিষ্ট পদ্ধতি; ঐরূপ ভূমিতে সম্বৎসর অনবরত চাষ চলে, কিন্তু শুষ্ক ভূমিতে বৎসরে একবারমাত্র ফসল হয়। এইরূপে ছাত্রেরা বিবিধপ্রকার কৃষিকর্ম্মসম্বন্ধে
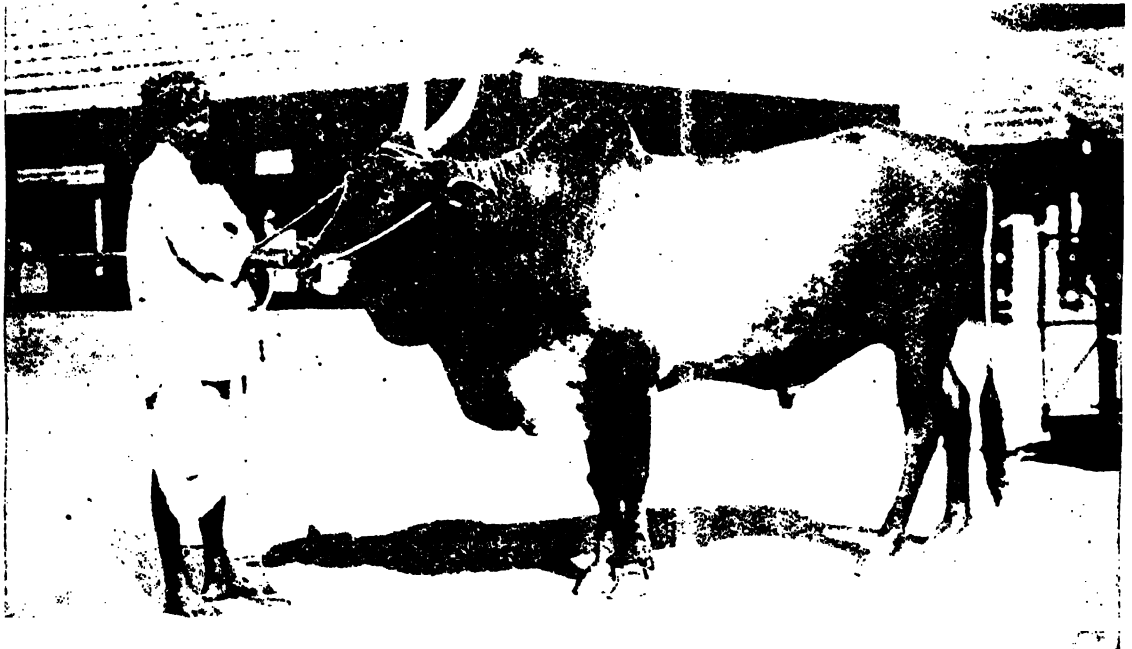
কোম্বাটোর-কৃষি-কলেজের ষাঁড়।

অভিজ্ঞতা-লাভ করে; ভবিষ্যতে স্ব স্ব অদৃষ্টক্রমে তাহাদের যেখানে গিয়াই কৃষি-পরিদর্শন করিতে হউক না কেন, ঐ অভিজ্ঞতা তাহাদের প্রচুর ফলোপধায়িনী হয়।

কোম্বাটোরস্থ সরকারী কৃষিক্ষেত্রের গাভী।

যেমন কলেজের শ্রেণীতে ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে, তেমনই কলেজসংশ্লিষ্ট কৃষিক্ষেত্রেও অনেক কৃতী শিক্ষক আছেন, তদ্ভিন্ন সকলপ্রকারের কৃষি-যন্ত্রাদিও যোগান হইয়াছে। ৩০ জোড়া বলদ, ৩টি সহজে স্থানান্তর করণোপযোগী তৈলচালিত এঞ্জিন, মাড়াই-কল, আখমাড়াইবার কল, পেষকযন্ত্র ইত্যাদি আছে। তাহাছাড়া গোহাল, ছুতার ও কামারশালা ইত্যাদিও আছে। এইরূপ একটি কৃষিক্ষেত্রে গাভীপালন ও বৎসোৎপাদন একটি বিশিষ্ট কার্য্য। যে

প্রাঙ্গণ।

সমস্ত পশু এই প্রকারে পালিত হয়, তাহাদের ভাগ্য কি সুখময়!

কোয়েম্বাটোর কৃষি-কলেজের কয়েকটি গরুবলদ।

আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত নাসাবিকুঞ্চন করিয়া বলিবেন, ছি! কৃষি বড় ইতরবৃত্তি! এইরূপ মনে করা মহাভ্রম। মনুষ্যজাতিকে আহার যোগাইবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের সহকারী হওয়ার অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিপ্রদ কার্য্য আর জগতে কি হইতে পারে? এই কার্য্যে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রজ্ঞা ও মনোবৃত্তি-নিচয় প্রয়োগ করিলে, বাস্তবিকই একটি মহাকার্য্য করা হয়।

-:*:-

হংসমাতা।

১

শীতকালে বঙ্গদেশের নদীতে, ঝিলে ও বিলে হংস-জাতীয় নানাপ্রকার ছোট-বড় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পক্ষী, শীতের আরম্ভেই, দার্জ্জিলিং-পর্ব্বত-বিহারী সাহেব-মেম ও বাবু-বিবিদের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়-পর্ব্বত-মালার "তরাই"-অঞ্চলহইতে "শস্য-শ্যামল" বঙ্গদেশে আইসে, আবার উক্ত সাহেব-মেম ও বাবু-বিবিদের সঙ্গে, শীতের শেষে, গ্রীষ্মের আরম্ভে, পর্ব্বতাঞ্চলে চলিয়া যায়।

শীতকালে পাহাড়ে বড় শীত, বরফ পড়ে; ঝিল, বিল ও হ্রদের জল বড় শীতল হয়; গাছের পাতাপর্য্যন্ত ঝরিয়া পড়ে; কাজেই পাখীদের খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না। আবার শীতকালে বঙ্গদেশে ধান পাকে; বিলে, নদীতে বিস্তর মাছ। এইজন্য হিমালয়-পর্ব্বতের তরাই-অঞ্চলের নানাজাতীয় পক্ষী দল বাঁধিয়া বঙ্গদেশে আসে, আর এককথা বলিয়া রাখি, এই পাখীরা এদেশে বাসা করে না, ও ডিম পাড়ে না

আমরা এক্ষণে একটী "বিগড়ি-হাঁসের" গল্প বলিব।

হিমালয়ের তরাই-অঞ্চলের একস্থানে একটা ছোট ঝিল আছে। এই ঝিলে বারমাসই অল্প-বিস্তর জল থাকে। ঝিলের তীরে, ডাঙ্গায় ও জলে নানাপ্রকারের নলজাতীয় গাছপালা ও অনেক-প্রকার ঘাস। এই ঝিলের ধারে একটা পাথরের আড়ালে বিগড়ি-হাঁসের এক বাসা। ঝিলের একধারের পাহাড়ের ঢালু কাটিয়া রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এই পথে অনেক লোকের চলাচল হয়। কিন্তু ঐ ঝিলের দিকে কেহ চাহিয়াও দেখে না; জলে হাঁস দেখিতে পাইলেও, কচিৎ কোন শিকারী নামিয়া ঝিলে যায়; কারণ পাহাড়ের ঢালু ভাঙ্গিয়া নামা-উঠা সহজ ব্যাপার নহে। ঝিলের চারিধারে, পাহাড়ের গায়ে অনেক আখরোট ও কেলু-গাছ আছে। এই সকল গাছে নানাপ্রকার পক্ষী থাকে। কিন্তু এ সকল পক্ষীও শীতকালে বড় একটা চখে পড়ে না।

ফাল্গুন গিয়া চৈত্র পড়িয়াছে—গাছে নূতন পাতা দেখা দিয়াছে।

অনেক পাখী ফিরিয়া আসিয়া কেলু ও আখ্‌রোট-গাছে বাসা করিতেছে ও করিয়াছে। আমাদের বিগড়ি-হাঁসীর বাসায় দশটী ডিম, এই দশটী ডিম হংস-মাতার অতি স্নেহের ধন, অঞ্চলের নিধি। হাঁসটা নাই—বঙ্গদেশহইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে সে অদৃশ্য হইয়াছে—বোধ হয়, শিকারীরা মারিয়া ফেলিয়াছে। হাঁসী একাই ডিমে তা দেয়, কেবল দুই-একবার ঝিলে গিয়া কিছু খাইয়া আইসে। ডিমগুলির ভিতর যে তরল পদার্থ ছিল, তাহা পক্ষীর দেহে পরিণত হইয়াছে; ফলে পা, ডানা, মাথা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইয়াছে—কিন্তু অপূর্ণ। তবু একটু নড়ে চড়ে। প্রথমে ডিমগুলি, ঈগল-পক্ষীর বাসার ডিমের সঙ্গে যে সকল প্রস্তরখণ্ড থাকে, সেই সকল পাথরের মত অচল ছিল, এখন আপনি নড়ে, যেন পাশ ফিরে। ভিতরে যে প্রাণী আছে, সে যেন আর অণ্ড-পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না।

হাঁসী যখন বাসা ছাড়িয়া আহারের অন্বেষণে যায়, তখন ডিমগুলির উপরে কতকগুলি পালখ চাপাদিয়া যায়। সে পালখ উহারই—নিজের দেহের অনাবশ্যক পালখ ঠোঁটদিয়া তুলিয়া, আমাদের মায়েরা যেমন কাঁথা তৈয়ার করেন, হংসমাতা সেইরূপ একটা কিছু করিয়াছে। তাই আমরা এই পালখ রাজিকে "কাঁথা" বলিব। একদিন হংসমাতা ডিমগুলি কাঁথা চাপা দিয়া রাখিয়া আহার খুঁজিতে যাইতেছে, এমন সময়ে, বাসার একটু দূরে গিয়াই, নলবনে যেন কিছু নড়িতেছে, এইরূপ শব্দ পাইল। পাইয়াও বাসায় ফিরিয়া গেল না। ভালই করিল। বাসায় ফিরিয়া গেলে, দেখিতে পাইয়া শিকারী নিশ্চয়ই হাঁসীটাকে মারিয়া ফেলিত। কিয়ৎক্ষণ পরে হাঁসী ফিরিয়া আসিল। নিকটে একগাছে পানিকৌড়ী-পাখীর বাসা ছিল। হংসীকে দেখিয়া পানিকৌড়ী ডাকিয়া যেন বলিল, সাবধান! হাঁসীটা যাইতে যাইতে বাসার কাছেই মানুষের পায়ের দাগ ইত্যাদি দেখিতে পাইল, বাসায় গিয়া দেখে, কাঁথাখানা একটু সরিয়া গিয়াছে,—বোধ হয়, বাতাসে। কিন্তু ডিমগুলি যেমন, তেমনি রহিয়াছে। কারণ পালখের নীচে যে ডিম, তা সে টের পায় নাই—এইপ্রকার শিকারীরা ডিম চায়, পালখ চায় না।

ডিমগুলি আজকাল ফুটিবে, বেশি বিলম্ব নাই হংসীর প্রাণে অপত্যস্নেহেরও ক্রমে ডানা, পা, মাথা, চক্ষু, ইত্যাদি হইল—ফলে অপত্য-স্নেহ ক্রমেই বাড়িতে থাকিল। কতক্ষণে সন্তানের মুখ দেখিবে, হংসমাতার মনে কেবল এই চিন্তা। হংসমাতা যেন ডিমের ভিতরহইতে বাচ্চাদের আধ-আধ স্বর শুনিতে পায়, মধুমাখা স্বরে যেন উত্তরও দেয়। ফলে ডিমের ভিতরহইতে বাচ্চারা যেন মায়ের সঙ্গে কথা কহে; ডিমের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যগ্র; মাও বাচ্চাদের মুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু জন্ম, জরা, মৃত্যু, এসকলে প্রাণীর হাত নাই; বিধাতার বিধানমতে, সময় পূর্ণ হইলে, ডিমের ভিতরহইতে ছানা বাহির হয়। ভাব-গতিক দেখিয়া বোধ হইল, হংসমাতার যেন এ বোধ আছে। আগে বলিয়াছি, ডিমের ভিতরহইতে বাচ্চারা যেন মায়ের সঙ্গে আলাপ করে; কিন্তু সে ভাষা কি, জানি না; কারণ সে কথা মানুষে ত শুনিতে পায় না। ডিম ফুটিয়া বাচ্চারা বাহির হইলে, মায়ের অনেক ইসারা, অনেক কথা বুঝিতে পারে। তাই বলি, ডিমের ভিতর থাকিতেই মায়ের অনেক কথা যেন শিখিয়া লয়। কোন কোন পণ্ডিতে বলেন, রক্তের রক্ত বলিয়া বুঝে; ভাল, তাই হউক।

অনেক বিপদ্ গেল। কিন্তু এক ভারী বিপদ্ উঁকি মারিতে লাগিল। বৃষ্টি নাই—আকাশে মেঘও নাই। চৈত্র-মাস, মাস যায় যায়, এক-ফোঁটা জলও হইল না। ডিম ফুটিবার সময় যত নিকট হইয়া আসিল, হংসমাতার ততই ভাবনা হইল। সে দেখিল, ঝিলের জল নিতান্ত তলায় পড়িয়াছে। যেটুকু আছে, শীঘ্রই শুকাইয়া যাইবে। কেবল থাকিবে কাদা; যদি বৃষ্টি না হয়, বাচ্চারা ডিম ফুটিয়া বাহির হইলে বড় কষ্টে পড়িবে; মায়ের সঙ্গে হাঁটিয়া হাঁটিয়া, অনেক দূরে নীচের দিকে, অন্য ঝিলে যাইতে হইবে।

ইচ্ছা করিলেই, যেমন আবশ্যকমত বৃষ্টি বর্ষান যায় না, তেমনি ইচ্ছা করিলেই, নিয়মিত সময়ের আগে ডিম ফুটান যায় না। হংসমাতা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিল—সমস্ত জল শুকাইয়া গিয়া ঝিলের তলায় কেবল কাদা পড়িয়া রহিল। এখন উপায়?

এমন সময়ে বাচ্চারা দেখা দিল। একে একে ডিমের খোসা ভাঙ্গিল, এক-একটা ডিমহইতে এক-একটা শিশু-বিগড়ি-হাঁস বাহির হইল। প্রথমে আটায় জড়ান এক-একটা গোল দলা বাহির হইল; তাহা গলিয়া এক-একটা কতকটা সোনালী রঙ্গের পালখময় কিছু দেখা দিল, অবশেষে দশটা বাচ্চা স্পষ্ট দেখা গেল।

আবার বলি, এখন উপায়? এ ঝিলে ত জল নাই, নীচের দিকে যে ঝিলে জল আছে, সে ঝিলে পঁহুছিতে পঁহুছিতে এই

বাচ্চাগুলির ধড়ে ত প্রাণ থাকিবে না। অথচ জল নহিলেও এ-গুলি মরিয়া যাইবে।

ডিমের ভিতরহইতে বাহির হইলে পর, কয়েকঘণ্টা ছানারা কিছু খায় না, খাইবার প্রয়োজন হয় না। ডিমের ভিতরে জীবন-রক্ষার জন্য ঈশ্বর যে বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন, সেই বন্দোবস্তের গুণে কয়েকঘণ্টাকাল ছানাদের দেহ-রক্ষা হয়। কিন্তু সেই নিয়মিত সময় অতীত হইয়া গেলে, ছানাদের ক্ষুধা পায়, কিছু খাইতে না পাইলেই নয়। এখন কথা এই, ছানাগুলি কি বড় ঝিলে যাওয়াপর্য্যন্ত কিছু না খাইয়া থাকিতে পারিবে? পথের নানা বিপদ্ এড়াইয়া কি এইগুলি এতটা পথ যাইতে পারিবে? কাক, চীল, বাজ, শিয়াল, গো-সাপ, যে দেখিতে পাইবে, সেই ত এগুলিকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিবে!

স্বভাবতঃ মায়ের মনে এই সকল ভাবনা-চিন্তা হইল, তবে কি না, মনুষ্য-মাতার ন্যায় পক্ষিমাতা ভাবনার ভরে কাতর হইয়া আত্মকর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল না। বাচ্চাকয়টী যেই একটু গরম হইয়া উঠিল ও তাহাদের ডানা ও পায়ের জড়তা দূর হইল, হংসী অমনি সেগুলিকে ঘাসের উপর লইয়া গেল। মনে রাখিও, এই ঘাস দূর্ব্বা-ঘাসের মত হইলেও একটু লম্বা লম্বা। বাচ্চাগুলি এই ঘাস-বনে লাফাইতে, গড়াইতে, দৌড়িতে ও ঘাসবনের ভিতরদিয়া যাইতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু এই ঘাস-বন যেন বেচারাদের পক্ষে বেত-বন, মাথা গলাইতে কষ্ট হইল। মা একচক্ষুদিয়া বাচ্চাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে, এবং অন্যচক্ষুদিয়া দেখিতে লাগিল, কোন দিক্-দিয়া শত্রু আসিতেছে কি না। সঙ্গের সাথী কেহ নাই—অথচ আশে পাশে, ও আকাশে যে অগণ্য প্রাণী আছে, তাহারা কতক শত্রু, আর কতক না শত্রু, না মিত্র, মাঝামাঝি—কিন্তু উপকারী বন্ধু এ সংসারে উহাদের নাই।

(ক্রমশঃ।)

:*:-

ক্রীড়া-বৈচিত্র্য

গায়ানার ঢাল-যুদ্ধ

গায়ানার এক বলিষ্ঠ জাতির মধ্যে এইরূপ একটী ক্রীড়া প্রচলিত আছে—

এই ক্রীড়া একপ্রকার বলপরীক্ষামাত্র। কেবল দুইজন প্রতি-পক্ষের মধ্যে সেই বলপরীক্ষা হয়। সেই বলপরীক্ষাকালে উভয় প্রতিযোগীর হাতে বৃক্ষবিশেষের তুণ্যদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শাখাদ্বারায় প্রস্তুত একটী করিয়া একপ্রকার লঘু ঢাল থাকে; ঐ ঢালের বিস্তার দৈর্ঘ্যা-পেক্ষা কম এবং ঢালদুইটি বহির্ভাগে একটু বক্র। প্রত্যেক ঢালের বহির্ভাগ বিবিধবর্ণে বিরঞ্জিত এবং অধিকারীর কল্পনার অনুরূপ একটী চিত্রদ্বারা শোভিত থাকে। উহার উপরিপ্রান্তে কয়েকটি—সচরাচর তিনটি—স্থিতি-স্থাপক-গুণযুক্ত মৃণালবৎ পদার্থের শীর্ষদেশে রঞ্জিত ঝাঁপা বা থোপসহ শিরোধ্বজ থাকে। ঐ ঢাল মোটের উপর দেখিতে সুন্দরই হয়।

দুই যুযুৎসু বা সংগ্রামেচ্ছু যুবাই তাহাদের নিজ নিজ ঢালের দুই পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্ত উভয়হস্তদ্বারা দৃঢ় করিয়া ধরে; তাহার পর, উভয়ে উদ্দিষ্ট স্থানের অন্যত্র আক্রমণের ভাণ করিতে থাকে, এবং মুখবিকৃতি করিয়া প্রতিপক্ষকে অসতর্ক করিতে প্রয়াস পায়; অনন্তর সহসা "ঠকাশ্" করিয়া একটা শব্দ হয়; তখন দেখা যায়, উভয়ে সম্মুখভাগে লাফাইয়া আসিয়া ঢালে ঢালে ঠেকাইয়া উভয়কে ঠেলিয়া ধরিয়াছে। উভয়েরই দক্ষিণ-আঁটু ঢালে ঠাসিয়া ধরা হইয়াছে এবং দুইজনেই বামপদ পশ্চাদ্দিকে পিছাইয়া দিয়াছে। দুইজনেই সমস্ত শরীরের ভার-দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাছু হটাইবার চেষ্টা করিতেছে। শেষে কখন কখন একজন আর একজনকে পাছু হটাইয়া দেয়; কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, তাহারা যতক্ষণ না ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ততক্ষণ উভয়ে উভয়কে ঠেলিতে ঠেলিতে হাঁফাইতে ও ধস্তাধস্তি করিতে থাকে। তখন উভয়ের সম্মতিক্রমে ঢাল-যুদ্ধে "ইতি" দেওয়া হয়। তৎকালে ঐ দেশের ক্রীড়ক-সমাজের শিষ্টাচারানুযায়ী ব্যঙ্গচ্ছলে উভয়ে উভয়কে দেখাইয়া ঢাল-সঞ্চালন করিয়া উহার শিরোধ্বজ কাঁপাইতে ও হাস্যোদ্দীপক অদ্ভুত বাহ্বাস্ফোট-শব্দ করিতে থাকে, সে যেন অশ্বশাবকের হ্রেষারব। তাহার পর, দুইজনেই মন খুলিয়া খুব হাসিয়া ফেলে, সে হাস্যে দর্শকেরাও যোগ দেয়। তখন আবার আর একযোড়া পলওয়ান লড়িতে যায়।

-:*:

চৈনিক জালিকতা।

চীনারা অনেকপ্রকারে মাছ ধরিয়া থাকে, তাহার মধ্যে কর্মোরাণ্ট্-পক্ষীদ্বারা মাছ ধরিবার পদ্ধতিটা একটু বিচিত্র। ধীবরের কয়েকটি করিয়া পোষা কর্মোরাণ্ট্-পক্ষী থাকে, তাহারা ডিম্বহইতে বাহির হইলেই, তাহাদিগকে মাছধরা শিখান আরম্ভ হয়, শিক্ষিত হইলে তাহারা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়। জেলে ভেলা ভাসাইয়া পাখীগুলিকে সঙ্গে করিয়া মাছ ধরিতে যায়; উপযুক্ত স্থানে পঁহুছিলে, তাহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দেয়। তাহারা তৎক্ষণাৎ জলে ডুব দেয় এবং তাড়া করিয়া মাছ ধরিয়া তাহাদের মনিবের কাছে উপস্থিত করে। যদি মাছটা এমন বড় হয় যে, কর্মোরাণ্ট্ তাহা ভেলার উপর টানিয়া তুলিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে জেলে মাছ ও পাখী দুই-ই একটা লাঠির ডগায় বাঁধা একপ্রকার ঝুড়ি-জাল বা 'ঘুনি' করিয়া উড়ুপের উপরে টানিয়া তুলে। পাখীর গলায় একটা ঢিলা আংটা পরাইয়া রাখা হয়, তাই সে ইচ্ছা করিলেও মাছটি খাইয়া ফেলিতে পারে না। যতবার কর্মোরাণ্ট্ মাছ ধরিয়া আনে, ততবার তাহাকে একগাল করিয়া বাইন-জাতীয় একরকম মাছ খাইতে দেওয়া হয়। তখন অবশ্য তাহার গলার আংটাটা খুলিয়া লইতে হয়।

৩

ধূমপানলব্ধ অশ্ব

আমেরিকার আদিমনিবাসীরা যে কিরূপ অশ্বপ্রিয়, তাহা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নিম্নলিখিত কৌতুকজনক পদ্ধতিটির কথা পড়িলে জানিতে পারা যাইবে। যখন এই আদিম আমেরিক-দিগের কোন উপজাতি অন্য উপজাতির বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতে গিয়া দেখে যে, তাহাদের বাজিসংখ্যা বড় কম, তখন তাহাদের মিত্র কোন উপজাতির নিকট এই সংবাদ পাঠায়,—আমরা অমুক দিন, অমুক সময়ে, এতগুলি ঘোড়ার জন্য তামাক খাইতে যাইব, তোমরা ঘোড়া-যোগাড় করিয়া রাখিও। এই বাজিভিক্ষুক-দিগকে বিমুখ করিবার যো নাই, করিলে, যে জাতি তাহা করে, সে জাতির মর্য্যাদা-হানি হয়।

নির্দ্ধারিত দিনে যে যুবক-যোদ্ধাদের অশ্ব নাই তাহারা, যুদ্ধে যাইতে হইলে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করা যেমন তাহাদের জাতীয় পদ্ধতি, তেমনই সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া মিত্রগ্রামে উপস্থিত হয় এবং সকলে মুখামুখী হইয়া বৃত্তাকারে বসিয়া নীরবে ধূমপান করিতে থাকে। গ্রামের লোকেরাও আবার, মধ্যে খুব খানিকটা জায়গা ছাড়িয়া দিয়া, গোল হইয়া দাঁড়ায়। তাহার অল্পক্ষণ পরেই, যতগুলি আগন্তুক আসিয়াছে, দূরে ঠিক ততগুলি সেই গ্রামস্থ যুবক তাহাদের দেশীয় প্রথামত সারি বাঁধিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া টগবগ্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, দেখা যায়। তাহারা আসিয়া পল্লীবাসী ও আগন্তুকদিগের মধ্যবর্ত্তী মুক্তস্থানে অশ্বারোহণে প্রবেশ করে এবং প্রথম ঘোড়-সওয়ার যে কোন একটি আগন্তুককে মনোনীত করিয়া লইয়া ঘোড়াহইতে ঝুঁকিয়া তাহাকে সজোরে একঘা চাবুক লাগাইয়া দেয়! তাহার অনুগামীরাও অন্য অন্য আগন্তুককে চাবুক মারিয়া "হাতের সুখ" করিয়া লইতে থাকে। এইপ্রকারে, ঘোড়-সওয়ারেরা যতবার বৃত্তমধ্যে পাক খায়, ততবারই তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত অভাগা আগন্তুককে এক এক চাবুক লাগাইতে থাকে! অশ্বলাভেচ্ছু ধূমপানশীল অভ্যাগতদিগকে তাহা এমন অম্লানবদনে সহ্য করিতে হয়, যেন তাহারা আদৌ প্রহারিত হইতেছে না। নির্দ্দিষ্ট কয়েকবার পাক খাওয়া হইলে, প্রত্যেক অশ্বস্বামী তাহার অশ্বহইতে অবতরণ করিয়া তাহার মনোনীত প্রহৃত ব্যক্তিকে ঘোড়া ও চাবুক দিতে দিতে এই কথা বলে,—"তুমি ভিক্ষুক; আমি তোমাকে এই অশ্বটি দিতে বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু তোমার পিঠে আমার মারের দাগ থাকিয়া যাইবে।"

এই উৎকট-পদ্ধতিটি সেই দেশের আপামরসাধারণেরই প্রীতি-দায়িনী। প্রহৃত যুবকেরা এইজন্য সন্তুষ্ট হয় যে, তাহারা প্রত্যেকেই একএকটি ঘোড়া পায়, মারের জন্য তাহারা পরওয়া করে না। তাহাছাড়া এই উপায়ে তাহারা কতটা সহিষ্ণু, তাহাও দেখাইবার সুযোগ পায়। যাহারা প্রহারক, তাহারা বদান্যতা দেখাইতে পারে বলিয়া সন্তুষ্ট হয়, কারণ আদিম আমেরিকদিগের মধ্যে দান-ধর্ম্মের বড় সমাদর করা হয়। তদ্ভিন্ন তাহারা বিনা প্রত্যবায়ে একটা যোদ্ধাকে প্রহার করিতে পায় বলিয়া একটা উৎকট উল্লাসানুভবও করে।

অশ্বদাতা ও অশ্বগ্রহিতা উভয় উপজাতিরও ইহাতে সন্তোষ দেখা যায়। অশ্বগ্রহিতা উপজাতি ঘোড়াগুলি পাইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট, কারণ অশ্বগুলি না পাইলে তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেই পারিত না। অশ্বদাতা উপজাতি অশ্বগ্রহিতা উপজাতির অপেক্ষা যে ধনাঢ্য, মনে মনে এই আত্মগর্ব্বপোষণ করিয়াই প্রীত হয়!

চাঁদের বুকে!

গাথা।

বিস্তারি' বিমান-পথে মেঘ-আস্তরণ
ক্লান্ত-কলেবর ভানু ঢ'লে পড়ে তা'য়।
কভু খুলে, কভু মুদে সহস্র লোচন,
শ্রান্তশির বারবার করে সঞ্চালন;
কত সোণা ঢেলে দেছে শৈলবনচ্ছায়—
দেবদারু-তরু-শিরে হিঙ্গুলবরণ।
এখনো একটী পাখী শূন্যপথে গায়,—
দূরহ'তে গীত তা'র জুড়ায় শ্রবণ;
এখনো গাভীর হাম্বা গো'লে শুনা যায়,
এখনো পতঙ্গ-পক্ষ-ধ্বনি ভাসে বায়—
ঘুমপাড়ানিয়া কত মৃদুল নিঃস্বন।
কিন্তু, আহা, দেখ, দেখ, গিরিগাত্র'-পরে
—তার সান্ধ্য সুষমা ও প্রশান্তির মাঝে—
কি ব্যথা বহিয়া বুকে কাঁদে কে কাতরে!
আহা, খরগোশ উটি,—গায় রক্ত ঝরে,
ধুঁকিতেছে—বাঁচিবে না—বড় ব্যথা বাজে!
তপন বলিল তা'রে,—'ভাই, দিবা যায়,
তার সাথে কত কি না মুদি'ছে নয়ন;
কেবল তুমিই কাল প্রাচী-আঙ্গিনায়
হেরিবে না ফুটিবারে তরুণী উষায়,
তুমিও ত ভালবাস আমার কিরণ।'
শশক কাতরে তা'রে কহিল,—'রাজন্!
সত্য বটে, আমি অতি ক্ষুদ্র—তুচ্ছ প্রাণী,
তবু ভাল বাসিতাম এই গিরি-বন;
সুখে থাকিতাম, যদি থাকিত জীবন,—
করি নি তো এ জীবনে কা'রো কোন হানি
প্রভাকর প্রবোধিয়া কহে অভাগায়,—
'কে জানে, হয় তো তব থাকিবে জীবন;
কাঁদিও না, শান্ত হ'ও জীবন-আশায়;
করিও না ভঙ্গ মোর সোণার স্বপন।
মেরেছে যে, তা'রে বিধি রাখেন হেথায়—'
নীরবিল ভানু—শশ মুদে যে নয়ন!
* * * *
তপন মগন হ'ল; রজত-গোধূলি
তূর্ণ আসি' শৈল-শষ্পে ঢালে রৌপ্য-ধারা,
যামিনী ফেলিয়া দিল যবনিকাগুলি,
স্তব্ধ হ'ল চরাচর তন্দ্রাবেশে ঢুলি',
হেন কালে, দেখ, দেখ, সবে আঁখি খুলি';
বিধু-বক্ষে বুঝি সেই শশ প্রাণহারা!

চিঠিচাপাটি

শ্রীঅজিতনাথ ঘোষ, মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউসন, কলিকাতা—গৌরীবেড়িয়ায় যে পার্শ্বনাথের মন্দির আছে, তাহার একটী "ফোটো" তুলিয়া পাঠাইয়াছেন। ইনি আশা করেন যে, আমরা ফোটোটি ছাপাইব, কিন্তু উহা তত ভাল উঠে নাই, তাহা-ছাড়া উহার "ব্লক" তৈয়ারী করিতে বিস্তর খরচও পড়িবে। ফোটো বিজ্ঞানে আপনি উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করেন, ইহাই আমাদের কামনা। হয়ত ভবিষ্যতে কোন সময়ে আমরা ফোটো-প্রতিযোগিতার কথা বালকে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা—বালকের প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, ইনি আমাদের ফুট্বল-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-গুলি বড় মূল্যবান্ মনে করেন, এবং আশা করেন যে, আমরা এই বৎসরেও ঐ বিষয়সম্বন্ধে আরও উপদেশ দিতে পারিব।

শ্রীনবকুমার সেন, মিসন স্কুল, বাঁকুড়া—ঈশ্বরসম্বন্ধে একটী কবিতা পাঠাইয়াছেন। আমাদের কাছে যে সমস্ত কবিতা আসে, তাহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক কবিতাই আমরা বালকে প্রকাশিত করিতে পারি। আপনি আমাদের পরবর্ত্তিনী কবিতা-প্রতিযোগিতার প্রতীক্ষায় থাকুন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া—লিখিয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার ভগিনী নিয়মিতরূপে বালক পড়িয়া থাকেন, এবং পড়িয়া বেশ আনন্দোপভোগ করেন। তিনি এই বর্ষের বালকের উৎকর্ষার্থে একটী পরামর্শ দিয়া পাঠাইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটী প্রশংসাপূর্ণ দীর্ঘ পত্র ও "এই নবীন বর্ষ উপলক্ষে আমাদের প্রার্থনা"-শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীফকিরেশ্বর সেন, বাঁকুড়া—গত জুলাই-মাসের বালকের ১০০র পৃষ্ঠায় "এক অন্ধ বালিকা একটী গল্প বলিতেছে"-শীর্ষক যে একটী ছবি বাহির হইয়াছে—চান যে অন্ধ বালিকাটি কি গল্প বলিতেছে, তাহা আমরা তাঁহাকে জানাই। আমাদের পাঠকদের মধ্যে কেহ এই ভার-গ্রহণ করিলে, উপকৃত হইব। ইনি পত্রমধ্যে কয়েকটি ডাকটিকিটও পাঠাইয়াছেন, উদ্দেশ্য তিনি বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের কাছে যে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহা প্রত্যর্পণ করিব। পাণ্ডুলিপিসহ ডাকটিকিট না পাঠাইলে, আমরা অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলি। বালকের সকল লেখক-লেখিকাই এই কথাটি স্মরণে রাখিবেন। আবার কখন যদি আপনি আমাদের চিঠি লেখেন, তাহা হইলে আপনার ডাকটিকিট কি করিব, জানাইবেন। এইরূপে প্রেরিত ডাকটিকিট প্রেরয়িতার নিজ ব্যয়ে ভিন্ন আমরা প্রতিপ্রেরণ করিতে পারি না। বর্ত্তমান সালের বালকের জন্য আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

৺ বালকা

২য় বর্ষ।] ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩। [২য় সংখ্যা

স্বর্ণসূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপরকার আলোটা পরেশের নজর এড়াইয়া যাইতেছিল, পরে আবার দেখা দিতেছিল। অবশেষে আলোটা ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। পরেশ সেই আলোক-রশ্মি ধরিয়া চলিয়া শীঘ্রই একটা উঁচু পাহাড়ের কাছে পঁহুছিল। সেই পাহাড়ের উপরে একটা উঁচু, কালো-রঙের কেল্লা খাড়া হইয়া আছে। অন্ধকারে হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে পরেশ কেল্লায় যাইবার একটি সরু পথ পাইল। ঐ কেল্লারই একটি জানালাহইতে ঐ উজ্জ্বল আলোটা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। সে একটা ভারি খাড়া সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়া একটা লৌহনির্ম্মিত প্রকাণ্ড দরোজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে যত-দূর পারে, জোরে জোরে দরোজার কড়া নাড়িতে লাগিল। তাহা শুনিয়া দুর্গের ভিতরে একটা মস্ত কুকুর ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করিতে ও দরোজার কাছে আসিয়া দরোজা আঁচড়াইতে লাগিল—যেন সে দরোজাটা নখদিয়া চিরিয়াই ফেলিবে। তখন দরোজার মাথার উপরের একটা জানালাহইতে কে কর্কশ স্বরে হাঁকিল,—"কে—অ—অ? এ সময়ে কে আমায় এমন ক'রে উদ্ব্যস্ত ক'র্‌ছে?"

ক্ষুদ্র বালক পরেশসিংহ ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল,—"মশাই, অনুগ্রহ ক'রে দরোজাটা একবার খুলুন; আমি পরেশসিংহ, মহারাজ প্রবর-সিংহের ছেলে; এই বনে পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

সেইরূপ কর্কশস্বরে কে বলিল,—"কি ব'ল্লে, মহারাজ-কুমার পরেশসিংহ? এত রাত্তিরে আমারই দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছেন? একেই বলে,—'খোদা যব্‌ দেতা, তব্‌ ছপ্পড় ফোড়্‌কে দেতা'! আসুন, আস্‌তে আজ্ঞে হোক্‌ কুমার-সাহেব, আপনার ছিরিমুখ দেখে কেরতার্থ হই।"

এই বলিয়া সেই কর্কশভাষী ব্যক্তি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর কে দোতলাহইতে একতলায় ধপ্‌ ধপ্‌ করিয়া পায়ের আওয়াজ করিয়া নামিতেছে, শুনিতে পাওয়া গেল। তাহাছাড়া কে সেইরূপ কর্কশকণ্ঠে কুকুরটাকে বলিতেছে,—"চোপ্‌—চোপ্‌রাও, কেলো! বেজায় ঘেউঘেউ লাগিয়েছিস্‌ যে! কা'কে খা'বি? রাজকুমারকে?—হজম হ'বে না, চুপ্‌টি মেরে শুয়ে থাক্‌"—এই কথাও শুনা গেল। ক্ষণ পরে একটা লম্বা দাড়িওয়ালা বিকটচেহারার লোক আসিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত বালকের মুখপ্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া তাহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দুর্গদ্বার পুনরায় রুদ্ধ করিয়া দিল। পরে সে রাজকুমারকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিল, রাজকুমার

উত্তরে সত্য কথাই বলিল। সকল কথা শুনিয়া লোকটা যেন সন্তুষ্ট হইয়া 'আন্নি, আন্নি' বলিয়া কাহাকে ডাকিতে লাগিল। কয়েক-মুহূর্ত্ত পরে একটা কদাকার থুড়্‌থুড়ে বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা বলিল,—"আন্নি, কুমারকে কিছু খেতে দে। ওঁর সমস্ত দিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, সঙ্গে ক'রে ওপরে নিয়ে যা।"

বুড়ী বড় বিরক্তির ভাব দেখাইল, বিকট মুখখানা আরও বিকট করিয়া একটা অন্ধকারময় সিঁড়িদিয়া অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া

কুমারকে একটি ছোট কুঠরীর মধ্যে লইয়া গেল। সে ঘরে আস্‌বাব-পত্র কিছুই নাই; মেঝেতে কেবল একটা মলিন বিছানা পাতা আছে; কুমারকে সেই বিছানার উপর বসাইয়া সে তাহার জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিল। ডালকুত্তাটা তাহাদের সঙ্গে উপরে উঠিয়াছিল। বুড়ী চলিয়া গেলেও, কুকুরটা কুমারের কাছে বসিয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া পরেশের প্রথমে বড় ভয় হইয়াছিল, সে কি প্রকাণ্ড, দেখিতে কি ভয়ানক! কিন্তু সে আসিয়া পরেশের গায়ে মাথা ঘসিতে লাগিল। পরেশ তখন ভরসা করিয়া তাহার গায়ে হাত দিল,—তাহার কাণ চুল্‌কাইয়া দিতে লাগিল। বুড়ী খাবার দিয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল; পরেশ সব খাবার নিজেই খাইল না, বেশীরভাগ বরং কালুকেই দিল। কালু বড়ই খুসী! লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া শীঘ্রই সব সাবাড় করিয়া ফেলিল, তাহার নিশ্চয়ই বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। তাহার পর, কুকুরে যেমন করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করে, তেমনই করিয়া পরেশের কাছে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে লাগিল। কয়েকমুহূর্ত্ত পরে বুড়ী এঁটো পাত তুলিয়া লইতে আসিল; পাত তুলিতে তুলিতে সে তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কুমার, পেট্‌পূজো তো বেশই ক'রেছ, আমার সাতদিনকার খোরাক তুমি একবেলায়ই সাবাড় করেছ। এখন আর কি ক'র্‌বে, শুয়ে পড়!"

কুমার ঈশ্বরের শ্রীচরণ-স্মরণ না করিয়া কখনও শুইতে যাইত না; বুড়ী বিদায় হইলে, সে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহাই করিতে লাগিল। বুড়ী আবার হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া তাহা দেখিয়া তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল,—"ঈস্! কুমারকে যে বড় ধর্ম্মিষ্ঠি দেখ্‌ছি, ধর্ম্মটা কি রোজই ফলান হ'য়ে থাকে?" বালক ভয়ে ভয়ে বলিল,—"হ্যাঁ।" "শিখিয়েচে কে?" "মা।" "বটে!" এই বলিয়া বুড়ী, কি জানি কেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পরেশ ছেলেমানুষ, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না। হয়ত বুড়ীর ছেলেবেলা ঈশ্বরে ভক্তি ছিল, কিম্বা হয় ত সে তাহার ছেলেকে ঐরকম করিয়া ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে শিখায় নাই—সে ছেলে বদ্‌মায়েস্ হইয়া গিয়াছে, তাহা এসময়ে হয়ত তাহার মনে পড়িল, তাই সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, পরেশ একাকী অন্ধকারে পড়িয়া রহিল। সে তাহার ঘরের ঘুল্‌ঘুলীর ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে দেখিবার চেষ্টা করিল, বড় কিছু দেখিতে পাইল না; কেবল দেখিল, আকাশে কতকগুলা কালো কালো মেঘ ছুটাছুটি করিতেছে। দূরে একটা নগ-নির্ঝরিণীর জল-কল্লোল এবং ঝ'ড়ো হাওয়ায় মড়্‌মড়্‌শব্দে গাছের ডাল ভাঙিয়া ফেলিতেছে, শুনিতে পাইল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া কড়্‌কড়্‌শব্দে বাজ পড়িতেও, সে শুনিতে পাইল। ফলে সে ভয়ে বেশীক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে ভরসা করিল না।

কিয়ৎকাল পরে সে তাহার দরোজার কাছে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাইল। পরমুহূর্ত্তেই সেই দাড়িওয়ালা লোকটা সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার কাছে আসিয়া ঘেঁসিয়া বসিল। বসিয়া অল্প একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"তোমাদের বাড়ী কোন্ দিকে, তা' কি তুমি জান?"

পরেশ বলিল,—"না। আমি তোমাকে ব'লেছি, আমি এই বনে পথ হারিয়ে ফে'লেছি; সমস্ত দিন বনে বনে টো টো ক'রে হয়রাণ হ'য়েছি—পথ খুঁজে পাই নি। কাল তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে যদি একজন লোক দাও, আর সে যদি আমাকে ঠিক পথ দেখিয়ে আমার বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারে, তা' হ'লে—আমার বাবা বড় ভাল লোক—তিনি তোমাকে খুব ভাল ক'রে সন্তোষ ক'র্‌বেন।"

লোকটা বলিল,—"তুমি এখন তোমাদের বাড়ীথেকে অনে—ক দূরে এসে পড়েছ, আর যে তুমি সেখানে ফিরে যেতে পা'র্‌বে, তা'র কোন সম্ভাবনা নেই। তার চেয়ে তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে কতকগুলি খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখা'ব। আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি, তা' দেখে তুমি আর অন্য দিকে চোক ফিরুতে পা'র্‌বে না।"

এই বলিয়া লোকটা একহাতে পরেশের একটী হাত ধরিয়া অন্যহাতে একটী বাতি লইয়া একটী ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সে ঘরটি সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, সাচ্চাকাজকরা দামী দামী পোষাকে একেবারে ঠাসা—মণিমুক্তার জৌলুসে ঘরটা যেন আলো হইয়া আছে। সেই সমস্ত হীরা-জহরৎ পরেশকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া সে নরম আওয়াজে বলিল,—"বাবা, তুমি যদি আমার কাছে থাক, এ সমস্তই আমি তোমাকে দোব। আমিও একজন রাজা, আমি তোমাকে আমার ছেলের মত মানুষ কর্ত্তে চাই, পরে তোমাকেই আমি আমার বিষয়-আশয় দিয়ে যা'ব।"

পরেশ ঘৃণার সহিত বলিল,—"না, না, না, তা'ও কি হয়? আমি আমার নিজের বাবাকে ছেড়ে অন্যকে কি বাপ ব'ল্‌তে পারি?"

লোকটা তবুও তাহাকে লোভ দেখাইয়া বলিতে লাগিল,—"দেখ, তুমি যদি আমার কাছে থাক, তোমাকে কখন প'ড়্‌তে যেতে হ'বে না, সকালথেকে সন্ধ্যেপর্য্যন্ত কেবল মজা ক'রে নেচে খেলে বেড়া'বে; তোমাকে বেশ খাসা একটী টাট্টু কিনে দোব, আর আমার হাল্‌কী ছোট বন্দুকটাও দোব, তুমি ঘোড়ায় না চ'ড়ে বনে বনে বেশ হরিণ-শিকার ক'রে বেড়াবে। তা'ছাড়া, তোমায় এক-গাছা বেশ ভাল ছিপও দোব, তুমি মনের আনন্দে, যখন ইচ্ছে হ'বে, বেশ বিলে, ঝিলে মাছ ধ'রে বেড়া'বে। একজন চাকর সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; আর তুমি যা' খেতে চাইবে, তাই পা'বে। লক্ষ্মী-ছেলে, সোণা-ছেলে, যাদু-ছেলে! তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে তো, বাবা? থাক্‌বে, থাক্‌বে—কেমন তো?"

পরেশ বলিল,—"তুমি খুব দয়ালু লোক বটে, কিন্তু বাবার কাছে থাকৃতে না পেলে আমি কিছুতেই মনে সুখ পা'ব না।"

ঐ কথা শুনিয়া লোকটা বিষম চটিয়া গেল। পরেশের ডাইন-হাতটি শক্ত করিয়া ধরিয়া তাহাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"ভাল, ভাল, কুমারজী, তা' হ'লে আপনাকে আর এক জিনিস দেখাতে নিয়ে যাই, চলুন।" এই বলিয়া সে তাহাকে একটা অন্ধকারময় সুঁড়িপথ দিয়া কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সেই পথের অন্য প্রান্তে কেমন একপ্রকার বিকট বিমিশ্র কোলাহল উঠিতেছিল। সেই পথপ্রান্তে পঁহুছিয়া সে একটা ঘরের দরজা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। তখন দেখা গেল, বড় একটা হল-কামরায় চেটাই বিছান রহিয়াছে, তাহাতে কয়েকজন বীভৎসাকৃতি লোক বসিয়া একটা বড় পিপা-হইতে মদ ঢালিয়া পান করিতেছে। তাহাদের মুখগুলা রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহাদের ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোকগুলাহইতে যেন আগুন বাহির হইতেছে। বাঘা (সেই দস্যু-সর্দ্দারের নাম) পরেশকে তাহাদের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিল। একজন ডাকাইত তখন সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া বিকট-চীৎকার করিয়া এই গানটা গায়িতেছিল—

বাউল—একতালা।

নই মোরা কেও-কেডা,—
ভারি মন্দ, হন্দ ফুর্ত্তিবাজ!
দুনিয়াটা আমাদেরি—
মোরা সবে রাজা-মহারাজ!
আইন-কাইন মানিনেকো,
কয়েদ-কোতল জানিনেকো,
গরু-জরু আনি কেড়ে
প'ড়ে গাঁয়ে, পড়ে যেম্নি বাজ।
আইন করেছে বাঘা-রাজা,
আপন পরাণ বাঁচা চাচা;
বেঁচে থাক্ বাঘা-রাজা;
কর, মন্দ, হন্দ মজা আজ।

তাহাদের সেই ভয়ানক চেহারা, মদের ঝোঁকে আবল-তাবল বকা,—বিকট চীৎকার, আর তাহাদের আচরিত দুর্ব্বৃত্ততা-সম্বন্ধে নির্লজ্জ-ভাবে আত্মপ্রশংসাসূচক গীত-গান শুনিয়া পরেশের মত অল্পবয়স্ক বালক যে ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অনেক গল্পের বইএ অনেক ডাকাইতের কথা পড়িয়া তাহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ডাকাইতেরা বেড়ে লোক—খুব সাহসী। কিন্তু এখন তাহাদের পাল্লায় পড়িয়া সে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা ভারি নীচ, নিষ্ঠুর ও ভয়ানক লোক। তাহাদের বন্য, রুক্ষ ও রূঢ় মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভয়ে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; বাঘা তাহাকে ধরিয়া ছিল বলিয়াই, সে কোন রকমে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নতুবা হয়ত মূর্চ্ছা যাইত। গান থামিলে, একজন ডাকাইত পরেশের দিকে আঙুল দেখাইয়া বাঘাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কে?"

বাঘা বলিল,—"আন্দাজ কর্ তো।"

সে "কে বট, কে বট তুমি, তোমায় যেন চেন চেন করি" বলিয়া মদের ঝোঁকে আবার তান ধরিল, কিন্তু পরেশ কে, তাহা বলিতে পারিল না।

তখন বাঘা বলিল,—"ভাইসব, ইনি বড় কেও-কেডা ন'ন, আমাদের চিরকেলে দুষমণ প্রবরসিংহের বেটা—কুমারজী!"

"কুমারজী? কুমারজী? আরে, তবে তো কেল্লা মার দিয়া। সর্দ্দার, কুমারজীকে নিয়ে ত'বে আমাদের একটা কিছু করা তো উচিত

বাঘা। আল্‌বৎ, আল্‌বৎ, প্রথমে কুমারজীর কোমরটা হাল্‌কা ক'রে দেওয়া যা'ক্, কি বল?

দস্যুগণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' বৈ কি, তা' বৈ কি। কুমারজীর বড় তক্‌লিফ্ হচ্চে—ওটা আর কোমরে রেখ না!

বাঘা পরেশের কোমরহইতে কোমরবন্ধটা খুলিয়া লইয়া তাহা তাহার চোকের কাছে ধরিয়া, দেখিয়া, বলিয়া উঠিল,—"আরে এটা বেড়ে জিনিস তো!"

পরেশ সভয়ে বলিল, "আমার বাবা ওটি আমায় দিয়েচেন, আমি ওটি কাউকে দিতে পারি নে, চিতু কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারে নি।"

বাঘা। চিতু? চিতুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল? সে এটা তোমার কাছথেকে নিতে পারে নি? বল কি? সে বেটাও যে বাচ্ছা ডাকাত, ভয় কা'কে বলে, জানে না। আচ্ছা এটা তবে তা'কেই দোব, বেচারা মেহনৎ করেছে তো! এখন এটা আমার কাছেই থাক্। ভাইসব, তবে এখন কুমারজীকে নিয়ে কি করা যায়?

"প্রভুর হস্তে একখানা 'বালক' পড়িয়াছে; আজ যে আহারাদি কখন্ হইবে তাহা ত জানি না।"

একজন ডাকাইত অম্লানবদনে বলিল,—"আর কেন, এবার ওঁকেই হাল্‌কা করে দাও!"

আর একজন ডাকাইত, সে আরও নিষ্ঠুর, বলিল,—"আরে দূর! তা' হ'লে রগড় হ'বে কেন? তা নয়, সর্দ্দার, ওঁয়ার পেট-চড়্‌চড়ি ক'রে ওঁয়াকে অক্কা পাইয়ে দাও।"

তৃতীয় ডাকাইত, সে যেন নির্দ্দয়তার অবতার, বলিয়া উঠিল,—"বড় রগড়েরই কথা বল্লি আর কি! ওতে আর এমন কি রগড় হবে? কুমারজীর চোকদু'টো সাঁড়াসীদিয়ে টেনে বার ক'রে নিয়ে
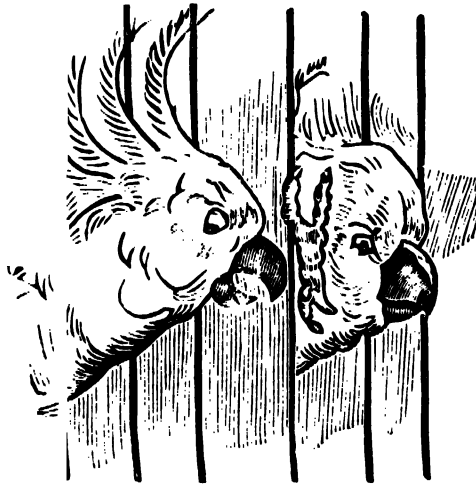
ওকে বেশ বাহারি করে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে পাঠালে, তবে না ঝগড়ের চূড়ান্ত হবে!"

বাঘা বলিল, —"ও সব কিছু করবার দরকার নাই; উনি যদি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে রাজি হন, তা' হ'লে ওঁকেই আমরা আমাদের সর্দ্দার ক'রব।" পরেশ এইবার একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"কক্‌খোনো রাজি হ'ব না, তার চেয়ে আমার মরাই মঙ্গল।"

তাহা শুনিয়া একটা বীভৎস চেহারার ডাকাইত বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা তা'ই হ'বে। একটা ওমরা'কে যমের দক্ষিণ-দুয়োর দেখিয়ে দিয়েছিল ব'লে, ওর বাপ আমার তেমন ভাইটাকে ফাঁসীকাঠে লটকে দিয়েছে। সর্দ্দার, হুকুম কর, লাগাই বেটার বুকে ছুরি!"

বাঘা বলিল,—"আমি বলি, আপাততঃ এই সিংঙ্গির ছানাটাকে খাঁচায় পুরে রাখা যাক্। তার পর এর বাপের কাছে এই সুখবর পাঠান যা'ক্ যে, তোমার পেয়ারের বেটা এখন আমাদের মুঠার ভেতর, তুমি যদি লক্ষ্মী-ছেলেটির মত এত টাকা আমাদের এখানে অমুক দিনের অমুক সময়ের মধ্যে পৌঁছে দাও, তা' হ'লে তোমার বেটাকে নিকেশ না ক'রে দয়া ক'রে আমরা ছেড়ে দিতে পারি।" ঐ কথা শুনিয়া সকল দস্যু উল্লাসে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বা! বা! কেয়া বাৎ! কেয়া বাত! বেড়ে মৎলব, পাকা পরামোশ! হুঁ, সর্দ্দারছাড়া এত বুদ্ধি আর কা'র হবে? সর্দ্দার, বেশ কথা ব'লেছ, এখন ওকে কয়েদই ক'রে রাখ গে।"

বাঘা পরেশকে নীচে লইয়া চলিল। দুইজনে কত যে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিতে লাগিল, পরেশ তাহা গণিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহাকে বুঝি ডাকাইতটা পাতালে নামাইয়া দিতেছে। অবশেষে তাহারা একটা লৌহকবাটযুক্ত ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ লৌহকবাটের অর্গলটা যেমন প্রকাণ্ড, উহাতে সংলগ্ন তালাটাও তেমনই বিপর্য্যয় বড়। বাঘা তখন পরেশকে বলিল,—"আমি তোর বাপকে খুব চিনি। সে বেটা আমার চিরকেলে দুষ্‌মণ, আমি তা'কে দু'চক্ষু পেড়ে দেখ্‌তে পারি নে। বেটা আমাকে ধর্‌বার জন্যে আমার পেছনে সেপাই লাগায়, কোন একটা রাহী যদি ছোট্‌কে এসে আমার পাল্লায় পড়ে, বেটা আমার হাতথেকে তা'কে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এখন তুই আমার হাতে প'ড়েচিস্। হয় সে বেটা আমাকে আক্কেল-সেলামী দিয়ে তোকে বাঁচাবে, নয় তুই এই গারদেই প'চে ম'র্‌বি।" এই বলিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যু কারাদ্বার খুলিয়া পরেশকে তাহার মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর রাগে গশ্‌গশ্ করিতে করিতে মহাশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পরেশ সেই কারাকক্ষে পড়িয়া রহিল।

পরেশের তখন কত কথাই না মনে হইতে লাগিল। তাহার পিতার কথা শুনে নাই বলিয়া তখন তাহার হৃদয় অনুতাপের আগুনে পুড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, যাহা করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া,—নিজের ইচ্ছামত চলিয়া, সে সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদেরই মত দুরাচরণ করিয়াছে।

প্রায় একঘণ্টা পরে, তাহার অনুমান হইল, কে যেন বাহিরে কারাকক্ষের দেওয়াল বহিয়া উঠিতেছে। পরে সে শুনিল, কে চুপি চুপি তাহাকে ডাকিল,—"কুমারজী!"

পরেশও চুপি চুপি সাড়া দিল,—"কে ও?"

তাহার বুক ধড়্‌ধড়্ করিতে লাগিল!

কে বলিল,—"চুপ্! আমি চিতু। এইখেনে একটা জান্‌লা আছে, আমি বা'রথেকে খুলেছি। আপনি এই জান্‌লার ওপরে উঠুন—উঠে জান্‌লা ভেঙে প্রাণ নিয়ে পালান।"

পরেশ আর কোন কথা শুনিতে পাইল না। ঘরের দেওয়াল টুক্‌রা টুক্‌রা পাথরের। তাহাতে বালিকাঙ্করা নাই। সেই পাথর-গুলার খাঁজে খাঁজে পা-দিয়া কুমার জানালার উপরে উঠিল। উঠিয়া গাছের পাতার ভিতরদিয়া দুই-একটা তারা উঁকি মারিতেছে, দেখিতে পাইল। জানালায় কাঠের গরাদিয়া, জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য তত শক্ত নয়। পরেশ প্রায় নিঃশব্দে দুইটী গরাদিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। তাহার পর জানালা গলিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। কে তাহাকে সেই সময়ে লুফিয়া লইল। সে আর কেহ নয়—চিতু! চিতু তাহাকে মাটীতে নামাইয়া দিয়া বলিল,—"কুমার, এই নিন্ আপনার সোণার কোমরবন্দ্‌টা। আমি এটা বাঘার কাছথেকে পেয়েছি। যিনি তখন মেঘের মধ্যে কথা কইছিলেন, তিনি এখন আমার বুকের মধ্যে কথা কইচেন। আপনি গরীব চিতুর ওপর বড় দয়া করেচেন। আপনার আমি কিছু চুরি ক'র্‌তে পারি নে। এখন পালান, কুমারজী! একদম্ টেনে পাড়ি জমান, এখানে আর এক লহমাও থা'ক্‌বেন না। আমি আবার জান্‌লাটা বন্ধ ক'রে দি। তা'হ'লে আপ্‌নি কি ক'রে পালিয়েছেন, বাঘা বুঝতে পা'রবে না। কাল সকালের আগে সে আর গারদের দরজা খু'লবে না। আপ্‌নি তা'হ'লে অনেকটা সময় পা'বেন। এইবেলা সড়ক ধরে বরাবর সোজা ছুট্‌টে পালিয়ে যা'ন। পথে একটা পাহাড় পা'বেন, সেটা পার হ'য়ে চ'লে যা'বেন। তা'র পর একটা নদীও পা'বেন, তা'র বরাবর উজানদিক্ ধ'রে চ'লে যা'বেন। এখন ঝড় পেরায় থেমে গেছে, আর তেমন গোলমাল নেই, এই বেলা পোঁ দিন।"

চিতুর প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে পরেশের মুখদিয়া বিশেষ কোন কথা বাহির হইল না, সে কেবল বলিল,—"চিতু, চল্লুন, ভাই, ঈশ্বর তোমার ভালই করুন।"

এই বলিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়! পরেশ প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। একটু জোরে হাওয়া বহিলেই, তাহার মনে হয়, ঐ বুঝি ডাকাইতেরা আমার পাছু লইয়াছে, সে আরও বেগে ছুটিতে থাকে। যতক্ষণ না সে পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের কাছে পঁহুছিল, ততক্ষণ সে ছুটিতেই

থাকিল। পাহাড়ে উঠিয়া সে তাহা দৌড়িয়া পার হইয়া গেল। পরে পাহাড়ের সানুদেশস্থিত এক শ্যামদূর্ব্বাস্তৃত ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। উহারই অনতিদূরে চিতুকথিত গিরিনির্ঝরিণীটি কুলকুল-নাদে বহিতেছে। সেই নদীতীরে পঁহুছিয়া সে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আর পা চলে না। চলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; পড়িয়া গেল। তাহার পর সে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল কি মূর্চ্ছা গেল, তাহা বুঝা গেল না, কিন্তু সে সেইখানেই নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল। (ক্রমশঃ।)

"বিদ্যাসাগর"-বৃত্তি।
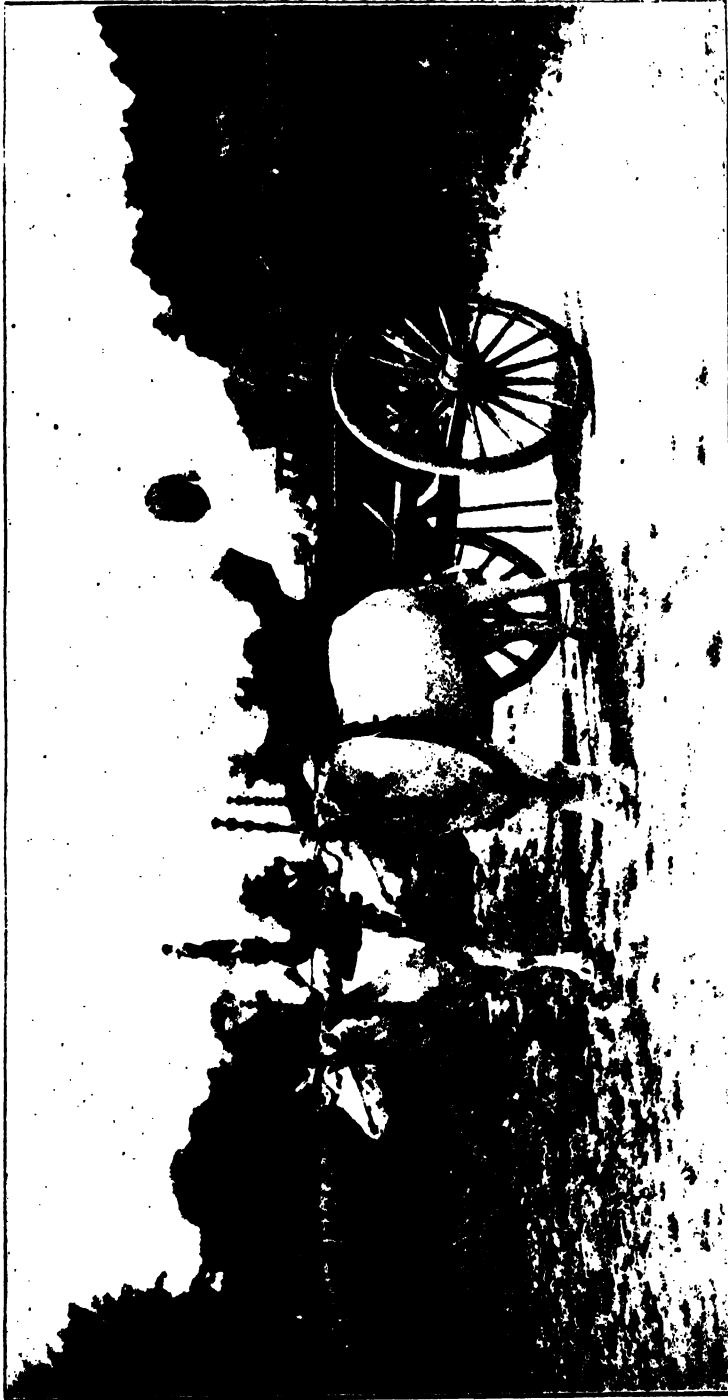
ভোর হইল। গাছের ফাঁক-দিয়া আবীরের মত লাল আলো ফুটিয়া উঠিল। সৌদামিনী অল্প-ক্ষণ পরেই যমজ মেয়েদু'টিকে তাহাদের মাসীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী একেবারে গুম্‌শাম্, কাহারও গলা পাওয়া যাইতেছে না।

স্নেহেরও জ্বর হইয়াছে, কিন্তু সে চুপ্ করিয়া পড়িয়া আছে। পুণ্যকে, বোধ হয়, কোন ঘুমের ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, সেও এখন ঘুমাইতেছে।

ডাক্তার চলিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে আবার আসিলেন। স্নেহের অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পুণ্যের অবস্থা দেখিয়া তখনও মাথা নাড়িলেন। সৌদামিনীর উদ্দেশে বলিলেন,—"দেখুন, আজ রাত্রে, বোধ হয়, পুণ্যের জ্বর আরও একটু বা'ড়্‌বে। আমি তখন আবার আসবো, কিন্তু এর মধ্যে যদি ও জেগে ওঠে, ওকে একটু চুপ-চাপ্ ক'রে রা'খ্‌বার চেষ্টা করবেন, ওর সঙ্গে কাউকে কথা কইতে দেবেন না।"

* * * *

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। পুণ্য যেমন ছিল, তেমনই রহিল। বৈকালে সে জাগিল, কিন্তু তখনও তাহার ঠিক জ্ঞান হয় নাই। সেই এক বুলি,—"আমি নিই নি, আমি নিই নি" বলিতেই থাকিল।

ছয়টার সময় প্রিয়ব্রতবাবু ডাক্তারকে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা দুইজনেই তাহার দিকে নজর রাখিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, পুণ্য যেন কিছু খুঁজিতে লাগিল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি চাও, বাবা?" "ঘোঁড়ার লাঠি—আমার ব্যাগ—কোথায়—স্যার, আমি নিই নি।"

সৌদামিনী তাহার বালিশের তলাহইতে "মনিব্যাগ" বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে

যাইতেছিলেন, ডাক্তারবাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"ওটা একবার আমাকে দিন তো।" সৌদামিনী তাহাই করিলেন। ডাক্তার ব্যাগ খুলিয়া তাহার মধ্যে একখানি রসিদ ও একখানি চিঠি দেখিতে পাইলেন।

ডাক্তার পড়িলেন, রসিদটায় লেখা আছে—

"Babu Punyavrata Bose, Midnapur.........Dr.
To S. S. & Co.,
Chemists & Druggists,—Dhurrumtolla St.,
Nov. 7th, 1 pair Child's Crutches 20-10-0
Paid.
P. B. D.
For S. S. & Co."

"Crutches? খোঁড়ার লাঠি নিয়ে পুণ্য কি করেছে? চিঠিখানাও পড়ুন তো।"

সেই চিঠিখানিতে লেখা রহিয়াছে—

"মহাশয়, আপনার প্রেরিত ডাক-টিকিটগুলির বাবদ্ শতকরা ১৷৹ দাম হিঃ একুনে ২০৷৵৹ মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলাম। প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন। ইতি তাং—

বশম্বদ,
শ্রীসুখময় দত্ত,
ষ্ট্যাম্প-ডিলার।"

চিঠিখানির মধ্যে ২০৷৵৹র একটা মনি-অর্ডার কুপনও পাওয়া গেল।

"হাঁ, পুণ্য ডাকটিকিট্ জড় ক'রে বটে। তা' সে ঐ ডাক-টিকিট বেচে খোঁড়ার লাঠি কিনেছে কেন?"

ডাক্তার বলিলেন,—"পুণ্য, ঠিক হয়েছে, আমরা এখন বুঝতে পা'রলুম যে, তুমি সত্যিই টাকা নাও নি। নিশ্চয়ই ভারি একটা ভুল হয়েছে।"

পুণ্য হাঁফ ছাড়িয়া শান্ত হইয়া শুইল। তাহার ভ্রূর ও কপালের কুঞ্চন লুপ্ত হইল। সে আর বকিল না, অল্পক্ষণের পরই ঘুমাইয়া পড়িল।

ডাক্তার বলিলেন,—"আর ভয় নাই। এখন ওকে একটু স্থির ক'রে রাখবেন। তা' হলে শীগ্‌গিরই ও ভাল হয়ে উঠবে।"

এই সময়ে রঘু পা টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘরে আসিল।

প্রিয়বাবু। কি রে, রোঘো, কি চাস্?

রঘু। আজ্ঞে, ভূতোর মা এয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি ব'ললুম যে, 'বাবুর ছেলের অসুখ, বাবু বড় ব্যস্ত, এখন তাঁর সঙ্গে কিছুতেই দেখা হতে পারে না।' সে বলে, দাদাবাবুর সম্বন্ধে কি কথা সে আপনাকে বলতে এয়েছে।

ডাক্তার। আপনি ইচ্ছা ক'রলে এখন যেতে পারেন। এখন আর কোন ভয় নাই।

প্রিয়বাবু পুত্রের দিকে স্নেহপূর্ণ-নয়নে বেশ খানিকক্ষণ তাকাইয়া দেখিয়া, নীচে নামিয়া গেলেন। নীচের হল-কামরায় গিয়া দেখেন, চিরপরিচিতা দুঃখিনী ভূতোর মা দাঁড়াইয়া আছে, বড় কাঁদিতেছে।

"কাঁদ কেন, ভূতোর মা, ব্যাপার কি?"

"এঁজ্ঞে, দাদাবাবু এখন কেমন আছে? তেনার অসুখের কথা শুনে অবধি আমি ছট্‌ফট্ করে মরছি। আমার ভূতোর জন্যেই ওনাকে এই কষ্টটা পেতে হয়েছে।"

প্রিয়বাবু তাহাকে বৈঠকখানা-ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। একটা জায়গা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বোস, বোসে ব্যাপারখানা কি হয়েছে, সব ভেঙে চুরে বল ত।"

ভূতোর মা বসিল না। চোকে আঁচলদিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনাটা বলিল। বলিল,—"ডাক্তারবাবু (রামসদয়বাবু) আমায় বলেছিলেন যে, খোঁড়ার ডাক্তারী লাঠি পেলে তিনি ভূতোকে ভাল ক'রে দিতে পারেন। একদিন আমি কথায় কথায় সে কথা দাদা-বাবুকে বলি; একদিন দেখি, দাদাবাবু কোথেকে আমার ভূতোর জন্যে দুটো খোঁড়ার লাঠি এনে হাজির। আমি বল্লেম, 'দাদাবাবু, কোথেকে পেলে গো? বাবুকে ব'লেছিলে বুঝি?' তিনি বল্'লেন, 'না, আমি আমার ডাক-টিকিট বিক্রি ক'রে কিনেছি। কিন্তু খবরদার, একথা তুমি কাউকে বোল না।' তা' তেনার অসুখ হয়েছে শুনে আমি তো চুপ্ করে থাক্‌তে পারলুম না—সব বলে ফেল্‌তেই হ'ল।" এই বলিয়া সে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"চুপ্, ওরকম ক'রে কেঁদ না। আমার ছেলে এমন কাজ ক'রেছে—এ কথা শুনে আমার বুক দশহাত হয়ে উঠেছে—এর চেয়ে আর সংকাজ কি হ'তে পারে? ডাক্তার ব'লছেন যে, বিপদ্ কেটে গেছে, এখন সে শীগ্‌গিরই ভাল হ'য়ে উঠবে।"

"আহা, তাই হোক, বাবু, তাই হোক। ঈশ্বর করুন, দাদাবাবু যেন শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে ওঠেন, বেঁচে থাকুন, আমার মত পাকা চুল হোক—একশোবছর পেরমাই হোক! অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না।"

বৃদ্ধা প্রিয়বাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

প্রিয়বাবু উপরে গিয়া ডাক্তারকে বলিলেন,—"খোঁড়ার লাঠির ব্যাপারখানা এতক্ষণের পর বোঝা গেল।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কা'র জন্যে কিনেছিল?"

প্রিয়বাবু। ভূতোর জন্যে।

ডাক্তার। ওহো, তাই ত! ভূতোর মাকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে-ছিলেম, 'এ দুটো তুমি কোথায় পেলে'? সে ব'ললে,—'এঁজ্ঞে যিনি আমায় দিয়েচেন, তিনি নাম বলতে মানা করেছেন।' তা'হ'লে পুণ্যই কিনে দিয়েছে—এতক্ষণের পর সব বোঝা গেল।

প্রিয়বাবু। তা' হ'লে, এখন কথা হ'চ্ছে, ক্লাবের টাকাটা কে নিলে?

ডাক্তার। আমিত ইস্কুলের "অনারারী সেক্রেটারী," আমাকেই ওটা বার কর্ত্তে হ'বে দেখ্‌ছি।

৬

"বাবা!"

"কি, বাবা!"

"কে টাকাটা নিয়েছে, তা'কি তা'রা ধর্ত্তে পেরেছে?"

"না, পারে নি। কিন্তু তোমার দোষ কেটে গেছে। হেড্‌মাষ্টার মাফ চেয়ে একখানা চিঠি লিখেছেন।"

পুণ্য এখনও বড় দুর্ব্বল, কোন উত্তেজনা সহিতে পারে না।

তাহার পর, একপক্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। স্নেহ ও পুণ্য তাহাদের পিতার কাছে বসিয়া আছে, স্নেহের জ্বর বড় বেশী হয় নাই, এখন সে ভালই আছে।

পুণ্য বলিল,—"বাবা, আমি ট্রেজারার; আমারই খোয়া টাকাটার কিনারা করা উচিত।"

এই সময়ে রঘু আসিয়া বলিল,—"দাদাবাবুর ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে এয়েচেন।"

প্রিয়বাবু। আচ্ছা, তুমি তাঁকে বৈঠকখানায় বসাও, আমি যাচ্ছি।

দুই ভাই-বোনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"বাবা, উনি নিশ্চয়ই টাকাটার সন্ধান পেয়েছেন।"

"দেখি গে"—এই বলিয়া তাহাদের পিতা বৈঠকখানায় নামিয়া গেলেন। দেখিলেন, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতেছেন। প্রিয়বাবুকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"মশাই, আমি একটা ভারি ভুল ক'রে ফেলেছি। তাই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। রামসদয়বাবু আপনার ছেলের অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার ও নিরহঙ্কারের কথা আমাকে ব'লেছেন। টাকাটার খোঁজ পাওয়া গেছে। আমাদের একজন জুনিয়ার টীচারের জ্বর হয়, তাঁ'র কাগজপত্র সব আমাকে দেখ্‌তে হয়, তা'র ভেতরে একখানা ২০৸৵০র রসিদ পাওয়া গেছে। ঐ টাকাটা দিয়ে কতক ক্রিকেটের সরঞ্জাম কেনা হয়। ঐ টাকাটা তিনি ট্রেজারারকে না জানিয়েই নিয়েছিলেন। কেন তিনি তা করেন জিজ্ঞাসা করাতে ব'ল্‌লেন,—'আমার তখন অসুখের জন্য মাথার ঠিক ছিল না।' আমি সমস্ত ইস্কুলেরই হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

* * * *

হেড্‌মাষ্টার চলিয়া গেলে, পুণ্য বলিল,—"মেজদি', তা' হ'লে আমার নামটা আর কাটা যা'বে না। হয়ত আমি "বিদ্যাসাগর"-বৃত্তিটাও পেতে পারি। মা আমাকে ঐ বৃত্তিটার জন্যে চেষ্টা ক'র্‌তে ব'লে গেছেন।"

৭

ছয়মাসের পরে, একদিন, মেদিনীপুরের স্কুলে মহাধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আজ ঐ স্কুলের 'প্রাইজ'।

পুণ্য দেখিল, তাহার বাবা ও স্নেহ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে বসিয়া আছেন। একটী ছেলেকে বলিল,—"আমার অসুখ না হ'লে, আমিও হয়ত একটা প্রাইজ পেতুম।"

প্রাইজের দিনে যেমন হয়, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি হইল। তাহার পর, রিপোর্ট পাঠ। তাহার পর, প্রাইজ দেওয়া হইতে লাগিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি হইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী প্রাইজ দিতেছেন। ছেলেরা, যেই একটী ছেলে প্রাইজ লইয়া যাইতেছে, অমনি হাততালি ও শিশ্‌দিয়া এবং পা-ঠুকিয়া ও কোলাহল করিয়া উঠিতেছে। প্রাইজ সব দেওয়া হইয়া গেলে, মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত সভাস্থল নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর, সেক্রেটারী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"এইবার সবচেয়ে ভাল প্রাইজটি দেওয়া হইবে। যে ছেলে পরলোকগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মহৎ জীবন-যাপনের পূর্ব্বলক্ষণ দেখায়, তাহাকেই এই বৃত্তিটি দেওয়া হয়। এই বৃত্তিটি বৃত্তিভুক্ পাঁচবৎসর-ভোগ করিতে পারিবে। এইবার এই বৃত্তিটি শ্রীমান পুণ্যব্রত ব—"

তিনি তাঁহার কথা-শেষ করিতে পারিলেন না। ছেলেরা উল্লাসে ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল! তারা থামিলে, সেক্রেটারী, রামসদয়বাবু, বলিলেন,—

"এই বৃত্তিটি আর কেউ পেলে, আমি এত খুসী হতুম না। যে সর্ত্তে এই বৃত্তিটি পাওয়া যায়, সে সর্ত্তটা পুণ্য বড় কষ্টে রক্ষা করেছে।"

তাহার পর, ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী প্রাইজটি দিবার সময়ে বলিলেন,—"I am proud of you, my boy, you have been very courageous. It is a great pleasure to me to present your prize."

ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব বলিলেন,—"বরো ব্রেভ বয় আছে, হামিভি খুসী হইছে যে, টুমি এই scholarship পাইলা!"

সম্পূর্ণ।

শৃঙ্খলা।

অসতর্ক মানুষের উন্নতির পথে যে যে অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে একটী হইতেছে—শৃঙ্খলার অভাব। অনেক বালক ঠিক সময়ে বিছানা ছাড়িয়া উঠে না, বেলায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি না সারিয়া হয়ত পড়িতে বসে; নিয়মিত সময়ে পড়িতে বসে না; আবার পড়িবার সময়ের একটা পরিমাণও করা নাই,—কোন দিন পড়ে, কোন দিন পড়ে না, কিন্তু পরীক্ষার সময় হয় ত পাঁচঘণ্টা
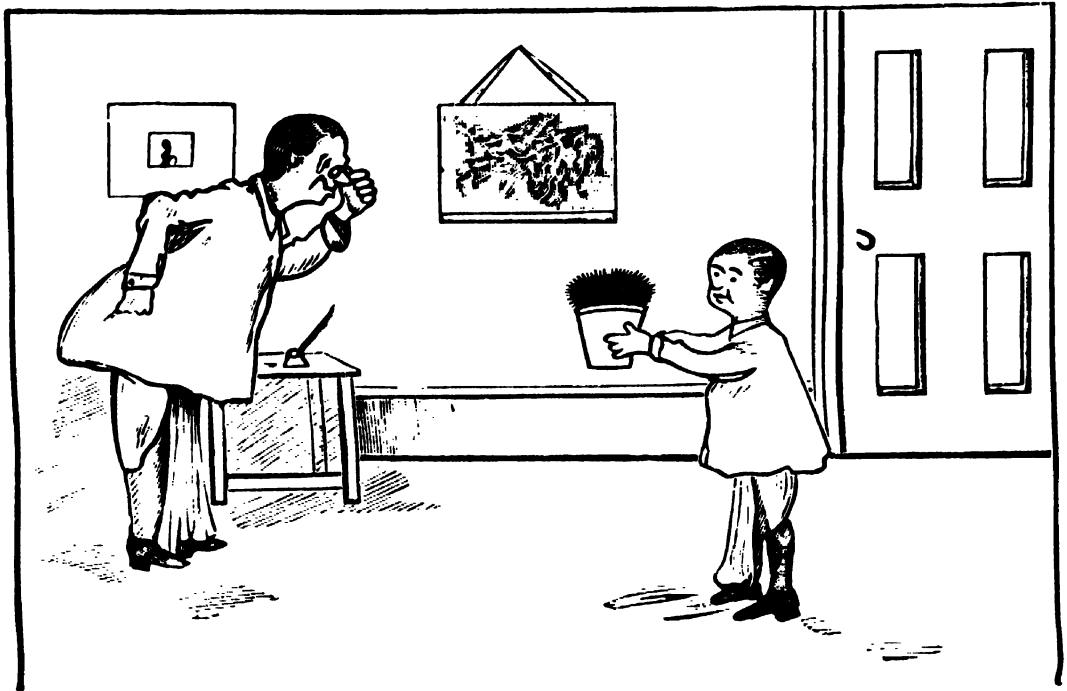
অধ্যাপক অ—রসিক। বা! বেশ নূতন রকমের মনসাগাছ ত
অবসরমত পরীক্ষা ক'রে দে'খ্‌তে হ'বে।
এ'টি কোথায় পেলে, বাবা?
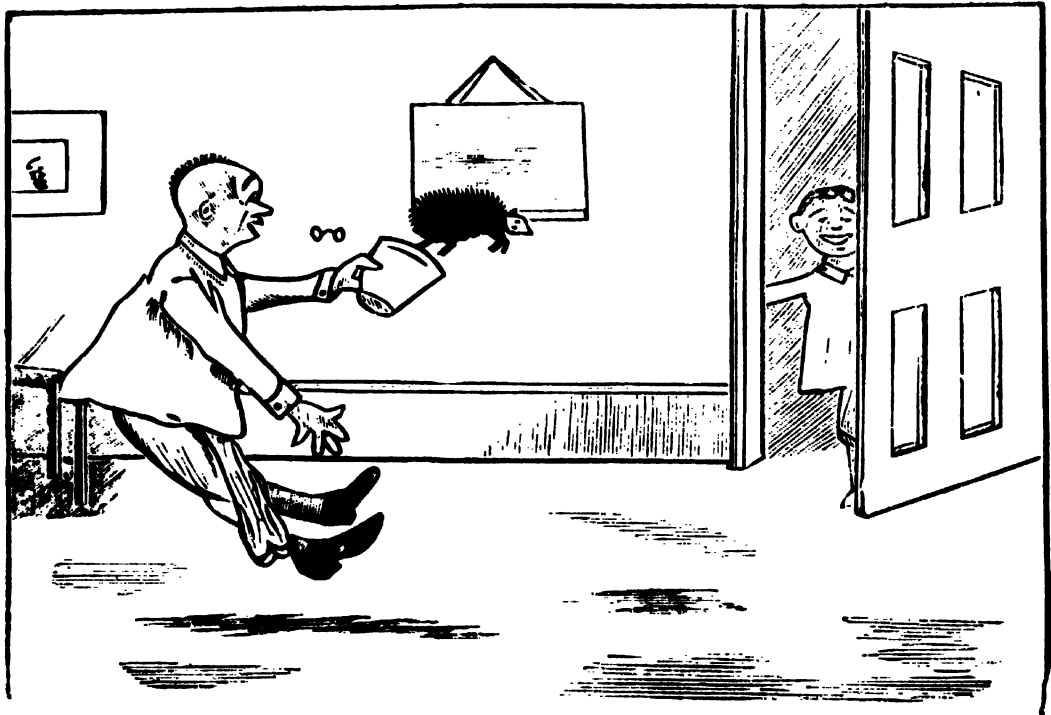
ছাত্র (বিনীতভাবে)। আজ্ঞে, বেড়ার ধারে।

বই মুখে করিয়া বসিয়া থাকে ; সময়ে প্রাতরাশ খায় না ; সময়ে বিদ্যালয়হইতে ফিরে না; কাপড়-চোপড় যেথানে সেখানে ছাড়ে,—যথন তথন যাহা তাহা কাপড় পড়ে ; বই, খাতা, পেন্সিল, কলম কথন গুছাইয়া রাথে না ; পড়িবার সময় খেলিবার কথা ভাবে, খেলিবার সময় পরীক্ষার ভয়ে আতঙ্কিত থাকে ; খেলিবার একটা নিয়মিত সময় নাই, খেলাও শৃঙ্খলার সহিত খেলে না ; কথারও কোন শৃঙ্খলা নাই,—মুখের যেন আগড় নাই,—যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা বলিয়া বসে ; অধিক কি বলিব, খাইবার সময়ও গুছাইয়া পরিষ্কৃতভাবে খায় না, আবার ক্ষুধা বা অগ্নিমান্দ্যেরও বিচার নাই ; যাহা তাহা খায়। বলা বাহুল্য, এ সকল বালক জীবনে কথনও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। এই প্রবন্ধের লেখক যতগুলি মহৎ লোককে জানেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে সুন্দর শৃঙ্খলা দেখিতে পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবনের সকল ব্যাপারেই তাঁহারা শৃঙ্খলানুবর্ত্তী। তাঁহারা প্রতিদিন একসময়ে শয্যাত্যাগ করেন, একসময়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করেন, একসময়ে কর্ম্মে যান, একসময়ে কর্ম্মস্থলহইতে ফিরেন ; তাঁহারা প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তাঁহাদের দিনলিপি লিখেন, তাঁহাদের আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদের একটা ধারা বাঁধা আছে। তাঁহারা নিয়মভঙ্গ করিলে, কেহ তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিবার নাই, তথাপি তাঁহারা নিয়ম বা শৃঙ্খলার কাছে যেন তটস্থ বা যুক্তহস্ত হইয়া আছেন। কোন নিয়মের, একান্ত অপরিহার্য্য কোন কারণ না ঘটিলে, তাঁহারা একচুলও এদিকে ওদিকে যান না। আমাদের এই দেশের লোকের একটা বড় বদ্ অভ্যাস হইতেছে, তাঁহারা বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালায় কথা কহিতে কহিতেও কথন কথন, বিশেষ কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও, ইংরাজী পদ বা বাক্য-প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ফলে তাঁহাদের কথোপকথন যেন কথোপকথনের খেচরান্ন হইয়া উঠে ; কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের একটী মহৎ লোকের কথা জানা আছে, তিনি ন্যূনপক্ষে দশটী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তথাপি একভাষায় কথোপকথনকালে তাঁহার কেহ ঘুণাক্ষরেও অন্য ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাইত না। লেখকের আর একটী মহৎ লোকের কথা জানা আছে, লেখকের বাল্যকালে সেই মহাপুরুষটী যেন লেখকের ঘটিকাযন্ত্রের কার্য্য করিতেন। ঠিক ভোর পাঁচটার সময় সেই মনস্বী ব্যক্তি প্রতিদিন ভৈঁরোরাগে একটী ধর্ম্মগীত গায়িতে গায়িতে লেখকের গৃহদ্বার-অতিক্রম করিয়া যাইতেন, তাহাতে লেখক বুঝিতে পারিতেন, পাঁচটা বাজিয়াছে।

বাল্যকালই অধিকাংশ শিক্ষা ও সদভ্যাসের পক্ষে সুপ্রশস্ত কাল। বাল্যকালহইতে যে বালক শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগী না হইয়া উঠে, সে বালক উত্তরকালে কিছুতেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া উঠিতে পারিবে না। কারণ তখন শৃঙ্খলানুযায়ী হইয়া চলা তাহার পক্ষে একান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিবে। আমরা দেখিয়াছি, অনেকে পরিণত বয়সে অনেক বিষয়ে নিজ নিজ ভুল বুঝিতে পারিলেও, তাহার প্রতীকার করিতে পারে না। লেখকের এক পত্রিকা-সম্পাদকের কথা জানা আছে, তিনি প্রায়ই লেখকদের মূল্যবান্ রচনা হারাইয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইতেন, এমন কি তিনি নিজেরও অনেক রচনা হারাইয়া ফেলিয়া অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তথাপি কথন সুশৃঙ্খলভাবে পাণ্ডুলিপিগুলি রাখিবার অভ্যাস করিতে পারেন নাই।

শৃঙ্খলামত কার্য্য করা সহজ কথা নহে, কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে, শৃঙ্খলা-রক্ষাই বরং বিশৃঙ্খলার অপেক্ষা স্বল্পায়াসসাধ্য বোধ হয়। শৃঙ্খলার অভাবে লোককে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সময়ে উপস্থিত না হইলে, "ট্রেন ফেল" করিতে হয়, দলিল-দস্তাবেজ নির্দ্ধারিত স্থানে রাখিবার অভ্যাস না থাকিলে, দরকারের সময়ে পাওয়া যায় না, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আহারাদি না করিলে, পাকযন্ত্র বিকৃত হইয়া যায়। পরিচ্ছদাদি গুছাইয়া না রাখিলে, ময়লা কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে হয়, আবার আফিসে বা স্কুলে হয়ত "ফুলবাবু" সাজিয়া গিয়া সকলেরই রঙ্গরসের পাত্র হইতে হয়।

অতএব শৃঙ্খলা কেবল মানুষের উন্নতির পথ নির্ব্বিঘ্ন রাখে, তাহা নহে, উহা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতা ও নিরুদ্বেগেরও হেতু বটে।

বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের অপেক্ষা সুশৃঙ্খল লোকই জীবনে অধিকতর উন্নতিলাভ করিতে পারেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক শৃঙ্খলার অভাবে বরং সমাজে ও কর্ম্মস্থলে নিম্নপদস্থ রহিয়া যান।

আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, যে ছেলে সকলেই মনে করিয়াছিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, সে ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ; যাহার সম্বন্ধে কাহারও কোন আশা-ভরসা ছিল না, সেই ছেলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন আমরা হয় সেই ছেলের দুর্ভাগ্যের, নয় পরীক্ষকের শৈথিল্যের দোষ দিই, কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, অনুত্তীর্ণ ছেলেটীর জীবনে শৃঙ্খলা নাই, কিন্তু উত্তীর্ণ বালকটী তত বুদ্ধিমান্ না হইলেও, তাহার জীবনে বরং শৃঙ্খলা আছে। বয়োপ্রাপ্ত মানবের কর্ম্মক্ষেত্রেও এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উদাহরণ বড় বিরল নহে, সেখানেও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, আমরা দেখিতে পাইব, বিশৃঙ্খল ও উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব মানবই অভীষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

বিশৃঙ্খল-স্বভাব লোক কোন কারবার খুলিলে, লোকসান দেয়। কারণ সে কি করিয়া পণ্যদ্রব্যগুলি খরিদ্দারের লোচনলোভনীয় করিয়া সাজাইতে হয়, তাহা জানে না। তাহার দোকানে বিক্রেয় বস্তুগুলি এলোমেলোভাবে নৈরাকার ও ধুলি-ধূসরিত হইয়া পড়িয়া থাকে। কোন খরিদ্দার যদি বা কোন দ্রব্য তাহার দোকানে কিনিতেই আসেন, তাহা হইলেও সে হয় তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া বলে, নাই ; নয় খরিদ্দারের বিস্তর সময় নষ্ট করিয়া ধুলিমলিন অবস্থায় বস্তুটি তাঁহার হাতে দেয় ; তিনি তখন হয় তাহা অল্পমূল্যে লইতে চান, নয় বিরক্ত হইয়া মোটেই না লইয়া চলিয়া যান।

তাহার হিসাবের খাতাও বিশৃঙ্খলার লীলাস্থল; জমার খাতে খরচ লেখা আছে, খরচের খাতে জমা ঢুকিয়া গিয়াছে; অনেক পাওনা টাকার দেনাদারদের কাছে সময়ে তাগাদা করা হয় নাই, ফলে সেগুলি তমাদিদোষে বারিত হইয়াছে; অনেকের কাছে "লহমা" বা "বিলেত" আদায় হইয়া গিয়াছে, তবু তাঁহাদের কাছে "হাত-চিটা" লইয়া সরকার ছুটিতেছে; মালের খরিদ্-বিক্রির হিসাবেরও একান্ত দুরবস্থা, সে ক্ষেত্রে সে লোক লোকসান দিবে না তো, দিবে কে? বিশৃঙ্খল-স্বভাব কেরাণীরও ঐ দুর্দ্দশা। সে কখন এক ধাঁজে বা ধরণে হস্তলিপি লিখে না, সুতরাং তাহার হাতের লেখা কখনও পাকে না। লিখিবার সময়ে শোষক-কাগজ হাতের কাছে রাখে না, ফলে লেখা হয় থেবড়াইয়া যায়, নয় নিজের ধুতির খুঁটদিয়া কালী শুসিয়া কাপড়খানি মাটী করে। এইরূপ ব্যক্তির কালীপূর্ণ দোয়াত প্রায়ই টেবিলের উপর উল্টাইয়া পড়ে।

আর পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই। তোমরা এখন বালক, এই বেলাহইতে সুশৃঙ্খল হইতে অভ্যস্ত হও, নতুবা, দেখিতেছ, উন্নতি তো দূরের কথা, জীবনে বড় বিড়ম্বনা-ভোগ করিতে হইবে। যে রাস্তায় বড় ভীড়, বড় কাদা, বড় গাড়ী-ঘোড়ার ছুটাছুটি, সে রাস্তাদিয়া কোন বিশৃঙ্খল-স্বভাব লোক যাউক, তাহার অন্য লোকের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া যাইবে, সে কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথদিয়া চলিতে চলিতে হয় সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমানুলিপ্ত হইয়া উঠিবে, নয় পড়িয়া যাইবে। সাবধান হইয়া পথ দেখিয়া না চলিলে, হয়ত সে গাড়ী-চাপাই পড়িবে। তোমরা জানিবে, জীবনের উন্নতির পথেও তেমনই বড় ভীড়; সেখানেও বড় ঠেলাঠেলি, বড় ঠোকাঠুকি, বড় প্রতিযোগিতা চলিতেছে; সুশৃঙ্খল হও; সাবধানে—সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ কর, নতুবা বিপদে পড়িবে।

বর্ণ-বিলাস

(ডল্‌ফিন্।)

বিশ্বেশ্বরের বিশ্বপ্রকৃতিতে জলে, স্থলে, ভূগর্ভে ও শূন্যে কত যে বিবিধ ও বিচিত্র জীবের বসতি আছে, তাহা বলা যায় না। গভীর সমুদ্রসমূহে "করুকইনা" বলিয়া একপ্রকার মৎস্য আছে, ইংরাজ-নাবিকেরা উহার নাম দিয়াছে—"ডল্‌ফিন্"; আমরা উহার নাম রাখিলাম—"বর্ণ-বিলাস"; কেন-না ঐ মৎস্য যখন জলমধ্যে অতিচঞ্চলভাবে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখন উহার মুণ্ডে, পুচ্ছে, পাখ্‌নায়, সর্ব্বাঙ্গে কত যে বিচিত্র বর্ণের বিলাস-বিকাশ হইতে থাকে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; তদ্ভিন্ন যখন উহারা আহারাভিপ্রায়ে কোন মাছকে তাড়া করিয়া যায়, কিংবা রবিরশ্মিসহ উজ্জভাবে জলোপরি ভাসিয়া 'ঘাঁই' মারে, তখন উহাদের সর্ব্বাঙ্গে নীল ও স্বর্ণবর্ণের সংমিশ্রণে কত যে অপূর্ব্বোজ্জ্বল বিনোদ বর্ণের বিকাশ হইতে থাকে, তাহা, যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে সে-ছাড়া আর কেহই অনুমানও করিতে পারিবে না। তবে উহার অঙ্গ-চালনার সময়েই কেবল উহার অবয়বে ঐ অদ্ভুতবর্ণের অপূর্ব্ব বিকাশ হয়; তখন উহা যত দ্রুতভাবে গতিপরিবর্ত্ত

করে, ততই দ্রুতভাবে উহার অঙ্গের বর্ণ-বিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। বলা বাহুল্য, যে সেই বর্ণ-বিবর্ত্তন-লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, তাহার মনে বিশ্বেশ্বরের বর্ণ-বৈচিত্র্যের এক স্বপ্নময় স্বপ্নরাজ্য চিত্রিত হইয়া আছে! কিন্তু যখন উহা স্থির হইয়া থাকে, তখন উহার সমুদয় বর্ণ-বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়, তখন উহার অঙ্গবর্ণ অনুজ্জ্বল রজতাভ হইয়া যায়

অনেকের ধারণা এই, মৃত বর্ণ-বিলাসের দেহেই নানাবর্ণের প্রকটন হয়, কিন্তু এ কথা সত্য নহে। জীবিত বর্ণবিলাসই লীলা-চাপল্যে বিবিধ ললিত বর্ণের বিলসন করে। তবে কোন বর্ণ-

বিলাস সহসা আক্রমিত হইলে মরণ-যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখনই অল্পক্ষণের নিমিত্ত অতিদ্রুত-ভাবে নানা মনোজ্জ্বল-বর্ণের সুচারু-রূপে বিকাশ করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। অধিক আর কি বলিব, জীবিত বর্ণ-বিলাসের কেলিচপলতা-জনিত বর্ণবিকাশ কালিদাসের ন্যায় কলা-কুশল মহাকবি এবং মাইকেল এঞ্জেলোর মত চিত্রণ-চতুর মহা-চিত্রকরও বর্ণিত বা চিত্রিত করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ!
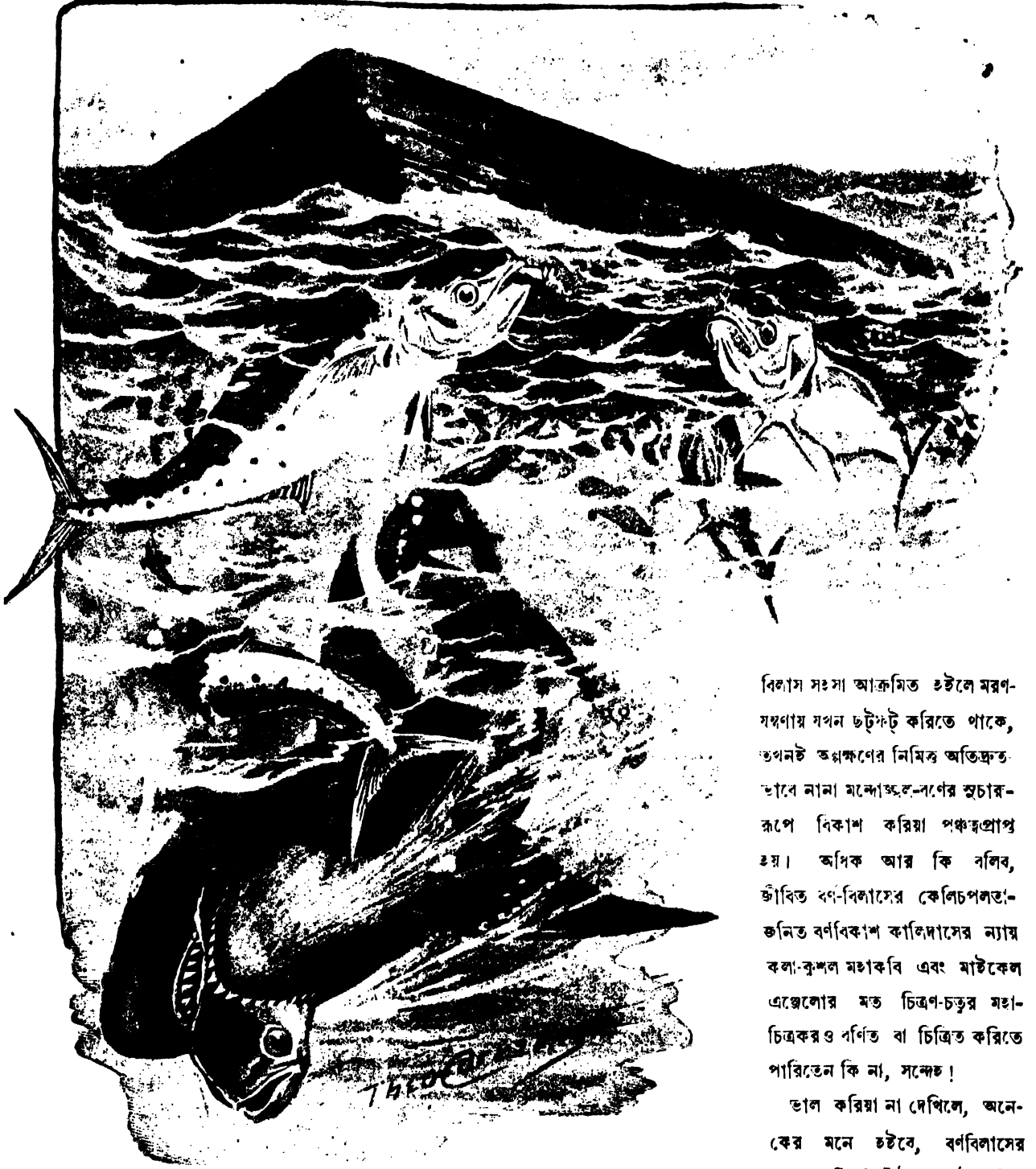
ভাল করিয়া না দেখিলে, অনেকের মনে হইবে, বর্ণবিলাসের দেহে বুঝি আঁইষ নাই, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, দেখা যাইবে, উহার সর্ব্বাঙ্গে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইষ আছে। তন্মধ্যে উহার স্কন্ধদেশস্থিত আঁইষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও অধিকতর ঘনসন্নিবিষ্ট

এই মৎস্য লম্বে দুইগজের এবং প্রস্থে কিঞ্চিদধিক এক ফুটের অধিক হয় না। স্ত্রীজাতীয় বর্ণবিলাসও পুংজাতীয় বর্ণবিলাসের ন্যায়ই কেলিকালে নয়নরঞ্জন বিচিত্র বর্ণের বিকাশ করে, তবে উহা আকারে পুং-বর্ণবিলাসের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। এই মৎস্য গভীর সমুদ্রের অধিবাসী হইলেও সচরাচর সমুদ্রসলিলের প্রায় উপরিভাগেই সঞ্চরণ করে। বর্ণবিলাস যখন শিশু থাকে, তখন উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাইভগিনীগুলির সহিত ঝাঁক বাঁধিয়া সঞ্চরণ করে, কেননা 'চারা' বর্ণবিলাসের শত্রুসংখ্যা বড় অধিক থাকে—এমন কি তখন উহার স্বজাতীয় কোন বৃহত্তর বর্ণবিলাসও উহাকে কবলিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু শত শত্রুগ্রাসহইতে রক্ষা পাইয়া যদি উহা কোন প্রকারে বড় হইতে পায়, তাহা হইলে তখন আর ঝাঁকের সহিত বিহার করে না, কেননা তখন দলে থাকিলে, অরি-কবল-অতিক্রম করিয়া পলাইবার, বোধ করি, উহার তত সুবিধা হয় না।

বর্ণবিলাস বড় দ্রুতগামী মৎস্য। এজন্য কুম্ভীর, হাঙ্গর, তিমি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মন্থরগামী জলজন্তু উহাকে বড় সহজে গ্রাস করিতে পারে না। তবে এই মৎস্য, বোধ করি, তত চতুর নহে, তাই হাঙ্গর প্রভৃতির ন্যায় উহার অপেক্ষা মন্থরগামী জীবও কখন কখন উহাকে গ্রাস করিতে পারে।

হংসমাতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

২

কষ্টে সৃষ্টে বেচারারা অনেক দূর গিয়া ঝিলের পাড় বহিয়া উপরে উঠিয়া, বঙ্গদেশের হোগলা-বনের মত একপ্রকার লম্বা লম্বা ঘাসের বনে ঢুকিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল। একটা বাচ্ছা অনেক কষ্ট করিয়া আর সকলের সঙ্গে সঙ্গে এতটা পথ আসিয়া, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে যে বাকি পথ হাঁটিয়া, বড় সাধের বড়ঝিলপর্য্যন্ত যাইতে পারিবে, এমন আশা নাই বলিলেই হয়।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা হইলে, ধাড়ী হাঁসী ধীরে ধীরে "প্যাক" করিয়া উঠিল, মানে, "বাচ্ছাসকল, আর কেন—চল।" এই ডাক শুনিয়াই সকলে উঠিয়া, পিক-পিকশব্দ করিতে করিতে ঝিলের দিকে চলিল। ঘাস-বনের ভিতর-দিয়া মাথা গলাইয়া গলাইয়া হেলিতে দুলিতে বাচ্ছারা চলিল। যেটা গলিয়া বাহির হইয়া যায়, সেটা বড় খুসি; যেটা ঘাসের ডগায় আটকিয়া যায়, মা আসিয়া সেটার পথ করিয়া দেয়।

খানিকদূর হাঁটিয়া হংসমাতা ছানাগুলিকে লইয়া, এক পরিষ্কার খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল। এরূপ জায়গা দিয়া পথচলা সহজ, কিন্তু চীল ও বাজপক্ষীর বড় ভয়। এই খোলা জায়গায় পা দিবার পূর্ব্বে হংসমাতা লতা-পাতার আড়ালে থাকিয়া আকাশ পানে, আশে পাশের গাছে বেশ করিয়া তাকাইয়া দেখিল, কোথায়ও বাজ বা চীল ইত্যাদি শত্রু আছে কি না। যখন কোথায়ও কিছু দেখিতে পাইল না, তখন আপনার নবজাত সেনাদল লইয়া, দুইশত-হাত দীর্ঘ ভূমি পার হইবার জন্য যাত্রা করিল।

ছানাগুলি হাঁইফাই করিতে করিতে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ছোট ছোট ডানাগুলি খুলিয়া, এঁকে বেঁকে পা ফেলিয়া বাচ্ছারা চলিল; এক এক বাচ্ছার পা-দুইখানি যেন "দাঁড়," আর ডানা-দুইখানি যেন "হাইল"

হংসিনী মনে করিয়াছিল, পথে বিশ্রাম না করিয়া, বরাবর

চলিয়া মাঠ পার হইবে। কিন্তু খানিকদূর গিয়া দেখিল, তাহা অসম্ভব। গোটাকতক বাচ্ছা বেশ শক্ত-সমর্থ, সেগুলি মায়ের সঙ্গে সমান সমান বেশ চলিল; কিন্তু বাকিগুলি দুর্ব্বল। সেগুলির বড়ই কষ্ট। ফলে এক্ষণে আর সকলে সমান সমান চলিতে পারিতেছে না। এখন একটার পিছনে আর একটা, এইরূপে কুড়িহাত লম্বা সারি বাঁধিয়া চলিল, যেটা সকলের অপেক্ষা দুর্ব্বল, সেটা সকলের শেষটার, কম হইলেও, পাঁচহাত পিছনে।

আর কাহারও পা চলে না। এই মাঠের মধ্য-স্থলে খানিক বিশ্রাম না করিলেই নয়; অথচ এখানে—এই খোলা মাঠে বিশ্রাম করিলে, বিপদ্ ঘটিতে পারে। আবার বিশ্রাম না করিলেও নয়। বাচ্ছাগুলি হাঁফাইতে হাঁফাইতে মায়ের কাছে আসিয়া, কেহ মায়ের গায়ে হেলান দিয়া, কেহ বা মায়ের পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল। কাজেই বিশ্রাম করিতে হইল। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর, ধাড়ীটা আবার ছানাগুলিকে লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। আর ধীরে ধীরে মধুর প্যাঁক-প্যাঁক-শব্দ করিয়া, যেন বলিতে লাগিল, "বাচ্ছারা, সাহস কর, সাহস কর।"

অর্দ্ধেকের বেশী পথ বাকি আছে; সম্মুখে একটু জঙ্গল দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাচ্ছাগুলি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে। বাচ্ছারা একটার পিছনে, এবারে একটু বেশী পিছনে—আর একটা চলিয়াছে, এমন সময়ে একটা বাজ-পক্ষী দেখা দিল। সেটা খুব নীচে নামিয়া উড়িতে আর কোন্‌টাকে ধরিবে, তাই দেখিতে লাগিল।

বাজ দেখিতে পাইবামাত্র ধাড়ীটা 'প্যা-য়া-ক'শব্দ করিল; ইসারা বুঝিতে পারিয়া একটী ছাড়া সমস্ত বাচ্ছা সটান মাটীতে শুইয়া পড়িল—কেবল একটী, যেটী সকলের পিছনে ছিল, সেইটী মায়ের ডাক শুনিতে না পাইয়া, হাঁইফাঁই করিয়া চলিতেছিল। বাজপক্ষী থাবা মারিয়া সেইটাকে ধরিয়া আকাশে উড়িল। মা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, নিষ্ঠুর শত্রু বেচারীর অঞ্চলের নিধি লইয়া গেল, বাধা দিতে ও দণ্ড দিতে পারিল না; মনে বড়ই দুঃখ হইল। বাজটা দণ্ড পাইল না, একথাই বা কি করিয়া বলি। বাজের বাসায় তাহার নিজের বাচ্ছা ছিল। বাজটা হাঁসের বাচ্ছা লইয়া সেই দিকে উড়িল। ঝিলের নিকটে একটা গাছে দুইটা কাক ছিল। দুইটা কাকই বাজকে তাড়া করিয়া ছুটিল। বাজ খুব বড়, কিন্তু কাক অতি ছোট পাখী; হইলে কি হইবে? কাকের ভয়ে বাজ বিদ্যুৎ-বেগে উড়িল, কাকেরা যে "নাছোড়বন্দা"। কাকেরা বাজকে ধর ধর হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে কাক, বাজ, সকলেই অদৃশ্য হইল। আর তাহাদের গলাও শুনিতে পাওয়া গেল না। অনেক দূরে চলিয়া গেল।

পণ্ডিতেরা বলেন, পুত্রকন্যার শোকে মানুষের প্রাণ যতটা কাতর হয়, পক্ষি-মাতার প্রাণ ততটা কাতর হয় না। হউক বা না হউক, বাচ্ছাটীর শোকে হংসীর মনে যে কতকটা বেদনা জন্মিয়াছিল, পণ্ডিত, অপণ্ডিত, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু একটার শোকে আত্মহারা হইলে ত চলিবে না, বাকি নয়টাকে বাঁচাইতে হইবে ত! বেচারী তাহাদের ভাবনায় অস্থির। পক্ষি-মাতা খুব তাড়াতাড়ি নয়টী ছানাকে লইয়া ঝোঁপের ভিতরে গেল। এইখানে আসাতে তাহাদের ধড়ে যেন আবার প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

হংস-মাতা ছানাগুলিকে ঝোঁপের ভিতর ও ডালপালার আড়াল দিয়া দিয়া ঝিলের দিকে লইয়া চলিল। একঘণ্টার একটু বেশী এইরূপে পথ চলিল; পথে অনেকবার বিশ্রাম করিতে হইল, অনেকবার ভয়ও পাইতে হইয়াছিল; অবশেষে ঝিল দেখা গেল, নিকটেই, বেশী দূর নহে। ভালই হইল, কারণ বাচ্ছাগুলি নিতান্ত কাতর হইয়াছে; আহা, ডানায় ঘাসের আঁচড় লাগাতে বেচারাদের কচি ডানা ও হাঁটু দিয়া রক্ত পড়িতেছে, আর বাচ্ছাগুলি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, ধড়ে প্রাণ নাই বলিলেই হয়। পুনরায় যাত্রা করিবার আগে হাঁসী বাচ্ছাগুলিকে লইয়া একটা বড় ঝোঁপের আড়ালে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল। এইবার খানিকটা খোলা জায়গা দিয়া যাইতে হইবে—মাঝে মাঝে হোগলার মত একপ্রকার ঘাস আছে।

মৃত্যু যে অন্য আকারে পিছনে পিছনে ধাইয়াছে, বেচারারা সে বিষয়ে কিছুই জানে না। বাচ্ছাদের লইয়া হাঁসী যে দিকে গিয়াছে, একটা শৃগাল কোথাও যাইতে যাইতে সেই দিকে আসিয়া পড়িল। আসিবামাত্র হাঁসের গন্ধ পাইল, এবং পায়ের দাগ দেখিতে পাইল। এই সকল দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে, এই দাগ ধরিয়া গেলে, বিলক্ষণ "ফলারের" জোগাড় হইবে—ধাড়ী ও বাচ্ছা, সমস্তই উদরস্থ করিতে পারিবে; কেবল পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া গেলেই হয়। অতএব শিয়াল গন্ধ ও পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া চলিল। খানিক-দূর গিয়াই বাচ্ছা-সমেত হাঁসীকে দেখিতে পাইল। শৃগাল অবাধে বরাবর আর খানিকটা যাইতে পাইলে, শীঘ্রই ধাড়ী ও বাচ্ছা সকলই তাহার দামোদরে স্থান পাইত, কিন্তু এ সংসারে অনেক কাজেই বাধা পড়ে। শিয়াল হাঁসেদের আরও কাছে আসিল। যদি গণিতে জানিত, তবে গণিতেও পারিত। এমন সময়ে বন্দুক কাঁধে করিয়া, ঝোঁপের ভিতর-হইতে এক গুরখা-শিকারী দেখা দিল। শিকারীকে দেখিয়াই ধূর্ত্তরাজ শৃগাল ঊর্দ্ধশ্বাসে—হাঁসেরা যে ঝিল-হইতে আসিয়াছিল, সেই ঝিলের দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটিল। দেখিতে না দেখিতে শিয়াল অদৃশ্য হইল। আগেই ত বলিয়াছি, এই ধূর্ত্ত-রাজ শিয়ালের হাতে পড়িলে ধাড়ী-বাচ্ছা সকলই মারা যাইত, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া শিয়াল পলাইল। হংসমাতা যে এত "হুঁশিয়ার" এই ঘটনার বিষয় সেও বিন্দুবিসর্গ টের পাইল না।

(ক্রমশঃ।)

জীবাণু।

বালকগণ, তোমাদের মধ্যে অনেকেই, বোধ হয়, জান না যে, আমরা খালি চখে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তাহাছাড়া এই পৃথিবীতে আরও অনেক পদার্থ আছে। এই সকল পদার্থ অণু-বীক্ষণ-নামক যন্ত্রের সাহায্য বিনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অণু-বীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল অতি ক্ষুদ্র পদার্থকে বৃহৎ দেখায়। তোমরা জীবন-ধারণ-জন্য সর্ব্বদাই বায়ুমণ্ডলহইতে বায়ু টানিয়া লইতেছ ও তৃষ্ণা পাইলে, জলপান করিতেছ; কিন্তু তোমরা কখন কি ভাবিয়াছ যে, বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবীস্থ জলরাশি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুতে পরিপূর্ণ? এই সকল জীবাণুকে তোমরা খালি চখে দেখিতে পাও না বলিয়া বায়ুমণ্ডলে কিংবা জলে তোমরা ইহাদের অস্তিত্ব হয়ত বিশ্বাস করিবে না।

জীবাণু কি? উহারা অতিশয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌জাতীয় সচেতন পদার্থ। উহারা জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। সাধারণতঃ উহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিরীহ জীবাণু ও অনিষ্টকারক জীবাণু। আমি তোমাদিগকে এই অনিষ্টকারী জীবাণুসম্বন্ধেই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

অনিষ্টকারী জীবাণুসকল মনুষ্য ও পশুদেহে নানারূপ কঠিন ও সাংঘাতিক পীড়ার সৃষ্টি করে। উহারা ক্ষতস্থানে বাস করিয়া, ঘা ও ফোড়ার যন্ত্রণা-বৃদ্ধি করে ও উহাদিগকে সহজে আরোগ্যলাভ করিতে দেয় না। উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথমে ইউরোপে কোন রোগী সহজে হাঁসপাতালে যাইতে চাহিত না। সে সময়ে ইউরোপের লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, রোগী হাঁসপাতালে যাইলে আর ফিরিয়া আসিবে না। এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল, তাহা নহে। কঠিন রোগ না হইলে, প্রায় কেহ হাঁসপাতালে যায়না। এই সকল হাঁসপাতালে কঠিনরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের ক্রমাগত চিকিৎসা হওয়ায়, হাঁসপাতালের গৃহ ও প্রাচীরাদি অসংখ্য অনিষ্টকারক জীবাণুতে পরিপূর্ণ থাকিত। কোন রোগী কঠিন কিংবা সাংঘাতিক ব্যারাম কিংবা ক্ষত লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, এই সকল অনিষ্টকারক জীবাণু তাঁহাকে আক্রমণ করিত ও ব্যারাম-আরোগ্য হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা-প্রদান করিত। আরও বিপদের কথা এই যে, তখনকার চিকিৎসকগণ এই সকল রোগোৎপাদনকারী জীবাণুকে কিরূপে বিনাশ করিতে হয়, তাহার সম্যক্ উপায় জানিতেন না। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক লর্ড লিষ্টার প্রথমে দেখাইলেন যে, গরম জল, কারবলিক এসিড, পরিষ্কৃত লিণ্ট প্রভৃতি ব্যবহার করিলে এবং ক্ষতস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিলে, এই সকল জীবাণু ঘা-ফোড়ার বেশী অনিষ্ট করিতে পারে না। তাহার পর জর্ম্মণির সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার কোথ্ এই জীবাণুকে বিনাশ করিবার বহু উপায়-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল অনিষ্টকারক জীবাণু প্রধানতঃ পচা জিনিস, দূষিত ও ময়লা জল এবং অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে উৎপন্ন হইয়া তথায় তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি করে এবং সুযোগ পাইলে মনুষ্য ও পশুদেহকে আক্রমণ করিয়া কঠিন ও সাংঘাতিক রোগ-সমূহ উৎপাদন করে। তোমরা অনেকেই, বোধ হয়, জান না যে, পচা ও অপরিষ্কৃত খাবারে, দূষিত ও ময়লা জলে এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে আমাদের প্রাণবিনাশকারী বিষম শত্রু লুকাইয়া থাকে। জানিলে, তোমরা, বোধ হয়, পূর্ব্বহইতেই সাবধান হইতে পার। আমাদের দেশে যে সমস্ত ভয়ানক রোগ হয়, ওলাউঠা তাহার মধ্যে একটি। এই রোগে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর বহুলোক মারা যায়; বিশেষতঃ চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে এই রোগ ভীষণ আকার-ধারণ করিয়া অকালে বহুলোকের প্রাণ-সংহার করে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গে এই রোগ এত প্রবল হয় কেন? তাহার কারণ বঙ্গে এই সময়ে ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়। এই ওলাউঠা-রোগও একপ্রকার জীবাণুর কার্য্য। ইহা-দিগকে 'কমা-জীবাণু' বলে। দেখিতে অনেকটা কমার ন্যায় বলিয়া, পণ্ডিতগণ উহাদিগকে ঐ নাম-প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলি-য়াছি, এই সকল অনিষ্টকারক জীবাণু পচা জিনিস এবং অপরিষ্কৃত ও দূষিত জলে উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রের তাপে নদী, বিল ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুকাইয়া যায়, সুতরাং সেই সকল জলাশয়ে যে অল্প জল থাকে, তাহা শীঘ্রই ময়লা, ঘোলা ও কর্দ্দমযুক্ত হইয়া উঠে। আবার মূর্খ লোকে এই সকল পানীয় জলে গরু, মহিষ প্রভৃতিকে স্নান করাইয়া উহা আরও ঘোলা ও দূষিত করিয়া তুলে। তখন কমা বা ওলাউঠার জীবাণু এই দূষিত জলকে আপ-নাদের বাসস্থানের উত্তমরূপ উপযোগী দেখিয়া তাহাতে উৎপন্ন হয় ও বংশ-বৃদ্ধি করিতে থাকে। লোকে পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল জলের অভাবে তৃষ্ণার সময় এই বিষাক্ত জল-পান করিয়া বিষম শত্রুকে উদরের মধ্যে স্থান দেয় ও রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ওলাউঠারোগ সংক্রামক, অর্থাৎ এই রোগের জীবাণু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহহইতে সুস্থ ব্যক্তির উদরে প্রবেশ-লাভ করিয়া ওলাউঠারোগ উৎপাদন করিতে পারে। দুগ্ধের সহিত এই জীবাণুর কোনরূপে সংযোগ হইলে, ইহারা দুগ্ধেই বংশ-বৃদ্ধি করে। তখন লোকে এইরূপ দুগ্ধপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সময়ে সময়ে এই জীবাণুসকল রাস্তার ধূলিরাশির সহিত মিশ্রিত থাকে। বড় বড় সহরের রাস্তার ধূলি সর্ব্বদাই নানাপ্রকার অনিষ্টকারক জীবাণুতে পরিপূর্ণ। সহরের রাস্তায় ময়রায় দোকানে যে ভাবে খাদ্যাদি সজ্জিত থাকে, তাহা বিশেষ আপত্তিজনক। বায়ুতে ধূলি উড়াইয়া খাবারের উপর ফেলিয়া দেয় এবং ধূলির সহিত যে জীবাণু থাকে, তাহা খাবারে আশ্রয়-লাভ করে। এরূপ খাবার খাইলে যে

ব্যারাম হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। খাদ্য দ্রব্যাদি সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত। সুখের বিষয় এই যে, বিসূচিকার জীবাণুকে বিনষ্ট করিবার অতি সহজ উপায় আছে জল ও দুগ্ধ ভালরূপে ফুটাইয়া লইলে, ওলাউঠার জীবাণু মরিয়া যায়। কেবল ওলাউঠার জীবাণু কেন, অধিকাংশ জীবাণুই, যে উত্তাপে জল ফুটিতে থাকে ততটা উত্তাপ পাইলে, মরিয়া যায়। সাধারণতঃ বিসূচিকার সময়, জল ও দুগ্ধ বিশেষরূপে উত্তপ্ত না করিয়া কদাচ পান করিতে নাই। ওলাউঠার সময় অপক্ক কিংবা অতিশয় পক্ক ফল খাইবে না। কলিকাতার কলের জল একরূপ দোষশূন্য, উহা না ফুটাইয়া পান করা যাইতে পারে।

শ্রীতরুণচন্দ্র বসু, বি, এ।

———:*:———

ব্যোম-বিহার।

ইউরোপে ও আমেরিকায় এখন আকাশে উড়িয়া বেড়ান প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় দুইজন সাহেব আসিয়া আকাশে উড়িয়া বঙ্গবাসী অনেককেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছেন। অতএব এ সময়ে ব্যোম-বিহারসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বালকের পাঠকগণকে বলা, আশা করি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তবে কি কৌশলে ব্যোমবিহারিগণ আকাশ-পথে বিচরণ করিয়া বেড়ান, তাহা বর্ত্তমান নিবন্ধের অন্তর্গত করা হইবে না; আশা করি, সে সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানবিৎ ও যোগ্যতর লেখক বালকের বালক-পাঠকগণকে কএকটি কথা সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়া আমাদের সকলেরই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। আমি এই প্রবন্ধে কয়েকজন ব্যোমবিহারীর যথেচ্ছবিচরণশীল ব্যোমযানে চড়িয়া ব্যোমমার্গে প্রথমবার বিচরণের অভিজ্ঞতার কথাই বালকের পাঠকগণকে উপহার দিব।

সাধারণ ব্যোমযান বা বেলুনে চড়িয়া কেহ যথেচ্ছবিচরণ করিতে পারিত না। ঐ যানে চড়িয়া আকাশে উড়িবার সময়ে বায়ুর গতি যে দিকে থাকিত, ঐ যান-বিহারীকেও অগত্যা সেইদিকে উড়িয়া যাইতে হইত। পরে পুরাকালীন 'পুষ্পকরথের' কল্পনা যাহাতে বাস্তবে পরিণত হয়, তাহার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যোম-বিহারিগণের মধ্যে নানা জল্পনা, কল্পনা, চেষ্টা ও আবিষ্ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ঐ উদ্যম করিতে গিয়া কয়েকজন অতিসাহসিক বীর-পুরুষ প্রাণ হারাইলেন। অবশেষে মার্কিণমুলুকের রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় উহাকে কল্পনার রাজ্যহইতে বাস্তবের রাজ্যে আনিতে সমর্থ হইলেন। পরে এখন ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকেই অনেকপ্রকারের ব্যোমরথ (aeroplane) আবিষ্কারপূর্ব্বক আকাশ-পথে উড্ডীন হইয়া যশোলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

তাঁহাদিগের মধ্যে মসিয়েঁ লুই ব্লেরিয়ট্‌নামক একজন ফরাসী বীরপুরুষ ডোভারপ্রণালী পার হইয়া বিলাতের "দৈনিক ডাক"- (Daily Mail) নামে সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারিগণদ্বারা ঘোষিত একহাজার পাউণ্ড অর্থাৎ পনেরহাজার টাকা পুরস্কার পান। তিনি ১৯০৯ সালের ২৫শে জুলাই-তারিখে ঐ মহাবিস্ময়জনক বীরোচিত কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়া দর্শক ও বৈজ্ঞানিকমাত্রেরই নিকটহইতে ভূয়সী প্রশংসা ও উক্ত অর্থ-পুরস্কার-লাভ করেন। তিনি তাঁহার প্রথমবার ব্যোমরথারোহণ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"আমি ১৯০৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর-তারিখে Issy-les-Moulineaux-নামক প্যারিসের নিকটবর্ত্তী গড়ের মাঠহইতে প্রথমবার ব্যোমরথে করিয়া ব্যোমপথে উঠি। এখন অনেকেই ঐ মাঠহইতে প্রথমবার ব্যোমরথে চড়িয়া আকাশে উঠিতেছেন।

আমি সে বার একাকী উঠিয়াছিলাম, এবং পুনরায় ভূমিস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে শূন্যে প্রায় দুইশত গজ পথ উড়িয়াছিলাম। আমি যে যন্ত্রটির সাহায্যে উড়িয়াছিলাম, তাহার এক্ষণে আমি "ব্লেরিয়ট্ মনোপ্লেন"-নাম রাখিয়াছি। ঐ যন্ত্রে আমিই প্রথমবার উড়ি। আমার ঐ ব্যোমরথের ঐরূপ প্রাথমিক অবস্থায় দুর্ঘটনার ভয়েই যে আমি একাকী উড়িয়াছিলাম, তাহা বলা অনাবশ্যক।

আমি ভয় পাই নাই, বরং আমার ঐ ব্যোমরথ কেমন উড়িতে পারে, তাহা দেখিবার জন্য আমি কৌতূহলাক্রান্ত ছিলাম। ব্যোম-রথটা বেশই উড়িয়াছিল, তজ্জন্য আমার বড়ই সুখ ও আহ্লাদ-বোধ হইয়াছিল। সেবার আমি অধিক দূর উড়িতে পারি নাই বটে, তবু আমার ব্যোমরথের ভবিষ্যোন্নতির আশা করিয়া আমি সে বারকার সেই সংক্ষিপ্ত যাত্রাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।"

আমেরিকার রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বায়ুর অপেক্ষা গুরুতর ব্যোমরথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশে বিহার করিবার অগ্রণী-গৌরব তাঁহাদেরই প্রাপ্য। উইলবার ও অর্ভিল রাইটই তাঁহাদের কৌশল, সাহস, আবিষ্ক্রিয়াবলী ও পরীক্ষাদির দ্বারা শূন্যে বিচরণের পথ সর্ব্বপ্রথমে সুগম করেন।

(ক্রমশঃ।)

———

বর্ত্তমান বর্ষের আদর্শক-বাক্য।

আমাদের শ্রদ্ধেয় শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলের খাস-দফতরের সুযোগ্য প্রধান-কর্ম্মচারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, আর, গুর্লে-মহোদয় বালকের বালক-পাঠকদিগের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত আমাদের অনুরোধক্রমে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত আদর্শক-বাক্য বা 'মটো'টি পাঠাইয়া দিয়াছেন—

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ এবং যাহা ঠিক তাহাই কর। সৎ, সদয় ও সাহসী হও।

"টীম"-নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে মোটে পাঁচজন প্রতিযোগী নাম লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এ কারণ আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না।

"বালক"-সম্পাদক

পদ্য-রচনার প্রতিযোগিতা।

এই ছবিটি-অবলম্বন করিয়া ছেলেদের উপযুক্ত একটী হাসির কবিতা-রচনা করিতে হইবে। কবিতাটি যেন যোল-পংক্তির বেশী বড় না হয়। উহা ফেব্রুয়ারীমাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে আসা চাই। কবিতাটি কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া "বালক"-সম্পাদক, ২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। প্রাপ্ত কবিতাগুলির "বালক"-সম্পাদক যথেচ্ছ-ব্যবহার করিতে পারিবেন। যে লেখকের কবিতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে একখানি ইংরাজী-পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

তাই লেখকগণ তাঁহাদের রচনাগুলির নিম্নে কোন একস্থানে তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

চিঠিচাপাটি

১। শ্রীশ্রীমন্তলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, বয়ঃক্রম তেরবৎসর, বালকের নিমিত্ত প্রবন্ধ লিখিতে চাহেন, কিন্তু প্রথমে তিনি আমরা কিরূপ প্রবন্ধ চাহি, তাহা জানিতে চাহেন। আপনি ১৯১২ সালের বালকগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া দেখিলে, আমরা কিরূপ প্রবন্ধ চাহি, তাহা অনেকটা অনুভব করিয়া লইতে পারিবেন।

২। শ্রীবলাইচন্দ্র আঢ্য, চুঁচুড়া, আমাদের নিকটে কএকটি কবিতা ও ধাঁধা পাঠাইয়াছেন। ধাঁধাগুলি প্রকাশোপযোগী হয় নাই; প্রেরিত ধাঁধাগুলির অপেক্ষা অধিকতর সুকৌশলসম্পন্ন ধাঁধা পাঠাইলে, আমরা প্রকাশিত করিতে পারি। পত্রের নিমিত্ত ধন্যবাদ।

৩। শ্রীপঞ্চানন সরকার, ম্যানেজার, এস, এন্, ক্লাব, আন্দুল, আমাদিগকে একখানি দীর্ঘ ও আগ্রহোদ্দীপক পত্র লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন "বালকে" প্রকাশার্থ একটী কবিতাও পাঠাইয়াছেন; দুঃখের বিষয়, কবিতাটি ঠিক প্রকাশোপযোগিনী হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষের বালকে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের ধন্যবাদযোগ্য হইয়াছেন। আপনার পত্রখানি পাইয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আশা করি, আপনি পুনরায় কোন সময়ে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।

৪। শ্রীদাশরথী চৌধুরী, কলিকাতা, বালক পড়িয়া যে বড় আনন্দিত হইয়া থাকেন, তাহা জানাইতেছেন। তিনি লিখিতেছেন যে, সময়ে সময়ে তিনি বালক পড়িতে পড়িতে এমনই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহার আহারের বেলা হইয়া যায়। ১৯এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবিখানি দেখিয়া তিনি নিশ্চয়ই কৌতুক, বোধ করিবেন। তবে আমরা আশা করি, "বালক" পড়িতে তিনি তাঁহার আহারের কথা ভুলিয়া গেলেও, তাঁহার পোষা প্রিয় জীবটির কথা ভুলিয়া যান না। ইনি বালকে প্রকাশার্থ একটী গল্প পাঠাইয়াছেন, গল্পটি বেশ সুন্দর, কিন্তু বালকে প্রকাশোপযোগী হয় নাই।

বালক

২য় বর্ষ।] মার্চ, ১৯১৩। [৩য় সংখ্যা।

স্বর্ণসূত্র।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৩

পরেশ যে কতক্ষণ সেইস্থানে সেইভাবে পড়িয়া রহিল, তাহা অনুভব করিতে পারিল না; সে যেন স্বপ্নে শুনিতে লাগিল, কে গায়িতেছে—

প্রভাতী—আড়াঠেকা।

"একাকী বিহরি' বনে, প্রিয় বৎস, তুমি শ্রান্ত,
হৃদয় ভাঙিয়া যায় হ'য়ে, আহা, পথ-ভ্রান্ত।
যাতনা অরাতি নহে,
ধন্য, যে যাতনা সহে;
নহ তুমি বন্ধুহীন, হইলেও ক্লিষ্ট, ক্লান্ত।"

পরেশ চোক মেলিয়া চাহিল, কিন্তু তখনও একটিও অঙ্গ-সঞ্চালন করিল না, সে যেন এক আশ্চর্য্য কুহকে মোহিত হইয়া পড়িয়া রহিল। তখন উষার ধূসর আলোকে পূর্ব্বদিক্ আলোকিত হইয়াছে। তাহার মাথার উপরে একটা গাছে বসিয়া একটা শ্যামা-পাখী শিশ্ দিতেছে। আবার কে গায়িতে লাগিল—

"যাতনা শিখা'বে ভক্তি,
পিতৃপদে অনুরক্তি;—
আজ্ঞাধীন হ'তে তাঁ'র দমি' দর্প দুরদান্ত।
পাখীরা অদৃশ্য হ'য়ে,
কুলায়-মাঝারে র'য়ে,
শুন কি মধুর গায়, দেখি' দূরগত ধ্বান্ত।
তা'হতেও সুমধুর
তা'র মর্ম্ম-বীণা-সুর,
ছাড়ে না যে সত্য পথ, হইলেও জীবনান্ত।"

পরেশ নড়িতে বা কথা কহিতে পারিল না; কিন্তু সে নিজের মনে মনে দুঃখের সহিত স্বীকার করিল যে, সে অন্যায় করিয়াছে। আবার সেই সুধাময় সঙ্গীত আরম্ভ হইল—

"উঠ, উঠ, হে দয়িত,
নহ তুমি নির্ব্বাসিত,
গেছে নিশা, রবি আসি' রঞ্জে, হের, প্রাচীপ্রান্ত।
পিতৃপ্রেম মনে রাখি',
তাঁহাতেই স্থির থাকি',
যাও ফিরি' তাঁ'র কাছে, রহিবে না ভারাক্রান্ত।"

পরেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমি আমার বাবার কাছে ফিরে যা'ব।" তখন সে দেখিতে পাইল, তাহার কাছে কে একজন পরম-সুন্দরী মহিলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পরেশ ছবিতে তাহার মাকে যেমন দেখিয়াছিল, দেখিল এই মহিলাটিও দেখিতে ঠিক তেমনই। মহিলা বলিলেন,—"ভয় কি, বাবা? আমি তোমাকে চিনি, তুমি পরেশ। তুমি কেমন ক'রে এখানে এসে প'ড়েছ, তা'ও আমি জানি। তোমার বাবা তোমাকে ভাল অভিপ্রায়েই বনে পাঠিয়েছিলেন। তোমাকে তিনি একগাছি সোণার সূতো ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সূতোগাছি ধ'রে তুমি বনের মধ্যে পথ চিনে যেতে পা'রবে, এই তাঁ'র উদ্দেশ্য ছিল; তাই তিনি তোমাকে সূতোগাছি হাত-ছাড়া ক'রতে মানা ক'রেছিলেন। সূতোগাছি শক্ত ক'রে ধ'রে থাকাই তোমার উচিত ছিল, তোমার বাবার কথায় বিশ্বাস করা ও তাঁ'র বাধ্য থাকাই

তোমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তুমি প্রজাপতি ধ'রতে আর বুনো ফুল পেড়ে খেতে গিয়েছ; ওরকম তুমি একবার নয়, অনেকবার ক'রেছ; তোমার বাবা তোমাকে যে সৎপরামর্শ দিয়ে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, তুমি গ্রাহ্য কর নি। তুমি আপনার ওপরে নির্ভর ক'রেছ, আত্মসুখে মত্ত হ'য়েছ। তাই প্রথমে তুমি সুতোগাছি হারিয়ে ফেলে, পরে পথও হারিয়ে ফেলেছ। তোমার বাবার কথা অমান্য ক'রে তুমি কত বিপদেই না প'ড়েছ, কত কষ্টই না পেয়েছ। তিনি যে তোমাকে সত্যিই বড় ভাল বাসেন, আর তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি যে তোমার চেয়ে ঢের বেশী, তা' তুমি বিশ্বাস ক'রতে পার নি। তোমার বাবার কথামত তুমি যদি চ'ল্‌তে, তা' হ'লে সোণার সুতোগাছি তোমাকে ঠিক তোমার বাবার কেল্লায় পৌঁছে দিত। সেখানে তুমি তোমার খেলার সাথী ভাইবোনদের আবার পেয়ে বেশ সুখেই থা'ক্‌তে পা'র্‌তে।"

মহিলার সব কথা মনদিয়া শুনিয়া অভাগ্য পরেশ বড় কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহিলা সদয়ভাবে বলিলেন,—"বাবা, আমার কথা শোন; যতক্ষণ না, যা' উচিত, তা' ক'র্‌ছ, ততক্ষণ মনে শান্তি পা'বে না। তোমার ভাই-বোনেরাও সোণার সুতো ধ'রে এই বন পার হ'য়েছে। এখন তা'রা ঘরে কেমন আনন্দে র'য়েছে!"

পরেশ তাহা শুনিয়া মহিলার হাত ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মা! আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান।"

তিনি বলিলেন,—"আমি তোমাকে বাঁচা'তে পারি, যদি তুমি বাধ্য হও। বাবা, আমি তোমাকে চিনি, বড় ভাল বাসি। আমি তোমার বাবাকেও চিনি, বড় ভক্তি করি। তিনিই আমায় তোমাকে উদ্ধার ক'রতে এখানে পাঠিয়েছেন। কাল রাত্তিরে তুমি যা' ব'লেছ, যা' ক'রেছ, সব আমি জানি। কাল তোমার একটা মহাপরীক্ষার দিন গেছে। আমি বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি যে, কাল তুমি সত্যপ্রিয়তা, পিতৃভক্তি আর লোকানুরাগের পরিচয় দিতে পেরেছ। এই সব দেখে শুনে আমার এই আশা হ'য়েছে যে, ভবিষ্যতে তোমার ভালই হ'বে। এখন তুমি আমার সঙ্গে এস।"

এই বলিয়া সেই রূপসী মহিলা পরেশের হাত ধরিলেন। ঝড় থামিয়া গিয়াছে। বৃক্ষের শ্যামপত্রে সূর্য্যকিরণ ঝকিতেছে। হিম-বিন্দুগুলি হীরকের ন্যায় জ্বলিতেছে। পাখীরা প্রভাতী গাহিতেছে,—শাবকদিগকে খাওয়াইতেছে। ঝরণাগুলি নাচিয়া নাচিয়া শৈল-কন্দরহইতে ভূতলে নামিয়া কলধ্বনি তুলিতেছে। আনন্দে শৈল-মালা যেন গীতোচ্ছ্বাস তুলিয়াছে, এবং তরুপত্র যেন সেই সঙ্গে তালি দিতেছে। এখন পরেশের সকলই সুখময় ও সুন্দর-বোধ হইতে লাগিল; কারণ কর্ত্তব্য ও গৃহগমন-চিন্তায় এখন পরেশ স্বয়ংই সুখী হইয়াছে। মহিলা তাহাকে বনের একটী রৌদ্রদীপ্ত মুক্ত স্থানে লইয়া গেলেন। সেই স্থানটি সুরভি বন-কুসুমে আচ্ছন্ন, মধুমক্ষিকারা সে বন-কুসুম-সমূহহইতে মধু-সঞ্চয় করিতেছে। সেখানে পহুঁছিয়া মহিলা পরেশকে বলিলেন, "বাবা, তুমি কি তোমার বাবার ইচ্ছামত কাজ ক'র্‌তে রাজি আছ?"

পরেশ। হাঁ, মা।

মহিলা। বিপদ্ দেখে ভরা'বে না?

পরেশ। না।

মহিলা। তবে শোন, তুমি যে সোণার সুতোগাছি হারিয়ে ফেলেছিলে, তা' আবার তোমার বাবা তোমাকে দিতে আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি তোমাকে তাঁ'র আশীর্ব্বাদ দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, তুমি যদি সুতোগাছি বরাবর শক্ত ক'রে ধ'রে থাক, আর ও যেখানে তোমাকে নিয়ে যায়, সেইখানে ওর পিছু পিছু যাও, তা' হলে সূর্য্যাস্তের সময় তুমি নিশ্চয়ই তাঁ'র কাছে পৌঁছবে। কিন্তু তুমি যদি সুতোগাছি আবার ছেড়ে দাও, তা' হ'লে তুমি আবার এই বনে পথ হারিয়ে ঘু'র্‌তে ঘু'র্‌তে হয় মারা প'ড়বে, নয় ডাকাতেরা আবার তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে। এও তুমি জেনো, এই সুতোগাছির পিছু ধ'রে না গেলে, তোমার আর রক্ষা পা'বার কোনই সম্ভাবনা নেই।"

পরেশ। যা'ই ঘটুক না কেন, আমি কর্ত্তব্যপালন ক'র্‌তে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

মহিলা। ভাল, ভাল; ঈশ্বর করুন, তুমি যেন তোমার কর্ত্তব্য-পালন ক'র্‌তে পার।

এই বলিয়া তিনি পথে খাইবার জন্য তাহাকে কিছু খাদ্য দিলেন। পরে বলিলেন, "বাবা, আর একটী কথা ব'লে দি, এ কথা তোমার বাবা তোমাকে পূর্ব্বে ব'লে দিয়েছিলেন, তুমি ভুলে গেছ। সেটি এই—যদি তুমি বোধ কর যে, সুতোগাছি তোমার হাতথেকে ফস্‌কে যাবার যো হ'য়েছে কিম্বা তুমি নিজেই কোন লোভে প'ড়ে তা' ছেড়ে দিতে চাইচ, তা' হ'লে তখনই ঈশ্বরের কাছে বল-ভিক্ষা ক'রো। তা' হ'লে তুমি তা' আবার খুঁজে বা'র ক'রবার, ধ'রে থা'কবার আর তা'র পিছু পিছু যা'বার শক্তি আর বুদ্ধি পা'বে। এখন আমি চাই যে, আমি বিদেয় হ'বার আগে তুমি একবার আমার সামনে হাঁটু গেড়ে সৎ, সাহসী, বাধ্য আর সহিষ্ণু হ'বার জন্যে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাও।" ক্ষুদ্র বালক পরেশ ঈশ্বরের কাছে কি করিয়া ওসকল চাহিতে হয়, তাহা জানে না; সে তাহার স্বর্গীয়া মায়ের কাছে একটী সুন্দর শ্লোক শিখিয়াছিল, হাঁটু গাড়িয়া, চোক বুজিয়া তাহাই এখন সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল -

তুক—একতালা।

স্বর্গবাসী পিতঃ, বিভা-বিমণ্ডিত
হউক তোমার নাম।
যথা অমরায়, তথা এ ধরায়
উঠুক তোমার ধাম।
পূর্ণ হোক তব পূত ইচ্ছা সব
মরতে স্বর্গের মত।

আজিকে সবার দাও গো আহার ;
ছেড়ে দাও ঋণ যত,—
আমরা যেমন ক'রেছি মার্জ্জন
নিজ নিজ ঋণিগণে।
আমাসবাকায় কভু পরীক্ষায়
ফেলিও না এ জীবনে;
মন্দহ'তে সবে বাঁচাও গো ভবে;
তোমারি যে সমুদয়,—
সাম্রাজ্য, শকতি, মহিমার জ্যোতিঃ,
চিরকাল ব্যাপি' রয়।"

যখন পরেশ—

"পূর্ণ হোক তব পূত ইচ্ছা সব
মরতে স্বর্গের মত।"

এই অংশটি আবৃত্তি করিতেছিল, তখন তাহার হৃদয়ে শান্তি আসিল, সে সুখানুভব করিতে লাগিল। তখন তাহার স্বর্গীয়া জননীর স্নেহপূর্ণ মুখখানি মনে পড়িল; তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার মা আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মাথা তুলিয়া, সে দেখে, সেখানে আর কেহ নাই, কেবল স্বর্ণ-সূত্রখণ্ড তাহারই নিকট-হইতে বহুদূরপর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া মৃদু-পবনে আন্দোলিত হইতেছে।

বালক সেই সূত্রখণ্ড দৃঢ়ভাবে ধরিয়া গৃহা-ভিমুখে যাইতে লাগিল। সে বনপথ ধরিয়া চলিল; সে পথে বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রাবলি পুরুভাবে বিছান এবং তাহার মধ্যে বিবিধ বর্ণের ছোট-বড় কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সে রজতসূত্রবৎ শুভ্রোজ্জ্বলা এবং রৌপ্যঘণ্টিকা-বৎ মধুরনাদিনী কত বনতটিনী পার হইয়া চলিল। যাইতে যাইতে সে দেখিল, স্থানে স্থানে কত প্রকাণ্ড-কাণ্ড বনস্পতি দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাদের শাখা-প্রশাখা যেমন একদিকে ঝুলিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি উচ্চে নীলাকাশ ছুঁইবার উপক্রম করিতেছে। পাখীরা ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া তাহার খুব কাছেই আসিতে লাগিল, কেহ কেহ বা সুশ্যামল তরুপল্লবের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত শুনাইতে লাগিল। কেহ কেহ যেন তাহাদের নিজের ভাষায় তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, কাকের মত একজাতীয় বড় পাখী তাহাকে বলিতে লাগিল,—"বেশ ছেলে, ভাল ছেলে!" আর একটী সুন্দর পাখী যেন তাহাকে শিশদিয়া বলিতে লাগিল,—"সাহস কর, সাহস কর!" তাই পরেশ এখন বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতে পথ চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে টুনটুনি, বুলবুলি, মুনিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট পাখীকে তাহার খাবার-হইতে একটু একটু খাইতে দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে বনমধ্যস্থিত এক শ্যাম দূর্ব্বাস্তৃত ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানে তরুলতা কিছুই নাই, কেবল একটী একপদী মাঝদিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই পথদিয়া স্বর্ণসূত্র তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সে একটী জিনিস দেখিয়া অবাক্ হইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। উহা আর কিছুই নহে, কপোতের মত বড় একটী পাখী, উহার পালখগুলি সোণার মত এবং উহার ঝুঁটী রূপার মত, সে আস্তে আস্তে তাহার কাছে হাঁটিয়া আসিতেছিল; পরেশ দেখিল, অল্প দূরে ঘাসের মধ্যে একটী বাসায় কতকগুলি স্বর্ণবর্ণ ডিম্ব ঝক্‌মক্ করিতেছে। সে ভাবিল, ডিম-শুদ্ধ ঐ বাসাটা বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলে, বড় মজা হইবে। পাখী তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। সে তাহার নীল-তারকাযুক্ত একটী চক্ষুদিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া যেন এই মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল,—"তুমি কি সত্যি সত্যিই আমার ডিমগুলি বাসা-শুদ্ধ চুরী করিবে?" যাহা হউক, হাতদিয়া পরেশ তাহার বাসার নাগাল পাইল না। সে স্বর্ণ-সূত্রগাছি টানিতে লাগিল, কিন্তু সূত্র একচুলও ঢিল দিল না, ঠিক তারের মত কড়া হইয়া রহিল। লোভাতুর বালক আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"আমি সুতোগাছা বেশ স্পষ্ট দে'খ্‌তে পাচ্ছি। ওপারে বনে যেখানে ঢুকে গেল, তা'ও দেখে নিয়েছি; একলাফে ডিমগুলো নিয়ে পকেটে পুরেই, আবার দৌড়ে গিয়ে সুতো ধ'রে ফে'লব। এখানে বেশ রোদ র'য়েছে, তা'ছাড়া আমি অনেকদূরপর্য্যন্ত সুতোগাছা দে'খ্‌তে পাচ্ছি, আর হারা'বে কোথায়?" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ডিম-কয়টি লইতে গেল। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া সে সেই পাখীর বাসার উপর পড়িয়া গেল, ফলে ডিমগুলি একেবারে চুরমার হইয়া গেল। পাখীটী তাহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উড়িয়া পলাইয়া গেল। হঠাৎ তখন অন্য পাখীরাও ডানা ঝটপট্ করিয়া এধারে ওধারে উড়িয়া পলাইতে লাগিল। একটা অন্ধকারময় মুক্তস্থানহইতে একটা বৃহৎ পেচক বাহির হইয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। একখানি মেঘ আসিয়া সূর্য্যকেও ঢাকিয়া ফেলিল। পরেশের হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে সোণার সুতোগাছি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কিন্তু কোথায় বা সুতা, কোথায় বা কি? সে পুনরায় তাহা ধরিবার জন্য চেষ্টা করিল, পারিল না; তখন সে দেখিল, সুতোগাছি, 'বুড়ীর সুতা' যেমন বাতাসে উড়িতে থাকে, তেমনি তাহার মাথার উপরে উঁচুতে উড়ি-তেছে। এখন একবার পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার যেমন তাহার উপরে রাগ হইবে, তেমনি তাহার উপরে মায়াও হইবে। বড় অবাধ্য ছেলে, বড় বোকা! এখন মুখ ফেঁকাশে করিয়া একবার পথের দিকে, একবার সূতার দিকে চাহিয়া কি

লাভ হইবে? সূতা হারাইয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে পথও হারাইয়াছ। তখন তাহার মনের মধ্যে এমনি গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে, সে দিক্‌নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, অবশেষে সে যেন শুনিল একটা পাখী বলিতেছে,—"খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ"; এবং আর একটা পাখী যেন বলিতে লাগিল,—"চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, আর একবার চেষ্টা কর।" এই সময়ে তাহার মনে পড়িল, মহিলা বলিয়াছিলেন, "প্রার্থনা ক'রো।" সে অমনি হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"আমার সূতো ফিরিয়ে দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন কখন আমি সূতো ছেড়ে না দিই।" সে তাহার পর আকাশের দিকে চোক তুলিয়া দেখিল স্বর্ণসূত্র ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। সে উঙ্কে লাফাইয়া উঠিয়া সূতোগাছি ধরিয়া ফেলিল। তখন সে কাঁদিবে, কি হাসিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। তখন কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার মায়ের শিখান ছড়ার যে অংশে আছে—

"আমাসবাকায় কভু পরীক্ষায়
ফেলিও না এ জীবনে;
মন্দহ'তে সবে বাঁচাও গো ভবে।"

সেই অংশটি মনে পড়িল। সে নিজের মনে বলিয়া উঠিল,—"এমন সুন্দর, সবুজ জায়গাটিতে যে আমি এত শীগ্‌গির বিপদে প'ড়ব, তা'কে ভেবেছিল? ছি, ধিক্ আমাকে!" সে আবার পথ চলিতে লাগিল। এবার সে খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া, সাবধান হইয়া পথ চলিতে লাগিল। একটা কাক কা কা করিতে লাগিল, তাহাতে পরেশের মনে হইল, সে যেন তাহাকে বলিতেছে, "সাবধান হও, সাবধান হও।" পরেশ কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার খাদ্যহইতে তাহাকে একটু খাইতে দিল। এখন স্বর্ণসূত্র তাহাকে অদ্ভুত অদ্ভুত স্থান-দিয়া লইয়া চলিল। সে সকল স্থান বড় বিপদ্‌সঙ্কুল। পরেশের প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল, বুঝি, এই জায়গাতেই আমি মারা পড়িব। কিন্তু একটী একটী করিয়া সে অনেকগুলি বিপত্তিপূর্ণ স্থান নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গেল। অবশেষে সে একটী অদ্ভুত সেতুও স্বর্ণসূত্র ধরিয়া নিরাপদে পার হইয়া গেল। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে তাহার ভয় দূর এবং স্বর্ণসূত্রের উপর নির্ভর করিতে ভরসা হইতে লাগিল। তখন তাহার এই জ্ঞান জন্মিতে লাগিল যে, বাহ্যদৃশ্য কিছু নহে, স্বর্ণসূত্র প্রাণপণে ধরিয়া থাকাই বিধেয়।

(ক্রমশঃ।)

-:*:-

হংসমাতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ধাড়ী আগে আগে। বাচ্চাগুলি পিছনে পিছনে চলিল। "গজেন্দ্রগমনে" বা "মরালগমনে" নহে। খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। এই মাঠটুকু পার হইতে পারিলেই, এক লম্বা ঝিল। তাই হংসী দ্রুতপদে বাচ্চাদের লইয়া এই গাছপালাবর্জ্জিত স্থানটুকু পার হইতে ব্যস্ত। ধাড়ী প্যাঁ-ক প্যাঁ-ক করিয়া যেন বাচ্চাদিগকে বলিল, "পা চালাইয়া চল, ঐ যে ঝিল।"

বিপদ্ প্রায়ই বলিয়া-কহিয়া আইসে না। বেচারী হংসীর আর এক অতিভয়ানক বিপদ্ ঘটিল। মাঠের শেষভাগে বড় বড় দুইটা খাড়া গর্ত্ত ছিল। এই গর্ত্তে লুকাইয়া থাকিয়া শিকারীরা বাঘ, হরিণ ইত্যাদি শিকার করে। তাড়াতাড়ি মাঠের শেষভাগে গিয়াই প্রথম গর্ত্তটায় চারিটা ছানা পড়িয়া গেল। বাকি পাঁচটা কোনমতে এ গর্ত্তটা ছাড়াইয়া গেল বটে, কিন্তু হঠাৎ অন্য গর্ত্তে পড়িয়া গেল। এখন উপায়? গর্ত্ত-দুইটাই খাড়া, বাচ্চাদের উঠিবার শক্তি নাই। মাও নামিয়া গিয়া তুলিয়া আনিতে অসমর্থ।
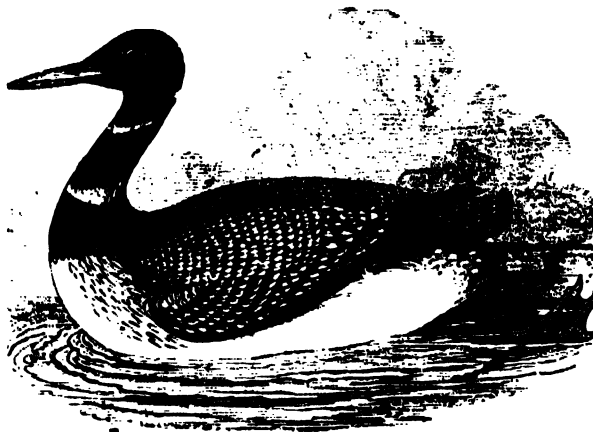
মায়ের কি দারুণ কষ্ট, ভাবিয়া দেখ দেখি! খাড়া-গর্ত্ত বহিয়া হাঁসের কচি বাচ্চা ত কচি বাচ্চা, বড় বড় ধাড়ীরাও উঠিতে পারে না। মা ত নিরাশ হইয়া একবার এ গর্ত্তের কাছে, আবার ও গর্ত্তের কাছে যায়। আর বিকট প্যাঁক-প্যাঁক-শব্দ করে। বেচারী নিতান্ত নিরুপায়। তবু বাচ্চাদের সাহসে ভর করিয়া গর্ত্ত-হইতে উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে বলিতেই থাকিল। এমন সময়ে—হাঁসেরা যাহাদিগকে পরম শত্রু বলিয়া জানে, সেই মনুষ্য-জাতীয় একজন শিকারী আসিয়া দেখা দিল; কাঁধে বন্দুক,

কোমরে ভুজালী। দেখিয়াই ত হংসমাতার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল।

ধাড়ীটা উড়িয়া শিকারীর পায়ের উপর পড়িয়া, ডানা-দিয়া তাহার পায়ে আঘাত করিতে লাগিল। সে কি বলিল, "পায়ে পড়ি, আমার বাচ্চাদের মারিও না?" না। হংসিনী দেখাইতে চাহিল, তাহাকে যেন গুলি লাগিয়াছে; আর শিকারী তাহাকে ধরিতে যাইবে; যেই ধরিতে যাইবে, সে অমনি সরিয়া যাইবে; এইরূপে শিকারীকে দূরে লইয়া যাইতে পারিলে, বাচ্চাগুলি রক্ষা পাইবে। শিকারীর এইপ্রকার চালাকি বেশ জানা ছিল, তাই সে হাঁস ধরিতে গেল না। না গিয়া এদিক্-ওদিক্ দেখিতে লাগিল। দেখিতে পাইল, নয়টা বাচ্চা গর্ত্তে পড়িয়া আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র বাচ্চারা লুকাইতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু লুকাইবে কোথায়? বাচ্চাগুলির উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া শিকারীর প্রাণে দয়া হইল।

শিকারী গর্ত্তে নামিয়া, বাচ্চাগুলিকে ধরিয়া এক থলিয়াতে রাখিল। বেচারারা থলিয়াহইতে বাহির হইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। হংসমাতা ছানাগুলিকে পরমশত্রু মানুষের হস্তগত হইতে দেখিয়া বিকট চীৎকার-আরম্ভ করিয়া দিল। সে ভাবিল, এখনই এই লোকটা আমার বাছাদের মারিয়া ফেলিবে। তাই শিকারীর সম্মুখে মাটীতে মনের দুঃখে পড়িতে উঠিতে, উঠিতে পড়িতে লাগিল।

বাচ্চাগুলিকে লইয়া পশুপক্ষীদের পরমশত্রু শিকারী ঝিলের জলের ধারে গেল। ধাড়ীটা ভাবিল, এইবার এই নিষ্ঠুর আমার বাচ্চা-গুলিকে চিবাইয়া চিবাইয়া খাইয়া, জল খাইবে, আর হাত-মুখ ধুইবে।

শিকারী জলের ধারে গিয়া বসিয়া, থলির ভিতরহইতে বাচ্চাগুলি বাহির করিয়া জলে ছাড়িয়া দিল। জল পাইয়া বেচারারা যেন প্রাণ-দান পাইল। জলের মধ্যে এই প্রথমবার সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ধাড়ীটা উড়িয়া ঝুপ্ করিয়া গিয়া জলে পড়িল। এবং প্যাঁক প্যাঁক করিয়া যেই ডাকিল, বাচ্চাগুলি অমনি সাঁতার দিয়া দিয়া মায়ের কাছে গেল। হংসমাতা জানিত না যে, এই প্রাণীটা পরম শত্রু না হইয়া পরম উপকারী বন্ধু হইবে। সে জানিত না যে, ইহাকে দেখিয়াই শিয়াল পলাইয়া যাওয়াতে, তাহার নিজের ও বাচ্চাদের প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে; মনুষ্যজাতি বহুকাল ধরিয়া হংসজাতিকে বধ করিয়া আসিতেছে। তাই প্রথমহইতেই এই ধাড়ীটা শিকারীকে পরম শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়াছিল।

হংসমাতা বাচ্চাগুলিকে শিকারীর নিকটহইতে অনেকটা দূরে লইয়া গেল। উহারা ঝিলের প্রায় মধ্যস্থলে গিয়া পড়িল। ভাল করিল না। মিত্রকে শত্রু ভাবিয়া সেই শত্রুর হাত এড়াইতে গিয়া আর পাঁচটা প্রকৃত শত্রুর এলাকায় উপস্থিত হইল। সেই—সেই বাজটা দেখিতে পাইয়া, আকাশের অতি উচ্চহইতে তীরবেগে নামিয়া আসিতে লাগিল। ভাবিল, এইবার এক-এক-পায়ে এক-একটা করিয়া তুলিয়া লইতে পারিবে।

হংসমাতা পিঁ-য়াঁ-ক-শব্দ বার বার করিয়া বাচ্চাদিগকে বলিল, "ঐ নল-খাগড়া-বনের ভিতর যাও; পালাও, পালাও।" এই কথা শুনিয়া ছানাগুলি সাঁতার কাটিতে কাটিতে যত ত্রস্ত পারিল, নিকটস্থ ঝোঁপ-জঙ্গলের দিকে ছুটিল।

মা বলিতেই থাকিল, "পালাও, পালাও।" কিন্তু বাজ এই সময়ে নিতান্ত কাছে আসিয়া পড়িল। হাজার ছুটুক না কেন, মুহূর্ত্তমধ্যে বাজ উহাদের উপর পড়িবে। এই ত অবস্থা। নিতান্ত বাচ্চা, ডুব দিতে জানে না। তা' জানিলে, রক্ষা পাইবার কতকটা আশা থাকিত। ইহাদের মরণ নিশ্চিত। দেখিতে না দেখিতে বাজ ছোঁ মারিয়া, শোঁ-শোঁ শব্দে আসিল। যেই আসিল, ধাড়ীটা অমনি দুই ডানা ও পা দিয়া, যত জোরে পারিল, বাজের মুখে, নাকে, কানে বিস্তর জল ছড়াইয়া দিল। সজোরে নাকে মুখে জল লাগাতে, বাজ একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে আবার আকাশে উড়িয়া গা ঝাড়া দিয়া গায়ের জল ঝাড়িয়া ফেলিল। এদিকে হংসমাতা বাচ্চাদিগকে ঝোঁপ-জঙ্গলের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। বাচ্চারাও ত্রুটি করিল না। কিন্তু বাজ আবার "শক্তিশেল"-বাণের বেগে আসিল। আবার হংসী তেমনি করিয়া, জল ছড়াইয়া দিয়া, বাজকে হটাইয়া দিল। তিন-তিন বার-বাজ ছোঁ মারিয়া আসিল। আর তিন-তিন-বারই পক্ষীমাতা জল ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে হটাইয়া দিল। ইত্যবসরে বাচ্চাগুলি ঝোঁপ-জঙ্গলের ভিতরে গিয়া আশ্রয় লইল, কাজেই নিরাপদ্ হইল। বাজ তিন-তিন-বার নিরাশ হইল, গায়ে আর রাগ ধরে না। সে এইবার হংসমাতার উপরেই ছোঁ মারিয়া পড়িল। যেই পড়িল, হাঁসটা অমনি দশহাত দূরে গিয়া উঠিল।

আর এক ডুবে সে ঝোঁপের ভিতর গিয়া উঠিল, এবং প্যাঁক-প্যাঁক-শব্দ করিয়া বাচ্চাগুলিকে ডাকিল। মায়ের গলা পাইয়া ক্লান্ত বাচ্চাগুলি কাছে আসিল। এক্ষণে সকলে নিরাপদে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

আরও কিছু ঘটিল! সকলে কাদা ঘাঁটিয়া ছোট ছোট পোকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া খাইতেছে, এমন সময়ে দূরে পিঁক-পিঁক-শব্দ শুনিতে পাইল। এই শব্দ শুনিতে পাইয়া, হংসমাতা অমনি প্যাঁ-য়া-ক করিয়া উঠিল। এমন সময়ে শেওলার উপরদিয়া, যে বাচ্চাটাকে বাজে লইয়া গিয়াছিল, সেইটা আসিয়া দেখা দিল।

বাজের থাবায় বাচ্চাটীর গায়ে আঁচড়পর্য্যন্ত লাগে নাই। কাকেরা বাজকে তাড়া করিয়া, ঠোক্‌রাইতে ঠোক্‌রাইতে, ঝিলের উপরদিয়া লইয়া যাইতেছিল। কাকদের আঁচড়াইতে বাজ যেই পায়ের নখবিস্তার করিল, অমনি হাঁসের বাচ্চা জলে শেওলার উপর পড়িয়া গিয়াছিল। কোনপ্রকার আঘাত লাগে নাই। এক্ষণে মাকে ও ভাইভগিনীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের কাছে আসিল।

কালক্রমে বাচ্চাগুলি বড় হইয়া, উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সম্পূর্ণ।

কর, পারো যত উৎকৃষ্ট।

উছটের ডরে যেবা কেঁপে মরে,
কেন ধায় সেই পৃষ্ঠ?
সাঁতারিতে চাও, জলে নেমে যাও;
হইও না ভয়-ক্লিষ্ট।
প্রাণে ভয় যা'র যশঃ, পুরস্কার
লভিতে নহে সে স্পষ্ট।
ভিত্তি কর দৃঢ়, তা'র পরে গড়
সৌধ—শূন্য-পথ-স্পৃষ্ট।
আসিলে পরীক্ষা, লহ এই শিক্ষা
হ'বে আগেভাগে দৃষ্ট।
জেত কিম্বা হারো, যতদূর পারো,
কর তুমি উৎকৃষ্ট।
কর ভরসায় করণীয় যায়,
যেমন করিয়া পারো।
হয় না বিফল কভু স্বেদজল,
প্রাণপণ-চেষ্টা কা'রো।
যেতে কেহ পারে হয় তো তোমারে
ধাবনে ফেলিয়া পিছে।

ক'রে থাকো কাজ সাধ্যমত, লাজ
দেয় দেবে লোকে মিছে।
কথা-কাটাকাটি, মাথা-ফাটাফাটি,
মহতী কীর্ত্তির যশঃ,
ছি ছি! করে তা'র নিন্দাই প্রচার,
যে জন বঞ্চনা-বশ।
মিথ্যাভাষে পটু শঠ কিম্বা বটু
বাহোবা দি'ক না তা'য়;
হিয়া হয় তা'র অসুখ-আগার,
তিলেক শান্তি না পায়।
যুঝ হাসিমুখে, আশাভরা বুকে,
সব শক্তি নিয়োজিয়া;
ডরিও না কিছু, হটিও না পিছু
সমর-অঙ্গনে গিয়া।
যে আসে সম্মুখে, দাও তা'রে রুখে
আস্ফালিয়া বীর-বক্ষ।
কভু নাহি হয় তা'র পরাজয়,
শ্রেষ্ঠতাই যার লক্ষ্য।

বড় ভাল লেগেছে। গাড়ী-বদল কর্ত্তে যে হ'বে, সে হুঁশ্ একেবারে নাই।

ব্যোম-বিহার।
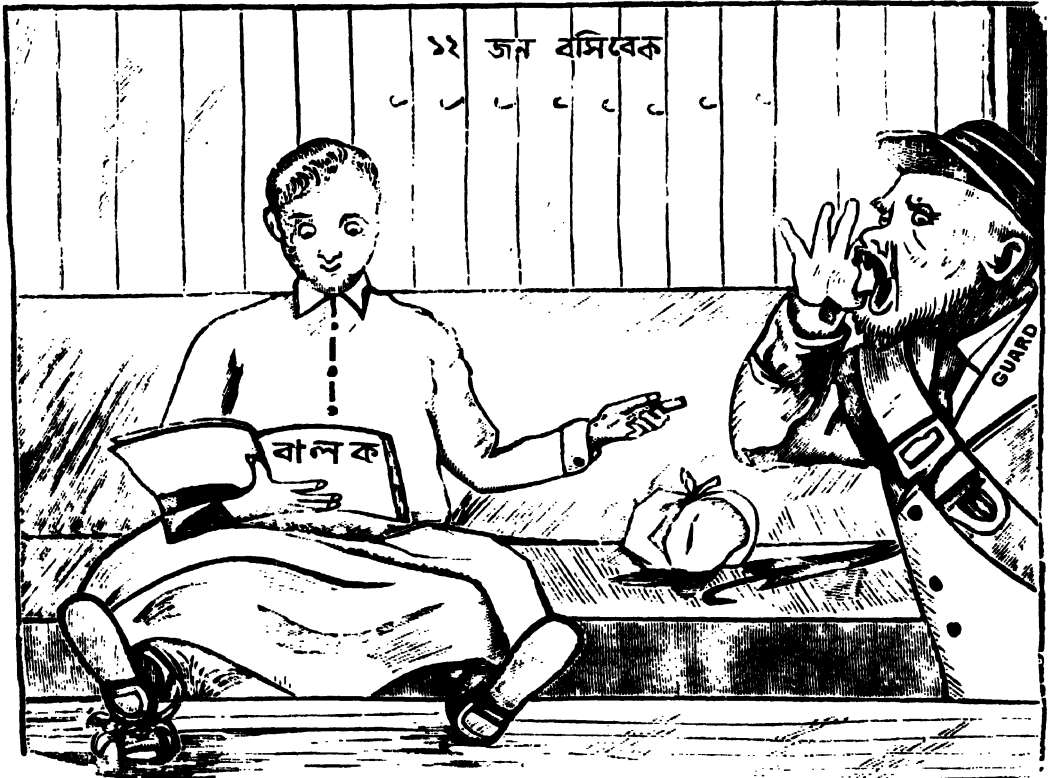
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উঁহাদের ঐ অমরগৌরব উঁহাদের মধ্যে অবিভাজ্য। কেননা উভয়ে সমবেতভাবেই ঐ আবিষ্ক্রিয়া-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীযুক্ত উইলবার রাইট লিখিয়াছেন—

"আমরা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দহইতে উড্ডয়ন-ব্যাপারে ব্যাপৃত আছি। আমরা প্রথমে একটা উচ্চ পর্ব্বতহইতে আমাদের ব্যোমরথটি নামাইয়া দিতাম। উহা উড়িতে উড়িতে ক্রমশঃ নামিয়া ঐ পর্ব্বতের সানুদেশে একস্থলে অবতরণ করিত। কিটি হকের নিকটবর্ত্তী কিল্‌ডেভিল্ স্যাণ্ডহিল্‌হইতে ১৯০০ সালের শেষাশেষি আমরা প্রথমবার উড়ি।

ঐ স্থানে যে দিন পঁহুছি, তাহার পরদিন আমরা আমাদের আকাশ-রথ নামাইয়া দিলাম। আমরা সেইরূপে অবতরণ করিয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে, সেইদিনই অন্ততঃ বারোবার অবতরন করিয়াছিলাম। আমরা ঐ রথে চিৎ হইয়া শুইয়াছিলাম।

ঐ উড্ডয়নের চারিবৎসর পরে আমরা অনবরত অবতরণ ইত্যাদি করিতে করিতে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আমরা ব্যোমরথ-গঠন-বিদ্যায় প্রভূত উন্নতিলাভ করিলাম।

অবশেষে আমরা ঐ যন্ত্র-সাহায্যে আকাশে যথেচ্ছবিচরণে সমর্থ হইলাম। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরমাসে ঐ মহাঘটনাটি ঘটে। আমরা উত্তর ক্যারোলিনাহইতে বায়ুর অপেক্ষা গুরুতর যন্ত্র-সাহায্যে আকাশে উড্ডীন হইলাম। তৎপূর্ব্বে আর কোন মনুষ্য ঐ স্থানহইতে আকাশে উঠে নাই, এবং কেহ কোন আকাশযান বিদ্যুৎ-সাহায্যে চালিত, উন্নীত, অবতারিত ও যথেচ্ছপরিচালিত করে নাই।

সেদিন ঐ যন্ত্র-চালনায় তেমন কোন কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। সকলই প্রায় ঠিকঠাক ছিল। তবে অধিক দূর উড়িতে পারি নাই, তাহা অবশ্য স্বাভাবিক। তথাপি আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। অর্ভিল ও আমি, আমাদের দশবৎসরের আশা সেদিন পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলাম। আমরা সেই যন্ত্রের সাহায্যে যখন ইচ্ছা করিয়াছি, তখন কেবল যে উড়িতে পারিয়াছি, তাহা নহে, উহা উপরে উঠাইয়াছি, সম্মুখাসম্মুখি চালাইয়াছি, নীচেও নামাইয়াছি।"

ইউরোপের প্রথম ব্যোম-বিহারী বলিয়া মঁসিয়ো সান্ত ডুমন্টের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি আমার ব্যোম-রথের নাম দিয়াছি,—১৪ নম্বর 'বিস'। উহা দেখিতে অনেকটা বাক্স-ঘুড়ীর মত। প্যারিসের অন্তর্গত বাগাটেলীহইতে যখন আমি কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রথমবার উহাতে উড়ি, তখন অনেকে উহা দেখিতে আসিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালের ১২ই নভেম্বর-তারিখে আমি প্রথমবার শূন্যমার্গে উড্ডীন হই। আমার ব্যোম-রথটি যে কালে উড়িতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার প্রথমাবধিই ছিল।

প্রথম উড্ডয়ন-দিনে আমি ২২০ গজমাত্র উড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া গিয়াছে? আমিই ইউরোপে—ইউরোপেই বা বলি কেন—আমেরিকার রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে, আমিই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে ব্যোম-রথে আরোহণ করি। তাই বলিতেছিলাম, প্রথমবার যে বেশীদূর উড়িতে পারি নাই, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় নাই। ব্যোম-রথ-সহায়ে সত্য সত্যই উড়িতে ত পারিয়াছিলাম? হাওয়ার অপেক্ষা ভারী ব্যোম-রথ যদি প্রথম উদ্যমে ২২০গজ উড়িতে পারে, তাহা হইলে পরে উহা এমন করিয়া নির্ম্মিত করা যাইতে পারে, যাহাতে উহা কালে কেবল ২২০গজ কেন, পঞ্চাশক্রোশও উড়িয়া যাইতে পারে।

আমার ব্যোম-রথটিকে আকাশে উড্ডীন হইতে দেখিয়া আমি যে বড় আহ্লাদিত ও সুখী হইয়াছিলাম, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি সে বার উহার দুই পক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলাম। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আমার একটুও হয় নাই। সে দিন বরং আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। সে দিন আমার একটা বিশিষ্ট আনন্দের হেতু এই হইয়াছিল যে, রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়, ব্যোম-বিহার-ব্যাপারে অগ্রগণ্য হইলেও সে দিনপর্য্যন্ত সরকারী তত্ত্বাবধানে—প্রকাশ্যে ব্যোম-রথে আরোহণ করেন নাই; আমিই সেই প্রথমবার প্রকাশ্যে ব্যোম-রথে আরূঢ় হই।"

ব্যোম-রথে ব্যোম-বিহার-বিদ্যা অন্যের নিকট যতটা ঋণী—শ্রীযুক্ত হেনরী ফার্ম্মাণের নিকটেও ততটা ঋণী,—এ বিষয়ে, বোধ করি, আর মতদ্বৈধ নাই। তবে রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার তুল্য কৃতজ্ঞতাভাজন। ফার্ম্মাণই প্রথম ব্রিটিশ ব্যোম-রথ-বিহারী; কিন্তু তিনি আজীবন ফ্রান্সবাসী এবং ভাষা, রুচি, ও সহানুভূতি-ব্যঞ্জনে এমনই ফরাসী যে, ফ্রান্সও তাঁহাকে তাহার স্বজন মনে করিতে পারে।

বর্ত্তমানকালের অনেক সুপ্রসিদ্ধ ব্যোম-রথ-বিহারীর ফার্ম্মাণই শিক্ষক, ব্যোম-রথ-নির্ম্মাণের সর্ব্বপ্রধান কারখানাটির তিনিই স্বত্বাধিকারী এবং ব্যোম-রথে চড়িয়া ব্যোম-পথে তিনি অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া এক-হিসাবে তিনিও অন্য সমুদয় ব্যোম-রথ-বিহারীর অগ্রগণ্য।

তিনি লিখিয়াছেন—

'আমি বহুদিনাবধি নভোমণ্ডলে উঠিবার চেষ্টা এবং তদর্থে পরীক্ষা ও অনুশীলন করিতেছিলাম। ১৯০৭ সালের অক্টোবর-মাসে একদিন যখন আমার ব্যোম-রথটি নামিয়া পড়িতেছিল, তখন হতাশার উত্তেজনায় আমি আমার তদুপরিস্থ আসনহইতে সহসা লাফাইয়া উঠিলাম, ইচ্ছা—সেইরূপ করিলে উহা যেন উপরে উঠে। তাহাতে উহা বাস্তবিকই কিছু উপরে উঠিল, দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কয়েক দিন পরে, আমার আসনহইতে লাফাইয়া না উঠিয়াও আমি ৮০গজহইতে ১০০গজ-পর্য্যন্ত উড়িতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু উহার অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। অবশেষে ১৯০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর-তারিখে আর একটা উপায়াবলম্বন করিয়া আমি Issy-les-Moulineauxএর সমস্ত মাঠটা পার হইলাম। তাহার পরই আমাকে অবশ্য নামিয়া আসিতে হইল। তথাপি আমার বিলক্ষণ আনন্দ হইল। সে দিন অনেকবার আমি ঐ পরীক্ষাটি করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমি ব্যোম-রথারোহণ-সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়াছি। সে দিন আমি চারিশত ক্রোশপর্য্যন্ত উড়িতে পারিয়াছিলাম। ইংরাজ-ব্যোম-বিহারিগণের মধ্যে আমিই প্রথম।"

বাঁচিয়া থাকিলে, অনেক জিনিস দেখা যায়। আমরা বাঁচিয়া আছি, তাই কত কি দেখিতেছি। পাঁচবৎসর পূর্ব্বেও কে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল যে, কলিকাতাশহরে সকলের সম্মুখে তিনজন ইউরোপীয় ব্যোমবিহারী পক্ষীর ন্যায় শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়াইবে? ক্ষুদ্র মনুষ্য আমরা, ঈশ্বর আমাদেরই মধ্যে সামান্য শক্তির বীজ নিহিত করিয়া রাখেন নাই। তবে শক্তির পরিচয়টুকু গ্রহণ করা চাই এবং সেই পরিচিত শক্তিকে যথাভাবে প্রয়োগ করাও চাই। সকল উদ্ভাবনীর মূলে ঐ দুই সত্যই নিহিত রহিয়াছে।

বিখ্যাত বিখ্যাত জীবন-তরি

ইংরাজিতে যেপ্রকার ডিঙ্গি-নৌকাকে Life-Boat বলে, সেই-প্রকার নৌকা আমাদের দেশে নাই—দরকারও তেমন নাই। তবে ইংরাজি Life-Boatকে বাঙ্গালায় কি বলিব?—কোন কোন লেখক "জীবন-তরি" বলিয়াছেন, আমরাও তাহাই বলিলাম।

ইংলণ্ডদেশ একটী বড় দ্বীপ, কাজেই দেশের চারিদিকে সমুদ্র। এই সমুদ্রে অগণ্য জাহাজ চলে। আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ-মাসে ঝড়-তুফান হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে শীতকালে বেশি ঝড় হইয়া থাকে। আমাদের দেশের বড় বড় নদীতে যেসকল বড় নৌকা চলে, সেগুলির মাঝিরা বেলা-বেলি ভাল জায়গা দেখিয়া নৌকা লাগায়, রাত্রে পার্য্যমাণে নৌকা চালায় না। কিন্তু সমুদ্রে দিবারাত্র জাহাজ চলে। অনেক সময়ে রাত্রে ঝড় হয়, আবার কুয়াসায় আকাশ অন্ধকারময় হইয়া যায়, জাহাজের মাঝি বা কাপ্তেন কিছুই দেখিতে পায় না। আমাদের পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীতে যেমন বালির "চড়া" বা "চোরা-বালি" আছে, ইংলণ্ডের সমুদ্রে তেমনি বালির চড়া আছে। ঝড়ে এইপ্রকার চড়ায় জাহাজ আনিয়া ফেলিলে, জাহাজ ভাঙ্গিয়া বা কা'ত হইয়া ডুবিয়া যায়। এইপ্রকার বিপন্ন জাহাজের নাবিক ও চড়ন্দারদিগকে বাঁচাইবার জন্য যে ছোট ছোট ডিঙ্গি-নৌকা লইয়া লোকেরা ডুবো জাহাজের কাছে যায়, সেই ডিঙ্গি-নৌকাকে "জীবন-তরি" বলে।

আমাদের জাহাজ নাই—পণ্ডিতেরা বলেন, সেকালের বাঙ্গালি-দের একপ্রকার জাহাজ ছিল। চাঁদ সওদাগরের অনেক "ডিঙ্গা" ছিল। শ্রীমন্ত সপ্তডিঙ্গা লইয়া সিংহলে গিয়াছিলেন। ও কথা থাকুক। সেকালের বাঙ্গালী সওদাগরদের জাহাজের গঠন, বোধ হয়, বড় বড় "পলোয়ার"-নৌকার মত ছিল।

ইংরাজদের জাহাজের গঠন যেমন, জীবন-তরির গঠনও তেমনি—তবে জাহাজ অতি প্রকাণ্ড, আর জীবন-তরি অতি ছোট—ছবি দেখ।

ছুটি হইলে, তোমরা দেশে যাও; গ্রীষ্মের ছুটিতে আম-কাঁঠাল খাও, শীতকালের ছুটিতে দেশে গিয়া কইমাছের ঝোল খাও। ইংলণ্ডে ছুটি হইলে, ছাত্রেরা দেশে যায় বটে, অনেকে আবার সমুদ্রের তীরেও বেড়াইতে যায়। যাহারা সমুদ্রের তীরে যায়, তাহার জীবন-তরী দেখিয়া ও জাহাজ-ডুবি বিপন্ন লোকদের প্রাণ-রক্ষার জন্য মাল্লারা আপনারা কিরূপ বিপদে পড়ে, সেই বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত হয়, তাহাতে পরের প্রাণ-রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিতে তাহাদের উৎসাহ ও সাহস বাড়ে।

গ্রীষ্মকালের ছুটিতে ইংলণ্ডে ছাত্রেরা সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে যায়। সমুদ্রের তীরে টিনের ঘর আছে, সেই সকল ঘরে ঐ সকল জীবন-তরি থাকে। দুই-একজন লোক চৌকি দেয়। ছেলেরা গিয়া তাহাদিগকে জীবন-তরির বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করে। কোন্ ডিঙ্গি লইয়া গিয়া, কাহারা কত লোকের প্রাণ-বাঁচাইয়াছে, পরের প্রাণ-বাঁচাইতে গিয়া কত লোকে নিজেদের প্রাণ হারাই-য়াছে, এই সকল কাহিনী ঐ লোকেরা সগৌরবে ছাত্রদিগকে বলে। শুনিয়া ছাত্রদের প্রাণ পবিত্র উৎসাহে নাচিয়া উঠে।

এই সকল জীবন-তরির নাম আছে। (আমাদের দেশে নৌকার নাম রাখা হয় না, এটা বড় দোষ)। এক্ষণে খানকতক জীবনতরির-ও এই সকল ডিঙ্গির মাঝি-মাল্লাদের কার্য্যের বিষয়ে কিছু বলিব।

একখানি ডিঙ্গির নাম "নোরা রয়েড" (Nora Royds)। ঝড়ের রাত্রে সমুদ্রের পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে এই

জীবন-তরীর লোকেরা মগ্নপোতহইতে নিমজ্জমান লোকদিগকে বাঁচাইতেছেন।

ডিঙ্গি দ্বিতীয় নেপোলিয়ন বা দ্বিতীয় অভিমন্যু। কুড়ি-বাইশ-বৎসর পূর্ব্বে পৌষমাসে, একরাত্রে ভয়ানক ঝড় উঠিল "মেক্সিকো"-নামে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ বালির চড়ায় ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া ডুবু-ডুবু হইল। রাত্রিকালে এইপ্রকার বিপদে পড়িলে, তীরস্থ জীবন-তরির লোকদিগকে খবর দিবার জন্য জাহাজের লোকেরা "রকেট" ছোড়ে। "মেক্সিকো"-জাহাজের লোকেরাও রকেট ছুড়িতে লাগিল। রকেট দেখিয়া মাঝি-মাল্লারা "নোরা রয়েদ"-ডিঙ্গি লইয়া সমুদ্রে ভাসিল। গ্রামের লোকেরা আসিয়া সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইল। পারে ত সাঁতার দিয়া গিয়া ডুবো-জাহাজের লোকদের বাঁচায়।

আশ-পাশের গ্রামের লোকেরা আর দুইখানি জীবন-তরি লইয়া সমুদ্রে ভাসিল। রাত্রি ভয়ানক অন্ধকার—ঠিক যেন আমাদের আষাঢ়মাসের মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যারাত্রি। গ্রামের লোকেরা সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সকলেই জানিত যে, জীবন-তরির মাঝিমাল্লারা পিছে হটিবার লোক নয়—পরের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিজেদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

ভোর হইল, তিনখানির একখানি ডিঙ্গিও ফিরিয়া আসিল না; গ্রামস্থ লোকদের মুখ শুকাইয়া গেল। এমন সময়ে, একখানি ডিঙ্গি দেখা দিল; কিন্তু আর দুইখানি কোথায়? দুইখানিকেই সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে। একখানিতে ১৫জন মাল্লা ছিল, ১৩জন মারা পড়িয়াছে। আর "নোরা রয়েদ" যে ডিঙ্গির নাম, সেখানি উল্‌টিয়া বালু-চড়ায় পড়িয়াছিল—মাঝি-মাল্লা সমস্ত মারা পড়িয়াছে। বড় দুঃখের কথা! কিন্তু আজিও সমুদ্রের তীরস্থ গ্রামের লোকেরা ঐ তিনখানি জীবন-তরির মাঝিমাল্লাদের কথা যখনই পাড়ে, তখনই দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র আনন্দভোগ করিয়া থাকে। আর ছাত্রদিগকে গৌরব-মাখা কথায় উহাদের "বীরত্ব"-বর্ণন করে। "বীরত্ব" বলিলাম,—মানুষের প্রাণবধ করা বীরত্ব নয়, নিজের প্রাণ হাতে করিয়া পরের প্রাণ বাঁচাইতে যাওয়াই আসল বীরত্ব।

সমুদ্রের কূলস্থ একখানি ছোট গ্রামের নাম কাইষ্টার (Caister)। এই গ্রামে একঘর লোক আছে, তাহাদের পদবী হেলেট—যেমন আমাদের হালদার, মণ্ডল ইত্যাদি। জেম্‌স্ হেলেট-নামে একজন লোক এই গ্রামে বাস করে। ইহারা জেলে। কয়েকবৎসর হইল, এক জাহাজ বালির চড়ায় ঠেকিয়া ডুবিয়া যায় যায় হইল। এই গ্রামে "বিশাম্প" (Beauchamp) নামে একখানি জীবন-তরি ছিল। গ্রামের যুবকেরা ডুবো জাহাজের লোকদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ডিঙ্গি চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিল। জেম্‌স্ হেলেটের কয়েকটী পুত্র ও পৌত্র সেই ডিঙ্গির মাল্লা হইয়া গেল। জেম্‌স্ সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া রহিল—কতক্ষণে বাছারা ফিরিয়া আসিবে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার; কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার উপর আবার ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। ভোর হইল—কোথায় বা ডিঙ্গি, কোথায় বা মাঝিমাল্লারা, সকলে ডুবিয়া মরিয়াছে! এই সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ জেম্‌স্ শোকপ্রকাশ করিল না, প্রশান্তভাবে বলিল, "যাঁ'র ধন, তিনি লইয়াছেন!" ঠিক কথা!

পরে সমুদয় ব্রিটনবাসী যখন সগৌরবে বৃদ্ধকে কোলে তুলিয়া লইয়া নাচিবার ইচ্ছা করিতেছেন; তখন তিনি কোথায়? তিনি করোণারের আদালতে দাঁড়াইয়া করোণারের সম্মুখে এজাহার দিতেছেন। করোণার সব কথা শুনিয়া সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অত বিপদ্ দেখিয়া তোমার পুত্রপৌত্রেরা তবে ফিরিয়া আসিল না কেন?"

তখন সেই তেজস্বী বৃদ্ধ অগ্নিবর্ষী লোচনে ও সংযুক্তদন্তে যে উত্তর-প্রদান করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রিটনের সমুদয় লোকই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"কি, ফিরিবে? কাইষ্টারের লোক কখন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে না!"

ইহাই প্রকৃত সাহস। ইহাই কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

-:*:-

মিঞাউ

একে ত এই মধুর আওয়াজটা শুনিলেই, লোকের আত্মা-পিত্ত জ্বলিয়া যায়, তাহার উপর যখন সকলে বেশ ঘুমাইতেছে, আর কোন হতভাগ্য একটু ঘুমাইবার জন্য বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, তখন ঐ মধুর বুলিটি শুনিলে, তাহার সেই বিড়ালটাকে কি করিতে ইচ্ছা করে? আজ রাত্রে, এই সময়ে কানাইকে ও কথা জিজ্ঞাসা কর, সে বলিয়া দিবে!

এডোয়ার্ড-মেমোরিয়াল বোর্ডিং-স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পূর্ব্বে "স্পোর্টস্" হয়। এবারকার "স্পোর্টসে" নৌকার বাচ্‌খেলায় কানাই প্রথম হইবার চেষ্টা করিতেছে। সে-ই তাহার নৌকার মাঝি; আর নরুর, হিতেন্দ্র, শরৎ ও ভূষণ এই চারিজন তাহার নৌকার দাঁড়ি। তাহারা সকলে একশ্রেণীতে—তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, আর বোর্ডিংএ একঘরে—৭নং ঘরে শয়ন করে। দুইটী কারণে এই ছেলেগুলি স্থির করিয়াছে যে, কয়েকদিন তাহারা একটু সকাল সকাল শুইতে যাইবে; প্রথম কারণ, বার্ষিক পরীক্ষা সন্নিকট, ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় কারণ, বার্ষিক স্পোর্টস্‌ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; সুনিদ্রা হইলে, গায়ের জোর বাড়ে, স্ফূর্ত্তি হয়। ঘরের সকলেই ঘুমাইতেছে—দিব্য নাক ডাকাইতেছে; কেবল কানাই-বেচারা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার ঘুম

আসিতেছে না? একে ত তাহার ঘুম আসিতেছে না, তাহার উপর আবার ঐ শুন—"মিঞাউ"!

কানাইএর মেজাজটা এখন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে,—সপ্তমে চড়িয়া আছে। সপ্তমে না চড়িবে কেন? প্রথমতঃ দেখ, এত মেহনৎ করিয়া বাচ-খেলায় যদি দেবেন্দ্রের দলই প্রথম হয়, তাহা হইলে তাহা কতদূর অপমানের কথা! দ্বিতীয়তঃ, তাহারা এই বাচ-খেলার জন্য একটু সকাল সকাল—বেশী নয় ঘণ্টাখানিক আগে—শুইতে যাইতেছে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর—দেবেন্দ্রের দলের প্রফুল্ল ও নরেশ—আর চতুর্থশ্রেণীর সেই তাড়া করিলে মাগুরমাছের মত হাতহইতে পিছলাইয়া যায় চেংড়া ছোড়া ফটিকটা তাহাকে লইয়া খুব ঠাট্টা-মস্করা জুড়িয়া দিয়াছে। এ হেন সময়ে একটা হতভাগা বিড়ালে ঘুমটাও মাটী করিয়া দিলে, কি করিতে ইচ্ছা করে? ইচ্ছা করে, সে লক্ষীছাড়া চারপেয়েটাকে একেবারে দু' আধাখনা করিয়া ফেলি, কেমন কি না?

কানাই সেইরূপ ইচ্ছা করিতে করিতে বড়ই বিরক্তির সহিত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া যে জানালা দিয়া ঐ পৈশাচিক শব্দটা আসিতেছিল, সেই জানালার ধারে গিয়া বিড়ালটা কোথাহইতে ডাকিয়া মরিতেছে, দেখিতে গেল। বাহিরে একেবারে অন্ধকার না হইলেও, আলো-আঁধারি। কেবল "সুঃ-মহাশয়ের" ঘরের জানালাদিয়া আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। তা' তিনি, যদিও স্বীকার করেন না, তবু একটু কাণে খাটো; সুতরাং তিনি যে বিড়ালের ঐ বক্তৃতা শুনিয়া তাহাকে তাড়াইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এদিকে কানাইও আলো-আঁধারিতে সেই ইঁদুরের যমের অবস্থান-নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক, সুখের বিষয় যে বিড়ালটা এতক্ষণের পর দয়া করিয়া গলাবাজি থামাইল। কানাই একটা হাঁফ ছাড়িয়া আবার শুইতে গেল। প্রায় সমস্ত দিন দাঁড় টানিয়া টানিয়া তাহার হাত, কোমর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, পিঠের অবস্থাও তথৈবচ, একটু বিশ্রাম না করিলেই নয়। বিছানায় পড়িয়া সে আবার জুৎ করিয়া শুইল, ঘুমের একটু আমেজও আসিতে লাগিল, এমন সময়ে আবার, আঃ, সেই—মিঞাউ!

কানাই মহাক্রুদ্ধ হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আরে ম'লো—দূর!—দূর!—কোথাকার হতভাগা বেড়াল রে! বেটাকে একবার ধ'রতে পারি ত, এক আছাড়েই নিকেশ করি!"

তাহার চীৎকারে নফর জাগিয়া উঠিল। অর্দ্ধঘুমন্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কিসের গোলমাল?"

কানাই বলিল,—"আরে ভাই, একটা হুলো-বেড়াল ত আমায় জ্বালাতন ক'রে মারলে। এখনপর্য্যন্ত একবারও দু'টো চোকের পাতা এক ক'রতে পারলুম না।"

কানাই একাকী জাগিয়া ছিল, এখন একজন সঙ্গী পাইয়া একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গী বলিয়া উঠিল,—"কোথাকার গাধা রে, এই সুখবরটুকু দেবার জন্তে আমাকে জাগা'বার তোর কি দরকার ছিল?"

কানাই বলিল,—"আ ম'লো! আমি কি তোকে জাগিয়েছি? একটা হুলো-বেড়াল—"

নফর তন্দ্রাজড়িত স্বরে বলিল, "হুঁ—হুলো-বেড়াল—তুই—তলো—" তাহার পর, তাহার আর বাক্যসমাপ্তির অবসর ঘটিল না, নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল!

কানাই ক্রোধভরে বলিল,—"পয়লা নম্বরের গাধা!"

কাহাকেও বিনাদোষে দোষ দিলে রাগ ত হইবারই কথা, তাহার উপর কানাইএর ঘুম হইতেছে না, কিন্তু নফর পাঁচমিনিটও জাগিয়া রহিল না—এ কি কম রাগের কথা! দুঃখটা সমদুঃখীর সহিত ভোগ করিতে পাইলে, অনুভূতিটা তত প্রখর থাকে না। কানাইএর বিড়ালের উপর রাগটা আরও বাড়িয়া উঠিল। তখনও মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই, এমন সময়ে বিড়ালটা—আথ! আবার মিঞাউ করিয়া উঠিল, কানাই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। বিছানা-হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মেঝেতে হাতড়াইয়া কাহার একপাটী জুতা পাইল, তাহার নিজেরও হইতে পারে। উহা হাতে করিয়া সে জানালার কাছে ছুটিয়া গেল, এবং আন্দাজে বিড়ালের অবস্থান-নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া সজোরে সেই জুতা ছুড়িয়া মারিল। দিনের বেলাও তাগ্ করিয়া কাহাকেও জুতা ছুড়িয়া মারা বড় সোজা কাজ নয়, রাত্রিবেলার ত কথাই নাই।

রাগে কানাইয়ের হাতের তাগ্ও ঠিক থাকিবার কথা নহে। যাহা হউক, জুতাটা গিয়া নীচেকার জানালার শার্সিতে লাগিল; ঝন্ ঝন্ করিয়া কাচ ভাঙিয়া পড়িল। কানাই তাহা শুনিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, যেন শুধু বাঘের মাসী নহে, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি মার্জ্জারজাতীয় যতগুলি জীব আছে সকলেই যোট বাঁধিয়া আসিয়া তাহাকে তাড়া করিয়াছে!

তাহাতে যাহারা আচম্বিতে জাগিয়া উঠিল, তাহাদের তন্দ্রা-জড়িত উক্তিমালা, "কে রে," "কি হ'লো রে", "আঁ আঁ" ইত্যাদি কানাইকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। সে চুপি চুপি অনুনয়-ব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিল,—"আরে, চুপ্ চুপ্! কিছু হয় নি, ঘুমো, সব ঘুমো!"

"একটা বিট্‌কেল আওয়াজ শুন্‌তে পাওয়া গেল না—কে কর্‌লে?"

"আরে চুপ্ কর, একটা হতভাগা বেড়ালকে জুতো ছুড়ে মা'র্‌তে গিয়ে, আমি নীচেকার ঘরের শার্সি ভেঙে ফেলেছি—দোহাই, তোরা চুপ্‌টি মেরে পড়ে থা'ক্।"

কিন্তু "যেখানে বাঘের ভয়,
সেখানেই সন্ধ্যে হয়!"

নীচে কে একটা দরোজা সজোরে বন্ধ করিল, তাহার পর কে মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কে কাঁচ ভাঙ্‌ছে?" এই রে, তবেই হয়েছে! তাহার উপর আবার কানাইদের ঘরের ঠিক নীচে যে কতকগুলা চ্যাংড়া ছোঁড়া থাকে, তাহাদের ঘরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসির মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা বোধ হয়, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিয়াছে। একটা "ওপরকেলাসের" ছেলে, বিড়াল মারিতে গিয়া শার্সি ভাঙিয়াছে, ইহার অপেক্ষা আমোদের কথা তাহাদের পক্ষে আর কি হইতে পারে? কানাই মনে মনে তাহাদের মুণ্ড চিবাইবার ইচ্ছা করিতেছে, এমন সময়ে খোদ সুঃ-মহাশয়ের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। "শিববাবু, কোন ছোক্‌রা ওপরথেকে জুতো ছুড়ে নীচেকার একটা ঘরের শার্সির কাঁচ চুরমার ক'রে দিয়েছে।"

তাহা শুনিয়া কানাই সভয়ে বলিয়া উঠিল,—

"ঐ রে, এইবার মুস্কিল হ'ল—দফা রফা! দোহাই তোরা কেউ টুঁ-শব্দ করিস্ নি, সব মট্‌কা মেরে প'ড়ে থাক্।"

উহার একটু পরেই সুঃ-মহাশয়ের মেঘগর্জ্জনবৎ কণ্ঠস্বর এবং সেই চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলার "হাঁ, স্যার!" "না, স্যার!" "একটা শার্সি ভাঙার আওয়াজ পেয়েছি, স্যার!" শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার পরই দুর্গাদাস বাবু (সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট) ধপ্ ধপ্ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া ৭নং ঘরে ঢুকিলেন। এত গোলমালেও এ ঘরের ছেলেরা ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, এই ঘরেই আসামী আছে। তিনি জুতাগুলা গণিয়া দেখিলেন, একপাটী কম পড়িল, তখন কোন্ ঘরে আসামী আছে তাহা সাব্যস্ত করিতে তাঁহার আর একসেকেণ্ডও লাগিল না। তিনি কেবল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জলদগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে জুতো ছুড়েছে?"

কাজেই কানাই উঠিয়া অতিশয় অনুনয়সূচক স্বরে বলিল,—"আ—আমি, স্যার!"

"কানাই, তুমি? এই বদ্‌মায়েসীর মানে কি?"

"আজ্ঞে, এক—বেড়াল (এ সময়ে বিড়ালের বিশেষণটা বাদ দিবার কথা কানাইয়ের মনে আসিল না!) ম্যাও ম্যাও ক'রে জ্বালাতন ক'র্‌ছিল, আমি ঘুমুতে পার্‌ছিলুম না, তাই ঐ জুতো ছুড়ে মেরেছিলুম।"

"বেড়াল? কই আমি তো বেড়াল দেখি নি!"

"একটা ছেল, স্যার! ভয়ানক ম্যাও ম্যাও ক'রছিল।"

"কাল সকালে তুমি আমার প'ড়বার ঘরে আ'সবে।" ছাত্রবর্গের চিরভীতিপ্রদ ঐ কথা-কয়টি বলিয়া সুঃ-মহাশয় চলিয়া গেলেন। তাঁহার পড়িবার ঘরে একগাছা সরু লিক্‌লিকে বেত থাকে।

(ক্রমশঃ।)

আমে নাম।

মনে কর, তোমাদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটী বেশ ভাল কলমের আমগাছ আছে; তোমাদের সেই আমগাছের আমগুলি মধুরতার জন্য প্রসিদ্ধ, ফলে সেই আমগুলি তোমরা একাই উপভোগ করিতে পাও না, চাহও না; পাড়া-প্রতিবেশীকে দিইয়া-থুইয়া খাইতে হয়। তাই তোমরা চাও যে, সেই আমগাছের অন্ততঃ কতকগুলি আমে গৃহকর্ত্তার বা উপহারদাতার নামের আদ্যক্ষর লিখিত থাকে; কালি, পেন্সিল বা রঙদিয়া নাম লিখিতে তোমাদের মন সরে না। তোমরা চাও, উহাতে সেই নামের আদ্যক্ষরটি যেন স্বভাবতঃ মুদ্রিত থাকে। তাহা কি হয়?

হয়। মনে কর, তোমার নাম "অরুণ"। তুমি চাও যে, তোমার নামের আদ্যক্ষর "অ" তোমাদের বাড়ীর সেই কলমের গাছের একটি আমে মুদ্রিত হয়। তাহার জন্য ভাবনা কি? একটুক্‌রা রাঙতা বা তেলা-কাগজ প্রথমে পেন্সিলদিয়া দাগিয়া লইয়া পরে একটা মাফিক-সই "অ" কাটিয়া লও। তাহার পর, যে কাঁচা অথচ পুষ্ট আমটিতে নাম মুদ্রিত করিতে চাও, তাহার যে দিকে বেশ রোদ লাগে, সেই দিকে খোসার উপর একটু পাৎলা আটাদিয়া উহা উল্টা করিয়া সাঁটিয়া দাও। আমটি পাকিলে দেখিবে, সকল দিকে বেশ রঙ্ ধরিয়াছে, কেবল যেটুকুতে "অ" সাঁটা ছিল, সেইটুকুই সবুজ হইয়া রহিয়াছে এবং সেইটুকুতে সুস্পষ্টভাবে তোমার নামের আদ্যক্ষরটি প্রকৃতি লিখিয়া দিয়াছেন! বৃষ্টির জল লাগিয়া সাঁটা কাগজ বা রাঙতাটুকু খসিয়া পড়িতে পারে, তাই একমাপের দুই-তিনটি অক্ষর কাটিয়া লওয়া ভাল। একটী খসিয়া পড়িলে, আর একটী ঠিক সেই স্থানে সাঁটিয়া দিলে চলিবে। কিম্বা সেই অক্ষরটির যে দিক্ বাহিরে পড়িবে, সেই দিকে একটু "বার্ণিস" লাগাইয়া দিলে, বৃষ্টির জল উহার গায়ে লাগিয়া ঠিক্‌রাইয়া যাইবে, উহা খসিয়া পড়িবে না। আমের উপর ঐপ্রকারে লিখিয়া অনেক মজা করা যাইতে পারে। তবে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ এই, মজাটা যেন সুশ্লীলভাবে করা হয়।

বিলাতে এক ফলোদ্যানের অধিকারী একজন বিখ্যাত ফলবিক্রেতাকে ঐরূপে নাম লিখিয়া দিয়া ফল-সরবরাহ করিত।

জ্যৈষ্ঠমাসে যখন আম পাকিবে, তখন "বালক"-সম্পাদক তোমাদের কাহারও নিকটহইতে ঐরকম নাম-লেখা সুরসাল রসাল-উপহার পাইবেন কি?

চিন্তা-সংযম।

আমরা প্রত্যেকেই একহিসাবে এক-একজন সর্দ্দার-রাজমিস্ত্রী, কেননা আমাদের সকলকেই নিজের নিজের চরিত্রটিকে গাথিয়া তুলিতে হইতেছে। সর্দ্দার-রাজমিস্ত্রীকে কতকগুলি রাজ ও মজুর খাটাইয়া কাজ করিতে হয়, আমাদেরও তেমনি আমাদের চিন্তাগুলিকে খাটাইয়া চরিত্রগঠন করিতে হইতেছে। সর্দ্দার-রাজমিস্ত্রীর রাজ ও মজুরগুলি কাজের লোক হইলে, যেমন সে কোন একটী ইমারত বেশ ভাল করিয়া খাড়া করিতে পারে, আর তাহারা অকেজো হইলে, যেমন সে সেই ইমারতটি মনের মত করিয়া গাথিয়া তুলিতে পারে না, তেমনি আমাদের ভাবনাগুলিও আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র হয় সুন্দর, নয় কুৎসিত করিয়া তুলিতেছে।

এই যে আমরা সকলে আত্মার কোন এক লুকান জায়গায় আপনাআপনি কথা কহিতে পারি, ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য জিনিস জগতে আর কিছুই নাই। ভাবনাগুলি একটীর পর একটী করিয়া আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা তাহাদের প্রত্যেককে বেশ ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লই। তাহার পর, হয় আমরা তাহাদের আদর করিয়া মনের মধ্যে ঠাঁই দিই, নয় দূর করিয়া তাড়াইয়া দিই।

আমরা বেশ ভাল রকম করিয়াই জানি যে, যদি এক বদ্ ভাবনাকে মনের মধ্যে ঠাঁই দিই, তাহা হইলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে নানা বিপদে ফেলিবে। কিন্তু কোন্ ভাবনাটি ভাল, আর কোন্‌টাই বা মন্দ, তাহা চেনা সকল সময়ে বড় সোজা কাজ নয়। সময়ে সময়ে সকলের অপেক্ষা কুৎসিত ভাবনাটাই এমন সভ্য-ভব্য হইয়া ফিট্‌কাট্ বাবু সাজিয়া আসে যে, আমরা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া বলি,—"আসুন, আস্তে আজ্ঞে হো'ক, বসুন! আপনার মত আমুদে লোকের সঙ্গে দু'টো কথা না কইলে, মনে স্ফূর্ত্তি হয় না।" সে যে চিনির প্রলেপ দেওয়া বিষের বড়ী, তাহা আমরা চিনিয়া উঠিতে পারি না।

চীনা ফেরিওয়ালা

কিন্তু একবার একটা বদ্ ভাবনা যদি কোনরকমে আমাদের মনের মধ্যে থাকিতে পায়, তাহা হইলে পরে তাহাকে তাড়ান দায় হইয়া উঠে।

এই যে সব আগন্তুক কোন এক তিমিরাচ্ছন্ন, নিভৃত ও অজ্ঞাত প্রদেশহইতে আসিয়া আমাদের মনের দুয়ারে ঘা দেয়, ইহারা কে? কোথাহইতেই বা আসে? এই কথা দুইটির জবাব আমরা কেহই দিতে পারি না। ইহারা আমাদের শৈশবের সাথী নহে, পরে ইহারা আমাদের কাছে আসে, আমরা নিজেরা তাহাদের উৎপন্ন করি না, তাহারা কিন্তু, আমরা যাহা হইতে চাই, আমাদিগকে তাহাই করিয়া দেয়! তাহা সত্ত্বেও আমরা যদি ইচ্ছা ও সবিশেষ যত্ন করি, তাহা হইলে তাহাদের বশে রাখিতে পারি। এই কথাটি একটী বড় মনে রাখিবার কথা।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে বিবেক বলিয়া একটী বস্তু বা চৈতন্য আছে। কোন কিছু করিবার বা বলিবার আগে, যদি আমরা সে কাজটি বা কথাটি করিব বা বলিব কি না, তাহা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে থাকি, তাহা হইলে শুনিতে পাই, কে যেন ভিতরহইতে "হাঁ" কিম্বা "না" বলিতেছে। সে আর কেহ নয়, ঐ বিবেক। বিবেক সুস্থ থাকিলে, ভুল করে না।

বিবেক আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আমাদের চিরাত্মীয় হইয়া রহিয়াছে; যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই করিতে আমাদের সেই প্রাণের বন্ধু আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে; কখন একটা কুকাজে মতি দেয় না। সেইজন্য যখন আমরা ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের চিরপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বন্ধু বিবেকেরই পরামর্শ লওয়া উচিত। আমরা যদি সর্ব্বদাই বিবেকের পরামর্শমতে কাজ করি, তাহা হইলে আমরা দেখিব, আমাদের ভাবনাগুলি ক্রমশঃ আমাদের "মুঠার ভিতর" আসিয়া পড়িতেছে। বলিতে কি, তখন আমরা বিবেক যে কাজে "না" বলিয়াছে, সে কাজ করিতেই পারিব না; লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাইবে, একশোবার বাধো বাধো ঠেকিবে।

ভাবনাগুলিকে বশে রাখিতে হইলে, আর একটী কাজও করা দরকার। দিবারাত্রের মধ্যে একবার আমাদের কিছু সময় যাহা ভাল, যাহা মানসিক বলপ্রদ, যাহা শুচিতাজনক, যাহা নির্ম্মল, যাহা পবিত্র এমন সমস্ত বিষয়ের কথা ভাবিতে হইবে। শিক্ষার গুণে যেমন কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনীয়ার, কেহ অধ্যাপক ইত্যাদি হয়, সৎ চিন্তার গুণে তেমনই আমরা আমাদের চিন্তামাত্রকেই সৎ করিয়া তুলিতে পারি।

আপনিই আপনার কর্ত্তা হইবার জন্ত তোমরা অনেকেই হয়ত এখন বড় উৎসুক, বিবেককে তোমরা তোমাদের চিন্তাগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে দাও, তাহা হইলে তোমরা বড় হইলে প্রকৃতই পৃথিবীর কাহারই বশে থাকিবে না। আর তোমাদের সুচিন্তাবলী তোমাদের চরিত্র এমনই পবিত্র করিয়া তুলিবে যে, সেই চরিত্র লইয়া যাঁহার চরিত্রে কোনই খুঁত নাই, সেই ঈশ্বরের কাছে যাইতে তোমাদের কোনই লজ্জাবোধ হইবে না।

বক্তৃতা-প্রণালী

প্রতি বিদ্যালয়েই প্রায় কোন-না-কোন সময়ে কোন-না-কোন উপলক্ষে ছাত্রদের আবৃত্তি করিতে শিখান হয়, ভালই করা হয়, কেননা "সদসি বাক্‌পটুতা" একটী মহাগুণ, এবং আবৃত্তি "সদসি বাক্‌পটুতার" আদ্য সোপান। সুবিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন, বক্তৃতা করার সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পুত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—"মুখটী ভাল ও গোল করিয়া হাঁ করিবে, সকলের শেষে যে লোকটি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিবে, এবং বেশ সময় লইয়া বক্তৃতাটি করিতে থাকিবে।"

বক্তৃতা-প্রণালীসম্বন্ধে ঐ উপদেশের অপেক্ষা সারগর্ভ উপদেশ দেওয়া দুষ্কর। তাঁহার ঐ উপদেশের শেষের কথাটিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্,—"বেশ সময় লইয়া বক্তৃতা করিতে থাকিবে।" তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া কত ছেলে ঘাবড়াইয়া গিয়া আবৃত্তির থাই হারাইয়া ফেলে। "মুখটী ভাল ও গোল করিয়া হাঁ করিবে"—এই কথাটি পড়িয়া তোমাদের অনেকের হয়ত হাসি পাইবে, কিন্তু ইহা স্থির জানিও, প্রীতিজনক ও সফলকাম বাগ্মী হইতে হইলে, ঐ দুইটি কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক।

আবৃত্তি প্রকাশ্যে বক্তৃতার সোপান বা দ্বারস্বরূপ বটে, কিন্তু উহা বক্তৃতাহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। আবৃত্তিকারকদিগকে প্রায়ই "কথার সঙ্গে ক্রিয়া মিলাইতে" বলা হয়। বিলাতে একটী বালক না কি "the comet lifts its fiery tail" (উল্কা তুলে তা'র পুচ্ছ অগ্নিময়) এই অংশটি আবৃত্তি করিবার সময়ে খুব গম্ভীরভাবে তাহার কোটের পুচ্ছদেশ উঠাইয়া দর্শকগণের হাস্যভাজন হইয়াছিল। বক্তার বক্তৃতার সহিত ক্রিয়া মিলাইলে চলে না; কারণ বক্তা অঙ্গভঙ্গী যত অল্প করেন এবং যতই প্রশান্তভাবে বক্তৃতা করিতে থাকেন, ততই তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃগণের হৃদয়স্পর্শী হইয়া উঠে।

বক্তৃমাত্রকেই প্রথমতঃ প্রত্যেক শব্দটির যাহাতে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক শব্দটি টাকশালের মুদ্রাযন্ত্রহইতে টাকাগুলি যেমন বেশ একটী সুমধুর ও সুস্পষ্ট নিক্কণসহ নির্গত হয়, তেমনই করিয়া কণ্ঠনালী ও রসনার সাহায্যে নির্গত করিতে হইবে। কথোপকথনকালে আমরা যেমন-তেমন করিয়া শব্দগুলির উচ্চারণ করি, কিন্তু বক্তৃতার সময়ে বক্তাকে প্রত্যেক শব্দের সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রথম প্রথম হয়ত বক্তার মনে হইবে যে, তাহাকে বড় চেষ্টা করিয়া (শব্দাংশগুলিতে বড় জোর দিয়া) শব্দগুলির উচ্চারণ করিতে হইতেছে, কিন্তু কালে তাহার সে দোষ সারিয়া যাইবে।

মনে কর, তোমাদের একজনকে কোন এক সভার সভাপতি-মহাশয়কে ধন্যবাদসূচক কয়েকটী কথা অতি সংক্ষেপে বলিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। সে স্থলে তাহার কি করা উচিত? তাহার সেই ক্ষুদ্র বক্তৃতামধ্যে যে কয়টি শব্দ প্রধান, সে কয়টি শব্দের প্রথমতঃ উচ্চারণ শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত, যে শব্দগুলির উপর জোর দিতে হইবে, সেই শব্দগুলি বাছিয়া লইয়া আপনা-আপনি সেই বক্তৃতাটি করিবার ছলে সেই শব্দগুলির উপর ঠিক জোর পড়িতেছে কি না, তাহা দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। শব্দের একটীও বর্ণ অনুচ্চারিত রাখা উচিত নহে। "কোথায়" এই শব্দটির যদি উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে "কোথা" বলিয়া উচ্চারণ করিলে, উচ্চারণ-দোষ ঘটে।

সভাস্থলে, যতক্ষণ না সকলে নীরব হয়, ততক্ষণ বক্তৃতারম্ভ করিও না; তুমিও নীরবে ও স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিও। মুখ বুজিয়া নাকদিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস-গ্রহণ করিও। তাহাতে তোমার ভয়ভাব ঘুচিয়া যাইবে, এবং বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বে তুমি একটী প্রশ্বাসত্যাগেরও সুযোগ পাইবে। তাহার পর, তাড়াতাড়ি না করিয়া, ধীরে সুস্থে বক্তৃতাটী আরম্ভ করিবে। ঐরূপ করিলে, তুমি সন্তোষ ও সাফল্যের সহিত বক্তৃতাটী করিতে পারিবে।

এমন অনেক বক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু বক্তব্য বিষয়গুলি ভাবিয়া, সাজাইয়া-গুজাইয়া লয় নাই। এইরূপ বক্তা বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া

যা' মুখে আসে, তা'ই বকিয়া যায়। শ্রোতৃগণ তাহার চিন্তার সূত্র ধরিতে পারেন না; সেও একবিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করে, আর একবিষয়ে শেষ করে। কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হইলে, সেই বিষয়সম্বন্ধে যদি কোন পুস্তক থাকে, তাহা পড়িয়া, চিন্তা করিয়া, বক্তৃতার একটী নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া কিম্বা বক্তৃতাটী সম্পূর্ণ লিখিয়া বার বার পড়িয়া, ঠিক মুখস্থ করিয়া নয়, মনের মধ্যে

এই চিত্রোক্ত উপকথাটি কবিতায় দীর্ঘত্রিপদীচ্ছন্দে সংক্ষেপে রচনা করিতে হইবে।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটি "বালকে" প্রকাশিত হইবে।

পরিপাক করিয়া লইয়া তবে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়ান উচিত। অনেকের বক্তৃতাকালে অনেক "মুদ্রাদোষ"-প্রকাশ পায়। এজন্য বক্তৃতাটী গৃহে অভ্যাসকালে একটী দীর্ঘ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই করা উচিত অতিরিক্ত পান বা মিষ্ট খাইলে লোকে কিছু তোৎলা হইয়া পড়ে, মুখের কথা জড়াইয়া যায়। বক্তার প্রতিদিন দন্তধাবন ও জিহ্বা-পরিষ্কার করা উচিত। কণ্ঠ-স্বরের সুমিষ্টতার দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত কারণে কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া যায়, সে সমস্ত কারণ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা বিধেয়। অতিরিক্ত চীৎকার করিয়া বা অতি নিম্নস্বরে বক্তৃতা উভয়ই দোষাবহ। কোন কোন বক্তা, দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি শব্দের খুব জোরে উচ্চারণ করিয়া আবার কতকগুলি শব্দের বড় আস্তে উচ্চারণ করেন, কাছের লোক শুনিতে পায়, দূরের লোকের শ্রুতিগোচর হয় না। স্বর তরঙ্গিত করা বা উঠান-নামান বক্তৃতায় কখন কখন আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হইলেই, ভাল হয়। বক্তৃতায় অতিরিক্ত গিটকিরী-ব্যবহারও অনেকের একপ্রকার মুদ্রাদোষ, গিটকিরীর ব্যবহার বক্তৃতায় খুব অল্পই হয়। যখন-

তখন গিট্‌কিরী-ব্যবহার, যেমন গানে, তেমনই বক্তৃতায়, হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠে। অনেকে বক্তৃতায় একটীমাত্র ভাবকে তিনচারি-প্রকারে ব্যক্ত করা বাক্‌পটুত্বার একটী সুন্দর লক্ষণ মনে করিয়া পুনরুক্তি করিতে থাকেন। পুনরুক্তি যেমন রচনায়, তেমনই বক্তৃতায় একান্ত বিরক্তিকর। সুবক্তা পুনরুক্তির ভাণ করেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন একটী প্রধান চিন্তাকে তাঁহার সুললিত ভাষা ও ভাষাভঙ্গী-সহকারে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতে থাকেন। অলঙ্কারবহুলা বক্তৃতা আজকাল শ্রোতৃগণ অশ্রদ্ধাই করিয়া থাকেন। প্রাঞ্জলতাই ভাষার শ্রেষ্ঠ ভূষণ; কি রচনায়, কি বক্তৃতায় চেষ্টা-কৃত অলঙ্কার-প্রয়োগ অর্থাৎ অলঙ্কার-প্রয়োগের অনুরোধেই অলঙ্কার-প্রয়োগ পাঠক বা শ্রোতার প্রীতিকর হয় না।

উৎকৃষ্ট লেখকমাত্রেই শব্দশিল্পী। এই শব্দনির্ব্বাচন-কৃতিত্ব লেখকের পক্ষে যত আবশ্যক, বক্তার পক্ষে তত আবশ্যক নহে। কেননা বক্তা স্বরভঙ্গীদ্বারা ঐ কাজটি অনেকটা সারিয়া লন। তথাপি বক্তারও শব্দশিল্পী হওয়া আবশ্যক। যে শব্দ যে ভাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্যোতক, সেই শব্দটাই বাছিয়া-গুছিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলেই, ভাল হয়।

অনেকের ধারণা এই, বাঙ্গলাভাষায় ভাল বক্তৃতা করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও কৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রভৃতির বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইয়াছে। যাঁহারা হৃদয়ভাবের উন্মাদনায় মত্ত না হইয়া সুললিত ভাষাপ্রয়োগে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা বক্তৃতার মুখ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যেখানে যেমন শ্রোতা দেখিবে, সেখানে তেমনই ভাষা-প্রয়োগ করিয়া যেন কথা কহিতেছ, এমনই ভাবে বক্তৃতা করিবে। ভাষা, অলঙ্কার, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি কিছুরই দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া কেবল তোমার বক্তব্য বিষয়টি যতদূর সম্ভব অনাড়ম্বরে ও সরলভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পার, তাহারই চেষ্টা করিবে। কি কি কথা বলিতে আসিয়াছ, তাহা যদি মনে না রাখিতে পার, একটী ক্ষুদ্র কাগজে তোমার বক্তৃতার প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সার-সংকলন করিয়া বক্তৃতাকালে তোমার নয়ন সমক্ষে রাখিও। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই, সে বিষয়ে বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিয়া উপহাসাস্পদ হইও না। বক্তৃতাটীর মধ্যে একটী শৃঙ্খলা-রক্ষার চেষ্টা করিও। আত্ম-প্রসঙ্গ বা অবান্তর-কথা তাহাতে যেন স্থান না পায়। আর একটী কথা বলিয়া আমারও এই বক্তৃতা-শেষ করি। বক্তৃতাটী যেখানে শেষ করিবার, সেইখানেই শেষ করিও। হাসিও না, অনেকেই যেখানে বক্তৃতা-শেষ করা উচিত, সেখানে শেষ না করিয়া অনবরত একই কথা বকিয়া যায়, শেষে যখন আর পারে না, তখন বক্তৃতার যেখানে-সেখানে ছেদ বসাইয়া দেয়। তোমার সর্ব্বশেষ কথাটী কি হইবে, তাহা তুমি বক্তৃতাকালে মনে রাখিও; না পার, কাগজে টুকিয়া লইও।

-:০:-

চিঠি-চাপাটি

বহু গ্রাহকের নিকটহইতে "বালকে"র গুণানুবাদপূর্ণ বহু পত্র পাইয়া আমরা নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। যে সমস্ত গ্রাহক বা পাঠকের নিকটহইতে আমরা পত্র বা পোষ্টকার্ড পাইয়াছি, নিম্নে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ক্ষুদ্র কবিতা বা প্রবন্ধও পাঠাইয়াছেন। কয়েকজন পত্রলেখক "বালক"-পাঠে তাঁহারা যে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কেবল তাহাই জানাইয়াছেন; এই পত্রলেখকদিগের কাছে আমরা দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি। এই পত্রিকাখানি আমাদের বাঙ্গালী বালক বন্ধুরা যে এত আগ্রহ-জনক-বোধ করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া আমরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। "আপনার গত বৎসরের বালক-পাঠে আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছি"—উল্লিখিত পত্রগুলিতে এইরূপ কথা ইঁহারা প্রায় সকলেই লিখিয়াছেন।

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকটহইতে ঐরূপ পত্র পাইলে, আমরা যে সততই বড় প্রীত হইয়া থাকি, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। হয়ত এই পত্রলেখক-দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের প্রবন্ধ-কবিতাদি "বালকে" প্রকাশিত না হইতে দেখিয়া ভগ্নাশ হইবেন; কিন্তু তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দুইটি কথা মনে রাখিলে, আমরা বাধিত হইব:—(১) "বালকে"র কলেবর বড় ক্ষুদ্র, উহার মাসিক পৃষ্ঠা-সংখ্যা ষোলটীমাত্র; (২) আমাদিগকে পত্রিকাখানি, যত দূর সম্ভব, সকল পাঠক-পাঠিকারই মনোমদ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কেহ "বালকে" প্রকাশার্থ কোন প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠাইতে বাসনা করিলে, কাগজের একপৃষ্ঠায় লিখিবেন। এই মাসে আমরা বালকের প্রচ্ছদপটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় উহার নিয়মাবলী মুদ্রিত করিলাম। ঐ নিয়মগুলি বালকের পাঠকগণ স্মরণে রাখিলে, আমরা বাধিত হইব। সকলে বিশেষ করিয়া ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে "বালক"-প্রেরণ-সম্বন্ধীয় নিয়মটী মনে রাখেন, এই আমাদের অনুরোধ; অন্যথায় প্রত্যেক গ্রাহককে পত্র লিখিতে আমাদের অনর্থক অনেক সময় ও অর্থব্যয় হয়। আমরা পুনরায় বলিতেছি যে, আপনাদের পত্রগুলি পাইয়া আমরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং আমরা আশা করি, যে, "বালক" বা আপনাদের আগ্রহজনক অন্য কোন বিষয়সম্বন্ধে এইরূপ পত্রাদি লিখিতে আপনারা কখন বিরত হইবেন না।

শ্রীফকিরেশ্বর সেন, বাঁকুড়া। শ্রীক—মিত্র, কলিকাতা। শ্রীমণিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ধুবড়ী। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ আচার্য্য, মেদিনীপুর। শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন, কলিকাতা। শ্রীদাশরথী চৌধুরী, কলিকাতা। শ্রীমধুসূদন সেন-গুপ্ত, গয়া। শ্রীরামকানাই দত্ত, ত্রিপুরা। শ্রীদেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শালিখিয়া। শ্রীহরিমোহন রক্ষিত, কলিকাতা। শ্রীমোহিতমোহন দাঁ, কলিকাতা। শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র কলিকাতা। শ্রীঅপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা। শ্রীপরিমল গোস্বামী, পাবনা। শ্রীবলাইচন্দ্র আঢ্য, চুঁচুড়া। শেখ্ আবদস্ শোভান, ঢাকা। শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। শ্রীগৌর-বিনোদ মিত্র, কলিকাতা। শ্রীনবইন্দু বসু, কলিকাতা।

বালক

২য় বর্ষ।] এপ্রিল, ১৯১৩। [৪র্থ সংখ্যা।

স্বর্ণসূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কিন্তু স্বর্ণসূত্রটি ধরিয়া থাকা পরেশের পক্ষে এখন মহাকষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল, তাহার বিশ্বাসের বড় পরীক্ষা হইতে লাগিল। যত সে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই স্বর্ণসূত্র তাহাকে আঁকাবাঁকা পথ দিয়া একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। অরণ্যের বড় বড় বৃক্ষগুলি সে শীঘ্রই পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইল। তখন ধূসরবর্ণ পাহাড়ের উপরিস্থিত অনুচ্চ ঝোঁপগুলি তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। যে পথ দিয়া সে এখন চলিতে লাগিল, তাহা যেন একটি শুষ্কতোয়া নগ-নির্ঝরিণীর তলদেশ; পথটি স্থানে স্থানে বড় খাড়া। স্থানটিতে পাখী বড় নাই, কেবল একজাতীয় শৈল-বিহগ শিলাহইতে শিলান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া কিচিরমিচির করিতেছিল। পরেশ এখন যেখানে উঠিয়াছে, সেখানহইতে অনেক নীচে সে তরুশিরগুলি এবং হেথা-হোথা এক-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-স্রোতস্বিনী রবি-কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, দেখিতে পাইল। স্থানটি নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দাঁড়কাকের কর্কশ কোলাহল কিম্বা আকাশে বহু উচ্চে বিন্দুবৎ হইয়া ঘূর্ণায়মান উৎক্রোশ-পক্ষী বা চীলের চীৎকার শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে, পরেশ সহসা শুনিল, স্বর্ণসূত্র তাহাকে যে দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই দিকে মেঘ-গর্জ্জনের মত শব্দ হইল। সে মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু স্বর্ণ-সূত্রের টান ঢিলা হইল না, সে তাহাকে বরাবর শৈলচূড়ায় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পরেশও সূত্র ছাড়িল না, সূত্রনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেই থাকিল; যাইতে যাইতে যখন সে পাহাড়ের এক কোণে পঁহুছিল, তখন সে আবার সেই মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ শুনিতে পাইল, শব্দলক্ষ্যে চাহিয়া দেখে, এক গুহামুখহইতে একটা প্রকাণ্ড সিংহ মুখ বাড়াইয়া এপ্রকার গর্জ্জন করিতেছে। এখন তাহাকে যে পথ দিয়া যাইতে হইতেছে, তাহার এক পাশে সেই সিংহ-গুহা, আর এক পাশে সেই শৈলের এক শিরোঘূর্ণনকারী ভগ্নদেশ। দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। এ ক্ষেত্রে তাহার কি করা উচিত? সে কি সূতা ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যাইবে? না; তাহার হৃদয়-বাণী তাহাকে সাহসী ও নির্ভীক হইতে উৎসাহ দিতেছে। তাহা-ছাড়া তাহার এই অভিজ্ঞতাও হইয়াছে যে, যখন সে স্বর্ণসূত্র ধরিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, তখন একবারও তাহাকে বিপদে পড়িতে হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই ধ্রুব বিশ্বাসও জন্মিয়াছে যে, তাহার পিতা তাহাকে ঠকাইবেন না,—যাহা কর্ত্তব্য তাহাছাড়া আর কিছু করিতে বলিবেন না। ঐ দূর সেই মহিলার স্নেহ-স্নিগ্ধ মুখখানিও এ সময়ে তাহার মনে পড়িল; যাঁহার মুখমণ্ডলে ঐশ্বরিক প্রেমের অমন বিমল-বিভা, তিনি কি বালক পরেশের সহিত মিথ্যা-চরণ করিতে পারেন? পরেশের তাহা মনে হইল না; তিনি বড় ভাললোক, তিনি পরেশকে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করিতে, প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তিনি কিছুতেই মন্দলোক হইতে পারেন না। আবার এ সময়ে পরেশের ধাত্রী-মাতার শিখান একটি ছড়াও সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"অমার আঁধারে, বৎস, সত্তার আলোক তুমি
দেখিতে কি পাও?
ডরিও না কিছু তবে, সত্যই সহায় তব,
আগুসারি যাও।

সত্যেরই শরণ তুমি লও, বৎস, লও,
সত্যেরই সেবক তুমি হও, বৎস, হও;
ধরি' সত্য-ধনুর্ব্বাণ, পরি' সত্য-তনুত্রাণ
রণাঙ্গনে ধাও।

অতএব পরেশ ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হইতেই মনস্থ করিল। যাইতে যাইতে একটি জিনিস দেখিয়া তাহার আনন্দ হইল। উহা আর কিছু নয়, একটি সাদা খরগোশ। সে তাহার কাণ খাড়া করিয়া সিংহের খুব কাছেই বসিয়া আছে, ভয় করিতেছে না। কিন্তু উহার এত সাহসের কারণ কি, তাহা সে তখন বুঝিতে পারিল না। সে আগাইয়া চলিল বটে, কিন্তু স্বর্ণসূত্র যত তাহাকে সেই সিংহের গুহার কাছে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তত তাহার ভয়ে দম্ বন্ধ হইয়া যাইবার যো হইতে লাগিল। সিংহটা তাহার গোল গোল, উজ্জ্বল চক্ষু-দুইটা পাকাইয়া পরেশের দিকে তাকাইয়াই যেন ক্রমশঃ তাহাকে তাহার কাছে টানিয়া লইতেছে! উহা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, একপাও নড়িল না, এদিকে ভূগুদেশের যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, সেই স্থানটি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই, পরেশকে এই উভয় ভীষণতার মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে যতক্ষণ না সিংহটার নিশ্বাস তাহার গায়ে লাগিতেছে, অনুভব করিল, ততক্ষণ অগ্রসর হইতেই থাকিল; তাহার পর সিংহটা তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার সেই প্রকাণ্ড থাবাদিয়া তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল। পরেশ ভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিল, জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিল; কিন্তু সিংহটা হঠাৎ পিছাইয়া গেল, কারণ সে একটা খুব মোটা শিকলে বাঁধা ছিল; পরেশ তাই নিরাপদে সেই স্থান-অতিক্রম করিয়া গেল!

তখন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে মহানন্দে পাহাড়হইতে দ্রুতবেগে নামিয়া পড়িতে লাগিল, সিংহটা তখনও সেই গুহামুখে দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছিল। পরেশ আর সে গর্জ্জনে কাণ দিল না, সবেগে সমতলক্ষেত্রে নামিয়া পড়িল; তখন তাবৎ কোলাহলই নিবৃত্ত হইল। পরেশ চলিতে চলিতে ক্রমে এক রমণীয় মরকত-শ্যাম বন-মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার মহত্তম পরীক্ষাটি সে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে এখন তাহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব বল ও শান্তি অনুভব করিতে লাগিল। যাহা হউক, একটা গগন-চুম্বী দেবদারু-তরুতলে পঁহুছিলে, স্বর্ণসূত্র আপনা আপনি সেই পাদপতলে শুইয়া পড়িল; তাহাতে পরেশ বুঝিতে পারিল, এ তাহাকে বিশ্রাম-গ্রহণার্থে ইঙ্গিত; সে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই তরুতলস্থ সুকোমল ও সুশ্যামল শষ্পোপরি বসিয়া পড়িল। বসিয়া সে মহিলা-প্রদত্ত খাদ্যহইতে কিয়দংশ আহার করিল এবং নিকটবর্ত্তী একটী নির্ম্মল জলোৎসারী উৎস-সন্নিধানে গিয়া জলপান করিয়া আসিল। তাহার পর, তাহার চারিদিকে প্রচুর গোলাপ-জাম ফলিয়া আছে দেখিয়া মনের সাধ মিটাইয়া ঐ ফল পাড়িয়া পাড়িয়া খাইতে লাগিল। ফল খাওয়া হইয়া গেলে, সে সেই সুকোমল শষ্পশয্যায় চিৎ হইয়া শুইয়া বৃক্ষপত্রের মধ্যহইতে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। সে তখন দেখিতে লাগিল, তরু-পত্রের মরকতশ্যাম অঙ্গে রবিরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সেই পত্রগুলিকে রজতাভ করিয়া তুলিতেছে, এবং সেই পত্র-পল্লবের বহু উর্দ্ধে নীলাম্বর-বক্ষে শুভ্র অভ্র-রাজি, নীলাভ বারিধিবক্ষে তুষারময় দ্বীপ যেমন শোভা পায়, তেমনই শোভা পাইতেছে। স্থূলপুচ্ছ ও হৃষ্টপুষ্ট কাঠ-বিড়ালীগুলি থর্থর্ করিয়া গাছের উপর উঠিয়া ডালে ডালে লাফাইয়া বেড়াইতেছে, পাতার আড়ালে গিয়া লুকাচুরী খেলিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে পরেশের মন এক অহেতুক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সে দিবাভাগেই সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিল। সে সেইখানে অর্দ্ধসুপ্তাবস্থায় শুইয়া থাকিয়া এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—একটী কাঠ-বিড়ালীর সহিত এক নগ-নির্ঝরিণীর কথোপকথন হইতেছে। সে কথোপকথন কবিতার ভাষায় হইতেছে, কিন্তু তাহার ছন্দঃ নাই, বা বড় শিথিল। এই কল্পনা কি তাহারই কর্ত্তব্য-পালন-জনিত প্রীতিপূর্ণ মনেরই নহে? যাহা হউক, সে যেন শুনিল, কাঠ-বিড়ালী নির্ঝরিণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"খিল্ খিল্ খিল্ হা'স্'ছ কেন,
ওগো তটিনি,—
গিরিরাজের প্রিয় নন্দিনী ?
বন ফুঁড়ে আ'স্‌তে আ'স্‌তে
কি দেখেছ পথে,
যা'তে চা'প্‌তে হাসি
নার কোনমতে ?"

তাহাতে সেই নির্ঝরিণী যেন এই উত্তর দিল—

"ও সে বড় মজা, বড় মজা !
দেখ্‌লুম কিনা বনে,—
কুন্দ-ছুঁড়ি ফিক্ ফিক্ ফিক্ হা'স্‌ছে আপন মনে !
এলা-লতা এলিয়ে দিয়ে চুল,
বাতাসেতে দু'ল্‌ছে দুলদুল্ ।
সারা-বনটা করে ফেলেছে নন্দন,
মন-মাতানো গন্ধ ছেড়ে চন্দন !
যেতে যেতে কিরণ, দিয়ে চুমো,
বল্‌লে,—'ব'ন, আর ছুটিস্ নে, ঘুমো' !
হাওয়া এসে শিউরে দিলে গা,
নুড়িগুলো জড়িয়ে ধরে পা !
এখন আমি যে রগড়ে আছি,
না হেসে কি কোনমতে বাঁচি ?"

পরেশ চোক খুলিয়া দেখে একটী ছোট কাঠ-বিড়ালী তাহারই কাছে একটী গাছের ডালে বসিয়া লেজ পিঠের উপর গুটাইয়া রাখিয়া তাহার প্রতি তাকাইয়া আছে ; তাহাকে চোক মেলিতে দেখিয়া সে লেজ নামাইয়া সুন্দর করিয়া নাচাইতে নাচাইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া পরেশ আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"আমি এখন কাজ করি গে, তা'র পর আমিও তোমার মত খেলা ক'রে বেড়া'ব।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কারণ স্বর্ণসূত্র তখন আবার তাহাকে টানিতেছিল। পরেশ বিশ্রাম করিয়া বেশ সুস্থ হইয়াছিল, এক্ষণে প্রফুল্লচিত্তে আবার স্বর্ণসূত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া সে দেখিল, বনের একটা ফাঁকা জায়গাদিয়া একটী ত্বরিৎগামিনী বন-তটিনী বহিয়া যাইতেছে। নদীটির কাছে গিয়া সে দেখিল, কেহ যেন সেই নদীতে হাবুডুবু খাইতেছে। তাহার পর, সে যেন কাহার আর্ত্তস্বরও শুনিতে পাইল, যেন কে সেই নদীতে ডুবিয়া যাইতেছে। সে সূত্র ছাড়িয়া দিয়া সেই বিপন্নকে সাহায্য করিতে যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহাকে তাহা করিতে হইল না, স্বর্ণসূত্র আপনিই সেই বিপন্নের দিকে যাইতে লাগিল। তখন পরেশ, যত তাড়াতাড়ি পারিল, সেই নদীর দিকে ছুটিয়া চলিল। নদীতীরে পহুঁছিয়া দেখে, একটী ছেলের মাথা জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া যাইতেছে ; অভাগ্য বালক ভাসমান থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। ঐরূপ করিতে করিতে সে সহসা অন্তর্হিত হইল। পরেশ স্বর্ণসূত্রগাছি আঁটিয়া ধরিয়া নদীগর্ভে ঝাঁপ দিল। প্রথমে ডুবিয়া গেল, পরে ভাসিয়া উঠিয়া অল্পহাতদিয়া সাঁতারিয়া, যেখানে বালকটীকে ডুবিতে দেখিয়াছিল, সেইখানে গিয়া পুনরায় ডুব দিল এবং মগ্ন-বালকটীকে পাইয়া অতিকষ্টে তাহাকে লইয়া ভাসিয়া উঠিল ; কিন্তু স্বর্ণসূত্র যদি তাহাদের দুইজনকেই ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে পরেশ, বোধ হয়, বালকটীকে জল-হইতে টানিয়া তুলিতে পারিত না।

জটাপাকান দীর্ঘ ও সিক্তকেশের মধ্যহইতে চোক খুলিয়া দেখিয়া বালকটী হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিয়া উঠিল,—"কুমারজী !"

পরেশও বলিয়া উঠিল,—"এ কি ! তুমি চিতু ?" বালকটী চিতুই বটে। সে এখন আর্দ্রবসনে নদীতীরে পড়িয়া হাঁফাইতেছে, অঙ্গসঞ্চালনে একান্ত অক্ষম।

পরেশ আনন্দোজ্জ্বল আননে বলিয়া উঠিল,—"চিতু, তুমি এখেনে কি ক'রে এলে ? তোমাকে বাঁচা'তে পেরেছি ব'লে আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে।"

কিছুক্ষণ পরে চিতু যখন কথা কহিতে পারিল, তখন সে, তাহার নিজের ধরণে একটু একটু করিয়া পরেশকে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্মটুকু এই — বাঘার সন্দেহ হয় যে, চিতুরই সাহায্যে পরেশ পলাইয়াছে, বুড়ীও তাহাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিয়াছিল। তাই বাঘা চিতুর কাছে কোমর-বন্ধ চায়, কিন্তু চিতু তাহাকে তাহা দিতে না পারিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। সে প্রাণ লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়িয়াছে। ইত্যাদি। পরে সে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"চলুন, কুমারজী, আর এখেনে নয়, আমার এখন গায়ে বেশ জোর পহুঁছেচে, চলুন আবার দৌড় দি। বাঘা নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নিয়েছে।"

তাহারা আবার দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। পরেশ চিতুকে সেই অদ্ভুত স্বর্ণসূত্রের কথা বলিয়া তাহাকেও তাহা ধরিতে দিল ; এবং বলিল,—"যা'ই হো'ক না কেন, তুমি এই সুতোগাছা কিছুতেই ছেড়ো না।" পরে তাহার ক্ষুন্নিবারণার্থে তাহার খাদ্য-হইতে তাহাকে কিছু খাইতে দিল। চিতু তাহা আহার করিয়া তাহার ভিজাচুল নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে পথ চলিতে চলিতে স্ফূর্ত্তিতে সেই "শুনচ তো, বড়মিঞা ?"-গান জুড়িয়া দিল। পরে গান থামাইয়া বলিল,—"পালিয়ে এসে আমি বেঁচেছি। বাঘা আমাকে পেলে শূয়োর-গোঁচা ক'র্‌ত। বুকের ভেতরথেকে সেই কথা আমাকে আপনার পেছনে পেছনে ছুটে যেতে ব'লেছেল।"

এইরকম করিয়া দুইজনেই দুইজনকে পাইয়া আনন্দে নানা সুখদুঃখের কথা বলাবলি করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে এক স্থানে চিতু হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। উদ্বেগ-ব্যঞ্জক বদনে পরেশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন ?"

"না। কিসের আওয়াজ ?"

"চুপ্! অঃ—ঐ আবার শোনা গেল !"

পরেশ বলিল,—"দূরে যেন আমি কুকুরের ডাক শুনতে পেলুম।"

এই বলিয়া দুইজনেই উৎকর্ণ হইয়া শব্দটা স্পষ্ট করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল। তখন তাহারা শুনিতে পাইল, দূরে খুব গম্ভীরস্বরে "বউ-ওউ-ওউ-ওউ-উ-উ-উ" এইরূপ একটা আওয়াজ বনমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। চিতু তাহা শুনিয়া ভয়ে বলিয়া উঠিল,—"চলুন, আমরা, যত শীগ্‌গির পারি, ছুটে পালাই ; ঐ শুনুন, ঐ শুনুন কিরকম ডা'কছে !" নিকটেই পুনরায় "বউ-ওউ-ওউ-ওউ-উ-উ-উ-উ" এই সারমেয়-কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"চিতু, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ? কুকুরটা কি ক'র্‌বে ?"

"ওটা বাবার সেই ডালকুত্তাটা—কেলো। আমাদের পেছনে ধাওয়া ক'রেছে। ও আমাকে হয় ত কিছু ব'ল্‌বে না, কিন্তু আপনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফে'ল্‌বে।"

তাহা শুনিয়া পরেশ যত দ্রুত পারিল, ছুটিয়া চলিল, কিন্তু সূত্রগাছি হাত-ছাড়া করিল না। স্বর্ণসূত্র এ সময়ে তাহাকে এক খাড়া পাহাড়ের উপর টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, পরেশ ও চিতু সেই পাহাড়ের উপরে হাইফাঁই করিয়া হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে বাধ্য হইল।

চিতু বলিল,—"কুমারজী, ছুটুন, ছুটুন ; শীগ্‌গির শীগ্‌গির পা ফেলুন ; একটা গাছের ওপর—সুকোন—নয় যেখানে পারেন।"

পরেশ বলিল,—"না ; তা' আমি পারি নে। যা'ই হোক না কেন, আমাকে সুতোগাছি ধ'রে থা'ক্‌তেই হ'বে।"

সারমেয়-গর্জ্জন ক্রমেই নিকটতর হইতে লাগিল। পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া তাহারা দেখে, কুকুরটা বনের মধ্যহইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বালকদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া সে এক-লাফে নদী পার হইয়া কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যেই ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে পাহাড়ের সন্নিকটে আসিয়া পড়িল। তাহার জিহ্বা লোল হইয়া মুখহইতে নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, সে প্রতি পদচিহ্নের আঘ্রাণ করিতে করিতে আসিতেছে।

চিতু বলিল,—"যাই, আমি এগিয়ে গিয়ে, যদি পারি, ওটাকে আট্‌কাই, নইলে আপনার আর রক্ষে নেই।"

এই বলিয়া সে "কেলো", "কেলো" হাঁকিতে, হাঁকিতে পাহাড়ের নীচে নামিয়া গেল। কেলোর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেলো চিতুকে চিনিতে পারিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পরেশের কাছে আসিয়া পড়িল। তাহাকে একান্ত সন্নিকট হইতে দেখিয়া পরেশ প্রশান্তভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ডালকুত্তা তাহার গা শুঁকিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। তাহার পর সে, যে পথে আসিয়াছিল, সেইপথে আবার ফিরিয়া গেল, যেন সে ভুল করিয়া এতটা পথ বৃথাই ছুটিয়া আসিয়াছে ! কিন্তু এরকম কেন হইল ? কুকুর বড় কৃতজ্ঞ জীব, কেলো পরেশের প্রদত্ত আহার্য্যের কথা বিস্মৃত হয় নাই, তাই সে পরেশকে পাইয়াও ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পরেশকে অক্ষতশরীর দেখিয়া চিতু বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। পরে পরেশ তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে, তাহার বিস্ময় বিদূরিত হইল। তাহার পর চিতুর হৃদয়-বাণী যেন বলিল,—"মানুষ হোক, জানোয়ার হোক, কারুর ওপর দয়া করা—তা'কে ভালবাসার চেয়ে ভাল কাজ আর জগতে কিছু নেই।" অতঃপর দুইজনেই আশা ও প্রীতিপূর্ণ-চিত্তে পথ চলিতে লাগিল, কারণ তাহারা এখন ডাকাতিয়া দেশের সীমা-অতিক্রম করিয়া চলিল ; পরেশ তাহার স্বদেশ ও গৃহ সন্নিকট বুঝিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। সূত্রগাছি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া উঠিল, উহা প্রতিমুহূর্ত্তেই পরেশকে অধিকতর সাহায্য করিতে লাগিল। চিতুও তাহার সেই বেঁটে খেঁটেটার উপর ভর দিয়া তড়্‌বড়্‌ করিয়া চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে শ্রমবশতঃ গরুর মত নাক-ঘড়্‌ঘড়্‌ করিতে লাগিল। তাহারা দুইজনে, সুবিধা পাইলে, কথাবার্ত্তাও কহিতে লাগিল। চিতু জিজ্ঞাসা করিল,—"আপ্‌নি কি পথে একটা সিংহি দে'খ্‌তে পেয়েছিলেন ?"

পরেশ। হ্যাঁ। ওঃ! সেটা বড় ভয়ানক ; তবে শিকলে বাঁধা ছিল।

চিতু। আপ্‌নার অদেষ্ট ভাল ! বাবা ঐ সিংহিটাকে নিয়ে শিকার ক'র্‌তে বেরোয়, রাহীদের মেরে ফেলে। সিংহিটা বাবার ছাড়া আর কারুরই বাগ্ মানে না। আমি আ'স্‌বার সময় তা'র গর্জ্জান শু'ন্‌তে পেয়েছি। এখন তা'র নিশ্চয়ই ভারি ক্ষিদে পেয়েছে। একবার সে আমার একটা গাই খেয়ে ফেলেছিল। গাইটাকে পেরথমে না পেলে, সে আমাকেই খেয়ে ফে'ল্‌ত। আমি একটা গাছের ওপর উঠে প্রাণ বাঁচাই।

(ক্রমশঃ।)

বিখ্যাত বিখ্যাত জীবন-তরি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইংলণ্ডের উপকূলে "র‍্যামস্‌গেট"-নামে একটি স্থান আছে। সেখানকার জীবন-তরির মাল্লাদের বাহাদুরীর বিষয়ে অনেক কথা আছে। এখানে "ব্রাড্‌ফর্ড"-নামে অতি বিখ্যাত একখানি ডিঙ্গি ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান চিক"-নামে একখানি জাহাজ ঝড়ে পড়িয়া "গুডুইন"-নামক সর্ব্বনেশে বালির চড়ায় আসিয়া ঠেকিল। পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউ লাগিয়া জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া লোকেরা জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া গ্রামের লোকদিগকে সংবাদ দিল। গ্রামের বিস্তর লোক আসিয়া উপস্থিত। সকলেই "ব্রাড্‌ফর্ড"-ডিঙ্গি চড়িয়া বিপন্ন জাহাজের নাবিকদিগের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যাইতে প্রস্তুত। এই ডিঙ্গির প্রধান মাঝির নাম চার্লি ফিশ্‌; সে একশত-সাতাত্তরবার ডিঙ্গি লইয়া, ঝড়-তুফান মাথায় করিয়া ডুবো-জাহাজের লোকদের প্রাণ বাঁচাইতে সমুদ্রে গিয়াছে। আজ সমস্ত মাল্লা লইয়া চার্লি ফিশ্‌ "ব্রাড্‌ফর্ড"-ডিঙ্গি চড়িয়া, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন"-প্রতিজ্ঞা করিয়া সমুদ্রে ভাসিল। ২৬-ঘণ্টাকাল ঝড় সম্মুখে করিয়া, ঢেউএর উপরদিয়া নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে ডিঙ্গিখানি চলিল, চার্লির হাতে হাইল।

গ্রামের লোক কাতারে কাতারে কূলে দাঁড়াইয়া! হায়, কি হইল, কি হইবে, বলিয়া চেঁচাইতে আর ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল। সকাল-বেলা দেখা গেল, ডিঙ্গিখানি নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে তীরের দিকে আসিতেছে। খালি? না। ডুবো-জাহাজের বিস্তর লোক ডিঙ্গিতে। ঝড় খাইয়া, জলে ভিজিয়া, প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া মাল্লাদের চেহারা এমন হইয়াছে যে, তাহাদের আপনার লোকেরাই তাহাদিগকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই।

একেই বলে, বাহাদুরী! এই বাহাদুরীর জন্য মাল্লারা সকলে রূপার আর চার্লি সোনার মেডেল পুরস্কার পাইয়াছিল।

নর্দ্দাম্বর্ল্যাণ্ডের একখানি জীবন-তরির নাম,—"গ্রেস্‌ ডার্লিং"। বহুকাল পূর্ব্বে, ঝড়-তুফানে পড়িয়া একখান জাহাজ মারা যায়। এই সময়ে গ্রেস্‌ ডার্লিংনামে এক যুবতী মাতা-পিতার সহিত লংষ্টোন-নামক স্থানের "বাতি-ঘরে" (Light-house) বাস করিতেন। তাঁহার পিতা বাতি-ঘরের রক্ষক ছিলেন। এই যুবতী আপনাদের ডিঙ্গি-নৌকা লইয়া পিতার সঙ্গে নিজ হাতে দাঁড় টানিয়া গিয়া ঐ জাহাজের লোকদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন। এই কীর্ত্তির স্মরণার্থে একখানি জীবন-তরির নাম "গ্রেস্‌ ডার্লিং" রাখা হইয়াছে। ঐ যুবতী কোন্‌ যুগে পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা আজিও গৌরবের সহিত তাঁহার নাম করে। একবার নর্দ্দাম্বর্ল্যাণ্ডের পাদ্রিপর্য্যন্ত বিপদ্‌ মাথায় করিয়া, জীবন-তরি লইয়া গিয়া এক ডুবো-জাহাজের লোকদের প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। আর একবার কোন জীবন-তরির একজন মাল্লা কার্য্য-উপলক্ষে কোথায় গিয়াছিল। রাত্রে বাড়ী আসিতে পারে নাই। সেই রাত্রিতেই বিষম ঝড় উঠিল। একখানি জাহাজ মারা গেল। জাহাজের বিপন্ন লোকদের প্রাণ-রক্ষার জন্য ডিঙ্গি লইয়া না গেলেই নয়, কিন্তু একজন মাল্লা কম। কি হইবে? সেই মাল্লার যুবতী স্ত্রী আসিয়া দাঁড় ধরিল, এবং পুরুষদের সঙ্গে সমানে দাঁড় টানিয়া গেল। দেখ, কি চমৎকার সাহস! এই যুবতী দ্বিতীয় গ্রেস্‌ ডার্লিং। ছুটির সময়ে যত লোক সমুদ্রের এই কূলে বেড়াইতে যায়, সকলেই "গ্রেস্‌ ডার্লিং"-ডিঙ্গি দেখিয়া আনন্দিত হয়।

ইংলণ্ডের ইয়র্কশিয়ার-উপকূলেও শীতকালে ভারী ঝড়-তুফান হয়। এই কূলে ঝড়ে পড়িয়া অনেক জাহাজ মারা যায়, এইজন্য দুইখানি খুব চমৎকার জীবন-তরি এইখানে আছে। একবার ভারী ঝড় উঠিল। ছয়খানি জাহাজ বালি-চড়ায় বা শৈলে ঠেকিয়া মারা যায় যায় হইল। ইহা দেখিয়া এইখানকার লোকেরা একখানি ডিঙ্গি লইয়া ছয়বার ভিন্ন ভিন্ন ডুবো-জাহাজে গিয়া পাঁচশত লোককে বাঁচাইল। শেষবারে যখন যায়, তখন মাল্লারা অতি ক্লান্ত। মাল্লারা সর্ব্বসমেত ১৩ জন। ডিঙ্গি ডুবিয়া যাওয়াতে ১২ জন মারা পড়িল। দেখ, কি চমৎকার ত্যাগ-স্বীকার! পরের প্রাণ-রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া।

আরও বীরত্বের কথা বলি, শুনিলে তোমাদের গায়ে কাঁটা দিবে। একবার স্কারবরা-নামক স্থানহইতে একটু দূরে এক জাহাজ চড়ায় ঠেকিয়া মারা যায় যায় হইল। স্কারবরার জীবন-তরি লইয়া মাল্লারা বিপন্ন জাহাজের দিকে চলিল। সম্মুখে ঝড়, ডিঙ্গি আর কোনমতে জাহাজের কাছে যাইতে পারিতেছে না। এমন সময়ে, ডিঙ্গি কাত হইয়া যাওয়াতে মাল্লারা জলে পড়িয়া গেল। লর্ড চার্লস্‌ বুক্লার্ক এবং উইলিয়ম টিণ্ডল ইহা দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। টিণ্ডল একগাছা কাছি চাহিলেন—কোমরে বাঁধিয়া যাইবেন বলিয়া চাহিলেন বটে, কিন্তু কাছির অপেক্ষায় তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়িলেন। তখন ইহাঁর বয়স ২৪ বৎসর। কেন পড়িলেন? ডিঙ্গির মাল্লাদের বাঁচাইবার জন্য। একটু বিলম্ব করিলে, লোকেরা ডিঙ্গি ও কাছি, উভয়ই আনিয়া দিত, কিন্তু কোন ফল হইত না। সে যে অতি ভয়ঙ্কর, যেন প্রলয়কালের ঝড়।

টিণ্ডল যেই লম্ফদিয়া সমুদ্রে পড়িলেন, লর্ড চার্লস্‌ বুক্লার্ক

বলিলেন, "এই যে, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।" যেই বলা, অমনি ঝাঁপ দেওয়া। সমুদ্রের কোলে, ডিঙ্গির মাল্লাদের সঙ্গে সঙ্গে, ইঁহারা দুইজনও স্থান পাইলেন!

এক্ষণে এই কূলে "লেডি লি"-নামে একখানি সুন্দর জীবন-তরি আছে—এই ডিঙ্গির মাঝি ও মাল্লারাও বিলক্ষণ সাহসী। ইহারাও অনেক ডুবো-জাহাজের বিপন্ন লোকদের প্রাণ বাঁচায়।

গ্রীষ্মকালের ছুটিতে "কেণ্টিশ্" উপকূলে বিস্তর লোক বেড়াইতে

আইজাক হার্ট-নামক একজন প্রাচীন লোকের আর সিরিল রবিন্-নামক একজন যুবক-পাদ্রির বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা ডিঙ্গিতে উঠিলেন; ইচ্ছা—নিজেরাই দাঁড় টানেন। টানিতে হইল না। গ্রামস্থ যুবকেরা আসিয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া গিয়া অনেক লোকের প্রাণ বাঁচাইল। এই যুবক গ্রাম্য-পাদ্রির পিতা উইণ্ডসরের পাদ্রি ছিলেন। পুত্র পিতাকে পরে লিখিয়াছিলেন, "বাবা! যখন ডিঙ্গি লইয়া যাই, তখন আপনার ও মায়ের কথা

যায়। এখানেও খানকতক বিখ্যাত জীবন-তরি আছে। "ডিল"-নামক স্থানের জেলেদের কীর্ত্তি দেশব্যাপিনী। এই সকল উপকূলেও শীতকালের ঝড়ে জাহাজ মারা যায়। "ডিল"-গ্রামের জেলেরা অনেক বিপন্ন লোকের প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এই কূলের একখানি ডিঙ্গির নাম—"মেরি সমারভিল"।

"লিড্"-গ্রামের লোকেরাও বিখ্যাত। একবার রাত্রে ভারী ঝড় উঠিল। একখান জাহাজ চড়ায় আসিয়া পড়িল—ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া যায় যায় হইল। জাহাজের লোকদের দুঃখ দেখিয়া,

বার বার মনে পড়িয়াছিল। আমি ঈশ্বরের কাছে আপনাদের মঙ্গলপ্রার্থনা করিয়াছিলাম।"

যে সকল জীবন-তরির কথা বলিলাম, এসকল-ছাড়া ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের উপকূলে আরও অনেক জীবন-তরি আছে। সেই সকল জীবন-তরির ও সে সকলের মাঝি-মাল্লাদের কীর্ত্তি-বর্ণনা করিতে গেলে, একখানি বড় বই হয়। তাই যুবক পাঠকদের উৎসাহ জন্মাইবার জন্য খান-কতকের বিবরণ লিখিলাম।

আর একটী কথা—ইংলণ্ডের দয়াশীল লোকেরা, পরের দুঃখে

যাহাদের প্রাণ কাঁদে, তাঁহারা চাঁদা করিয়া টাকা তুলেন, এবং সেই টাকা দিয়া এই সকল জীবন-তরির খরচ চালান এবং মাঝি-মাল্লাদিগকে বেতন ও পুরস্কার দেন। ইংলণ্ডের লোকেরা পাকা "স্বদেশী", তাই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া থাকেন না।

আগেই বলিয়াছি, এই সকল জীবন-তরির গঠন অনেকটা জাহাজের মতন। এই সকল ডিঙ্গি যেমন হাল্কা, তেমনি শক্ত। হাল্কা না হইলে, জলের উপর হাঁসের মত ভাসিবে কেমন করিয়া, আবার শক্ত না হইলে, ঢেউ খাইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে কেন? এক-একখানি ডিঙ্গি যেন আমাদের ঝুনা-নারিকেল—যেমন হাল্কা, তেমনি শক্ত।

এই সকল ডিঙ্গির তলায় লম্বা-লম্বী যে কাঠখানি থাকে, সে-খানিকে দাঁড়া বলে—ফলে এখানি নৌকার দেহের মেরুদণ্ড। এই কাঠখানি খুব শক্ত ও ভারী, অথচ মোটা। এই খানির তলায় এক প্রকাণ্ড লোহার দাঁড়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। কারণ ডিঙ্গির তলা ভারী হওয়া আবশ্যক। নহিলে ডিঙ্গিতে বাক্সের ভিতর বাতাস আট্কান থাকে বলিয়া ডিঙ্গি ঢেউয়ে উল্টিয়া উবুড় হইয়া ভাসিতে পারে। এইখানিহইতে প্রথমে মেহগ্নিকাঠের তক্তা—অগ্রহইতে পশ্চাৎদিকপর্য্যন্ত লম্বা-লম্বী নয়, দাঁড়াহইতে "মাথাকাঠ"-পর্য্যন্ত—ঠিক আমাদের পঞ্জরের হাড়ের মত—গাঁথিয়া যায়। তাহার উপর ঘন করিয়া গলা-শিরীষের লেপ দেওয়া হয়। সেই শিরীষের উপর কাম্বিস্ লাগাইয়া, পিটিয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর আবার মেহগ্নি-কাঠের তক্তা গাঁথিয়া দেওয়া হয়। মেহগ্নি-কাঠ খুব কঠিন অথচ হাল্কা। তাই সহজে ভাঙ্গে না, অথচ ঝুনা-নারিকেলের মত জলে ভাসে।

জীবন-তরি কেবল ভাসে কেন? গ্যাস্-পোরা থাকে বলিয়া বেলুন আকাশে উড়ে। বাতাস-পোরা থাকে বলিয়া জীবন-তরি জলে কেবলই ভাসে। এইসকল ডিঙ্গির মাল্লাদের কোমরে কার্কের খুব মোটা কোমরবন্ধ থাকে।

ডিঙ্গির সম্মুখ ও পিছনদিকে তাকের মত বাক্স আছে, সেগুলি ঘন বাতাস ভরা। ইহাছাড়া ডিঙ্গির সর্ব্বত্র বাতাস ধরিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। এই সকল বাতাসের বাক্সে, আবশ্যক হইলে, জল ভরিয়া রাখা যায়। বাতাস ধরিয়া রাখিবার এইপ্রকার বন্দোবস্ত আছে বলিয়া, জীবন-তরি জলের উপর শোলার মত ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাতে সমুদ্রের জল ঢুকিবার পথ নাই। আমাদের জেলে-ডিঙ্গির পাটাতনের তক্তা খোলা, তাই ঢেউয়ে জল উঠিয়া, ডিঙ্গি ডুবিয়া যায়। জীবন-তরি তেমন করিয়া ডুবিতে পারে না।

জীবন-তরিতে মাস্তল এবং দাঁড় আছে। সুবিধামত পাইল তুলিয়া বা দাঁড় বাহিয়া মাল্লারা ডিঙ্গি চালাইয়া যায়।

কোন কোন স্থানে ছোট ষ্টিমারও হইয়াছে। তা'-ছাড়া আবার "মটর-জীবন-তরি"ও হইয়াছে। কিন্তু মটর-ডিঙ্গি এখনও খুব ভালরকম হয় নাই। কালে ভাল হইতেও পারে।

ছেলেদের উপযোগী ব্লু-ব্ল্যাক্ কালি।

"বালকের" একজন বালক পাঠক এই কালি করিবার প্রণালীটি লিখিয়া পাঠাইয়াছে। কোন পাঠক, এই কালি কেমন হয়, জানাইলে বাধিত হইব। "বালক"-সম্পাদক।

মাজুফল	/॥০ আধসের।
টহরি	৵০ আধপোয়া।
হরিতকী	/॥০ আধসের।
হীরাকস্	/।০ একপোয়া।
পাকা নীলরঙ্	১ কাঁচ্চা।
গ্যালিক্-এসিড্	অর্দ্ধ আউন্স (½ oz.)।
গঁদ	১ ছটাক।

প্রস্তুত-প্রণালী—

প্রথমে মাজুফল, টহরি ও হরিতকী চূর্ণ করিয়া /৮ সের জলে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে লৌহ-কটাহে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ৵০ আধ পোয়া হীরাকস্ গুঁড়া মিশাইয়া বেশ কাল রঙ হইলে, নামাইয়া ছাঁকিবে। গ্যালিক্ এসিড্, সমস্ত হীরাকস্ বাকী ৵০ আধ পোয়া একত্রে গুঁড়াইয়া উহাতে নিক্ষেপ কর। উহা বেশ মিশ্রিত হইলে ১০ দিন রাখিয়া দিবে। পরে শোষক-কাগজদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট ব্লু-ব্ল্যাক্ কালি হইবে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মদেশে চাউলের ব্যবসায়। *

ব্রহ্মদেশে ধান্যের চাষই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিঞ্চিদধিক ত্রিংশ-লক্ষ বিঘা পরিমিত জমীতে উহার চাষ হয়। ঐ দেশে যত চাউল হয়, তাহার ৩/৪ অংশ ঐ দেশমধ্যেই খরচ হয়, অবশিষ্ট চাউল দেশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। জাহাজে বোঝাই করিবার আগে চাউল-ছাঁটাই হয়, সেইজন্য রেঙ্গুন ও অন্যান্য সমুদ্রবন্দরস্থিত শহরে অনেক চাউল-ছাঁটাইয়ের কল চলিতেছে; বলা বাহুল্য, ধান্যের চাষের উপরই ঐ কলগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। কেবল তাহাই নয়, যখন চাউলের রপ্তানি হইতে থাকে, তখন ঐ দেশের মধ্যে অনেক বহন-ব্যবসায়ও পুরা দমে চলিতে থাকে। তখন রেলের মালগাড়ী-গুলিতে স্থানাভাব ঘটে, তাহাছাড়া কতরকমের ছোট, বড় ও মাঝারি দেশী নৌকা যে চাউল-বোঝাই করিয়া লইয়া ব্রহ্মদেশের নদীগুলিদিয়া আনাগোনা করিতে থাকে, তা' গণিয়া শেষ করা যায় না। ইহা না বলিলেও চলে যে, বঙ্গদেশে প্রতিবর্ষে ব্রহ্মদেশের অপেক্ষা অনেক অধিক ধান্য জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ব্রহ্মদেশের অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া, বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগকে ব্রহ্মদেশের চাউল প্রচুর-পরিমাণে আমদানি করিতে হয়। ব্রহ্মদেশের কতটা স্থানের চাউল বিদেশে রপ্তানি করা যায়, তাহা যদি আমরা হিসাব করিয়া দেখিতে চাই, তাহা হইলে মোটামুটি এই হিসাব দেওয়া যাইতে পারে যে, কিছু বেশী দেড়বিঘা জমীর চাউল এক-একজন ব্রহ্মবাসীর আবশ্যক হয়, ইহার মধ্যে অবশ্য বাদ-বরবাদও ধরা হইয়াছে।

টোয়াণ্টি-খাড়ী।

এখনও ব্রহ্মদেশে কৃষি-যোগ্য অনেক ভূমি পতিত রহিয়াছে, সেই জমীগুলিতেও ধানের চাষ করা হইলে, ব্রহ্মদেশের চাউলের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। ধান্য-উৎপাদনসম্বন্ধে উত্তর ও দক্ষিণ-ব্রহ্মদেশের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দেখা যায়। প্রধান প্রধান ধান্যপ্রসূ জিলাগুলি দক্ষিণ-ব্রহ্মেরই অন্তর্গত। কিন্তু ঐ জিলাগুলিতে কেবল ধান্যেরই আবাদ হয় বলিয়া, ভয় হয়, উহাদের উৎপাদিকা শক্তি

ধান-বোঝাই নৌকার বহর।

* এই প্রবন্ধটী ও এতৎসহ মুদ্রিত চিত্রগুলি The Agricultural Journal of India র সম্পাদকের সানুগ্রহ-অনুমতিক্রমে উক্ত পত্রিকাহইতে সঙ্কলিত ও গৃহিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে। এদিকে উত্তরব্রহ্মে কিন্তু নানাপ্রকার শস্যের চাষ হয়, বঙ্গদেশে যেমন, সেখানেও তেমনি, চাষসম্বন্ধে পর্য্যায়-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সেখানে কিয়ৎপরিমাণে গোপালনও করা হইয়া থাকে। ইহা একটা মহাসুবিধা। কারণ যেখানে একই জমীতে বছর বছর একই শস্যের চাষ হয়, অথচ তেমন গোপালন করা হয় না, সেখানে জমীর উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায়, গোপালনের ফলে জমীতে যে সার পড়ে, তাহাও পড়িতে পায় না। এইজন্য দক্ষিণব্রহ্মদেশে যাহাতে একজমীতে বছর বছর কেবল ধানেরই চাষ না করা হয়, তন্নিমিত্ত চেষ্টা করা উচিত।

জঙ্গলী-ধানের কল এবং রেঙ্গুনের নিকটস্থ পাল-তোলা ধানের নৌকা।

তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়েও মনোযোগ করিলে, ব্রহ্মদেশে চাউল-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে—

(১) ঐ দেশে কিঞ্চিদধিক দেড়বিঘা-জমীতে পঁচিশসেরের ত কম নহে, কখন কখন পঁয়ত্রিশ-সেরপর্য্যন্ত বীজ-বপন করা হয়। মান্দ্রাজের সরকারী কৃষি-বিভাগ দেখাইয়াছেন যে, ঐ দেশে সাড়ে-আটসের বীজ-বপন করিলেও উহার ফসলের পরিমাণ পূর্ব্ববৎই হইবে। ঐরূপ করিলে, ঐদেশে প্রতি-বৎসর ৩২৪০০০০ মণ-পরিমিত চাউলের অপচয় নিবারিত হইবে।

জাহাজে পাঠাইবার জন্য বস্তাবন্দী ধান

(২) চাউল গোলাজাত করিবার সময়েও বিস্তর অপচয় করা

হয়। সিদ্ধ চাউল পচিয়া যায়, তাহাছাড়া কীটে ত নষ্ট করেই।

(৩) আবার ছাঁটিবার সময়ও অনেক চাউল নষ্ট হয়। ছোট, বড় আকারের চাউল একত্র মিশাইয়া ছাঁটা হয়। চাউল ছাঁটিবার সময় ঐরূপে মিশ্রণ না করিলে, অপচয় নিবারিত হইবে। এ বিষয়ে এক্ষণে চেষ্টা চলিয়াছে।

(৪) ব্রহ্মদেশে যে প্রণালীতে চাউল-ছাঁটাই হয়, তাহা ক্ষতিজনক। যদি সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া ছোট ছোট ধানভানাইএর কল-স্থাপন করা আর ছাঁটা-পদ্ধতি-পরিহার করা হয়, তাহা হইলে প্রচুর চাউলের অপচয় নিবারিত হইবে।

এইরূপ তাবৎ বিষয়েই সরকারী কৃষি-বিভাগ প্রজা-পুঞ্জের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ব্যাপৃত আছেন ও ভারতের কৃষিজীবীদিগকে সাহায্য করিতে সমুৎসুক।

মিঞাউ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তাহার পরদিন প্রভাতে সব ছেলেই সেই ভাঙা শার্সি দেখিয়া ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে মুখে গত-রাত্রির সেই দুর্ঘটনাটা পল্লবিত ও প্রচারিত হইতে লাগিল। ঘটনাটি মুখে মুখে শতশ্লেষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহার ফলে বেচারা কানাইএর জীবন দুর্ব্বহ-বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর, সে সবেমাত্র সুঃ-মহাশয়ের সেই সুপরিচিত কক্ষহইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, এমন সময়ে, নীচেকার ঘরের সেই হাড়-জ্বালানে চেংড়া ছোঁড়াগুলা তাহাকে পাক্‌ড়াও করিল, এবং সেই ফচ্‌কে ফটিক বলিল,—"কানাই, তোমার সতীশের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

কানাই। না, কেন?

ফটিক। মুরলীর অসুখ করেছে, সে কাল ম্যাচে খেল্‌তে পা'র্‌বে না, তোমাকে তা'র বদলে খেল্‌তে হবে।

কানাইএর কথাটা বিশ্বাস হইল না, সে বলিল,—"হাঁ, হাঁ, বলে যাও, বলে যাও!"

কিন্তু ফটিক তবুও এত গম্ভীর হইয়া রহিল যে, কানাই, অন্য ছোঁড়াগুলা মুচ্‌কিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিতেছে দেখিয়াও, তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

ফটিক বলিল,—"সত্যি ব'লচি, সতীশ চায় যে তুমি "বোল" ক'র্‌বে।"

কানাই। আমি "বোল" ক'র্‌বো?

ফটিক। হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে তুমি যেরকম চমৎকার ক'রে বেরালটাকে জুতো ছুড়ে মেরে—।

তাহার কথা-শেস হইল না, বদ্‌মাইশ্ ছোঁড়াগুলা বিশ্রী হাসিয়া উঠিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। কানাই রাগে ফুলিয়া তিনটা হইল; কিন্তু কি করিবে, ফটিক তখন পিছ্‌লাইয়া যাইবার মত দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! সুতরাং সে গায়ের রাগ গায়েই মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোরা কি কেউ বেরালটাকে দে'খ্‌তে পেয়েছিলি?"

অনেকগুলি ছোক্‌রা একসঙ্গে সুর টানিয়া বলিয়া উঠিল,—"হাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ! কিন্তু তুমি তা'কে দে'খ্‌তে পেতে না।"

ফটিক বেশ দূরহইতে বলিল,—"প্রথমে যখন বেরালটা মিঞাউ করে, আমরা মনে করেছিলুম, বুঝি তোমাদের একজন কেউ গান গাইচে; কেমন কি না, আমাদের তাই মনে হয় নি কি?"

অন্য ছোক্‌রারা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" ফটিক আরও একটু দূরে গিয়া বলিল,—"আমার মনে হ'য়েছিল, কানাই-ই বুঝি 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পা'বে না'ক তুমি' গাইচে। আমি ভাব্‌লুম, কানাইএর গলাটা ত আগেকার চেয়ে ঢের ভাল হয়েচে।"

সব ছোক্‌রা ভয়ানক হাসিয়া উঠিল। কানাই ফটিককে মারিতে ছুটিল। ফটিকের আত্মরক্ষার এক বড় চমৎকার কায়দা আছে। যখন কোন একটা ছোট ছেলে তাহার হাতের কাছেই থাকে, তখনই সে কাহাকেও কোন একটা বিশ্রী হাড়-জ্বালানে কথা বলে। তাহার পর, শত্রু তাহাকে মারিতে আসিলে, সে সেই ছোট ছোক্‌রাটাকে ধাক্কা মারিয়া তাহার সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া, আপনি সরিয়া দাঁড়ায়। তাহার ফলে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হয় সেই ছোক্‌রাকে মারিয়া অপ্রতিভ হয়, নয় তাহার সহিত ঠোকাঠুকি হইয়া আপনিই আহত হয়। এবারও সে তাহাই করিল। তবে ফটিকের সৌভাগ্যক্রমে তাহার উপর কাহারও রাগটা বড় বেশী ক্ষণ থাকে না; তা'ই যাহার হাড় সে জ্বালাইয়াছে, তাহার সহিত আবার দেখা হইলে, সে আর তাহাকে বড় কিছু বলে না।

কানাইএর "এমন দেশটি"-গানের কথায় রাগ করিবার কারণ এই, আরবছর প্রাইজের সময় ঠিক হয় যে, সে-ই ঐ গানটি গাইবে। গানটি সে কেমন করিয়া গাইয়াছিল, জানি না; কিন্তু এখন তাহার কাছে কেহ ঐ গানের ঘুণাক্ষরে উল্লেখ করিলেই, সে আর, কি জানি কেন, প্রকৃতিস্থ থাকে না।

৩

যাহা হউক, তৃতীয় শ্রেণীর সেই সখের মাল্লারা গত রাত্রির দুর্ঘটনার নিমিত্ত আজ দাঁড়টানা-অভ্যাস করিতে ছাড়ে নাই। পড়া-শুনা করিয়া যতটুকু অবসর পাইয়াছে, ততটুকু সময় দাঁড়-টানা-অভ্যাস করিয়াছে। কাজেই ঘুমাইবার ঘণ্টা পড়িলেই, তাহারা বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

নফর বলিল,—"আজ আমি দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ব। আঃ! গায়ে কি ব্যথা হয়েছে—হাত মুঠো করা যাচ্চে না।"

কানাই বলিল,—"তুই তো তবু কাল রাত্তিরে বেশ ঘুমিয়েছিলি, আজ আমি কাৎ হ'ব কি ঘুমোব। তবে সেই লক্ষীছাড়া বেরালটা আবার তান না ধ'র্‌লে হয়!"

নফর বলিল,—"বেটার গায়ে জল ছিটিয়ে দিবি। জলের চেয়ে আর বেরাল তাড়াবার দাওয়াই নাই, ওর আওয়াজ শুন্‌লেই, বেরালের পো পোঁ পোঁ ক'রে সে তল্লাট ছেড়ে পালাবে।"

কানাই। কুঁজোটা বেজায় ভারি, তা'থেকে জল-ছেটান মহামুস্কিল।

নফর। দূর্, তা' কেন? গেলাসে জল ঢেলে নিবি। আমি হ'লে কুঁজোটা জান্‌লার কাছে নিয়ে গিয়ে, এক-এক-বারে আধা-আধ-গেলাস জল বেটার গায়ে ছিটিয়ে দিতুম, কেউ শুন্‌তে পেত না।

কানাই। হ্যাঁ, এ মন্দ মৎলব নয়।

এই বলিয়া ঘুমাইবার অভিপ্রায়ে সে পাশ ফিরিয়া শুইল। ক্রমে ক্রমে তক্তাপোষের কচ্‌কচানি থামিয়া গেল। অনেকেরই নাসা-বীণাহইতে সুমধুর সঙ্গীত উঠিতে লাগিল। উহারা এত শীঘ্র কি করিয়া ঘুমাইতে পারে, কানাই তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল। এমন সময়ে, তাহারও চিন্তাগুলি ক্রমশঃ গুলাইয়া যাইতে লাগিল। তন্দ্রার আবেশে সে হুলোবিড়ালটার মুখটার সহিত (আ ছি ছি!) সুঃ-মহাশয়ের শ্রীমুখমণ্ডলের সাদৃশ্যানুভব করিতে লাগিল! তাহার পর, আর কি? সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন বাচ-খেলায় তাহারই জিত হইয়াছে এবং—

মিঞাউ!

আঃ, সে লক্ষীছাড়া বিড়ালটা আজও কি কানাই-কে ঘুমাইতে দিবে না?

দন্তে দন্তঘর্ষণ করিয়া এবং, আজ যাহাতে কোন-রকম গোলযোগ না হয়, তজ্জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কানাই জানালার কাছে গেল। শার্ষিটা একটু ফাঁক করিল। তাহার পর, খুব সাবধানে কুঁজাটা জানালার উপরিভাগস্থিত সরু তক্তার উপর রাখিয়া তাহাহইতে আধগেলাস-টাক জল ঢালিয়া লইয়া বিড়ালের প্রতীক্ষায় রহিল। কিছুক্ষণ গেল, সে চারপেয়ে কালোয়াতের আর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না। কানাই গেলাসের জলটা, যতদূর পারিল, ছড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দিল, তবুও বিড়ালটার গতিবিধি-অনুভব করিতে পারিল না।

ছাত্র (না বুঝিয়া-শুঝিয়া --'দূর হ', গাধা, নাড়াস নি।

তখন সে, মার্জ্জার-মহাপ্রভুর ঐক্যতান-বাদ্য আজিকার মত থামিয়াছে এইরূপ আশা করিয়া, আবার শুইতে গেল। কিন্তু তাহা বৃথা আশা। তখনও তাহার তক্তাপোষের কচ্‌কচানি থামে নাই, বেচারা জুৎ করিয়া শুইতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বিড়ালটা অনুনয়-সূচক মিহি-সুরে আবার মিঁউ মিঁউ করিতে লাগিল। কানাই লেপে মুখ ঢাকিয়া রহিল, কিন্তু বিড়ালটা গলাবাজি ক্রমেই চড়াইতে লাগিল। আওয়াজটা ক্রমেই কাণের কাছে আগাইয়া আসিতে লাগিল। আর সহ্য হয় না, কানাই তড়াক্ করিয়া বিছানা-হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া একবারে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তখন সে সভয়ে অনুভব করিল যে, তাহার ধাক্কা লাগিয়া কুঁজা ও গেলাস সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল। নীচে সেই জলাধার-পতনের শব্দসহ একটা নরকণ্ঠের কাতর-চীৎকারও শ্রুত হইল। তাহাতে কানাই ভয়ে কণ্টকিত-কায় হইয়া অনুভব করিতে পারিল যে, নীচেকার ঘরের কোন ছোক্‌রা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়াছিল, কুঁজাটা তাহারই মাথায় পড়িয়াছে।

তাহার গৃহসঙ্গীরা চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা শুনিবার তাহার অবকাশ রহিল না, সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। গিয়া সেই ছোট ছোক্‌রাদের ঘরে ঢুকিল। তখন একটী ছোক্‌রা বাতি জ্বালিবার চেষ্টা করিতেছে, আর চারিটী ছোক্‌রা বিছা-নায় বসিয়া বসিয়া ভয়ানক হাসির রোল তুলিয়াছে, আর ফটিক বাম-হস্তদিয়া বামগণ্ড ধরিয়া কাতরোক্তি করিতে করিতে ঘরময় লাফাইয়া বেড়াইতেছে; তাহার কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

কানাই সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই, অমন কচ্চিস কেন, কি হয়েচে তোর?"

ফটিক হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"কি হয়েছে? বাঁ-চোয়ালটা একেবারে থেৎলে গেছে। ওরে আমার কি হ'ল রে, আর আমি কখন কিছু চিবিয়ে খেতে পা'রবো না রেঁ।"

এই বলিয়া সে কোন কিছু চিবাইবার ভাণ করিতে লাগিল।

কানাই। তুই বুঝি জান্‌লাথেকে গলা বাড়িয়েছিলি?

ফটিক। হ্যাঁ, বেরালটা কোথায় আছে দেখ্‌ছিলুম, আর কোন্ হতভাগা আমার গায়ে একটা জলের কুঁজো ছুড়ে মেরেছে, তা'তে আমার বাঁ-গালটা জান্‌লায় ঠুকে গিয়ে দাঁতের পাটি একেবারে ধ্‌সকে গেছে রে —এঁ-এঁ-এঁ।

ঐ কথা শুনিয়া অন্য সকল ছোট ছোক্‌রা হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। ফটিকের তখনকার রঙ্‌ঢঙ্ দেখিয়া হাসি সাম্‌লান কাহারও পক্ষে বড় সহজ হইত না।

কানাই। ভাই, কিছু মনে করিস্ নি। হঠাৎ কুঁজোটা পড়ে গিয়েছে। তোর বেশি লাগে নি, বোধ হয়?

ফটিক। আমার খাবার দফা রফা করে দিয়েচ, আর ব'লচ, 'লাগে নি বোধ হয়'। বাঁ-দিকের দাঁতের পাটি একেবারে কেৎরে গেছে। ওপরের পাটির দাঁতের সঙ্গে নীচের পাটির দাঁত আর এজন্মে মিল খা'বে না।

একটী বালক বলিল,—"এই চুপ্, দুর্গাদাস-বাবু আস্‌চে!"

তাহা শুনিয়া সেই ঘরের একটী বালক তাড়াতাড়ি বাতিটা নিবাইয়া দিয়া বিছানার দিকে সোজা পথ ধরিল। কানাই তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত করিল, কিন্তু সে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার পূর্ব্বেই দুর্গাদাসবাবু বাতি হাতে করিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার মুখের দিকে চায় কাহার সাধ্য!

তিনি ঘরের মধ্যে পা দিয়াই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মেঘগর্জ্জনবৎ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের এত চেঁচামেচি হচ্ছে? উপরি উপরি দু'রাত আমার কাজ-কর্ম্মের ব্যাঘাত ক'র্‌বার অভিপ্রায়টা কি? কানাই, তুমি এখানে কি কচ্চ? এই ছোঁড়াটাই বা ভিজে কাপড়ে এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চে—অ্যাঁ?"

অভাগ্য কানাই উত্তর করিল,—"একটা ভারি দুর্ঘটনা ঘটেছে, স্যার। আমি জান্‌লাথেকে একটা কুঁজো ফেলে দিয়েছি, স্যার। হঠাৎ—"

দুর্গাদাসবাবু। অ্যাঁ, কি বল্লে? একটা কুঁজো ফেলে দিয়েছ? কি ক'রে ফেল্লে?

কানাই তখন মনে মনে আপনার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। সে তো তো করিতে করিতে বলিল,—"সেই বে—বেরালটা, স্যার—"

দুর্গাদাসবাবু। বাস্, যথেষ্ট হয়েছে। আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই—সব বোঝা গেছে। আর একটিও কথা চাই না। আর টুঁ-শব্দ শুনতে চাই না। সব একেবারে বিছানায়। কাল সকালে আমি দে'খ্‌ব, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যে একজন এখানে আছি, তা' দেখ্‌ছি কোন কোন বোর্ডারের আজকাল আর হুঁসের মধ্যেই নাই। ভাল, কাল দেখা যা'বে, সেই সব মহাপ্রভুদের চৈতন্য ফিরে আসে কি না।" এই বলিয়া তিনি একজন 'মনিটার'কে ছেলেরা ঘুমায় কি না, তাহা দেখিতে বলিয়া রাগে গশ্‌গশ্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

মনিটার আসিয়া কানাইকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছিল রে?"

কানাই। আর কেন, বাবা, জ্বালাতন কর? যা' ব'ল্‌তে হয়, কাল হুজুর-আদালতেই ব'ল্‌বো। এখন আর আথ্‌ড়াই দিয়ে মুখ-ব্যথা করি কেন?

এই বলিয়া সে উপরে উঠিয়া শুইতে গেল।

৪

এডোয়ার্ড-মেমোরিয়াল বোর্ডিংএর কোন কোন বালকের এই ধারণা ছিল যে, সুঃ-মহাশয় মস্ত একটা হৈচৈ করিয়া "হুজুর-আদালতে" অপরাধীদিগকে দণ্ড দিতে বড় ভাল বাসিতেন। ঐ বালকদের ঐ ধারণার মূলে কোন সত্য ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু পরদিন প্রভাতে বোর্ডিংএর হল-কামরায় তিনি যেরকম গুরু-গম্ভীর পদবিক্ষেপে প্রবেশ করিলেন, "রেসিডেণ্ট টিউটরদিগকে" তিনি যেরূপ দুঃখপূর্ণ-স্বরে গত রাত্রের দুর্ব্বৃত্ততার কথা বিবৃত করিয়া "রহস্যভেদের" ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন, এবং তাহার পর, তিনি যেরূপ প্রচণ্ড-স্বরে বিগত রজনীর অপরাধীদিগকে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন, তাহাতে পাঠকেরা যাহা হয় একটা সাব্যস্ত করিয়া লইবেন!

কানাই কিন্তু অদ্য প্রভাতে কল্য রাত্রির মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নহে। সময় পাইয়া কৈফিয়ৎস্বরূপে কি বলিতে হইবে, তাহা সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। অতএব অদ্য প্রভাতে যখন কল্য রাত্রির আচরণের জন্য তাহার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল, তখন সে বেশ সপ্রতিভভাবে সুস্পষ্টবচনে খুব একটী সুযুক্তিপূর্ণ কৈফিয়ৎ দিল।

তাহার প্রকৃতির সেইপ্রকার স্থৈর্য্য দেখিয়া সুঃ-মহাশয় একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তখন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"সীতানাথ, দাঁড়াও।"

সীতানাথকে দাঁড়াইতে বলাতে সকল শিক্ষক ও ছাত্রই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেননা সীতানাথের মত নিরীহ বালক ঐ বোর্ডিংএ আর একটীও ছিল না। সে ফটিকের সঙ্গে একঘরে থাকিত বটে, কিন্তু ফটিকের স্বভাব তাহার স্বভাবের ঠিক বিপরীত ছিল। তাহাকে কেহ সীতানাথ বলিয়া ডাকিত না, দুইটি কারণে তাহার নাম হইয়াছিল, "খরগোশ"! প্রথম কারণ, সে খরগোশেরই মত নিরীহ ছিল। দ্বিতীয় কারণ, বেচারার মাথার চুলগুলি খোঁচা খোঁচা, তাহার কান-দুইটি একটু লম্বা লম্বা এবং সম্মুখের দুইটি দাঁত একটু বড় ছিল বলিয়া বোর্ডিংএর বালকেরা তাহার আকৃতির সহিত শশকের আকৃতির কি একটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিল। ফলে অনেক ছেলেই তাহার নাম যে সীতানাথ, তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন সে বেচারা শশকেরই মত সভয়ে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুপারিণ্‌টেণ্ডেণ্ট বলিলেন,—"সীতানাথ, আমি জানি, তুমি সত্যি কথা ব'ল্‌বে। কাল রাত্রে তোমাদের ঘরে কি হ'য়েছিল?"

সীতানাথ ওরফে খরগোশ এইপ্রকারে সত্য বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কি করে? আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—"পেরথমে মিঞাউ হ'ল, স্যার, তা'র পরে, স্যার, ফটিক স্যার, যেই জান্‌লাথেকে গলা বাড়িয়ে দে'খ্‌তে গেল, স্যার, অমনি, স্যার, তা'র মাথার ওপরে একটা কুঁজো পড়ে গেল, স্যার, আর তা'র চোয়ালটা জান্‌লায় 'ঘিঁষ্‌টে' গেল, স্যার।"

সীতানাথের ভাব-ব্যক্তির কোন ত্রুটিতেই হউক, অথবা ফটিকের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াই হউক, ছেলেদের মধ্যে একটু চাপারকমের

হাসির তুফান উঠিল। তাহা শুনিয়া সুঃ-মহাশয়ের রোষকষায়িত লোচনদ্বয় তাহাদের স্বকার্য্যসাধন করিল। ফলে আবার সব চুপ্!

সুঃ-মহাশয় সীতানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ফটিক জান্‌লার কাছে কেন গিয়েছিল?"

সীতানাথের মুখ শুকাইয়া গেল, সে একবার নিরুপায়ভাবে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল,—"মিঞাউএর জন্যে, স্যার!"

"সে আবার কি? সে কি বেরালটাকে দেখ্‌তে গিয়েছিল?"

"না, স্যার।"

"তবে? তবে কি ক'র্‌তে গিয়েছিল?" এই বলিয়া তিনি আবার ছেলেদের দিকে চোক পাকাইয়া দেখিলেন, কেননা তাহাদের মধ্যে আবার একটু হাস্যধ্বনি শুনা গিয়াছিল।

সীতানাথ, একবার সভয়ে ফটিকের দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি করিয়া বলিয়া ফেলিল,—"ও-ই বেরাল, স্যার! ও বেরালের চেয়েও ভাল ক'রে মিঞাউ ক'র্‌তে পারে, স্যার।"

সব ছেলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুঃ-মহাশয় আর কিছুতেই গাম্ভীর্য্য-রক্ষা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি পুনরায় চোক পাকাইয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন। ফটিক সেই অবসরে বেচারা সীতানাথকে ঘুষি দেখাইল। তাহাতে সীতানাথ সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"আমি কি ক'র্‌ব, ভাই?"

সুঃ-মহাশয় বলিলেন,—"ফটিক, আমার প'ড়্‌বার ঘরে এস।"

পড়িবার ঘরহইতে ফিরিয়া ফটিক সীতানাথকে বলিল,—"ধর্ম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! আচ্ছা, আমার চোয়ালটা ভাল হো'ক, তা'র পর, তোর ধর্ম্ম-ফলানো আমি বা'র ক'র্‌ব।" এমন সময়ে, কানাই কোথাহইতে আসিয়া ফটিককেই বলিয়া উঠিল,—"বেশ হ'য়েছে, চোয়ালটা তেউড়ে গেছে। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল! ফের যদি আমি বেরালের আওয়াজ শুনি, তা' হ'লে তোর একদিন, কি আমারই একদিন—টুঁটি টিপে ধ'র্‌ব!"

এতো বড় জুলুমের কথা! নকলটা না হয় আওয়াজ নাই করিল, কিন্তু আসলটা তো মাঝে মাঝে তান ধরিতে পারে!

সম্পূর্ণ।

শকটারোহণে সোপানাবতরণ

ডানিউব-নদের পশ্চিমতটোপরি হাঙ্গারী-রাজ্যের রাজার প্রাসাদটি অবস্থিত। ঐ নদের একতীরে প্রাচীন-নগরী বুদা, অন্য-তীরে পেস্ত্‌। এই দুই নগরী ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এক হইয়া গিয়া যুগলিত নগরীটির নাম হইয়াছে—বুদাপেস্ত্‌, উহা এক্ষণে হাঙ্গারী-রাজ্যের রাজধানী।

রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি এক সুরম্য হর্ম্ম্যে উনবিংশ-শতাব্দির প্রারম্ভে কাউণ্ট স্যাণ্ডর বলিয়া এক ওমরাহ বাস করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্ব ছিল, বস্তুতঃ তাঁহার অশ্বগুলিই সেই দেশমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। উৎকৃষ্ট অশ্বসাদী বলিয়া হাঙ্গারীয়েরা চিরপ্রসিদ্ধ, কাউণ্ট স্যাণ্ডর তাঁহার সেই উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমগুলির চালনায় তাঁহার স্বদেশবাসিগণকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন।

উৎকেন্দ্রিক ও অসমসাহসিক কাউণ্ট স্যাণ্ডর তাঁহার অশ্বগুলিকে লইয়া অতি বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক কসরৎ দেখাইতেন। কখন পাহাড়ের উপর উঠিয়া সেখানহইতে অশ্বারোহণে অবতরণ করিতেন, কখন বা খাড়া পাহাড়ের উপর অশ্বারোহণে উঠিয়া যাইতেন। যখন ড্যানিউব-নদের বরফ গলিতে আরম্ভ করিত, তখন তিনি, এক বরফের চাপহইতে অন্য বরফের চাপের উপর ঘোড়া লইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নদীপার হইয়া যাইতেন। বেড়া-ডিঙ্গান, দেওয়াল-টপ্‌কান, নদীপার হওয়া, খানা-খন্দ লাফাইয়া পার হইয়া যাওয়া এই নিঃশঙ্ক অশ্বসাদীর পক্ষে অতি তুচ্ছ ব্যাপার ছিল। গতিশীল শকটগুলি তিনি একলাফে ঘোড়ায় চড়িয়া টপ্‌কাইয়া যাইতে পারিতেন।

ফলে, কাউণ্ট স্যাণ্ডরের অতিথি-অভ্যাগতদিগেরও নির্ভীক হওয়ার প্রয়োজন হইত। কারণ কাউণ্ট কখন্ কোন্ বিচিত্র-প্রণালীতে অশ্ব বা শকটারোহণে যাইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিবেন, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। কাউণ্টের শিক্ষাগুণে তাঁহার অশ্বগুলিও নানা খেয়ালের পরিচয় দিত। তাহারা মাঝে মাঝে আরোহীদিগকে ডিগ্‌বাজী খাওয়াইয়া ছাড়িত। অনভিজ্ঞ চড়ন্দারের পক্ষে সেইরূপ খেয়াল যে বড়ই বিপজ্জনক ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিত, তাহা না বলিলেও, চলে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্ট তাঁহার বিবিধ দুঃসাহসিক ও মারাত্মক খেয়ালের মধ্যে একটী খেয়াল এইরূপে চরিতার্থ করেন। জন্ প্রেষ্টেল্ বলিয়া একজন জর্ম্মাণ চিত্রকর ও তাঁহার একজন সহিসকে সঙ্গে লইয়া তিনি এক খোলা চার-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া প্রাসাদহইতে বাহির হইলেন। যে রাস্তা দিয়া তাঁহার গাড়ী চলিল, সে রাস্তাটী আঁকাবাঁকাভাবে পর্ব্বতবেষ্টিত নগররক্ষণ দুর্গহইতে এক সোপান-শ্রেণী দিয়া নামিয়া

গিয়াছে ; ঐ সোপান থাকাতে, নগরীর নিম্নতলবর্ত্তী অধিবাসিগণ বিস্তর ঘুরিয়া নগরের মধ্যস্থলে যাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। কাউণ্ট গাড়ী লইয়া সিঁড়ির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে, সহসা সম্মুখের ঘোড়া-জোড়ার মুখ ফিরাইয়া সটান সেই সিঁড়ি দিয়াই নামিয়া চলিলেন! চিত্রকর ও সহিস অতিমাত্র আতঙ্কিত হইয়া গাড়ী আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। তাহাদের ভয় হইতে লাগিল, বারবার ধপ্ ধপ্ করিয়া সিঁড়ির ধাপগুলি দিয়া নামিতে নামিতে গাড়ীর চাকাগুলি শেষপর্য্যন্ত টিঁকিবে কি না। তাহাছাড়া তাহারা চালকের এই ডাংপিটামি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিল। কাউণ্ট কিন্তু প্রশান্তভাবে ও নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুকৌশলে তাঁহার অশ্বগুলিকে চালনা করিতে লাগিলেন; বলবান্ ও যথাস্থানে পদার্পণপটু অশ্ব-চতুষ্টয় সিঁড়ি দিয়া ঠিক নামিয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে নিরাপদে নিম্নতলে অবতরণ করিল, আর সেই চমৎকার ভাবে শিক্ষিত বাজি-চতুষ্টয় যখন আনন্দে তড়্বড়্ করিতে লাগিল, তখন যেন অপর আরোহিদ্বয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল! চিত্রকর জন প্রেষ্টেল কাউণ্টের অনেক দুঃসাহসিক কার্য্যের চিত্রাঙ্কন করিয়া রাখিতেন, অতঃপর সেই চিত্রাবলীর সহিত তিনি এই চিত্রটীও আঁকিয়া রাখিলেন। ঐ চিত্রগুলি বহুবর্ষ-যাবৎ সংরক্ষিত ছিল, এখনও লোকে "স্যাণ্ডর য়্যালবম্" (চিত্রকোষ) বলিতে ঐ চিত্রগুলিকেই বুঝিয়া থাকে।

-:*:-

দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার।

বিগতবর্ষের বালকে আমরা কমাণ্ডার পিয়ারীকর্ত্তৃক উত্তরমেরু-আবিষ্কারের গৌরবময় কাহিনীটী দুইটি প্রবন্ধে বিবৃত করিয়া আপনাদের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বর্ষে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে, যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে, কাপ্তেন স্কটকর্ত্তৃক দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কারের মহিমা-প্রদীপ্ত অথচ অশ্রুসিক্ত কাহিনীটুকু আপনাদের কৌতূহল-নিবারণ ও প্রীতিবিধানার্থে বিবৃত করিলাম।

অনেকেই অনেক দিন-যাবৎ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ-কেন্দ্রে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুলতা-প্রকাশ করিতেছিলেন। অবশেষে কমাণ্ডার পিয়ারী উত্তরমেরুর অন্ধিসন্ধি সকলকে অবগত করাইলে, দক্ষিণমেরুতেও বা কি আছে, তাহা জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এতদর্থে শ্যাকল্টন-প্রমুখ অনেকে চেষ্টা-চরিত্র করিতে লাগিলেন। স্কটও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একবার গিয়া "রাজা সপ্তম এডবার্ডের দেশ" আবিষ্কৃত করিয়া আসিলেন, তৎফলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজ ও ম্যানচেষ্টার-বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়কর্ত্তৃক "ডক্টার অব সায়েন্স" এই উপাধি-ভূষিত হন; কিন্তু সেবারও দক্ষিণমেরু মানুষের অধিগত হয় নাই। পরে ১৯১০—১২ সালপর্য্যন্ত স্কট্ পুনরায় দক্ষিণমেরু-আবিষ্কার-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিলেন। তৎফলে দক্ষিণমেরু তাঁহার পদমর্দ্দিত হইল বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তাঁহার "হরিষে বিষাদ" ঘটিল। প্রথমতঃ তাঁহার পূর্ব্বে সেই স্থানটি আর এক ব্যক্তি আবিষ্কৃত করিয়া ফেলিলেন; দ্বিতীয়তঃ স্কট্ যখন দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কৃত করিয়া প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই অপূর্ব্ব আবিষ্কারের কথা জগৎকে নিজমুখে জানাইতে তিনি আর ইহলোকে রহিলেন না। প্রথম দুঃখের সান্ত্বনা আছে, আমণ্ডসেন (দক্ষিণমেরুর প্রথমাবিষ্কর্ত্তা) বিশেষ কোন মহদুদ্দেশ্যে দক্ষিণমেরু-আবিষ্কার করিতে ধাবিত হন নাই; তাঁহার উদ্দেশ্য এই, দক্ষিণমেরু-আবিষ্কার করিয়া তৎবিবরণরচনা-পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া তিনি আবার উত্তরমেরুর দিকে ছুটিবেন। কিন্তু স্কট্ সে অভিপ্রায়ে দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার করিতে যান নাই; তাঁহার ঐরূপ কোন লঘু উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ঐ স্থানটিকে যাহাতে ভূগোল-শাস্ত্রের অন্তর্গত করিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়েই গিয়াছিলেন, এবং তিনি যে বিবরণী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উত্তর-বংশীয়দের ভূমণ্ডল-সম্বন্ধে জ্ঞান বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং সে স্থলে আমণ্ডসেনের অগ্রগমনে স্কটের যশঃ প্রকৃত-প্রস্তাবে হৃত হয় নাই।

তবে দ্বিতীয়টি প্রকৃতই বড় দুঃখের কথা; স্কটবনিতা তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি বীর স্বামীকে হারাইয়াছেন, স্কট-জননী "গুণিগণগণনারম্ভে সুসম্ভ্রমাৎ" যাঁহার নামে "কঠিনী পতিত" হইত, এমন পুত্ররত্নকে হারাইয়াছেন, তাঁহার শিশুপুত্র বিশ্ববরেণ্য পিতাকে হারাইয়াছেন, আর বিদ্বৎমণ্ডলী অমন একজন আত্মপ্রাণতুচ্ছকারী জ্ঞানবীরকে হারাইয়াছেন, এ সকলের কি করিয়া ক্ষতি-পূরণ হয়?

যাহা হউক, এইবার সেই হর্ষবিষাদময় আবিষ্কার-কাহিনীটির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

স্কটের এই অভিযানটির নির্ঘণ্ট এইরূপ—

১৯১০।

১৫ই জুন—স্কটের পোত "টেরা নোভা" লণ্ডন-ত্যাগ করে।

১৬ই জুলাই—কাপ্তেন স্কট কেপটাউনে তাঁহার উক্ত পোতারোহণ করিবার অভিপ্রায়ে নবজিলণ্ড-যাত্রা করেন।

২৯শে নভেম্বর—নবজিলণ্ডের একান্ত দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী চামার্স-পোতাশ্রয়হইতে ৫৮জন কর্ম্মচারী, ৩৫টি কুকুর, ১৯টি টাট্টু-ঘোড়া, ২টি খরগোশ্ ও ২টি বিড়ালসহ কাপ্তেন স্কট্ দক্ষিণ-কেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেন।

১লা—৩রা ডিসেম্বর—আবহাওয়া বড় মন্দ থাকে, জলোত্তলন-যন্ত্রের মুখ রুদ্ধ ও অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

৯ই ডিসেম্বর—৮৫ নিরক্ষান্তরে পহুঁছিয়া তাঁহারা তুষার-স্তূপ পান। তথাকার তুষার বড় ভারী ছিল, তৎফলে অগ্রগতি বড় মন্থর হয়।

৩০শে ডিসেম্বর—"রস"-সমুদ্রে পহুঁছিয়া তাঁহারা আবার তুষারশূন্য জল পান, ২১ দিনে ৩৮০ মাইল অগ্রসর হন।

১৯১১।

৪ঠা জানুয়ারী—ক্রোজিয়ার-অন্তরীপে পঁহুছেন, কিন্তু বড় ঝড়-তুফান ছিল বলিয়া স্থলে আসিতে পারেন নাই।

৪ঠা—২০শে জানুয়ারী—ম্যাকমার্ডো-সাউণ্ডে যাত্রাপূর্ব্বক শীত-নিবাস-স্থাপন করেন।

৩০শে জানুয়ারী—কাপ্তেন স্কট্ সদলবলে কেন্দ্রাভিমুখে অভি-যানাভিপ্রায়ে স্থানে স্থানে আড্ডা গাড়িতে যান।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—তিমি-উপসাগরে টেরা নোভার সহিত আমণ্ডসেনসহ ফার্ম্মের (পোতের) সাক্ষাৎ হয়।

২রা নভেম্বর—কাপ্তেন স্কট্ শীত-নিবাস-হইতে কেন্দ্রগমনোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

১৯১২।

৩রা জানুয়ারী—তখন তাঁহারা কেন্দ্রহইতে ৭০ ক্রোশ দূরে, এমন সময়ে লেফ্‌টন্যান্ট এভন্স কাপ্তেন স্কট্‌কে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

১৮ই জানুয়ারী—কাপ্তেন স্কট্ কেন্দ্রে পঁহুছেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—নায়েব-নাবিক এড্‌গার এভন্স মস্তিষ্কস্তম্ভন-হেতু মারা পড়েন।

১৭ই মার্চ্চ—কাপ্তেন ওট্‌স ঠাণ্ডা লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯শে মার্চ্চ—কাপ্তেন স্কট, ডাক্তার উইলসন্ ও লেফ্‌টন্যান্ট বাউয়ার্স অনাহারে ও ঠাণ্ডা লাগিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন।

১৯১০ সালের ২রা জুন টেরা নোভা টেম্‌স-নদীহইতে যাত্রা করে। পরে পোর্টস্‌মাউথ-পোতাশ্রয় ও কার্ডিফ্ হইয়া (শেষোক্ত স্থানে কয়লা লইয়া) সপ্তাহখানিক পরে নবজিলণ্ডে যাইবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। টেরা নোভা-জাহাজখানি ডাণ্ডীপ্রদেশের একখানি পুরাণ তিমিধারী পোত, আবিষ্কার-কার্য্যে ইতঃপূর্ব্বে উহার অপেক্ষা অধিকতর সর্ব্বপ্রয়োজনীয় বস্তুপূর্ণ জাহাজ ব্যবহৃত হয় নাই। ঐ আবিষ্কার-অভিযানে যাইবার জন্য রাজকীয় নৌবিভাগ-হইতে চব্বিশজন নৌ-কর্ম্মচারী ও নাবিককে লওয়া হইয়াছিল।

কাপ্তেন স্কট্ "ওয়েলিংটন" বলিয়া একটী স্থানে টেরা নোভার আসিয়া চড়েন এবং ঐ বৎসরের শেষাশেষিই ঐ অভিযান দক্ষিণ-মেরু-অভিমুখে অগ্রসর হয়। গতবর্ষের প্রথমভাগে যখন টেরা নোভা সভ্যজগতে ফিরিয়া আসে, তখন অভিযান সম্বন্ধে সন্তোষ-জনক সংবাদই পাওয়া যায়। তখন এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, কাপ্তেন স্কট্ তাঁহার কার্য্য-সমাধা করিবার নিমিত্ত আর এক শীতঋতু দক্ষিণ-মেরুতে অতিবাহিত করিবেন।

১৫ই ডিসেম্বর টেরা নোভা আবিষ্কারক ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পুনরায় দক্ষিণ-মেরু-অভিমুখে গমন করে। অনেকদিন পর্য্যন্ত আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

দক্ষিণমেরু-যাত্রার শেষাংশের কাপ্তেন স্কট্ এইপ্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

২৪শে নভেম্বর, ১৯১১; নিরক্ষান্তর ৮১°১৫ দঃ।

২রা নভেম্বর সন্ধ্যাকালে আমরা "হাট্-পয়েণ্ট"-(কুটীর-বিন্দু) ত্যাগ করিলাম। ঘোড়াগুলি যাহাতে অহোরাত্রের উষ্ণতর অংশের উষ্ণতাটুকু ভোগ করিতে পায়, তজ্জন্য আমরা রাত্রিকালে পথ চলিয়া দিবাভাগে বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। ৯ই নভেম্বরের প্রভাতে আমরা "কর্ণার ক্যাম্পে" (কোণ-তাম্বু) পঁহুছি। ত্রিশক্রোশ আমরা মটর প্রস্থিত পথ ধরিয়া চলি, তাহার পর, আমরা দেখি, মটরগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। উপদেশমত মটরারোহী দল আগাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমরা একটা আকস্মিক শীত-ঝটিকাহেতু অগ্রগমনে বিলম্ব করিতে বাধ্য হই। ১৬ইএর প্রভাতে "ওয়ান টন ক্যাম্পে" (একটন তাম্বু) পঁহুছি।

কুকুরের দল কয়েকদিন আগে আসিয়া আমাদের সঙ্গ ধরে, এখন সমস্ত দলটী একসঙ্গে চলিল। ওয়ান-টন ক্যাম্পে জানোয়ারগুলিকে একদিন বিশ্রাম করিতে দেওয়া হয়। ১৭ইএর সন্ধ্যায় আমরা ঐ স্থানটি ছাড়িয়া যাই।

বোঝাগুলির ভারের, পথের দুর্গমতার এবং জানোয়ারগুলির স্বল্পসংখ্যার কথা চিন্তা করিয়া প্রতিরাত্রে আমি সাড়ে-সাতক্রোশমাত্র পথ চলিতে মনস্থ করিলাম। আটরাত্রি আমরা এইভাবে চলিয়া আসিয়াছি; আশা করি, ভবিষ্যতেও প্রতিরাত্রিতে আমরা এতটাই পথ-অতিবাহন করিতে পারিব।

ঘোড়াগুলি সমভাবে চলিয়াছে, তাহাদের শারীরিক অবস্থাও বেশ ভালই আছে। এখন প্রথম ঘোড়াটাকে প্রয়োজনহেতু গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল, কিন্তু উহা আরও অধিকদূর চলিতে পারিত। জানোয়ারগুলি রোজ ৫ সের করিয়া দানা আর দেড়সের করিয়া খইল খায়।

আমরা নির্ঘণ্টানুযায়ী "গ্লেসিয়ার"-পর্য্যন্ত অল্পায়াসে আমাদের আহার-যোজনার আশা করিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বে আমরা যত বিলম্ব হইবে মনে করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা আমাদের ২।১ দিন বেশী বিলম্ব হইবে।

(ক্রমশঃ।)

ফেব্রুয়ারীমাসের পদ্যরচনার প্রতিযোগিতার ফল

এইবার দুইজন বালক পদ্যরচনার প্রতিযোগিতায় সমান হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহাদের কবিতা-দুইটি মুদ্রিত করিলাম। ইতি—"বালক"-সম্পাদক।

১। বনমানুষের সখ।

আলিপুর-বাগানেতে বনমানুষের ঘরে,
একদা এক সাহেব এলেন "ফোটো" তুলিবারে।
কাণ্ডখানা দেখে তাঁ'র বনমানুষের দল,
লাগিয়ে দিলে সবাই মিলে উচ্চ কোলাহল।
তা'দের মধ্যে ছিল একটা—মস্ত ভুঁড়ি তা'র,
সাহেবকে দে'খ্‌তে পেয়ে হ'ল আগুসার।
চুপ্‌টী মেরে ব'স্‌ল গিয়ে ঠিক সুমুখপানে,
"ছবি নিশ্চয় উঠবে আমার"—ভা'ব্‌ছে যেন মনে।
তা'র ওপরে চেহারাখানি নয়তো যা'-তা' তা'র,
নাকটী খাঁদা, পেটটী নাদা, কিম্ভূতকিমাকার।
(আবার) কোদাল-সম দাঁত-দুপাটী ঠোঁটে চাপা আছে,
বড়ই ভয়, দাঁতের জন্য (সব) মাটী হয় পাছে।
চক্ষু-দুটী ভাঁটার মতন, শরীর যেন জালা;
ঠোঁট-দুখানি গড়ের মাঠ—মধ্যে মস্ত নালা!
উ'ঠ্‌ল ছবি নিখুঁতভাবে, যেন সোনার চাঁদ,
বনমানুষের(ও) মিটে গেল ছবি-তোলার সাধ!

শ্রীদাশরথী চৌধুরী। বয়স, ১৪ বৎসর।
স্কটিশ্ চার্চেস কলিজিয়েট স্কুল—তৃতীয় শ্রেণী।

২। শিশু ও পশু।

শিশু। চুপ্‌টী কোরে, মুখ্‌টি বুজে, বোসে কে গো তুমি?
নাম কি তোমার? কি কাজ কর? নিবাস কোন ভূমি?
দেখ্‌তে তোমায় মানুষের প্রায়—মানুষ নও ত ঠিক,
হাতদু'টি যে পায়ের মত লম্বা অত্যধিক!
পায়ের আঙুল হাতের মত—তফাৎ কিছুই নাই!
নাক্‌টি খাঁদা, পেট্‌টি মোটা, ঠোঁটদুটিও তা'ই!
চক্ষু-দুটি আলুচেরা—পটলচেরা নয়!
শুন্‌তে ভারি ইচ্ছা আমার তোমার পরিচয়!

পশু। শোনো, শিশু, কানটী দিয়ে, আমার বিবরণ—
নিবাস আমার আফ্রিকাতে, যথায় গভীর বন।
লেখা-পড়া, চাকুরি-বাকুরি কোত্তে হয় না সেথা,
গাছের ফলে, নদীর জলে পেট্‌টা ভরে যেথা।
মূর্খলোকে যদিও মোরে বলে বনমানুষ,
পণ্ডিতগণের মতে আমি নরের পূর্ব্বপুরুষ!
তোমাদের কেউ বা চাটার্জ্জী, আর কেউ বা বানার্জ্জী—
আমিও বড় কেও-কেডা নই!—মিষ্টার্ শিম্পাঞ্জী!

শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়। (বয়স, ১১ বৎসর।)
২৬ নং হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা।

বালকের রচনা।*

শিয়ালের বুদ্ধি।

(উপকথা।)

একদিন এক শিয়ালের সঙ্গে এক বাঘের দেখা হয়। শিয়াল বাঘকে বল্লে, "বাঘ-ম'শাই! আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী দ্রুতগামী আজ তা'ই দেখ্‌বা'র জন্যে একটা দৌড় হ'ক। সমস্ত পৃথিবী দৌ'ড়ে পার হওয়া চাই।"

বাঘ বল্লে, "এতো বেশ কথা! এস আমরা এইখানথেকেই দৌড়-আরম্ভ করি।"

তখন তা'রা একসঙ্গে দৌড়া'তে আরম্ভ কল্লে। শিয়াল বড় ধূর্ত্ত। সে একটুখানি গিয়েই বাঘের লেজ ধ'রে ঝু'ল্‌তে লা'গ্‌ল। বাঘ পাছে শিয়ালের কাছে বাজী হারে, এই ভয়ে খুব জোরে দৌড় দিলে। সে এত জোরে ছু'টতে লা'গ্‌ল যে, শিয়াল তা'র পেছনে ঝু'ল্‌তে ঝু'ল্‌তে যাচ্ছে, তা' একবারও টের পেলে না। কিছুক্ষণ পরে বাঘ যখন প্রায় পৃথিবীর শেষে এসেছে, তখন সে একবার ভাবলে,—"আমি ত এতদূর এসেছি, কিন্তু শিয়াল কোথা আছে, তা ত জানি না, একবার পেছন ফিরে দেখা যা'ক্, শিয়াল কোথা আছে!" এই ভেবে যেই সে পেছনে ফিরেছে, অম্নি শিয়াল এগিয়ে প'ড়্‌ল। তা'র পর, বাঘের লেজথেকে লাফিয়ে প'ড়ে পৃথিবীর শেষে দাঁড়িয়ে বল্লে,—"বাঘ-ম'শাই! এই দেখুন, আমি আপনার কত আগে এসেছি।"

বাঘ শিয়ালের চাতুরী কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বাধ্য হয়ে তা'র কাছে হার মা'ন্‌লে।

শ্রীপরিতোষ বসু,
কলিকাতা।

* আমরা আবার অনেক পাঠক-পাঠিকার নিকটহইতে "বালকের" প্রশংসাসূচক ও অন্যান্য পত্রাদি পাইয়া প্রীত হইয়াছি। এই বালকের রচনাটি প্রকাশোপযোগিনী মনে হওয়ায় প্রকাশ করা গেল।—"বালক"-সম্পাদক।

বালক

২য় বর্ষ।] মে, ১৯১৩। [৫ম সংখ্যা।

স্বর্ণসূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দুইজনে ঐপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল।

তাহারা কত কানন-কান্তার, কত দূর্ব্বাক্ষেত্র, কত টিলা-টিকড় পার হইয়া চলিল। অবশেষে চিতু বলিল,—"কুমারজী, ক্ষিদের চোটে নাড়ী চোঁ চোঁ ক'র্‌ছে—আর ত চ'ল্‌তে পারি নে।"

পরেশ তাহার খাদ্যের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, সবটুকুই চিতুকে খাইতে দিল। তাহাতে চিতুর ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না, তবুও সে সেই খাদ্যাহার করিয়া পরেশের কাছে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা উভয়ে একটী সুন্দর কুটীর দেখিতে পাইল, কুটীরটী তাহাদের গন্তব্য পথহইতে বেশী দূরে নহে। তাহারা সেই কুটীরের প্রায় সন্নিকট হইলে, সেই কুটীরাভ্যন্তরহইতে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও এক কিশোরী বাহির হইয়া আসিল। কিশোরী, বোধ হয়, ঐ বৃদ্ধারই কন্যা। বৃদ্ধা ও কিশোরী হাসিতে হাসিতে পথিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা পরেশের উদ্দেশে বলিল,—"নমস্কার, বাবুজী! ভৈরবী, বাবুকে নমস্কার কর।" কিশোরী বৃদ্ধার আদেশপালন করিল। পরেশ উভয়কেই প্রতিনমস্কার করিল।

বৃদ্ধা। ঈস্! বাবুজীর গা দিয়ে যে দরদর্ ক'রে ঘাম প'ড়্‌ছে। চলুন না আমাদের ওখানে একটু জিরিয়ে, তা'র পর যা'বেন।

বৃদ্ধা কিশোরীকে ইঙ্গিত করিল, সেও বলিল,—"আসুন না।" বলিয়া কুটিল দৃষ্টি করিয়া একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল।

চিতু বলিল,—"কি ভাগ্যি আমাদের!"

পরেশ গম্ভীরভাবে কহিল,—"আপনাদের ঐ কথা শুনেই আমরা বাধিত হ'য়েছি।"

বলিয়া সে রমণীদিগের অনুগমন করিতে গেল, স্বর্ণসূত্র কিন্তু টিল দিল না।

তাহা দেখিয়া পরেশ চিতুর উদ্দেশে বলিল,—"আমার যাওয়া হ'বে না।"

তখন কিশোরী প্রগল্‌ভভাবে বলিয়া উঠিল,—"আসুন না, বাবুজী, গরীবের বাড়ী কি আ'সতে নেই? একটু সরবৎ-পান-তামাক খেয়ে জিরিয়ে-টিরিয়ে যা'বেন। খরচ-পত্র কিছুই ক'র্‌তে হ'বে না।"

এই বলিয়া সে বৃদ্ধার ইঙ্গিতে হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া পরেশের হাত ধরিতে উদ্যত হইল। পরেশ সরিয়া দাঁড়াইল, তাহার সেই কিশোরীর অপাঙ্গদৃষ্টি ভাল লাগিল না।

বৃদ্ধা আসিয়া চিতুর হাত ধরিয়া বলিল,—"এস, বাবা, তুমিও এস।"

চিতু বলিল,—"আমি ত যেতে রাজি আছি; ওঁকে ধর। আমি তো আর ক্ষিদে-তেষ্টায় চোকে কাণে দে'খ্‌তে পাচ্চি নে। কুমারজী, এঁরা ব'ল্‌চেন চলুন না খানিক জিরণই যা'ক।"

পরেশ বলিল,—"না, ভাই, আমি যেতে পা'র্‌ব না।"

রমণীরা স্বর্ণসূত্র দেখিতে পাইতেছিল না, সকলে উহা দেখিতে পায় না; কিন্তু পরেশ দেখিল, উহা কুটীরের নিকটহইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে।

পরেশ রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপ্‌নারা কে? এই বনের ভেতর থাকেন কেন?"

বৃদ্ধা বলিল,—"আমরা লোক ভাল গো, লোক ভাল। এই দেশের রাজার কুটুম।"

চিতু জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কুমার পরেশসিংহকে চেন?"

কিশোরী বলিল,—"তা' আর চিনি নে! তিনি আমাদের এখানে পেরায়ই এসে থাকেন, আমাকে তিনি বড় ভাল বাসেন।"

পরেশ ঘৃণার সহিত উত্তর করিল,—"মিথ্যে কথা! তুমি তা'কে চেন না; মিথ্যে কথা ব'ল না।"

কিন্তু সে কে, পরেশ তাহা তাহাদিগকে জানিতে দিল না। চিতুকেও ইঙ্গিত করিয়া বলিতে নিষেধ করিল।

বৃদ্ধা বলিল,—"তা' কোথাকার কে কুমারকে নাই বা চি'ন্‌লুম গো। আমাদের ঘরে এসে দু'দণ্ড ব'স্‌লে কি আমোদ ক'র্‌লে, কি বাবুজীর কেতি হ'বে? আমরা কি যত্ন-আয়িত্তি ক'র্‌তে জানি নে?"

পরেশ উত্তর করিল,—"না, তোমাদের বাড়ীতে আমি যেতে পা'র্‌ব না। কর্ত্তব্য আমাকে অন্যপথে টান্‌ছে।"

কিশোরী। কর্ত্তব্য? সে আবার কে? বাবুজীর মত নবীন-পুরুষ খা'বে-দা'বে আয়েস ক'র্‌বে, এই তো আমরা জানি। কর্ত্তব্যকে ঘুরে আ'স্‌তে বলুন না, এখনই আপ্‌নাকে নিয়ে টানাটানি ক'র্‌বার কি দরকার? আমরা কি ফেল্‌না এয়েছি?

চিতু বলিল,—"চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যা'ব।"

পরেশ চিতুকে চুপি চুপি বলিল,—"চিতু, সাব্‌ধান। আমি যেতে পারি নে, স্বর্ণসূত্র আমায় অন্যদিকে টা'ন্‌ছে। এ স্ত্রীলোক-দু'টোকে আমার ভাল ঠে'ক্‌ছে না। এরা মিথ্যে কথা বলে; আমাদের চেনে না। তা' ছাড়া কর্ত্তব্যের কথা শুনে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিলে। চিতু, সাব্‌ধান হও। আমার সঙ্গে চল।"

চিতু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বলিল,—"ঘণ্টাখানিকের জন্য চলুন না, কুমারজী!"

পরেশ। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও না। তুমি যদি আমার চেয়ে ওদেরকে বেশী বিশ্বাস কর, তা' হ'লে যাও। তা' হ'লে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।

চিতু। কুমারজী, আপ্‌নাকেই আমি বেশী বিশ্বেস্ করি, আমার বুকের ভেতরথেকে সেই কথাটা আমাকে তাই ক'র্‌তে ব'ল্‌ছে।

এই বলিয়া চিতু রমণীদ্বয়কে ত্যাগ করিয়া পরেশের সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন রমণীদ্বয় রাগিয়া উঠিয়া তাহাদিগকে কুৎসিতভাবে গালি দিতে লাগিল। বৃদ্ধা কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাদের শাসাইয়া বলিল,—"আচ্ছা, যাও, আমিও বাঘাকে পেছনে পেছনে পাঠাচ্ছি।"

তাহা শুনিয়া চিতু বলিল,—"কুমারজী, ঠিক বলেছিলেন তো, মাগীরা বাঘার চর।"

পরেশ বলিল,—"মিথ্যুক, কর্ত্তব্যের জ্ঞান নেই, এরকম লোক কি কখন ভাল হয়, চিতু?"

৫

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে কথিত দুষ্টা স্ত্রীলোকদিগের সহিত দেখা হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই পরেশ ও চিতু চলিতে চলিতে পথে একটী চড়াই পাইল। সেই চড়াইএ উঠিবামাত্রই একটী মনোজ্ঞ দৃশ্য তাহাদের নেত্র-পথে নিপতিত হইল। নিম্নে একটী বনাচ্ছন্ন-শৈল-সংবেষ্টিত, স্বচ্ছসলিল সরোবর, তাহার উর্দ্ধে দেবদারু-তরুশ্রেণীর দ্বারা বলয়িত তুঙ্গ-শৃঙ্গ ভূধরাবলী, আবার নিকটস্থ নগমালার অপেক্ষা দূরবর্ত্তিনী গিরিমালা আরও উন্নত, উহাদের কাহারও কাহারও তুঙ্গশৃঙ্গে শুভ্রতুষাররাশি নীলাভ-অম্বরবক্ষে সুনির্ম্মল স্ফটিকবৎ জল্‌জ্বল্ করিতে-ছিল। পরেশ উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল, কারণ সে তাহার পিতার একজন অরণ্যরক্ষকের গৃহটি দেখিতে পাইল। ইতঃপূর্ব্বে সে তাহার পিতার সঙ্গে এইস্থানে একবার বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে সহর্ষে বলিয়া উঠিল,—"চিতু, দেখ, দেখ, ঐ আমাদের আরণ্যক অসিতাক্ষ সিংহের বাড়ী! আর আমাদের ভয় নেই, এখন আমরা আমাদের রাজ্যের এলাকায় এসেছি।" পরেশের মন এখন যেখানে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল, স্বর্ণসূত্র সৌভাগ্যক্রমে তাহাদিগকে সেইখানেই সোজা লইয়া যাইতে লাগিল। অসি-তাক্ষের সুরম্য বনগৃহটি পূর্ব্ববর্ণিত হ্রদমধ্যবর্ত্তী এক পাদপশ্যামল ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত। দ্বীপটি যেন একটী দুর্গ, কারণ উহার চারি-পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতগুলি উহার প্রাকারের কার্য্য করিতেছে। ক্ষুদ্র একটী তরণীযোগে ব্যতীত ঐ দ্বীপে যাওয়া যায় না, তরণীখানি অসি-তাক্ষ সর্ব্বদা দ্বীপের ঘাটে বাঁধিয়া রাখেন। পাহাড় কাটিয়া দ্বীপের ঘাটের একটী সরু সিঁড়ি তৈয়ার হইয়াছে। ডাকাইতেরা সাহস করিয়া ঐ দ্বীপের ঘাটে নামে না। অসিতাক্ষ সেইখানে থাকিয়া বিপন্ন পথিকদিগকে আশ্রয়-দান ও বনরক্ষা করিয়া থাকেন। স্বর্ণসূত্র পরেশ ও চিতুকে তড়াগ-তীরে নামাইয়া লইয়া গেল। পরেশ ও চিতু তাহা-দের ক্লান্তির কথা বিস্মৃত হইল। দৌড়িয়া দৌড়িয়া খেয়াঘাটে উপস্থিত হইল। পরেশ হাঁকিল,—"পাটুনি, ও পাটুনি!" তখনই আরণ্যক-গৃহহইতে দুইটি বালক দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, পাটনীকে কাহারা ডাকিতেছে, তাহা খরদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া, ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া দাঁড় টানিয়া তাহারা উল্টা ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইল, সেখানে পরেশ তাহার কনক-কটিবন্ধনী ও চিতু তাহার শার্দ্দূলচর্ম্মশোভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরেশ তাহার পুরাণ বন্ধুদের চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল,—"শকু, বিকু, তোমরা কি আমায় চি'ন্‌তে পা'র্‌ছ না?" তাহারা পরেশকে চিনিতে পারিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তাহার পর, মহানন্দে তাহাদের দুইজনকেই নৌকায় তুলিয়া লইল। পরেশ স্বর্ণসূত্রগাছি ধরিয়াই রহিল, স্বর্ণসূত্রও যেন হ্রদপার হইয়া বনবাটিকা-লক্ষ্যে চলিল। নৌকায় বসিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের কত কথাই না বলাবলি হইয়া গেল! শকু (শক্রসিংহ)

আর বিকু (বিক্রমসিংহ) আরণ্যক অসিতাক্ষের দুই পুত্র। কথায় কথায় তাহারা পরেশকে বলিল যে, তাহাদের বাবা এখন বাড়ী আছেন, সম্প্রতি তিনি রাজ-সন্দর্শনে গিয়াছিলেন; সেখানে দেখিয়া আসিয়াছেন যে, রাজা পরেশের আগমন-পথ চাহিয়া রহিয়াছেন, এবং এখন এই দ্বীপবাসীরা তাহাকে পাইয়া কত না আহ্লাদিত হইবে! বিকু, ছোট ভাই, বলিল,—"আর শুনেছ, কুমারজী, আমরা এখন একটা ভোঁদড় পুষেছি, সে বেশ মাছ ধ'রে ধ'রে আনে। আর আমাদের আর একজন ভাই হয়েছে, তার আমি কি নাম রেখেছি শু'নবে?—টুনটুনি! যদি তাকে ডাকি,—'টুনু'! অমনি সে আমার দিকে জুলজুল্ ক'রে চেয়ে দেখে!" সে আরও কত

পরেশ একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বলিল,—"আমার একজন বন্ধু।"

চিতু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া বলিল,—"আমার নাম চিতু।"

অসিতাক্ষ। আমি একে আগে, বোধ হয়, কোথাও দেখেছি। না—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে। ওহে ছোক্‌রা তুমি কি—

অসিতাক্ষ চিতুকে, বোধ হয়, ডাকাইতদের সঙ্গে দেখিয়াছিলেন। চিতুর মুখ গম্ভীরভাব-ধারণ করিল, সে কিছুই বলিল না।

পরেশ বলিল,—"আরণ্যক, তুমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস-পড়া ক'র' না; কেউ ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে যা'ক। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমার তোমাকে অনেক কথা ব'ল্‌বার আছে।"

ছেলেরা চিতুকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। পরেশের জন্য

কি অসংলগ্ন কাহিনী বলিতে বলিতে চলিল, সকলের তাহা শুনিতে ভাল লাগিবে না, পরেশের কিন্তু তাহার কথাগুলি মধুর মত মিষ্ট লাগিতেছিল। পরে নৌকা গিয়া পরপারে ভিড়িল। অসিতাক্ষ স্বয়ং তাহাদের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় ছিলেন। পরেশকে দূরহইতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সোপান-শ্রেণী দিয়া নামিয়া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন-দান করিলেন। বলিলেন,—"এস, এস, বাবাজি, তুমি যে বনে ছিলে, তা' আমি মহারাজের মুখথেকে শুনেছি, কিন্তু তুমি কোথায়, কোন্ বনে আছ, তা' তিনি আমায় বলেন নি। তিনি শুধু আমায় ব'লেছিলেন,—'আমি পরেশের আসা-পথ চেয়ে রয়েছি'। কিন্তু ও কে?"

খাদ্যাদি প্রস্তুত হইতে থাকিল, ইত্যবসরে পরেশ এক এক করিয়া অসিতাক্ষকে সকল কথা ভাঙিয়া বলিল। যতক্ষণ পরেশ তাহার জীবনের এই কয়দিনের ঘটনাগুলি বিবৃত করিতেছিল, ততক্ষণ অসিতাক্ষের মুখের ভাবের নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছিল। কখন তিনি হাসেন, কখন বিমর্ষ হন, কখন বা উত্তেজিত হইয়া উঠেন। যখন পরেশ বৃদ্ধা ও তাহার কন্যার কথা বলিতে লাগিল, তখন অসিতাক্ষ বলিয়া উঠিলেন,—"ওদের চেয়ে জঘন্য মানুষ ডাকাতে দেশে আর নাই। লোকে বলে, বুড়ীটা ডাইনী। রাহীদের ও বিষ খাইয়ে কি ডুবিয়ে মারে, তা' আমি জানি নে। বাঘার সঙ্গে ওদের যড়্ আছে, তুমি যদি ওদের বাড়ীতে যেতে, তা' হ'লে

হয় ওরা তোমার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিত, নয় তোমায় কোনরকম ক'রে আট্‌কে রা'খ্‌ত, তা'র পর বাঘা এলে, তোমাকে ধরিয়ে দিত। তুমি ওদের বাড়ীতে না গিয়ে ভালই ক'রেছ। লোভ-সাম্‌লাবার একমাত্র উপায় যা' উচিত, ভরসা ক'রে তা'ই করা।"

এই বলিয়া তিনি পরেশের হাত ধরিয়া তাহাকে বাটিকামধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার স্ত্রী তাহাকে মায়ের মত আদর-অবেক্ষা করিয়া ভোজন করাইলেন। তাহার আহার হইয়া গেলে, ছেলেরা তাহার চারিপাশে ঘেরিয়া বসিল, পরেশের মুখে যেন মধুমাখান আছে, পরেশ যেন এক মহাবীর, সম্প্রতি এক যুদ্ধজয় করিয়া আসিয়াছে, ছেলেরা অবাক্ হইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া তাহার কথাগুলি যেন গিলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীরূপচাঁদ-চরিত্রম্

আমাদের হরিণের মত সুশ্রী খুব বড় দুইটী ছাগল ছিল; আর ছিলেন, আমাদের—শ্রীল শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ! রূপচাঁদ বা রূপী বানর ছিলেন, তাহা হইলে কি হয়? প্রতাপাদিত্য, মেনাহাতী বা সীতারামের বীরত্ব, রূপীর বীরত্বের কাছে লাগে না! রূপী মহাবীর ছিলেন।

রূপীর নাম "রূপী" হইয়াছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গভীর গবেষণার কার্য্য,—প্রগাঢ়-জ্ঞান প্রত্নতত্ত্ববিদের জ্ঞান-সাপেক্ষ! আমরা সুধু এইমাত্র জানি যে, রূপীকে একরূপেয়ায় কেনা হইয়াছিল, তা'-ছাড়া রূপী বড় সুপুরুষও ছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, এই দুইটিই কি তাঁহার রূপী-নামকরণের প্রচুর হেতু হইতে পারে না—প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কি বলেন? কিন্তু বানর কি আবার সুশ্রী হয়? হয় না? রূপীর দেহযষ্টি বড় দীর্ঘ ছিল। তিনি দাঁড়াইলে তাঁহাকে তোমাদের বাড়ীর খোকার মত ঢেঙা দেখাইত, তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল সাহেবদের মত লাল টুক্‌টুকে ছিল; তাঁহার বাহুযুগল আপাদলম্বিত ছিল, এবং তাঁহার শ্রুতিযুগল বেশ সুন্দর ও ক্ষুদ্র ছিল। তাঁহার চক্ষুযুগল কোটর-বিবিক্ষু ছিল বটে, কিন্তু সেদুইটি নানাপ্রকার রঙ্গ-রসিকতার লীলাভূমি ছিল, অমন চোক-দু'টির যাহারা নিন্দা করিত বা করিবে, তাহাদের নিজেদেরই চোক ছিল বা আছে কি না সন্দেহ!

রূপী নিরামিষ-ভোজী ছিলেন; যাঁহারা বলেন, মাংস না খাইলে গায়ে জোর হয় না, তাঁহারা রূপীকে দেখিলে কি বলিতেন, জানি না। রূপী মাছ-মাংসের ত্রিসীমা মাড়াইতেন না। সব খাদ্য শুঁকিয়া খাওয়া তাঁহার একটী সুন্দর সদ্‌গুণ ছিল, আমিষের গন্ধে রূপীর উকি উঠিত। তাহা হইলেও রূপী খাদ্যসম্বন্ধে সুসভ্যই ছিলেন, কেননা তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে চা-পান করিতেন, চা না খাইলে, তাঁহারও মাথা ধরিত,—সন্ধ্যাবেলা তিনি "ঝুপ্‌সী মারিয়া" বসিয়া থাকিতেন! চা-পানের পদ্ধতিটিও তাঁহার সুসভ্যরকম ছিল, তিনি কখন পিছন উল্টাইয়া,—সেইভাবে চুমুকদিয়া চা-পান করিতেন না, এমন কি তাঁহার কায়দা-কানুনও খুব দুরন্ত ছিল, তিনি কখন চামচে চা তুলিয়া বা পিরীচে চা ঢালিয়া পান করিতেন না, বেশ চাএর পিয়ালার 'হাণ্ডেল্' ধরিয়া একটু একটু করিয়া চাখিয়া চাখিয়া চা-পান করিতেন।

তবে রূপী দুইটি বিষয়ে একটু সেকেলে ধরণের ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার দারুগৃহে বাস করিতে চাহিতেন না, তাহার ভিতর ঢুকিলে, তাঁহার যেন প্রাণ আইঢাই করিত। এইজন্য তিনি কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা বহিরঙ্গণে—পৃথিবীর চারিদিক্‌কে চারিপ্রাচীর ও নীলাকাশকে চন্দ্রাতপ করিয়া বসতি করিতেন। কিন্তু একটী কারণে রূপীর ঐ পুরাণ রেওয়াজটুকু ধরা নাও চলিতে পারে। রূপীকে কেহ অনুরোধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র দারুগৃহে প্রবেশ করিয়া, আড় হইয়া শুইয়া পড়িতেন; আর চোক মট্‌কাইয়া মট্‌কাইয়া অতি গম্ভীর-প্রকৃতির লোককেও হাসাইয়া ছাড়িতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি কিছুতেই কাপড় পরিতে চাহিতেন না—তাঁহার কেমন অস্বস্তি-বোধ হইত; তবে কাপড় জোর করিয়া পরাইলে যে তিনি কোন "বদিয়াতি" করিতেন, তাহা নহে। তখন শান্ত হইয়া পরিতেন বটে, কিন্তু পরে যখন যাহাকে কাছে পাইতেন, তাহাকেই তাঁহাকে পুনরায় আরাম দিতে অতি কাতর নয়নে ও দশনে অনুরোধ করিতেন। "কাতর দশনে" কি-রকম? মনে কর, তিনি কোট-প্যাণ্ট পরিয়া জড়ভরত হইয়া বিরসবদনে বসিয়া আছেন, তুমি কাছ দিয়া যাইতেছ, তিনি অমনি তোমাকে "কোঁ," "কোঁ" বলিয়া ডাকিবেন। এখানে তাঁহার "কোঁ"র মানে,—"ওগো, শুনচ!" রূপীর "'কোঁ'-শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়!" "রূপী, চা খেয়েচ?" "কোঁ!" এখানে "কোঁ"র মানে,—"হ্যাঁ।" ইত্যাদি। যাহা হউক, তাঁহার "কোঁ কোঁ" শুনিয়া যদি তুমি চাহিয়া দেখিলে, অমনি তিনি জামা দেখাইয়া "কিচিকিচি-কিচিকিচি" বলিয়া চোক ও দাঁতদিয়া কাতরতা-প্রকাশ করিলেন,—"দোহাই, দাদা, আমার এ অনভ্যাসের ফোঁটা প'রে কপাল চড়্-চড়্ ক'রছে—খুলে দাও, খুলে দাও, হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি!" ঐ "কিচি-কিচি-কিচি" নয়ন ও দশন-সাহায্যে অতখানি ভাব ব্যক্ত করিত! তুমি যদি দয়া করিয়া তাঁহাকে বসনের বালাইহইতে নির্ম্মুক্ত করিলে, তিনি অমনি কাপড়-জামা মাথায় করিয়া একবার

ইংরাজী "পোল্‌কা"-নাচ নাচিয়া তোমাকে "থ্যাংকিউ" করিলেন। এজন্ত তাঁহার সেই দিগম্বর অবস্থাও কাহারও চ'খে তত দোষাবহ ঠেকিত না।

আরও একটী কারণে রূপীকে প্রায়ই পরের খোসামোদ করিতে হইত। আমরা তাঁহার কটিদেশ সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতাম। তাহার ফলে, তাঁহার "ক্ষীণমধ্য" প্রায়ই সুড়্‌সুড়্ করিয়া চুল্‌কাইত। কেহ রূপীর কাছে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে একটু বিশ্রম্ভালাপ করিতে থাকিলে, তিনি একটু পরে আড় হইয়া কুলিশ-কঠোর অয়স-শৃঙ্খল তাঁহার তনু-কটির কি দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহা বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মত মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইতেন। তাহাতে কেহ করুণার্দ্র হইয়া যদি তাঁহার সেই অঙ্গটি কণ্ডুয়ন করিয়া অর্থাৎ চুল্‌কাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি যে একপ্রকার "আয়েস"-ব্যঞ্জক আওয়াজ করিতেন, তাহা শুনিয়াই কণ্ডুয়নকারীর সেই দাসত্বটুকু একান্ত আমোদজনক বোধ হইত।

কিন্তু আমরা যে তাঁহাকে কেন শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতাম, তাহা জানি না। কেননা শৃঙ্খলিত থাকা বা না থাকা বীরবর শ্রীশ্রীরূপচাঁদের স্বেচ্ছাধীন ছিল। আমরা তাঁহাকে প্রতিদিন চারিটি ভাত ও দুধ-কলা খাইতে দিতাম। যেদিন তাঁহার একটু হাওয়া খাইয়া আসিবার বা মুখ বদ্‌লাইবার ইচ্ছা করিত, সেদিন তিনি স্বচ্ছন্দে আপনাকে শৃঙ্খলনির্ম্মুক্ত করিয়া "সটান্" দিতেন; এবং যখন তপন অস্তমিতপ্রায় হইত, তখন একডজন বেগুণ, আধধামী বড়ি, গোটাকতক কদলী ইত্যাদি লুণ্ঠন-দ্রব্য লইয়া (চৌর্য্য বলিতে পারি না, কারণ পুরমহিলারা তাঁহার ভয়েই তাঁহাকে ঐ সকল দ্রব্য-উপহার দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিতেন) আপনার সেই দারুময় গৃহের কাছে বসিয়া "কোঁ" "কোঁ" করিয়া তিনি যে ফিরিয়াছেন, তাহা জানাইতেন। তখন আমরা গিয়া, কেন জানি না, তাঁহার কটিদেশ আবার শৃঙ্খলিত করিতাম, তিনি একান্ত উদাসীনভাবে তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইতেন।

যুদ্ধবিদ্যায় বীরবর রূপচাঁদ, কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জানি না, "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন যে, বুদ্ধি-কৌশলবিহীন বাহুবল কোন কাজেরই নহে। অস্তর্বলের কি করিয়া পরিরক্ষণ করিতে হয়, তাহা তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অপেক্ষা উত্তমরূপে জানিতেন। মনে কর, দূরে তিনি একটা বিড়ালকে আসিতে দেখিলেন। বিড়ালের সহিত যদি তিনি আগেকার বোকা রাজপুতদের মত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার বিড়াল-বিনাশরূপ মহৎ উদ্দেশ্যটি সাধিত হয় না। কাজেই লর্ড রবার্টসের মত কায়দা দেখানই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিতেন। বিড়ালকে দেখিবামাত্রই তিনি যেন দারুময় রূপচাঁদ হইয়া গেলেন, নড়েন না, চড়েন না, চোকের পলকপর্য্যন্ত পড়িতেছে না। বেচারা বিড়াল সে চতুর মর্কট-মনীষার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া যেই তাঁহার কাছে আসিয়াছে, অমনি বীরবর তাহার পুচ্ছ "পাকড়াইয়া" তাহাকে যেন চড়ক-গাছে পাক খাওয়াইতে লাগিলেন, সে যখন ধরাখানাকে ঘূর্ণায়মানা "সরা"খানা দেখিতে লাগিল, তখন তাহাকে তাহার সেই আবর্ত্তনের বেগানুভব করাইতেই যেন হস্তমুক্ত করা হইল; সে যেমনি "পপাত ধরণীতলে," অমনি "মমার চ"!

"চুরি-বিদ্যা বড়বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা!" রূপচাঁদ ঐ বড়-বিদ্যাটির চমৎকাররূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। জীবনে কখনও ধরা পড়েন নাই। তিনি এক গলির মুখে একটী বহির্নিঃসৃত কড়ির উপরে দিনমানে বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার পদতল দিয়া যদি কেহ খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইত, তিনি অমনি "ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি"-গোছ করিয়া তাহার কিয়দংশ বেমালুম হাল্কা করিয়া দিতেন, কখনও ধরা পড়িতে দেখি নাই, পাছে শিকলটার শব্দ হয়, এজন্য তিনি তাহা সে সময় কড়িহইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতেন।

রূপচাঁদ এদিকে বড় ভালমানুষ ছিলেন। কেবলই রঙ্গরস লইয়া থাকিতেন। রাস্তা দিয়া বিবাহের বাজনা বাজাইয়া কেহ বিবাহ করিতে যাইতেছে, রসিকচূড়ামণি রূপচাঁদ একটা টিন (যাহাতে তিনি অন্নাহার করিতেন) বাজাইয়া নাচিতে সুরু করিলেন। আমার মনে হয়, তিনি সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক ও নর্ত্তক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর "সাক্রেদ" ছিলেন! কিন্তু এহেন নর্ম্মসচিবও ক্রুদ্ধ হইলে বড় বিপর্য্যয় কাণ্ড করিয়া বসিতেন। "আখ্‌লু" বলিয়া আমাদের একজন মুসলমান ছোক্‌রা-সহিস ছিল, সে প্রায়ই রূপচাঁদকে কোন-না-কোনপ্রকারে উত্ত্যক্ত করিত। একদিন রূপচাঁদ তাহাকে বাগে পাইয়া তাহার রূপ অন্যরূপ করিয়া দিয়াছিলেন। সে ছয়মাস শয্যাশায়ী ছিল।

যাহা হউক, এইবার রূপচাঁদের মহামরণ-কাহিনীটি বিবৃত করিয়া আমরা সেই মহাবীরের জীবন-চরিতখানি সমাপ্ত করি।

আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সে বাড়ীহইতে উঠিয়া আর একটী বাড়ীতে গেলাম। রূপচাঁদও গেলেন। এইবার সেই গৃহের মুক্ত অঙ্গনে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই বাড়ীতে কয়দিন থাকিবার পর, একদিন প্রভাতে দেখা গেল, রূপচাঁদ আর ইহলোকে নাই, শত ক্ষতময় অঙ্গে ধূলিশয্যায় শয়িত আছেন। কিন্তু "ক্ষত বক্ষঃস্থল তাঁ'র, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা!" এবং তাঁহার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ডকায় দেশী কুকুরও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া মরিয়া পড়িয়া আছে। ব্যাপার কি, কিছু বুঝিলে কি? রাত্রিকালে ঐ পরগৃহপ্রবেশ-দোষে দুষ্ট ও দুর্ব্বৃত্ত কুকুরটার সহিত রূপচাঁদের তুমুল

দ্বৈরথ-যুদ্ধ হয়। রূপচাঁদের কটিদেশ পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, তথাপি মহাবীর রূপচাঁদ সারমেয়টার সহিত "রণ দিতে" ইতস্ততঃ করেন নাই, এবং আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া প্রভুর গৃহে চৌরবৎ প্রবিষ্ট ঘৃণ্য কুকুরটাকে দণ্ড না দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যুদ্ধটা এমনই নীরবে চলিয়াছিল যে, বাড়ীর লোকে কেহ কোন কোলাহল শুনিতে পায় নাই।

আমরা সেই বীরশ্রেষ্ঠকে অতি সম্মানের সহিত ভূপ্রোথিত করি এবং তাঁহার কবরের উপর এই কয়টি কথা লিখিয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু লোকে পাছে ভাবে যে, আমরা বড় বাড়াবাড়ি করিতেছি, তাই কথা-কয়টি এত বৎসর মনেই রাখিয়াছিলাম। আজ রূপচাঁদের স্মৃতিচর্চ্চা-দিনে লোকলোচনের গোচর করিয়া দিলাম—

"জীবন করিয়া তুচ্ছ, উচ্চ করি' শির,
শত্রু সারমেয়সনে যুঝিয়াছ, বীর!
কি কর্ত্তব্যজ্ঞান তব,—মরণেও স্থির!
লহ উপহার, বৎস, প্রভু-আঁখি-নীর।"

রূপচাঁদ চিরকুমার ছিলেন। বিবাহে তাঁহার কোন দিনই রুচি দেখা যায় নাই। বানরী দেখিলে, তিনি এমনই লাজুক ছিলেন যে, কোণে আশ্রয় লইতেন। এবিষয়ে তাঁহার এই আচরণের সহিত মানব-চিরকুমারদিগের আচরণের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কুকুরের পেটে ঘোড়া।

১০ই ডিসেম্বর ১৯১১, ৮৩·৩৭ দক্ষিণ-নিরক্ষান্তর।

মটরারোহীদল ৮১·১৫ নিরক্ষান্তরে ফিরিয়া আসিলে, আমরা আবহাওয়া ভাল হইয়া উঠিবে এই আশা করিয়া ক্রমেই দক্ষিণে আগাইয়া চলিলাম। ৮২·১৯ নিরক্ষান্তরে দ্বিতীয় ঘোড়াটিকে সংহার করা হইল, ৮২·৪৫ নিরক্ষান্তরে তৃতীয় অশ্বটিকে লোকান্তরে প্রেরণ করা হয়। ৮৩তম সমান্তরাল-রেখায় আর দুইটি অশ্ববধ করা গেল। এই ঘোড়াগুলির একটীও শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই, কিন্তু বোঝা হাল্‌কা করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাদিগকে মারিয়া কুকুরগুলিকে খাইতে দেওয়া হয়।

যত আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আবহাওয়া তত খারাব হইতে লাগিল, প্রায়ই তুষার-বৃষ্টি হইতে লাগিল। আকাশ অনবরত ঘোলা হইয়া রহিল, ভূমি কচিৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় সোঝা পথ ধরিয়া বা একনাগাড়ে চলা বড় কষ্টকর হইয়া উঠিল। যাহা হউক, ঘোড়াগুলি চমৎকারভাবে মাল টানিয়া লইয়া চলিল। কাপ্তেন ওট্‌সের পরিচালনা-কৃতিত্বেই তাহারা ঐরূপ শ্রম করিয়াও বেশ সুস্থ রহিল।

বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও ৪ঠা ডিসেম্বরে আমরা ৮৩·২৪ নিরক্ষান্তরে পহুঁছিলাম। আমরা পাঁচটী ঘোড়া লইয়া পরদিনের প্রভাতেই "গ্লেসিয়ারে" পহুঁছিতে পারিতাম, কিন্তু দক্ষিণ-প্রভঞ্জনের প্রতিবন্ধকতাহেতু পারিলাম না। ঐ দক্ষিণা তীব্র-বায়ু চারিদিন ধরিয়া প্রবাহিত হইল। ঐ স্থানহইতে ভূমি যদিও দুইক্রোশমাত্র দূরে ছিল, তথাপি ঐ চারিদিন আমরা ভূমি লক্ষিত করিতে পারি নাই।

বাতাস বড়ই জোরে বহিতেছিল, আর এক-একসময় বিপর্য্যয়রকম তুষার পড়িতেছিল। তাম্বু ও ঘোড়া আমাদের প্রায়ই তুষারগর্ভহইতে খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইতেছিল। তাহার পর, তাপমান-যন্ত্রে তাপ ৩৫ ডিগ্রি (ধন) পর্য্যন্ত উঠিল। আর তুষার গলিয়া আমাদের সব সাজ-সরঞ্জামগুলি একেবারে জলার্দ্র করিয়া দিল।

ডিসেম্বরমাসে এখানে ঐপ্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী ঝড়ের কথা ইতঃপূর্ব্বে শুনা যায় নাই। যে রাত্রে ঝড় থামিয়া গেল, সে রাত্রে ১৮ ইঞ্চি আর্দ্রতুষার আগেকার কোমল সমুদ্র-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অগ্রগামী ঘোড়া যদি তুষার-বারণ খড়ম এবং সহযাত্রীরা যদি "স্কাই"-নামক একপ্রকার বিচিত্র বিনামা না পরিত ও পরিতেন তাহা হইলে আমরা মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতাম না।

চারিক্রোশ পথ চলিতে আমাদের চৌদ্দঘণ্টা অনাহারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। প্রথমে যেখানে আসিয়াছিলাম, সেইখানেই অশ্বগুলিকে বিনষ্ট করা হয়, কারণ তাহাদের রসদ ফুরাইয়া গিয়াছিল।

বড় গ্লেসিয়ারে (চিরনীহার বাহু।)

আজ আমরা গিরিসঙ্কটের মধ্যদিয়া বিয়াউমোর-নামক অতিপ্রকাণ্ড সচল চিরনীহারময় বাহুতে অবতরণ করি, কিন্তু অপরিসীম কষ্টে, বারঘণ্টা পরিশ্রমে এই কার্য্যে সফল হই। ব্যাত্যানীত কোমল তুষারগুলি গিরিসঙ্কটপর্য্যন্ত আসিয়াছে। যাঁহারা পদব্রজে যাইতেছিলেন, তাঁহাদের চরণ হাঁটুপর্য্যন্ত আর স্লেজগুলির আড়কাটপর্য্যন্ত অনবরত তুষারে বসিয়া যাইতেছিল। কুকুরেরা কিছু সাহায্য করিতেছিল বটে, কিন্তু এপ্রকার সমুদ্রক্ষেত্রে তাহাদের উপর গুরুভার ন্যস্ত করা যাইতেছিল না।

এই চিঠিখানি আমি, যে দল প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাদের হাতে পাঠাইতেছি। আমাদের দল এখনও বেশ কার্য্যক্ষম আছেন, কিন্তু ঠিক সময়ে দক্ষিণকেন্দ্রে পহুঁছিবার আশা আর আমাদের নাই। ঝড়ের দরুণ পাঁচটি দিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহার পরিণাম-

ফলহেতু আমাদের আরও বিলম্ব হইতে পারে, তাহা হইলে ব্যাপারটি বড় গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। অন্যথা আর যেমন যেমন মতলব আঁটা গিয়াছিল, তেমনই হইয়াছে। গ্লেসিয়ারের মধ্যে আরও অগ্রসর হইলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি হইবে, আমরা এইরূপ আশা করিতেছি। আমরা স্বভাবতঃ আবহাওয়ার বশে রহিয়াছি, এপর্য্যন্ত উহা আশাজনক হয় নাই।

তুষারে নিমজ্জন।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯১১।

আমরা এখন ৮৫°৭ দক্ষিণ-নিরক্ষান্তরে এবং ১৬৩°৪ পূর্ব্ব-দ্রাঘিমায় আসিয়াছি। এস্থানের উচ্চতা অনুমান ৬৮০০ ফিট। এই স্থানটী "ডারউইন"-পর্ব্বতের ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে ও ২ ক্রোশ দক্ষিণে।

শেষ-পত্রে যে ঝড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে এই গ্লেসিয়ারের নীচের দিক্‌টা ভয়ানক নরম তুষারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা হাঁটিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের চরণ প্রতিপদক্ষেপে হাঁটু-পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছে। "স্কাই" না পরিলে, এইস্থানহইতে অগ্রগমন একান্ত অসম্ভব হইত, কারণ স্লেজগুলি বারবার তুষারে বসিয়া যাইতেছে, বারবার টানিয়া তুলিতে হইতেছে। চারিদিন-ধরিয়া আমরা এই জলা দিয়া চলিয়াছি, এগার ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়াও দিনে আড়াই ক্রোশের বেশী আগাইতে পারি নাই। এই-প্রকার সমুদ্রক্ষেত্রে তাম্বু-গাড়া বা স্লেজ-বোঝাই করা কষ্টকর। পঞ্চমদিনে সমুদ্রক্ষেত্র কঠিনতর হইল, তখন আমরা "স্কাই" পরিয়া একটু আগাইয়া যাইতে পারিলাম। ১৭ইএর পূর্ব্বে আমরা "ক্লাউডমেকার"-(মেঘকর) পর্ব্বতের রুজু রুজু হইতে পারি নাই। ঝড়ে আমাদের একসপ্তাহের অগ্রগমন-প্রতিরোধ করিয়াছে।

১৬ইএর পরহইতে আমরা বেশ চলিতে পারিয়াছি, এক-এক-দিন সাড়ে ছয় ক্রোশহইতে সাড়ে দশক্রোশপর্য্যন্ত পথ চলিয়াছি।

আমার 'প্রোগ্রাম'-(নির্ঘণ্ট) অনুযায়ী আমি ৮৫তম সমান্তরাল-হইতে আটজন লোক ও বারোটি চৌকির খাদ্য লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, ইহাহইতে কিছু বাঁচিবে, আমার এই আশা ছিল। এখন আমাদের হিসাবমত আধবেলার খোরাক কম পড়িয়াছে, সুতরাং যাত্রাটি ভালয় ভালয় সম্পন্ন করিবার এখনও আমাদের উত্তম সুযোগ আছে।

আবহাওয়া এখনও খারাব রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ভূমি আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইতেছে। নীহার-প্রবাহে মাঝে মাঝে ফাটল দেখা দিতেছে, সে সকল স্থান কুয়াসায় আচ্ছন্ন।

সকলেরই স্বাস্থ্য খুব ভাল আছে। তাই সকলেই বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতেও রহিয়াছে। কোন্ চারিজনকে এই পত্রখানি দিয়া ফেরৎ পাঠাইব, তাহার নির্ণয় করা সহজ হয় নাই।

এখন যাঁহারা অগ্রগমন করিতেছেন, তাঁহাদের নাম এই—

স্কট্, লেফ্‌টন্যাণ্ট এভন্স, ডাক্তার উইলসন, লেফ্‌টন্যাণ্ট বাওয়ার্স, কাপ্তেন ওট্‌স, মিঃ ল্যাশ্‌লি এবং নায়েব-নাবিক এভন্স ও ক্রীন্।

* * * *

গ্লেসিয়ার-চৌকী ছাড়িয়া অবধি আমরা মোটের উপর প্রতিদিন সাড়ে সাতক্রোশ করিয়া চলিতেছিলাম। খ্রীষ্টমাসের দিন আমরা ৮৬তম সমান্তরাল-রেখার প্রায় কাছে গিয়াছিলাম। খ্রীষ্টমাসের উৎসব-ভোজের আশায় আমরা একদিনে সাড়ে আট ক্রোশ পথ চলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরদিন আমরা ভাল বোধ করিতেছিলাম না। নববর্ষের অধিবাস-দিনে আমরা ৮৭°৫৬ নিরক্ষান্তরে পঁহুছি।

* * * *

শেষযাত্রা।

কাপ্তেন স্কট্, ডাক্তার উইলসন, কাপ্তেন ওট্‌স, লেফ্‌টন্যাণ্ট বাওয়ার্স, নায়েব-নাবিক এভন্স এই পাঁচজনে সর্ব্বশেষ অভিযানটিতে ছিলেন। তাঁহাদের কাছে একমাসের খোরাক ছিল। তাপ-পরিমাণ ২০ (ঋণ) ডিগ্রী ছিল। সূর্য্যালোক দুর্লভ ছিল না।

কমাণ্ডার এভন্স এই অভিযানের দ্বিতীয় কর্ম্মচারী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কাপ্তেন স্কটের মেরুযাত্রার শেষাংশের এই-প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

"১৯১২ সালের জানুয়ারী-মাসে কাপ্তেন স্কট্ কেন্দ্রহইতে ৭৫ ক্রোশ দূরে থাকেন। সেখানহইতে তিনি, উইলসন্ (বৈজ্ঞানিক), ওট্‌স, বাওয়ার্স (রসদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) ও এভন্স (স্লেজ ও সাজ-সরঞ্জামাদির কর্ম্মচারী) এই পাঁচ জনে মেরু-অভিমুখে যাত্রা করেন। আবহাওয়া বড় খারাব হইয়া উঠে, তথাপি তাঁহারা ১৮ই জানুয়ারী কেন্দ্রে পঁহুছিয়া আমণ্ডসেনের তাম্বু ও দলিলাদি দেখিতে পান। আমণ্ডসেন ১৪ই ডিসেম্বর-(১৯১১) তারিখে কেন্দ্রে পঁহুছেন। ফিরি-বার পথে আবহাওয়া একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠে। এভন্স মস্তিষ্কস্তম্ভন হইয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারী মারা পড়েন, কাপ্তেন ওট্‌স ১৭ই মার্চ্চপর্য্যন্ত যুঝেন, তাহার পর যখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার দুর্ব্বলতাহেতু অন্যে কষ্ট পাইতেছেন, তখন তিনি অন্যের ভারভূত না হইয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত তুষার-প্রান্তরে আত্মপ্রাণ-বলি-দান করেন।" অভিযানসম্বন্ধে ডাক্তার উইলসনের সহিত শ্যাকল্‌টনের একসময়ে এইপ্রকার কথোপকথন হয়, শ্যাকলটন্ জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেহ বড় অসুস্থ হইয়া পড়িলে, কি করেন?"

তাহাতে ডাক্তার উইলসন্ এই উত্তরপ্রদান করিয়াছিলেন,—"যদি কোন অসুস্থ সঙ্গী দেখেন যে, তিনি ভারভূত হইয়া অন্যের জীবন-সংশয় করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি দল ছাড়িয়া চলিয়া যান!"

কাপ্তেন ওট্‌সও তাহাই করিয়াছিলেন।

বাকী তিনজন যাত্রী দুর্ব্বল, অনশনক্লিষ্ট, ও ভগ্নচিত্ত হইয়া

পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন, আর "ওয়ানটন"-আড্ডাহইতে সাড়ে পাঁচক্রোশ পিছনে একটী চৌকিতে পঁহুছিলেন। সেখানে প্রচুর খাদ্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ জমা করা ছিল, কিন্তু ঐ পথটুকু চলিয়াই তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। একটা ঝড় উঠাতে তাঁহারা তাম্বু গাড়িতে বাধ্য হইলেন। ঝড় নয়দিন ছিল, কিন্তু নয়দিন অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই ঐ বীরত্রয়ের ইহলীলার অবসান হয়।

তাঁহাদের জীবিত সহযাত্রীদের কয়েক জন তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে গিয়া মৃতদেহগুলি পান। তাঁহারা তাঁহাদিগকে কবর দিয়া কবরের উপরে ক্রুশচিহ্ন বসাইয়া আসেন। কাপ্তেন স্কট্ যে শেষ-দিনলিপি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার একাংশে এই কয়টি কথা লিখিত আছে—

"আমরা যদি বাঁচিয়া থাকিতাম, আমি আমার সঙ্গীদিগের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, বীরত্ব, ধৈর্য্যের এমন একটী কাহিনী বলিতে পারিতাম, যাহাতে ইংরাজমাত্রেরই হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। এই খসড়া মন্তব্যগুলি ও আমাদের মৃতদেহই এখন সেই কাহিনীটি কহিবে।

আমাদের দেশের সম্মানার্থে এই উদ্যোগে আমরা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়াছি, এখন আমার স্বদেশীয়গণের সমীপে আমার নিবেদন এই যে, যাঁহারা আমাদের উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের যেন উপযুক্তরূপে তত্ত্বাবধান করা হয়।

আমাদের দেশের ন্যায় সমৃদ্ধ ও সমুন্নত দেশ নিশ্চয়ই আমাদের আশ্রিতগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সমুচিত ব্যবস্থা করিবে।"

-:*:

বাষ্পীয় শস্যমর্দ্দক।*

বাষ্পীয় শস্যমর্দ্দন-যন্ত্র "বালকের" তরুণমতি পাঠক-পাঠিকাগণ ইতঃপূর্ব্বে, বোধ করি, কখনও দেখেন নাই। ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্রই এই যন্ত্রটির দ্বারাই শস্যমর্দ্দন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতে এই যন্ত্রের ব্যবহার অদ্যাবধি বড় বিরল। বর্ত্তমানে এই যন্ত্রটির সাহায্যে ভারতে শস্যমর্দ্দন-কার্য্য কতদূর সুবিধাজনক হইবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপীয় কৃষি-জীবিগণ গঙ্গাতীরে কুঠী-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শীতঋতুতে বিহারাঞ্চলে গোধূমের চাষ করিতেন; তাঁহারা অনেকটা করিয়া ভূমিতে ছোলাও বুনিতেন, আর এই সমস্ত শস্যমর্দ্দনার্থে তাঁহারা প্রায় সকলেই বাষ্পীয় শস্যমর্দ্দক-ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে আর ঐ যন্ত্রটির বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস এই, ঐ যন্ত্রটির ঐ স্থানে ব্যবহার করিয়া যখন এককালে সুফল

বাষ্পীয় শস্যমর্দ্দন-যন্ত্র।

* এই প্রবন্ধ ও এতৎসহ মুদ্রিত চিত্রদুইটী The Agricultural Journal of Indiaর সম্পাদকের সানুগ্রহ-অনুমতিক্রমে ঐ পত্রিকাহইতে অনূদিত ও গৃহিত হইয়াছে।—"বালক"-সম্পাদক।

পাওয়া গিয়াছে, তখন উত্তরকালে উহা ভারতের অনেক স্থানেই কৃষাণকুলের এক অত্যাবশ্যক বস্তুমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। এই যন্ত্রটির ব্যবহার করিলে একটী বিশেষ উপকার এই পাওয়া যায় যে, ইহার সহিত দুইটী পেষণী সংলগ্ন আছে, সে দুইটির দ্বারা খড়-কর্ত্তন ও গুঁড়ান-কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয়। শস্যের খোসাগুলি একেবারে ঐ যন্ত্রহইতে 'ভুসি' হইয়া বাহির হয়

সময়ে অনেক কাজ হয়, কিন্তু দরিদ্র কৃষকের পক্ষে এই যন্ত্র-ক্রয় আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে এক কাজ করিলে দরিদ্র কৃষকও এই যন্ত্রটির ব্যবহার করিয়া শ্রম-লাঘব করিতে পারে। প্রতিগ্রামে বহু কৃষক পাশাপাশি ভূমিতে চাষ করিয়া থাকে, তাহারা সকলে মিলিয়া একটী যন্ত্র-ক্রয় করিলে, সকলেরই উপকারে আসিতে পারে। কিন্তু যে দেশে প্রতিবেশী কৃষকে কৃষকে অহি-নকুল-সম্বন্ধ, সে

ভারত-প্রচলিত উপায়ে শস্যমর্দ্দন।

ভারতে সাধারণতঃ যে উপায়ে শস্যমর্দ্দন করা হয়, সেই উপায়ে বা শস্যমর্দ্দন-যন্ত্রের দ্বারা শস্যমর্দ্দন করিলে খরচ কম পড়ে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে শস্যগুলি থলিয়া-বোঝাই করা এবং সরেস, নিরেস ও মাঝারি এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করাও যায়। আবার ইচ্ছা যদি হয়, কেবল এক-রকমই ছালা-বোঝাই করা চলে। যেখানে কোন কৃষক শত শত মণ শস্যের চাষ করে, সেখানে এই যন্ত্রের ব্যবহার করিলে অল্প

দেশে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র! ইংলণ্ডে বহু কৃষকে মিলিয়া একটী শস্যমর্দ্দন-যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রতি কৃষকের কাছে ঐ যন্ত্রটি কয়েকদিন করিয়া থাকে, তাহার কার্য্য হইয়া গেলে, অন্য কৃষকে লইয়া যায়। ভারতীয় হলধরগণ এইরূপ মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিলে যে কি উপকার-লাভ হইবে, তাহা বলা যায় না।

তবে লাভ কি ?

অধিকাংশ ছেলে, বোধ হয়, সহস্রবার মনে মনে আপনাদিগকে উক্ত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছে। অধিকন্তু তাহারা অনেক সময়ে তাহাদের ঐ প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয় নাই। তবে লাভ কি? তোমরা কতবার মনে মনে এই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিয়াছ! অনেক ছেলে বেশ উৎসাহের সহিত কোন-না-কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহাদের আশা শীঘ্র পূর্ণ না হইলে, তাহাদের মন ক্রমে ক্রমে অন্যরূপ হইয়া যায়। শেষে তাহারা প্রায় নিরাশ হইয়া আপনাদিগকে এই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করে,—'তবে লাভ কি'? ছেলেরা কেন, বিস্তর আশাহত বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিও মনে মনে ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছে।

আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা কিছুক্ষণ নিভৃতে বসিয়া উক্ত প্রশ্নটীর সঙ্গে যেন তর্ক-বিতর্ক কর। তাহা হইলে, তাহার প্রতি তোমাদিগকে কিপ্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, তোমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে। গত শনিবার, হয় ত, তোমরা অন্য কোন স্কুলের ছেলেদের সহিত ফুটবল খেলিতেছিলে। তোমরা প্রথমে এমন সাহস ও উৎসাহের সহিত খেলিলে যে, বিপক্ষ-দল অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু তাহাদের 'কোটে' অনেকক্ষণ ঠেসাঠেসি ও হুড়াহুড়ি করিয়াও তোমরা কোন মতে 'গোল' করিতে পারিলে না। তাহার পর, বিপক্ষ-দল তোমাদের আক্রমণহইতে হঠাৎ মুক্ত হইয়া 'গোল' করিল, এবং একটু পরে আরও একটা 'গোল' দিল। সেই অবসরে তোমাদের একজন খেলোয়াড় বলিয়া উঠিল, "আর কেন? আর চেষ্টা করিয়া লাভ কি? আর আমরা জিতিতে পারিব না।" আর একজন খেলোয়াড় তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "চুপ্, গাধা, আমাদের এখনও সময় আছে।" ঠিক কথা বটে, কিন্তু আর পাঁচজন ঐ প্রথম খেলোয়াড়ের নৈরাশ্য-জনক কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শিথিল হইয়া পড়াতে, তোমাদের দলের আর আশা রহিল না। ঐ পাঁচজন ছেলে যদি উক্ত কথাকে মনে ঠাঁই না দিয়া এই উত্তর দিত, "লাভ আছে বই কি, আমরা এখনও জিতিতে পারিব," তাহা হইলে ঐ দুর্ঘটনা না ঘটিবার সম্ভাবনা হইত। প্রত্যেক বালকের নিজ মনহইতে ঐপ্রকার নৈরাশ্য-ভাব দূর করিয়া দিয়া সমস্ত বিপদ্ বা প্রলোভনের সময়ে এইপ্রকার কথা মনে মনে কহা উচিত, "চেষ্টা করিলেই, লাভ হয়।"

এমন অনেক বালক আছে, তাহারা যেন একপ্রকারে ক্লান্ত হইয়াই জন্মিয়াছে। তাহাদের জীবন দেখিয়া আমাদের বোধ হয়, যেন তাহারা সর্ব্বদাই ক্লান্ত। কেহ তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে বলিলে, তাহারা বলে, "ও ক'রে লাভ কি?" এইপ্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহারা প্রায়ই অলস হইয়া বসিয়া থাকে, কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ঐপ্রকার ছেলেরা তাহাদের চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলে।

হয়ত তোমাদের অনেকে মনে মনে আপনাদিগকে ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিতেছ। তোমরা প্রলোভনের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তোমরা ঈশ্বরের সেবা ও অপর লোকের মঙ্গলসাধন করিতে চাও, কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়াতে তোমরা হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ। আর চেষ্টা করিয়া, লাভ কি? তোমরা অনবরত মনে মনে আপনাকে আপনি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছ। বালকমাত্রেরই যে কেন হতাশ না হইয়া ঈশ্বর ও সত্যের পক্ষে সাহস ও অধ্যবসায়-সহকারে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত, আমি অতি সংক্ষেপে তাহার দুই-একটী কারণ দেখাইতে চাহি। প্রথম কারণ হইতেছে এই, অন্য ছেলেরা তোমাকে দেখিতেছে; তুমি কি করিবে বা না করিবে, ইহা দেখিবার জন্য অন্যান্য ছেলে অপেক্ষায় আছে। আমরা সকলেই একজন অন্যজনের উপর প্রভাব-বিস্তার করিতেছি। এমন হইতে পারে যে, তোমার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক কোন ছেলে তোমাকে একপ্রকার বীর বলিয়া মানে। সে তোমাকে তাহার আদর্শস্বরূপ করিয়াছে। তুমি যাহা করিবে, তাহা সেও করিবে। তবে বুঝিতে পারা যায়, তুমি যদি সৎপথে চলিতে চলিতে সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেও, তাহা হইলে একটী লাভ এই হইবে যে, উক্ত ছোট ছেলেটি অনেক মহাবিপদ্‌হইতে রক্ষা পাইবে। অন্যদিকে আবার তুমি যদি "লাভ কি, লাভ কি"?—সর্ব্বদা এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিতে থাক, তাহা হইলে তোমার আদর্শানুসারে ঐ ছেলেটীর চরিত্র একেবারে শিথিল, এমন কি খারাব হইয়া যাইবে।

প্রাণপণে সংগ্রাম করিবার দ্বিতীয় কারণ এই, তুমি যদি সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে সৎপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতে থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, তুমি স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছ। এই মনোভাব কেমন সুন্দর! ইহা মনে মনে পোষণ করিতে পারিলে, আমাদের চমৎকার উন্নতি হইবে। ত্যাগস্বীকার করিলে, লাভ কি? অপরের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিলে, লাভ কি? যথেষ্ট লাভ হইবে; আমরা তদ্দ্বারা কেবল যে অপরের মঙ্গলসাধন ও আমাদের নিজেদের চরিত্র-গঠন করিতে পারিব, তাহা নয়; ঈশ্বর এই পৃথিবীতে যে প্রেম, শান্তি ও ধার্ম্মিকতারূপ রাজ্য স্থাপিত করিতে-ছেন, আমরা সেই রাজ্যস্থাপনে তাঁহার সহকর্ম্মী হইব। তবে বিপদ্ ও প্রলোভনের সময়ে নিরাশ বা সাহসহীন হইও না; অধ্যবসায়ের সহিত সৎপথে চলিতে থাক; জানিও যে, ঐরূপ চেষ্টা কোনমতে বৃথা হইবে না, লাভ হইবেই হইবে।

বিবেক-বৃশ্চিক।

১

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে,——পুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছুটিও হইয়া গিয়াছে। ছেলেরা এখন বিদ্যালয়ের "হাতায়" "ক্রিকেট" খেলিতেছে; কিন্তু অতি অল্প বালকই খেলা দেখিতেছে, অধিকাংশ বালকই "বিপ্রেন্দ্র"-বৃত্তির কথা-আলোচনা করিতেছে। তোমরা জান, ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিতে পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রতিবিদ্যালয়ে একটী প্রাথমিক (Test) পরীক্ষা হয়, আজ সেই প্রাথমিক পরীক্ষার ফল-বাহির হইয়াছে, তাই আজ ছেলেরা এ বৎসর "বিপ্রেন্দ্র"-বৃত্তিটি কে পাইবে, এই বিষয়ে মতপ্রকাশ, অনুমানাদি করিতেছে।

প্রথম-শ্রেণীতে এ বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বালক সুধীরচন্দ্র তরফ্দার; সে আচার্য্য শশিশেখর তরফ্দারের একমাত্র পুত্র-সন্তান। শশিশেখর-বাবুর বেতন বড় অল্প, পোষ্য অনেকগুলি; কাজেই তাঁহাকে বিলক্ষণ হাত টিপিয়া খরচ-পত্র করিতে হয়। পিতা স্বয়ং অর্থাভাবে মনের সাধ মিটাইয়া পড়া-শুনা করিতে—জীবনে বিশেষ কোন উন্নতি-লাভ করিতে পারেন নাই; পাছে তাঁহার পুত্রেরও সেই দুর্দ্দশা হয়, এই ভয়ে তিনি স্বীয় বসন-ভূষণে বিন্দু-মাত্র বাবুগিরি না করিয়া পুত্রটির শিক্ষার্থেই অধিকাংশ অর্থব্যয় করেন। সুধীর, তাহার পিতা তাহার নিমিত্ত যে কি ত্যাগস্বীকার করিতেছেন, তাহা যদিও জানে না, তথাপি তিনি যে অতিকষ্টে তাহার লেখা-পড়ার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেছেন, এ কথা বুঝে। সেইজন্য সে তরুণবয়সসুলভ জলন্ত উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত পাঠাভ্যাসে রত থাকে। প্রাথমিক-পরীক্ষায় সে-ই প্রথম, আর হরিপদ ভৌমিক দ্বিতীয় হইয়াছে।

হরিপদ ভৌমিক ছেলেটিও মন্দ নহে; শ্রেণীর মধ্যে সে-ই সুধীরের প্রায় সমকক্ষ,—প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য। সে এক ধনী আড়তদারের পুত্র; আড়তদারমহাশয় ছেলেপিলেকে ইংরাজী পড়াইবার বড় পক্ষপাতী নহেন, কারণ তাঁহার ধারণা আড়তদারী করিয়া যত রোজগার হয়, ছেলেপিলেকে পড়াইলে তাহারা চাকরী করিয়া তাহার সিকির সিকিও রোজগার করিতে পারে না। তবে তিনি হরিকে ইংরাজী পড়াইতেছেন কেন? আড়তদার যতই বড়লোক হউন না, লোকে তাঁহাকে সহজে 'বাবু' বলিতে চাহে না,—হরির পিতার মনে এই একটা ক্ষোভ আছে, তাই তিনি পুত্রের পক্ষে 'বাবু'-উপাধিটি যাহাতে সুলভ হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

ছেলে ভাল!

রূপচাঁদ খুব খুসি না কি?—ভারি খুসী।—'একজামিনে' পাশ করেছে না কি? 'মাষ্টার'-পণ্ডিত খুব তারিফ ক'রেছে না কি? 'প্রাইজ' পেয়েছে নাকি?—না; তা'র অঙ্কের 'মাষ্টারের' পা ম'চ্‌কে গেছে, তিনি আজ 'স্কুলে' আস্‌তে পা'রবেন না, তাই এত স্ফূর্ত্তি।

"বিপ্রেন্দ্র"-বৃত্তিটি কি, তাহা এখনও বলা হয় নাই।—উ, ই, বিদ্যালয়টি যে মহকুমায় অবস্থিত, সেই মহকুমার বাবু বিপ্রেন্দ্র রায়-চৌধুরী—বড় জমীদার, কথিত বৃত্তিটি তাঁহারই অর্থে ও নামে স্থাপিত। ঐ বৃত্তিটির মূল্য মাসিক বিংশতি-মুদ্রা, উহা পঞ্চবর্ষস্থায়ী অর্থাৎ বৃত্তিভুক্ উহা পাঁচবৎসর ভোগ করিতে পায়, ঐ অর্থে বৃত্তিভুক্ কলিকাতার কোন 'কলেজে' গিয়া পড়ে। আড়তদার-মহাশয় টাকা লইয়া 'ছিনিমিনি' খেলেন, তাঁহার ছেলে কোন বৃত্তি-লাভ করুক বা না করুক, তাহাতে তাঁহার

কিছুই আসিয়া যায় না। তবে তিনি, ব্যবসাদার লোক কি না, প্রতি টাকার 'বেয়াজ' কত, তাহা বিলক্ষণ বুঝেন, ছেলে যদি বৃত্তি-লাভ করিয়া প্রায় বিনাব্যয়ে কলিকাতায় গিয়া, 'কালেজে' পড়িতে পায়, তাহাতে তিনি আনন্দিতই হইবেন। সুধীর ও সুধীরের দরিদ্র পিতার কিন্তু ঐ বৃত্তিটির উপরই ভরসা, উহা না পাইলে, সুধীরের আর পড়া-শুনা চলিবে না।

যাহা হউক, সুধীর ও হরি উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বটে, তথাপি উভয়ের মধ্যে কোন মনোমালিন্য নাই। অদ্য অপরাহ্নে তাহারা উভয়ে এই সময়ে আগামী পরীক্ষার কথা বলাবলি করিতেছে। কেননা চরম-পরীক্ষার আর বড় বিলম্ব নাই।

তখনও বেশ রৌদ্র আছে, তাহারা দুইজনে তাই এক বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়াছে। হরি বটগাছের গুঁড়িটায় ঠেস্ দিয়া একটু ঔদাসীন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর পড়া-শুনা কেমন হয়েছে?"

সুধীর উত্তর দিল,—"অমনি একরকম; ইংরাজি, "হিষ্ট্রি" আর সংস্কৃতয় ত'রে যা'ব ব'লে বোধ হচ্ছে—অঁাকেই কিন্তু আমায় পেড়ে ফে'ল্‌বে। আমি রাতে শুয়ে শুয়ে 'ঘ্যালজ্যাব্‌রার প্রব্লেম' আর 'জিয়োমেট্রির একস্ট্রার' দুঃস্বপ্ন দেখি।"

হরি হাসিয়া উঠিল। এমন সময়ে এই বৎসর প্রথম-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে, এমন একটী বালক আসিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইল। বলিল,—"এখনও একজামিনের কথা চ'ল্‌ছে যে। এই গরমে এবছর যে আমায় ক'ল্‌কাতায় গিয়ে একজামিন্ দিতে হ'ল না, এ আমার আর-জন্মের অনেক পুণ্যের ফল। 'সেনেট-হাউসে' ছেলেদের পেঁপে, তরমুজ আর বরফ খেতে দেওয়া উচিত!"

হরি বলিল,—"তা' আর ব'লতে! তবে দুঃখের বিষয়, 'রেজিষ্ট্রার'-সাহেবের অতখানি দয়া হ'বে না।"

এমন সময়ে আর একটী বালকও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আচ্ছা, হরি, সুধীর যদি স্কলারশিপ্‌টা মেরে দেয়, তোর কি মনে দুঃখ হ'বে?"

হরি প্রশংসনীয় সরলতার সহিত উত্তর দিল,—"কিছু না; ওটা ওরই পাওয়া উচিত। তবে বাবার আড়তটায় যেতে আমার মন সরে না, 'ফেল্' হ'লে, বাধ্য হ'য়ে সেখানে গিয়েই সেঁধুতে হ'বে। ক'ল্‌কেতায় গিয়ে 'কলেজে' প'ড়্‌লে, অনেক মজা আছে, তাই অন্ততঃ একেবারে 'ফেল্'টা যা'তে না হই, তা'র চেষ্টা ক'র্‌ছি।"

* * * *

প্রায় সন্ধ্যা হইল। তাহা দেখিয়া সুধীর ও হরি গৃহাভিমুখে চলিল। দুইজনে একসঙ্গে চলিল, কারণ তাহাদের বাড়ী একই পল্লীতে। হরির বাড়ী বিদ্যালয়ের কাছেই, সুধীরের বাড়ী একটু দূরে। হরি বাড়ী ঢুকিল, সুধীর তখনও পথে। আড়তদার-মহাশয়ের বাড়ীখানি সুবৃহৎ—গৃহসংলগ্ন ফলোদ্যানটিও ক্ষুদ্র নহে। দেখিয়া সুধীরের সহসা তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরের লাউশাক, পুঁইশাক লাগান ক্ষুদ্র আঙ্গিনাটির কথা মনে পড়িয়া গেল,—চিত্তটা একটু অপ্রসন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের দৈন্যের শ্রীহীনতাটুকু আজ যেন তাহার বেশী করিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। কোন হেয় ঈর্ষ্যা তাহার মনে স্থান পায় নাই, বিলাসিতাও তাহার প্রিয় নহে; তবে সেও মানুষ, তাহারও সৌন্দর্য্যানুভূতি আছে; অসুন্দর সুন্দর কিছু দেখিলে, স্বভাবতঃ একটু মনঃপীড়া পায়। যে আজীবন দারিদ্র্য-রাক্ষসীর সহিত যুঝিতেছে, তাহার সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার সাধ মনে উঠিয়া, মনেই মিলাইয়া যায়।

যাহা হউক, যদি সে বৃত্তিটি লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্য জীবন কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এই সুখময়ী কল্পনার আনন্দাবেগে তাহার গতি দ্রুততর হইল। সে হন্‌হন্ করিয়া চলিতে চলিতে কলিকাতা-প্রবাসের সুখ-স্বপ্নে কিছুক্ষণ বিভোর হইয়া রহিল। কিন্তু সহসা তাহার বড় লজ্জাবোধ হওয়াতে, সে সে চিন্তাকে মনহইতে তাড়াইয়া দিল। সে ভাবিল,—"ছি! ক'ল্‌কেতায় যাওয়াই কি এত সুখের? ঘরে কি আমার মা-বাপ আমাকে কিছু দুঃখে রেখেছেন? 'স্কলারশিপে'র জন্য খুব চেষ্টা ক'র্‌ব বটে, তবে আমার নিজের কোন সুখের জন্যে নয়, মা-বাবার এই কষ্ট ঘোচা'বার জন্যে।" তখন আবার ঐ চিন্তায় সুশীল সুধীরের মনে আনন্দ জন্মিতে লাগিল।

তাহাদের কুটীরসমীপে পহুঁছিয়া সুধীর দেখিল, তাহার মা তাঁহার বিশীর্ণ মুখখানি মলিন করিয়া খুকীকে কোলে লইয়া দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি যেন সুধীরেরই প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত-ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সুধীরকে দূরহইতে দেখিয়া বৃতিদ্বার খুলিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অধরে একটু মৃদু হাস্য ফুটিল। সুধীর কাছে আসিলে, তিনি কষ্টে উৎকণ্ঠা-গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'ল 'একজামিনে', কত হয়েছে?"

সুধীর। 'ফাষ্ট' হ'য়েছি, মা।

মা আর কিছু বলিলেন না; আনন্দের আবেগে খুকীকে ভূমিতে নামাইয়া সুধীরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন। তাহার পর খুকীকে আবার কোলে তুলিয়া লইয়া মায়ে পোয়ে ঘরের দাওয়ায় গিয়া উঠিলেন। তখনও জননীর চক্ষুযুগল আনন্দাশ্রুবর্ষণোন্মুখ হইয়া ছিল। সুধীর হাতমুখ ধুইতে লাগিল, মা তাহার খাইবার জন্য পিঁড়া পাতিতে পাতিতে বলি-লেন,—"এখন দেখি, আসলটায় কি কর; ঈশ্বর করুন, যেন তুমি সেখানেও 'ফাষ্ট' হও।"

সুধীর কিছুই বলিল না, মুখহাত গামোছাদিয়া মুছিয়া পিঁড়ির উপর আসিয়া বসিল। মা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া দিলেন। সে নীরবে তাহা আহার করিয়া উঠিয়া পড়িল। পরে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পড়িতে বসিল। পিতা কাজে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

হইলে ঘরে ফিরিলেন। ফিরিয়াই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি গো, সুধীরের খবর কি ?”

স্ত্রী। ‘ফার্ষ্ট’ হ’য়েছে।

পিতার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না ; তিনি একটু উচ্চস্বরে ডাকিলেন,—“সুধীর, অ সুধীর !”

সুধীর উত্তর দিল,—“বাবা !”

পিতা। তুমি ‘ফার্ষ্ট’ হ’য়েছ ?

সুধীর। হ্যাঁ, বাবা।

পিতা। আর, হরি ?

সুধীর। ‘সেকেণ্ড’।

পিতা। বেশ ! তা’ তুমি এখন কি ক’চ্চ ?

সুধীর। প’ড়্‌ছি।

পিতা। আজ আর পড়া-শুনা কেন ? আজ থাক, কাল-থেকে আবার নিয়মমত প’ড়ো ; আজ একটু জিরোও।

মা বলিলেন,—“সুধীর, তবে তুমি আমার কাছে এসে ব’স।”

তরফ্‌দার-বনিতা স্বামীকে গাড়ু, গামোছা ইত্যাদি আগাইয়া দিলেন। তাহার পর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভাত দোব ?”

তরফ্‌দার। না, অবেলায় খাওয়া হ’য়েছে, ক্ষিদে তত নাই, একটু রাত ক’রে খা’ব।

তরফ্‌দার-বনিতা কোলের মেয়েটিকে কোলে লইয়া দুধ খাও-য়াইতে লাগিলেন। সুধীর মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। দুগ্ধ-পান করিয়া খুকী ঘুমাইয়া পড়িল। মা তাহাকে বিছানায় শুয়াইয়া আসিলেন। পরে সুধীরের কাছে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সুধীর তাঁহার বুক-জুড়ান ধন,—নয়নের মণি। পিতাও মুগ্ধ-নয়নে পুত্রপ্রতি চাহিয়া রহিলেন !

পরে পারিবারিক উপাসনা হইয়া গেলে, সুধীর শুইতে গেল।

(ক্রমশঃ।)

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্

“মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক’রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,—
সেই পথ-লক্ষ্য ক’রে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ’রে
আমরাও হ’ব বরণীয়।
সময়-সাগরতীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক’রে
আমরাও হ’ব হে অমর ;
সেই চিহ্ন-লক্ষ্য ক’রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।”

জীবন সঙ্গীত—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ-তারিখে ল্যানার্ক-শায়ারের অন্তর্গত ব্লান্টায়ার-নামক স্থানে ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্-নামে এক বালক জন্মগ্রহণ করেন। মার্চ্চমাসে সভ্যজগতের—বিশেষতঃ গ্রেটব্রিটেনের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মৃতিচর্চ্চা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন ?

“মরে না সে, জীবনে যে করিয়াছে ভালো,
তপন ডুবিয়া যায়,—রেখে যায় আলো ;
গানটি থামিয়া যায়,—র’য়ে যায় রেশ ;
ফুলটি শুকা’য়ে যায়,—রয় গো সৌরভ,
মানুষ মরিয়া যায়,—রয় গো গৌরব ;
মহতের জীবনের নাহি, নাহি শেষ !”

লিভিংষ্টোনের পিতা এক দরিদ্র পর্য্যটক-চা-ব্যবসায়ী এবং ধর্ম্মগ্রন্থবিক্রেতাও ছিলেন। তিনি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রবাসে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারের এবং দেশে প্রার্থনা-সভা-প্রতিষ্ঠার প্রবর্ত্তক ছিলেন। যৎকালে তিনি এই সমস্ত কার্য্য করিতেন, তৎকালে লোকের এই সমুদায় সৎকার্য্যের প্রতি আদৌ অনুরাগ ছিল না, কেহ বরং সাহসপূর্ব্বক এইরূপ কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, লোক-সাধারণের বড় বিদ্রূপভাজনই হইতেন। তিনি ডেভিড্‌কে শ্রেয়সী শিক্ষায় ভূষিত এবং তাঁহার নেত্রসমক্ষে একটী সমুদার ও সরল খ্রীষ্টীয় জীবনের আদর্শ সর্ব্বদা উপস্থাপিত রাখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-নিষ্ঠও করিয়া তুলিয়াছিলেন। লিভিং-ষ্টোনের মাতাও স্ফূর্ত্তিমতী ও মোহিনী, স্নেহময়ী ও অনু-গ্রহশীলা, শ্রমনিষ্ঠ ও ঈশ্বর-ভীরু মহিলা ছিলেন, তাঁহার স্বামীর ন্যায় তিনিও তাঁহার সন্তান-সন্ততির ভক্তিলাভের সম্পূর্ণ যোগ্যা ছিলেন। উত্তর-কালে ইঁহাদের পুত্রকন্যাগণ ইঁহাদের হ্যামিল্টন-গোরস্থানস্থিত কবরপ্রস্তরে এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন—

“নীল লিভিংষ্টোন
ও
তাঁহার বনিতা
ম্যাগ্‌নেস হণ্টারের

বিশ্রামস্থান-নির্দ্দেশার্থে
এবং
তাঁহাদের পুত্রকন্যা,
জন, ডেভিড্, জেনেট্, চার্লস ও য়্যাগ্নেসের,
নিঃস্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠ
মাতা-পিতা লাভহেতু
ঈশ্বরের প্রতি
কৃতজ্ঞতা-প্রকাশার্থে—"

লিভিংষ্টোনের বয়ঃক্রম যখন দশবৎসরমাত্র, তখন তাঁহাকে এক তূলার কারখানায় কাজ করিতে পাঠান হয়। সেখানে তিনি তাঁহার চরকার উপরে একখানি বই রাখিতেন, আর কাজ করিতে করিতে একটু ফুরসৎ পাইলেই বইখানি পড়িতেন, কখনও তিনি এককালে মুহূর্ত্তেকের বেশী অবকাশ পাইতেন, না তথাপি এইরূপে তিনি তাঁহার হৃদয় ও মনের উৎকর্ষবিধানে যত্নবান্ থাকিতেন। তিনি একটীও উপন্যাস পড়েন নাই, কিন্তু ল্যাটিনভাষায় বুৎপত্তিলাভ করেন, এবং ভ্রমণ, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচারোদ্যমবিষয়ক বিবিধ পুস্তক-পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-লাভ করিবার প্রয়াস পান। আলোচ্য বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগার্পণের ও শ্রমশীলতার তিনি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তিনি তরুণবয়সেই খ্রীষ্টকে হৃদয়-দান ও ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবন-কাহিনীর আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মজীবনের সূচনায়ই তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন এবং গ্ল্যাসগো ও লণ্ডনে তদর্থে ধর্ম্ম ও চিকিৎসা-শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন করিতেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি"-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-প্রচারক নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণাফ্রিকার অন্তর্গত আলগোয়া-উপসাগরে উপস্থিত হন, তাহার পর তথাহইতে তিনি "কুরুমানে" প্রস্থান করেন, সেই স্থানে "ডাক্তার মোফাট্"-নামে এক মহাপুরুষ ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য করিতেন। সেখানে পঁহুছিবার অত্যল্পকাল পরেই তিনি সার্দ্ধতিনশত-ক্রোশদূরবর্ত্তী "মাবোট্সা" বলিয়া এক জনপদে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে সেই স্থানে আর কেহই খ্রীষ্টের সুসমাচার-প্রচার করেন নাই। এইস্থানে সেই সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা এক সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও সংগ্রাম হয়।

কোন সময়ে মাবোট্সায় বড় সিংহের উৎপাত হয়। সিংহগুলা রাত্রিকালে গোয়ালহইতে গরু-বাছুর ধরিয়া লইয়া যাইত। এমন কি দিবালোকেও মেষের পালহইতে দুই-চারিটী মেষ ধরিয়া লইয়া যাইতে তাহারা ইতস্ততঃ করিত না। তাই সেই দেশীয় কয়েকটি লোকের সঙ্গে লিভিংষ্টোনও সিংহ-শিকার করিতে যান। তথায় তিনিএকটা সিংহকে গুলি করিয়া তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, কিন্তু তাঁহার "মেবাল-উই" বলিয়া এক কাফ্রী সঙ্গী নিজ প্রাণ-তুচ্ছ করিয়া সিংহটাকে গুলি করে, তাহাতে সিংহটা লিভিংষ্টোনকে ত্যাগ করিয়া তাহার জঙ্ঘায় গিয়া কামড়াইয়া দেয়, পরে আরও একটা লোককে জখম করে, কিন্তু শেষে তাহার অঙ্গপ্রবিষ্ট গুলির যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে। উহাতে লিভিংষ্টোনের একটী হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া খানিকটা স্থানের মাংস উঠিয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার মৃতদেহ ইংলণ্ডে আনা হয়, তখন ঐ ক্ষতচিহ্নই তাঁহাকে চিনিবার উপায়স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ মাবোট্সাতেই তিনি "মেরী মোফাট্"কে বিবাহ করেন, মেরী উত্তরকালে একান্ত পতিরতা ও পতিব্রতা পত্নী হইয়া উঠেন।

যাহা হউক, কয়েকটি বিচিত্র ঘটনাহেতু লিভিংষ্টোন্ ক্রমে আরও অগ্রগমনে বাধ্য হন। একটু একটু করিয়া তিনি আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলটি আবিষ্কৃত করিতে থাকেন, এবং ঐ কার্য্যব্যপদেশে তিনি শক্তিশালী কাফ্রি-অধিনায়কগণের সহিত সৌহৃদ্য-স্থাপন করিতেও সমর্থ হন; তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্য, সহানুভূতি, এবং সুসমাচারের প্রেম-কাহিনীর গুণে তিনি তাঁহাদের হৃদয়াধিকার করিয়া ফেলেন। বিশাল-"কালাহরি"-মরুভূমি পার হইয়া ইউরোপীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে Ngami-হ্রদ প্রত্যক্ষ এবং এক শস্যসম্পৎশালিনী উর্ব্বরা ভূমিদিয়া প্রবাহিতা কুম্ভীরপূর্ণ "জোঙ্গা" নদীটিকে আবিষ্কার করেন। অন্য একটী "মিসন"-আবাস-স্থাপনের অভিপ্রায়ে উপযুক্ত স্থানান্বেষণহেতু তিনি আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পান যে, সাধারণের ভ্রান্তধারণানুযায়ী আফ্রিকার মধ্যস্থলটি অনুর্ব্বর প্রান্তর নহে, উহা বরং অচল ও অরণ্য, তড়াগ ও সরিৎ, সমভূমি ও জলাভূমিপূর্ণ এক সুবিশাল রাজ্য। মধ্য-আফ্রিকা-আবিষ্কার-কালে তিনি বড়ই ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানেরা দারুণ তৃষ্ণায় মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন। একপ্রকারের মক্ষিকা এবং মশকের ঝাঁক তাঁহাদের জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বন্যা-প্লাবিত সরিৎসমূহ এবং সলিলশূন্য মরুভূমি উভয়ই তিনি সপরিবারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন; কারণ পতিপত্নী উভয়েই নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন।

অতঃপর তাঁহাকে পুত্রকলত্রের বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে হইয়া-

ছিল, কারণ এই সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে বিলাতে পাঠাইয়া দেন এবং আপনি একাকী আফ্রিকার অভ্যন্তরে অজ্ঞাত দেশসমূহের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যান। তথায় সর্ব্বত্রই তিনি দাস-ব্যবসায়ে দাস-দাসীদিগের দুঃখ, ভয়ানক ভয়ানক দেশাচার, লোমহর্ষক হত্যা, বর্ব্বরদিগের নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দেখিয়া ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন, এবং যে দিন সুসমাচার বিজয়ী হইয়া এই সমস্ত রুধিররঞ্জিত দৃশ্যের উপর যবনিকা-পাত করিবে, সেই মহাদিনটি দেখিবার জন্য আকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। তিনি এইবার ১১,০০ এগারশত মাইল অর্থাৎ ৫৫০০ ক্রোশ পথ-অতিক্রম করেন। পথে তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না। ভারত-সমুদ্রের দিকে আসিতে আসিতে তিনি জাম্বেসিতে ভিক্টোরিয়া-জলপ্রপাতটী আবিষ্কৃত করেন, উহা জগতের বিচিত্র বস্তুব্যূহের অন্যতম। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যোলবৎসর পরে তিনি বিলাতে ফিরিয়া গিয়া দেখেন যে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ লোক হইয়া পড়িয়াছেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার আফ্রিকায় ফিরিয়া যান এবং ঐ সালেই জাম্বেসি-আবিষ্কার করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিনবার "শায়ারী"-নদীতে জলযাত্রা এবং "শিরওয়া" ও "ন্যাসা"-হ্রদদ্বয়ের আবিষ্কার করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাম্বেসীতে তাঁহার পুরাতন বাসস্থানে মাকোলোলোদের মধ্যে ফিরিয়া যান। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "রোভুমা"-নদীটি আবিষ্কৃত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশনকে কার্য্যারম্ভ করিতে সাহায্য করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁগার সাহসিকা প্রিয়বনিতা জ্বররোগে ইহলীলা-সম্বরণ করেন এবং তাঁহাকে "শূপাঙ্গায়" ভূপ্রোথিত করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ন্যাসা"-হ্রদাবিষ্কার করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষদিয়া দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। দ্বিতীয়বার আফ্রিকায় গিয়া যে কয়-বৎসর তথায় ছিলেন, সে কয়বৎসর তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদাপদ্ দুঃখ-কষ্ট মাথায় করিয়া নানা মহৎ মহৎ আবিষ্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি আরব ও পর্ত্তুগিজদিগের দ্বারা পরিচালিত দাস-ব্যবসায়ের দুর্ব্বৃত্ততা-প্রতিপাদনের এবং ন্যাসামুলুকে একটী মিশন-প্রতিষ্ঠার্থে ব্রিটনকে উত্তেজিত করিবার জন্যই স্বদেশ-প্রত্যাগত হন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শেষবার আফ্রিকা-যাত্রা করেন; ভারতবর্ষ হইয়া আফ্রিকায় "রোভুমা"-নদীপর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তাহার পর, তাঁহার আর খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নাই। কতকগুলি দুষ্টলোক তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ-রটনা করে, তাঁহাকে খুঁজিতে লোক পাঠান হয়, লোকেরা তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইলেও, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ অলীক বলিয়া বুঝিতে পারে। লিভিংষ্টোন্ ইতোমধ্যে আফ্রিকার অতি অভ্যন্তরে Mweru এবং ব্যাঙ্গুউওলো-হ্রদদ্বয় আবিষ্কৃত করেন, কিন্তু জ্বরে ও ক্ষুধায় বড় ক্লেশ পান। তাহার পর, বহুবৎসরাবধি তাঁহার আর কোন খবরাখবর পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া, আমেরিকার এক সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী মিঃ এচ, এম্, স্টান্‌লীকে তাঁহার অন্বেষণে পাঠান। তিনি তাঁহাকে "উজিজিতে" খুঁজিয়া পান এবং লিভিংষ্টোন্ তাঁহাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন, কারণ তিনি তখন অনশনে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। স্ট্যান্‌লী তাঁহাকে গৃহ-প্রত্যাগত হইতে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু লিভিংষ্টোন কিছুতেই কর্ত্তব্যমার্গহইতে রেখামাত্র বিচলিত হন নাই।

তিনি বলেন যে, তখনও তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই। তিনি আবার জলাভূমিমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি অনশনে ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। অনবরত বৃষ্টি পড়িতে থাকিল। দেশটা একটা অন্তহীন জলাভূমি হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার যাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। "চিতাম্বো"'র "ইলালা"-নামে গ্রামে তাঁহাকে একটী কুটীরমধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। পররাত্রে তাঁহার ভৃত্যেরা কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি তাঁহার বিছানার পাশে হাঁটু গাড়িয়া আছেন—তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, শেষনিশ্বাসপর্য্যন্ত তিনি আফ্রিকার দুঃখদুর্দ্দশার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে-তারিখে ঐ মহাঘটনাটি ঘটে।

তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর "সুসী" ও "চুমা" তাঁহার দেহটির শটননিবারণার্থে উহা একপ্রকার দ্রবানুলিপ্ত করে এবং তাঁহার হৃদয়টি যে স্থানে তিনি তনুত্যাগ করেন, সেই স্থানেই ভূপ্রোথিত করা হয়। তাহার পর, নয়মাস-যাবৎ তাহারা নানা অরণ্য, জলাভূমি, শৈল-শ্রেণী এবং বর্ব্বরজাতি ও সিংহসঙ্কুল সমভূমির মধ্য দিয়া তাঁহার সেই মৃতদেহটি বহিয়া লইয়া গিয়া—জাঞ্জিবারে উহা একটী ব্রিটিশ পোতে উঠাইয়া লইয়া ইংলণ্ডে লইয়া যায়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার য়্যাবীতে ইংরাজ-জাতি সাশ্রুনয়নে সেই বীর দেশাবিষ্কারকের দেহের সৎকার করেন। যে স্থানে তাঁহাকে প্রোথিত করা হইয়াছে, সেই স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ শিলাফলকে—তিনি কিপ্রকারে কাহার দ্বারা ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছিলেন, তিনি কে ছিলেন, কোথায় তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছিল, তিনি কি কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি কয়েকটী কথা ক্ষোদিত আছে; আর সর্ব্বশেষে তাঁহার এই প্রার্থনাটি উৎকীর্ণ আছে—

"আমেরিকান, ইংরাজ, তুর্কী—যিনি জগতের এই অনাবৃত ক্ষতটি (দাস-ব্যবসায়) ভাল করিতে সাহায্য করিবেন, তাঁহার উপর যেন ঈশ্বরের মহাশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হয়।"

লিভিংষ্টোন্ আফ্রিকার মধ্যে ২৯,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করেন, এবং ঐ মহাদেশসম্বন্ধে আমাদের ভৌগলিক জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া দেন। খ্রীষ্টের সেবকরূপেই তিনি ঐ কার্য্য করেন।

লিভিংষ্টোনের কি একটী সুন্দর গুণ ছিল যে, দুইদিন কোন লোক তাঁহার সহিত বাস করিলে এক অচ্ছেদ্য সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িত। প্রিয়দর্শন লিভিংষ্টোন বর্ব্বর কাফ্রিদিগেরও হৃদয়-হরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাসহকারে কাহারও হিতসাধন করিয়া যাইলে, সে যত বড়ই শত্রু হউক না কেন, কোন-না-কোন

সময়ে তুমি তাহার হৃদয়-হরণ করিতে পারিবে। লিভিংষ্টোন্ ঐ মন্ত্রেই কাফ্রিদিগের হৃদয়ে এমন একটী সুন্দর স্থানলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেই বর্ব্বর অনুচরদ্বয় তাঁহার মৃত-দেহটি কিছুতেই পরিত্যাগ করে নাই। বহুকষ্ট সহিয়া দেহটি ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিল; ভালবাসা বৃথায় যায় না।

এই আফ্রিকা-পরিব্রাজকের সত্যের প্রতি সম্ভ্রম এবং কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাও তেমনই ছিল। যখন ইনি ডাক্তারী পড়িতেছিলেন, তখন এক ডাক্তার-অধ্যাপকের কাছে আফ্রিকাহইতে বৈজ্ঞানিকের প্রিয় কোন কিছু নূতন বস্তু পাইলে তাঁহাকে আনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। বহুবৎসরের পরে প্রথমবার যখন তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন, তখন সেই অধ্যাপক লিভিংষ্টোন্-প্রদত্ত সেইরূপ একটী উপহার পাইয়াছিলেন।

ষ্ট্যান্‌লী যখন তাঁহাকে দেশে ফিরিতে কাতরভাবে অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন যদি তিনি দেশে ফিরিতেন, বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত না, তিনি আবার কোন সময়ে আফ্রিকায় গিয়া তাঁহার কার্য্যসমাধা করিতে পারিতেন। তাঁহার দেশ তখন তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিলে, তখন, বোধ হয়, তাহা আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিত, তিনি নানা উপাধিতে ভূষিত হইতেন, নানা স্থানে নানা বড় বড় লোক ও সভা-সমিতির নিকটহইতে বহু সম্মান ও সমাদর-লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমনই প্রবল ছিল যে, তিনি এই সমস্ত যশোপাধি-উপেক্ষা করিয়া নানা বিঘ্ন-বিপত্তি, নানা কষ্ট ও উদ্বেগ দেখিয়াও কর্ত্তব্যের পথই ধরিয়া চলিলেন, এবং শেষে কর্ত্তব্য-পালনেই প্রাণ দিলেন।

লিভিংষ্টোন বাক্‌সর্ব্বস্ব লোক ছিলেন না, বরং তিনি বাক্-বিমুখই ছিলেন। তিনি জন-হৃদয় বক্তৃতার দ্বারা আকৃষ্ট করিতে পারিতেন না, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ পটুতা ছিল না, বক্তৃতার নামে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত। ছাত্রাবস্থায় একবার তাঁহাকে এক আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছিল, তিনি উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে দাঁড়াইয়া মূলবচনটিমাত্র বলিয়া প্রচার-বেদী হইতে নামিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি বক্তা ছিলেন না, বক্তৃতাই তাঁহার ধর্ম্মজীবন ব্যক্ত করিত না। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলিত। তাঁহার বক্তৃতার স্বর-লহরী নহে, তাঁহার হৃদয়ের অকপট স্বর্গীয় প্রেমই নরভুক্, পাষাণহৃদয় কাফ্রিদিগের হৃদয়াকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

লিভিংষ্টোন ধর্ম্ম গায়ে মাখিয়া বেড়াইতেন না। তিনি কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেন না। এমন কি খ্রীষ্টাচার্য্য হইলেও তিনি আচার্য্যের বিশিষ্ট বেশ-পরিধান করিতেন না।

তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার, লিভিংষ্টোনের মত লোক একটা দেশাবিষ্কার করিয়া এমনই কি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন? দেখ, তুমি তোমার শুধু নিজের বিষয়েই ভাবিবে, এজন্য সৃষ্ট হও নাই; ঈশ্বর চান যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর বিষয়েও ভাব, দেশের বিষয়ে ভাব, দশের বিষয়ে ভাব, যে আরামটুকু তুমি নিজে ভোগ করিতেছ, তোমার প্রতিবেশী ভাইটিকেও সে আরামের, সে জ্ঞানের, সে সুখ-স্বচ্ছন্দতার, সে সভ্যতার, সে সুবিধাজনক জীবনযাত্রা-প্রণালীর অংশী কর। যে পতিত, তাহাকে তুলিয়া ধর; যে জ্ঞানান্ধ, সাধ্য থাকিলে, তাহার সেই জ্ঞানান্ধতা দূর কর; যে নিপীড়িত, ক্ষমতা থাকিলে, তাহার সেই দুর্দ্দশা ঘুচাও। ইহাই মনুষ্যত্ব। লিভিংষ্টোন আফ্রিকাকে লোক-চক্ষুর গোচর করিয়া এই সমস্ত সৎকার্য্য-সাধন-পক্ষে অনেকের পথ সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ফলে যেখানে মানুষ মানুষকে পণ্যদ্রব্য-বৎ বিক্রয় করিত, এক মানব-ভ্রাতা আর এক মানব-ভ্রাতার রুধির-পান করিতে কুণ্ঠিত হইত না, সেখানে এখন সেই মানুষেরাই ঐশ্বরিক প্রেমে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন দিতেছে। তাহাছাড়া সে স্থানে ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদির যে কত উন্নতি হইয়াছে; কত সৌধ, কত সেতু, কত লৌহবর্ত্ম ইত্যাদি যে নির্ম্মিত হইয়াছে; কত নরপশু যে পশুত্বহইতে নরত্বে প্রত্যানীত হইয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

এইজন্যই লিভিংষ্টোন আজ অনেকেরই নিকট সমাদৃত ও সম্মানিত; সকলেই সকৃতজ্ঞহৃদয়ে সেই মহাপুরুষের স্মৃতিচর্চ্চা করিতেছে।

মার্চ্চ-মাসের সংখ্যায় যে একটী কবিতা-রচনার্থে দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অদ্যাবধি অতি অল্পসংখ্যক কবিতাই আসিয়াছে, তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সংখ্যায় ঐ কবিতা-প্রকাশের স্থানাভাবও ঘটিয়াছে, ঐ কারণে এই সংখ্যায় ঐ প্রতিযোগিতার ফলাফল-প্রকাশ করা গেল না। আগামী গ্রীষ্মাবকাশহেতু এই সংখ্যাটি একটু সত্বরও প্রকাশিত করিতে হইল।—বালক-সম্পাদক।

বালক

২য় বর্ষ।] জুন, ১৯১৩। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্বর্ণসূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই কানন-বাটিকার দক্ষিণদিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিপ্ দিয়া বেশ মাছ ধরা যায়। ছাদে উঠিবার একটি ঘুরান সিঁড়ি আছে, ছাদে উঠিলে এই হরিৎদ্বীপের (এই দ্বীপটির নাম হরিৎ-দ্বীপ) সমস্তটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পরিধি প্রায় সাধ-ক্রোশ, কিম্বা তাহার অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহার স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র বাটী বা কুটীর আছে, সেখানে রাজ-শিকারী ও আরণ্যকের সহকারীরা বাস করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বাটী বা কুটীরখানি তরুলতায় সমাচ্ছন্ন, প্রাতঃ-সন্ধ্যায় সেই তরুবেষ্টনীগুলির মধ্যহইতে ধূম উঠিতে থাকে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি এক-একটি গৃহ। প্রায় সর্ব্বত্রই সযত্নরক্ষিত উদ্যান আছে, সে সমু-দয়ের শ্যামলশ্রী তরুলতাগুলি ফল-ফুলে সদা সুশোভিত। তাহাছাড়া শস্যক্ষেত্রগুলিও সর্ব্ব-দাই শস্যশোভিত থাকে। শ্যামল পচুড়ে ও উপত্যকাগুলিতে হৃষ্টপুষ্ট, সুশ্রী গাভী ও মেষ-

গুলিকে চরিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন লজ্জাবতীলতামণ্ডিত শৈলে শৈলে ছাগলেরা কচ্ কচ্ করিয়া গাছপালা খাইতেছে, ইহাও দেখা যায়। দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে একটি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া সরসী আছে। আরণ্যক সেখানে ভোঁদড়ের একটি বাসা করিয়া দিয়াছেন, সেখানে একজোড়া ময়ূর-ময়ূরীও পালিত হইতেছে। এই দ্বীপের ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে বড় ভাব। তাহারা সকলে একসঙ্গে খেলা করে, 'কাঠি'-দিয়া গাঁথিয়া পাতার নৌকা করিয়া সেই পুকুরের জলে ভাসায়, আর প্রতিদিন সকাল-বিকালে দুইবার পাতভাড়ী বগলে করিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে যায়। বুড়াবয়সে ধর্ম্মালোচনা করিতে হয়, এ ধারণা অসিতাক্ষের নাই, তিনি সপ্তাহের মধ্যে একদিন সব ছেলেদের লইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনান, আর গল্প-চ্ছলে তাহাতে নিহিত উপদেশগুলি সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে শৈশবহইতেই তাহাদের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মে। রাজাদেশে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ-টিতেও একটি অতিথিশালা আছে, সেখানে দরিদ্র পথিকেরা আসিয়া আহার্য্য ও আশ্রয় পায়। দ্বীপস্থ বালক-বালিকারাও তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করে না; কোন পথিকের অসুখ-বিসুখ হইলে ত কথাই নাই, অপেক্ষা-কৃত বয়োবৃদ্ধ বালকেরা তাহাদের শয্যা-পার্শ্ব-ত্যাগ করে না। আগন্তুকদিগের সঙ্গে তাহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকারা থাকিলে, তাহারা যে কয়দিন এই দ্বীপে থাকে, সে কয়দিন ঘরের কথা ভুলিয়া যায়।

হরিৎদ্বীপের বালক-বালিকারা বিবিধ উপায়ে তাহাদের হৃদয়-হরণ করিয়া লয়। কখন ছিপ দেয়, তাহারা মাছ ধরিতে যায়, কখন ভোঁদড়ের সঙ্গে খেলা করে, কখন ময়ূরকে নাচায়, কখন পুকুরে পত্রপোত ভাসায়, কখন সকলে লুকোচুরি, হাডুডুডু, ইত্যাদি খেলা করে, কখন কোন মখমল-কোমল শষ্পোপরি স্নিগ্ধচ্ছায়া বৃক্ষতলে বসিয়া গল্প-গাছা করিতে থাকে। এই দ্বীপের কুকুরগুলিপর্য্যন্ত অধিবাসীদের সহিত বড়ই শান্তব্যবহার করে। তাই হরিৎদ্বীপের সকলেরই মুখে সুখের হাসি। এরূপ হইবার কারণ এই যে, অসিতাক্ষের এমনই শিক্ষা যে, কাহারও স্বার্থপর হইবার যো নাই।

তিনি বলেন, স্বার্থপরতার মত পাপ নাই, জীবনে যদি সুখী হইতে চাও, আত্মচিন্তা কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরের বিষয়ও ভাব। তিনি একটি মহাপুরুষের জীবনের কথা বলিয়া বলিতেন, তাঁহার মত নিঃস্বার্থ হও। যখন কাজ করিবে, তখন জোয়ান মানুষের মত খাটিবে, আর যখন খেলা করিবে, তখন ছেলেমানুষের মত খেলা করিবে, আর কি কাজ, কি খেলা দুইই মনদিয়া করিবে। এই-জন্য সেই দ্বীপে কেহ অলস ছিল না, অথচ সেখানে লোকে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদও করিত। আর একটি অন্যায় কাজও ঐ দ্বীপে করিতে দেওয়া হইত না। কেহ মাতাপিতার অবাধ্য হইতে পারিত না, কিম্বা কোন বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি অসম্মান-প্রকাশ করিতে পাইত না। কিন্তু এ কারণে কাহাকেও বড় দণ্ড পাইতে হইত না। তরুণমতি শিশুরাপর্য্যন্ত যাহা উচিত, তাহাই করিতে ভাল বাসিত। তাহারা এমনই বীরহৃদয় ও বিবেচক ছিল যে, কাহারও মনে কোনপ্রকারে কষ্ট দেওয়া তাহারা কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা মনে করিত। এইখানে আমার বলা উচিত যে, এই দ্বীপে বালকদের একটি ক্ষুদ্র সঙ্গীত-সম্প্রদায় ছিল। কেহ ঢোল বাজাইত, কয়েকজন বাঁশরীবাদন করিত, কেহ কেহ বেহালা বাজাইত, কেহ আবার করতালি দিয়া তাল দিত। আর সকলেই প্রায় একটু-আধটু গায়িতে পারিত। এইজন্য সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে শ্রান্ত পথিকেরা নিদাঘ-সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই বালক-কালোয়াৎদের সুমধুর ঐক্যতানবাদ্য বা সঙ্গীত সানন্দে শুনিয়া যাইত। অসিতাক্ষের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকাদের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বড় অল্প নাই, তাহারা ইচ্ছা করিলেই, সেই বৃত্তিগুলির ব্যবহার করিয়া মানব-মনোহরণ করিতে পারে।

যাহা হউক, অনেকক্ষণ পরেশ ও চিতুর কথা বলা হয় নাই, এইবার বলি। তাহাদের উভয়ের আহার ও বিশ্রাম-গ্রহণ হইয়া গেলে, স্বর্ণসূত্র আবার পরেশকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরেশ সেই স্থানহইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে চিতুকে বলিল,—"বাবার হুকুম না পেলে, তোমাকে আমি আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি নে। তুমি এখন আপাততঃ এখানে থেকে শিকারী হ'তে শেখ; আরণ্যক আমার উপরোধে খুসী হ'য়ে তোমার ভার নেবেন। এখানে থাক্‌লে, তুমি ভাল লোক হ'য়ে উঠ্‌বে, তোমার বুকের ভেতর যিনি কথা কন, তাঁ'কেও তুমি চি'ন্‌তে শি'খ্‌বে। তুমি যদি সব কাজ উচিতমত কর, তা' হ'লে এখানকার ছেলেমেয়েরা সকলেই তোমাকে ভাল বা'স্‌বে, তোমার সঙ্গে খেলা ক'র্‌বে।"

চিতু বিষণ্ণবদনে উত্তর করিল,—"বাঘা এসে আমায় ধ'রে নিয়ে যা'বে।"

তাহা শুনিয়া আরণ্যক বলিয়া উঠিলেন,—"ইস্‌, তা'র এতটা ভরসা হ'বে কি? আমি চাই, সে একবার এখেনে আসে, তা' হ'লে তা'কে আর ফিরে' যেতে হ'বে না! সে কিছুতেই আমার এই কেল্লার ভেতরে আস্‌তে পারে না, আ'স্‌বেও না, কারণ সে আমাকে আর আমার শিকারীদের খুব ভালরকম ক'রেই জানে। সেই বদমাইসের সঙ্গে আমার অনেকবার লড়াই হ'য়েছে, আমরা তা'দের সেই গুণ্ডার আড্ডাটা শীগ্‌গিরই ভা'ঙ্‌ব। কিছু ভয় নেই, চিতু, তোমার সে একগাছা চুলও ছুঁতে পা'র্‌বে না।"

তাহার পর তিনি পরেশের উদ্দেশে কহিলেন,—"কুমার, তুমি স্থির জেনো, আমার হাতে চিতু মানুষের মত মানুষ হ'য়ে উ'ঠ্‌বে। কিন্তু তুমি বিদেয় হ'বার আগে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। সন্ধ্যের সময় আমরা কি করি, তা' তুমি জান, স্বর্ণসূত্র যদি থা'ক্‌তে দেয়, তুমিও আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।"

পরেশ। আমি থা'ক্‌ব, চিতু-বেচারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দি'ক।

তাহারা সকলে গৃহমধ্যে গিয়া একটি মুক্তগবাক্ষ কক্ষায় বসিল। সেই জানালা দিয়া সূর্য্যাস্তসময়ের সরোবর-দৃশ্য, সূর্য্যকরোজ্জ্বল বনশোভা এবং হেমাভ অদ্রিচূড়া সকলই বেশ দেখা যাইতে লাগিল। তখন তড়াগের জল একেবারে স্থির, তাহাতে সান্ধ্য-প্রকৃতির সমুদয় বর্ণৈশ্বর্য্য সুস্পষ্টভাবে বিম্বিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্ণাভ অভ্রের বিম্বশোভা বর্ণনীয় নহে। অসিতাক্ষ ধর্ম্মগ্রন্থহইতে এক গৃহহারা পুত্র পিতৃগৃহ ত্যাগপূর্ব্বক প্রবাসে গিয়া পিতৃদত্ত অর্থ-অপব্যয় করিয়া কি কষ্টে পড়িয়াছিল, সেই কাহিনীটুকু পাঠ করিল। বই-পড়া হইয়া গেলে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া এই গানটি গায়িতে লাগিল—

পূরবী—আড়াঠেকা।

"তব প্রেমাম্বুদ, পিতঃ, বর্ষ'ক আশিস্‌-ধারা,
হ'য়ে আছি মৃতপ্রায় হ'য়ে ও আশিস্‌-হারা।
তব প্রেমযোগ্য নই;
পুত্রকন্যা তোমারই,
রাখ, রাখ তব পায়, নহিলে যাইব মারা।
কেবা বিধি তোমারই?
মোরা সবে তোমারই,
তুমি না মুছা'লে অশ্রু কেঁদে কেঁদে হই সারা।
কোন্‌ পথ ধরি' যা'ব',
কোথায় তোমায় পা'ব
জানি না তা'; জানি শুধু, তুমিই গো ধ্রুবতারা!
কণ্টক-কঙ্কর পথে,
চরণ বিকল ক্ষতে,
তুমিই দেখা'য়ে দাও হিয়া জুড়া'বার ঝারা।
তোমারি ত মোরা সব,
তোমারই সদা র'ব;
তোমারেই ভক্তি, ভয় করিব জীবনে সারা।
আমাদের ইচ্ছা নয়,
তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়,

হোক পূর্ণ ব্যাপি' সব চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা!
যাবৎ না যাই ঘরে,
ল'য়ে চল ধরি' করে;
তুমি যদি যাও দূরে, ধাঁধিবে গো আঁধিয়ারা।"

গীতগান হইয়া গেলে, অসিতাক্ষ ঈশ্বরের কাছে সকলের হইয়া তাঁহার প্রসাদ-ভিক্ষা করিল, তখন অন্য সকলে হাঁটু গাড়িয়া, চোক বুজিয়া রহিল। পরে তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল,—স্বর্ণসূত্র অল্ অল্ করিয়া জলিতেছে, পরে উহা দ্বার-অতিক্রম করিয়া খেয়াঘাটের দিকে চলিল। যখন গান গাওয়া হইতেছিল, তখন চিতু সেই প্রথমবার কি এক অননুভূত ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে তাহার মস্তক নত করিয়া উভয়পাণি-

দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল। সেই সংক্ষিপ্ত উপাসনার শেষে সে যেন আপন মনে চুপি চুপি বলিল,—"আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিনু—অনেক দিন আগে। একটা গাড়ী, তা'তে একটা মেয়েছেলে ব'সে আছেন। হাঁটু গেড়ে, হাত জোড় ক'রে আকাশকে কি ব'ল্‌ছেন। আমাকে তিনি ধ'রেছিলেন। তা'র পরে কি হ'য়েছিল, মনে নেই। হাঁা, বাঘা আর আর-সব ডাকাতেরা সেখানে ছেল।" তাহার পর, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। অসিতাক্ষ স্নেহপূর্ণনয়নে তাহার দিকে দেখিতেছিলেন, পরেশ তাঁহাকে চিতুর অলক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করিল,—"ও কি ব'ল্‌ছে?"

অ। কে জানে, কি ব'ল্‌ছে! আহা, বেচারা! গান শুন্‌লে অনেকের মন গলে যায়। হয়ত, হাঁ! তা' সম্ভব হ'তে পারে, বাঘা তা'কে কোন ধনী মহিলার কাছথেকে কেড়ে নিয়েছিল, সম্ভবতঃ তা'রা ওর মাকে খুন ক'রেছিল। ও হয়ত ভদ্দরলোকের ছেলে ছিল। যিনি ওর হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলেন, তিনি কি ওর মা ছিলেন? যদি তা'ই হন, এখন তিনি তাঁ'র প্রার্থনার উত্তর পেলেন, কারণ এখন তাঁ'র সন্তান উদ্ধার পা'বে,—বেচারা চিতু! চিতু, বাবা, এস, তোমার বন্ধুকে বিদেয় দাও।" চিতু যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল, চমকিয়া পরেশের কাছে আসিল। পরেশ বলিল,—"বন্ধু, তবে আসি; আমার আশা হয়, তোমাকে আমার বাবার বাড়ীতে এককালে দে'খ্‌তে পা'ব। রাখাল-বালক কিছুই বলিল না, দক্ষিণহস্তটি উল্‌টাইয়া চোক মুছিল। তাহা দেখিয়া পরেশ বলিল,—"চিতু, ভাই, কেঁদ না; তুমি এখানে ভাল থা'ক্‌বে, ভাল হ'বে।" চিতু বলিল,—"আমি এখন বেশ ফূর্ত্তিতে আছি; আপ্‌নারা যা' ব'ল্‌বেন, তা'ই ক'রব। কুমারজি, আমার কিছু নেই, শুধু এই লাঠিটি আছে—আপ্‌নি এইটাই নিন্, বাঘা সোণার টাকাটি কেড়ে নিয়েছে।"

পরেশ। না, চিতু, তোমার লাঠিটি আমি নো'ব না, ওটি তোমার দরকার হ'বে, তোমার স্মৃতি-চিহ্নে আমার দরকার নেই। তোমাকে আমি ভু'লব না।

চিতু। কুমারজি, আমি আপ্‌নাকে কত কষ্ট দিয়েছি; সে সব মনে রাখ্‌বেন না।

পরেশ। তখন তোমাতে আমাতে জানা-শুনা ছিল না—

তখনকার কথা ধর্ত্তব্যই নয়। তোমারই সাহায্যে যে আমি বাঘার হাত‍থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি—একথা আমি কখন ভুলব না।

চিতু। আমি আপ্‌নাদের সকলকেই ভালবা'স্‌তে সুরু ক'রেছি।

পরেশ। হ্যাঁ, তা'ত তুমি বা'স্‌বেই; তোমার মন ভাল। তবে আসি, চিতু, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

এই বলিয়া সে খেয়াঘাটের দিকে চলিল। কিন্তু ছেলেরা তাহার সঙ্গ ছাড়ে না; সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটপর্য্যন্ত চলিল। পরেশ তাহাদের প্রত্যেককেই দুই-একটি করিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিল। কেবল অসিতাক্ষ তাহাকে পার করিয়া দিতে নৌকায় উঠিলেন, তিনি পরেশের হস্তস্থিত স্বর্ণসূত্রটির—বিশেষতঃ তাহার তৎকালীন মুখমণ্ডলের স্বর্গীয়-শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। কুমার পরপারে অবতরণ করিল। অসিতাক্ষ বুঝিলেন, এই ভাস্বরতনু কুমারের সহযাত্রিরূপে আর অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না, এখন কুমারকে একাকীই পথাতিবাহন করিতে হইবে। অসিতাক্ষ কুমারকে বিদায়ালিঙ্গন-দান করিলেন; কুমার তাঁহাকে নমস্কার করিল। পরে পর-পারস্থিত বালক-বালিকাদিগের উদ্দেশে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া বিদায়-গ্রহণ করিল। তৎপরে সে অবিলম্বেই বনের আঁধারে মিশিয়া গেল।

দীর্ঘ গিরিপৃষ্ঠস্থিত একটি বিলম্বিত বর্ত্ম দিয়া গিয়া পরে পরেশ একটি প্রশস্ত, খরস্রোত অথচ প্রশান্ত নদের তীরে অবতরণ করিল। ঐ নদতীরে একটি রত্নময় ও সুদৃশ্য রাজপোত সংলগ্ন ছিল। উহা শ্বেত মরালের মত বিমল-শুভ্র; উহার পশ্চাদ্ভাগে একখানি কুঙ্কুমাভ সিংহাসন চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, সেই চন্দ্রাতপের ঝালরে কত চুনি, পান্না, হীরা, মতি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। স্বর্ণসূত্র পরেশকে সেই পোতোপরি লইয়া গেল; নৌকায় কেহ ছিল না, পরেশ গিয়া একটি অরুণাভ উপাধানাসনে উপবেশন করিল, তদুপরি স্বর্ণসূত্রও শুইয়া পড়িল। পরেশ বসিলেই, নৌকাখানি আপনা আপনি তীরত্যাগ করিয়া চলিল। নদের মধ্যস্থলে গিয়া উহা স্রোতোমুখে তর্‌তর্‌ করিয়া বহিয়া চলিল। নদের উভয়তটস্থ প্রাকৃতিক-শোভা, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার তো কোন্ ছার, কবি কালি-দাসও বর্ণনা করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। যে যে বস্তু দেখিলে নয়নের প্রীতি জন্মে, সেই সমস্ত বস্তুই ঐ নদ-পুলিনের শোভাসম্পাদন করিতেছে। রজতশুভ্রা শৈলশ্রেণী, মরকতদ্যুতিঃ তরুলতা, বিবিধবর্ণের সুরভি পুষ্পনিচয়, ফেনায়মান জলপ্রপাত, গীতশালিনী নগনির্ঝরিণী সকলই সেই সরিৎতটে ত্রিদিবশোভা-বিস্তার করিতেছে। কাননগুলি শতগীতমুখর; বিহগ-নিচয় বিবিধবর্ণের অপূর্ব্ব বিলাস-বিকাশ করিয়া হরিতাভ পাদপপল্লবের মধ্যে মেঘধনুর বর্ণ ফুটাইতেছে। পরেশ জানে না, সে কোথায় চলিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়মধ্যে এখন আনন্দকিরণ লীলা করিতেছে, তাহা এক্ষণে শান্তির আগার হইয়া উঠিয়াছে। সরিৎটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু কানন-কান্তার বিধৌত করিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার বুকের উপর দিয়া ললিত-লীলাগতিতে তূর্ণগামিনী তরণী-খানি তর্‌তর্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, অবশেষে উহা দুই পাহাড়ে ঠেকাঠেকি হইয়া যে একটি তিমিরাচ্ছন্ন তোরণ গঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যদিয়া গিয়া সহসা এক দিব্য আভাময় জনপদে আসিয়া পড়িল, সেইখানে ঐ রাজতরণী রজতশুভ্র সৈকতে আপনি গিয়া ভিড়িল, তখন স্বর্ণসূত্র পরেশকে তটস্থ করিল। তটে নামিয়া পরেশ যেই দূর্ব্বাশ্যাম এক ক্ষেত্রে পদার্পণ করিল, অমনি দেখিল, তাহার সম্মুখে গগনচুম্বী বনস্পতিসমূহে রচিত এক সুপ্রশস্ত বীথি শোভা পাইতেছে। পথের উভয়পার্শ্বস্থ পাদপগুলি ঊর্দ্ধভাগে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ বীথির বিপরীত প্রান্তে এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃশ্য সোপান-পরম্পরা, সেই সোপানশ্রেণী এক কৌমুদীশুভ্র সৌধের সহিত সংলগ্ন। সোপানের উভয়পার্শ্বে মর্ম্মরপ্রস্তরময়ী কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি, কত দ্রব দ্রবিণোৎ-সারী ফোয়ারা। সৌধটি এক পুষ্পোদ্যানের মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে কি সব তরু, কি সব লতা, কি সব ফুল, কি সব ফল! এ পরেশের পিতৃগৃহ। পরেশ পুলকিত চিত্তে প্রায় দৌড়িয়া চলিল। সে শীঘ্রই এক সুবৃহৎ সিংহদ্বারের সন্নিকট হইল। তাহাতে চুনি, পান্না, হীরা, পোখ্‌রাজ, নীলা, মুক্তা, প্রবাল, ফিরোজা ইত্যাদি কত প্রোজ্জ্বলশ্রী প্রস্তর খচিত রহিয়াছে। সেই দ্বারপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখিতে পাইল, কি এক মূল্যবান্ প্রস্তরনির্ম্মিত হাতলে স্বর্ণসূত্রের গোড়া বাঁধা রহিয়াছে। আর সেই সিংহদ্বারের শীর্ষদেশে এই কয়টি কথা রত্নাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

> "শেষাবধি বাধ্য মোর রহে যেই জন,
> তাহারেই দিই আমি স্নেহ-আলিঙ্গন।"

পরেশ যেই সেই মণিনির্ম্মিত হাতলে হাত দিল, অমনই স্বর্ণসূত্র হাতলহইতে ছিঁড়িয়া গেল, এবং নিমেষের মধ্যে বিদ্যুৎবৎ বিলসিত হইয়া অন্তর্হিত হইল। তখন এক অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। দ্বার মুক্ত হইল, আর—আর কি?—নির্ম্মল-শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত অঙ্গনের মধ্যস্থলে, এক অপূর্ব্ব ধাতুময় সিংহাসনে পরেশের পিতা বসিয়া আছেন, তাঁহার চারিপার্শ্বে পরেশের ভ্রাতৃভগিনিগণ বসিয়া রহিয়াছে। সেই বরবর্ণিনী মহিলাও সেখানে আসীনা আছেন, আরও অনেকে পরেশের অভ্যর্থনার নিমিত্ত উপস্থিত আছেন। পরেশের পিতা তাহাকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ং উঠিয়া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আমার হারানিধিকে আবার আমি ফিরে পেলুম।" তাহার পর, সকলে পরেশকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন, পরেশ ছিন্ন-বসনে ও ক্লান্তচরণে তাঁহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া শুনিল, বৃদ্ধ চারণ গাহিতেছেন—

"এই সেই গৃহ—যথা ললাটের স্বেদ
মুছে আসি' পান্থ— শ্রান্ত, গৃহাগত;
এই সেই গৃহ—যথা লভে আশীর্ব্বাদ,—
স্নেহ, সুখ, শান্তি সজ্জন সতত।
ধৃত মীন যথা যদি ফিরে নদী-নীরে
বহুক্ষণ যেন রয় কেলি-রত,
মুক্ত আত্মা তথা এই নিজগৃহে ফিরি'
সুখ অনুপম ভুঞ্জে অবিরত।

২

সংগ্রামেতে জয়—আহা কি গৌরবময়!
আনন্দ উদ্দাম কিসে আর তত?
পুরস্কার-লাভ—আহা কি উল্লাসময়!
—তুচ্ছ তা'র কাছে হীরা-মতি শত।
সাধনায় সিদ্ধি,—যতনে রতন-লাভ,
যেন গো সাম্রাজ্য হয় পদানত!
আরোহিতে শৈলে কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
আরোহিলে চূড়ে, স্ফূর্ত্তি হয় কত!"

তাহার পর, বহু বালককণ্ঠহইতে এই গীতটি লহরে লহরে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—

কানাড়া—ঝাঁপতাল।

"আনন্দের তান সবে তুল গো ললিত স্বরে,
ফিরিয়াছে ভাই, তা'রে লহ গেহে সমাদরে।
আজি যাত্রা অবসিত,
পিতৃপদে উপনীত
নরেশ-কুমার প্রিয়—শ্রান্ত, ক্লান্ত কলেবরে।
কর তা'রে আলিঙ্গন,—
সমাদরে আবাহন,
বাজুক মঙ্গলবাদ্য তাহার সম্মান-তরে।
সেই বিশ্বে বরণীয়,
বিভুপ্রতি করণীয়
ধরি' স্বর্ণসূত্র যেই চলে এই চরাচরে,—
বিপদে যে অবিচল,
লোভে পড়ি' যে অটল,
নিজপ্রাণ তুচ্ছ করি' রক্ষে যে বিপন্ন নরে।
মাত সবে উৎসবে,—
বন্দ বাঁশরীর রবে
পরেশকুমারে প্রিয়,—আত্মজয়ী বীরবরে!"

তাহার পর, প্রতীচীর মূলে শেষ-সৌরকররেখা মিলাইয়া গেল, ধরণী নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্না হইল এবং উত্তরমেরুতে শীতাকাশে যেমন মেরুপ্রভা প্রভাপ্রকাশ করিতে থাকে, পরেশের পিতৃপ্রাসাদ তেমনই তমিস্রাতিমিরে দীপ্তিবিকাশ করিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ।

-:*:-

বিবেক-বৃশ্চিক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৩

তরফদারের ছোট ভাই কলিকাতায় চাকরী করেন। সুধীরের সাতটি দিদি, সকলেই কলিকাতায় বোর্ডিংএ থাকে। পরশ্বহইতে সুধীরের চরম-পরীক্ষা, তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। তরফদার সপরিবারে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়া থাকিতে মনস্থ করিলেন। ভাইএর ওখানে গিয়া থাকিবেন, এই সুযোগে তাঁহারা মেয়েদেরও দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

সকলে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বাড়ী হানিফ্ বলিয়া এক বিশ্বস্ত মুসলমান কৃষকের জিম্মায় রহিল।

প্রথম দিন পরীক্ষা দিয়া আসিয়া সুধীরের মনে বড় ভরসা জন্মিল। দ্বিতীয় দিন অঙ্কের পরীক্ষা। সুধীর সোদ্বেগে প্রশ্ন-পত্র পড়িল। না, তেমন শক্ত নয়, সুধীর উত্তর লিখিতে পারিবে। প্রভাতের প্রশ্নপত্রখানির উত্তর সে ভাল করিয়াই লিখিল। অপরাহ্ণেও জ্যামিতির প্রায় সকল সমস্যারই সমাধান করিল, কেবল একটি 'একষ্ট্রা' ঠেকিয়া গেল।

তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, বড় গরম-বোধ হইতে লাগিল। একজন 'গার্ড'কে অনুরোধ করাতে, তিনি দয়া করিয়া একটী জানালা খুলিয়া দিলেন। হরির 'আসন' তাহার পার্শ্বেই হইয়াছিল। জানালা খুলাতে, হরির কাগজগুলি উড়িয়া মেঝ্যায় পড়িয়া গেল। একটু শব্দ হইল, সুধীরের সহসা তাই সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল, প্রথমে সে কি দেখিতেছে, তত অনুভব করিতে পারে নাই। পরে তাহার জ্ঞান হইল, এ কি! সুধীর কি দেখিল? যে 'একষ্ট্রাটি' সুধীর কষিতে পারে নাই, হরি তাহার চমৎকার সমাধান করিয়াছে। তখন হরি তাহার কাগজ তুলিয়া লইল। এখন সুধীরও ঐ সমস্যাটির সমাধান করিতে পারে! করিবে কি? সুধীরের হৃদয়-মধ্যে তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল। একবার সে দোয়াতে কলম ডুবাইল,—সে ত প্রায় সমস্যাটির সমাধান করিয়াছিল, কেবল একটী স্থানে সামান্য একটী ভুল হইয়াছিল, হয়ত সে নিজেই ঐ ভুলটি সংশোধিত করিতে পারিত, দৈবাৎ হরির খাতাটা তাহার নজরে পড়িয়া গিয়াছে মাত্র।

সে কলম রাখিয়া তাহার উষ্ণ কপালে হাত দিল। গৃহটি প্রায় নিস্তব্ধ, কেবল ঘড়ির টক্‌টক্‌ আর কলমগুলার খচ্‌খচ্‌-আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। হতাশার উত্তেজনায় সে অস্থির হইয়া পড়িল। "বিপ্রেন্দ্র"-বৃত্তিটি তাহার অদৃষ্টে নাই; হরিই পাইবে। সে যদি না পায়, তাহা হইলে যে তাহার ভবিষ্যৎ আঁধার! কেমন করিয়া বাপমার কাছে 'কালামুখ' দেখাইবে? হঠাৎ একজন 'গার্ড' বলিয়া উঠিলেন,—"আর দশমিনিট আছে।" শুনিয়া সুধীর চম্‌কিয়া উঠিল। সুধীরের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। মনটা একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

'গার্ড' আবার হাঁকিলেন,—"আর পাঁচমিনিট আছে।" সুধীরের তখন আর কিছুই জ্ঞান রহিল না। সে সমস্যাটি সংশোধিত করিয়া ফেলিল। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তাহার মনটা বড়ই খারাব হইয়া বিবেক-বৃশ্চিকের দংশনে অস্থির হইয়া উঠিল। সে যখন সমস্যাটির সংশোধন করিতেছিল, তখন তাহার হাত কাঁপিয়া গিয়াছিল,—লেখা বড় খারাব হইয়াছিল; তাহা-ছাড়া বড় একফোঁটা কালিও লেখার উপর পড়িয়া গিয়াছিল। সে লেখার উপরে শোষক-কাগজ চাপা দিল। এমন সময়ে 'গার্ড' হাঁকিলেন,—"সময় হ'য়ে গেছে।" সুধীরের সহসা সমস্যাটা কাটিয়া দিতে ইচ্ছা হইল। সে আবার কলম ধরিল, এমন সময়ে হুকুম হইল,—"লেখা থামাও!" সুধীর সম্মুখেই বসিয়াছিল। একজন 'গার্ড' সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সুধীর আর লেখনী-স্পর্শ করিতে সাহস করিল না।

বালক-পাঠক। ওরে বাবা রে! একি হ'ল রে!
সিংহ। ভয় নেই, ভয় নেই, তুমি কি প'ড়্‌ছ তাই আমি দে'খ্‌তে এসেছি।

'গার্ডেরা' উত্তর-পত্রগুলি তুলিয়া জড় করিলেন। ছেলেরা সব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। সুধীর দ্রুতপদে পরীক্ষা-কক্ষ-পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এ সময়ে কাহারও সহিত কোন কথা বলিবার তাহার প্রবৃত্তি হইল না, বলিবার শক্তিও ছিল না। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ী চলিল। সে আজ চোর হইয়াছে, বাপ-মার কাছে কি করিয়া মুখ দেখাইবে? তাঁহাদের সাগ্রহপ্রশ্নের কি উত্তর দিবে?

৪

সুধীর যাহা ভয় করিতেছিল, তাহাই হইল। তাহার বিলম্ব হইতে দেখিয়া মাতা-পিতা উভয়েই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন,—পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কলিকাতায় বড় গাড়ী-ঘোড়ার ভীড়; গাড়ী-চাপা ত পড়িল না? এত দেরী হইতেছে কেন? পিতা উত্তরীয় স্কন্ধে লইয়া পথে বাহির হইতে উদ্যত, এমন সময়ে দূরে সুধীরকে আসিতে দেখিলেন। তরফ্‌দার-বনিতা দেখিলেন, পুত্রের মুখখানি বড় শুকাইয়া গিয়াছে। কেন? অসুখ করে নাই ত? আজ আঁকের দিন, সে কি ভাল লিখিতে পারে নাই? সুধীর গৃহে প্রবেশ করিল। মা জিজ্ঞাসিলেন,—"সুধীর, মুখখানায় অত কালি মেড়ে গেছে কেন? কোন অসুখ কচ্চে কি?"

"হ্যাঁ, না, মা, তা'র মানে—" এই বলিয়া সুধীর নিজের কপাল টিপিয়া ধরিল।

তরফ্‌দার তাহাকে কোন প্রশ্ন না করিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিলেন। তাহাতে সুধীর তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু বুঝিল খাঁড়া তাহার মস্তকের উপর ঝুলিয়াই রহিল।

সমস্ত দিনের ক্লান্তিপ্রযুক্ত সে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। মাতা-পিতা উভয়েই রাত্রিতে দুই-তিনবার উঠিয়া সে কেমন আছে, তাহা দেখিয়া গেলেন। দেখিলেন, তাহার কপালটা একটু উষ্ণ বটে, জরটর হয় নাই।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সে নীরবে পড়াশুনা ও আহারাদি করিয়া সংস্কৃত-পরীক্ষা দিতে গেল। প্রশ্ন খুব সহজ হইয়াছিল, সে অবলীলা-ক্রমে সব প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আসিল। গৃহে ফিরিলে, মাতাপিতা উভয়ে একপরামর্শ হইয়া গতকল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ কেমন লি'খ্‌লে?"

সুধীর বিনীতভাবে জানাইল যে, সে সকল প্রশ্নেরই উত্তর করিতে পারিয়াছে। তাহা শুনিয়া তরফ্‌দার ও তাঁহার বনিতা উভয়েই একটু আশ্বস্ত হইলেন; কারণ তাঁহাদের এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, কাল সুধীর ভাল লিখিতে পারে নাই, তবে সে কথা তাহাকে এখন জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়া পরবর্ত্তী দুইটি বিষয়ও হয়ত খারাব করিয়া ফেলিতে পারে। পরীক্ষা চুকিয়া গেলে, কোন সময়ে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে চলিবে, কিম্বা পরীক্ষাফলের জন্য অপেক্ষা করাই হয়ত অধিকতর সমীচীন হইবে, এখন আর অভাগ্য বালককে প্রশ্ন করিয়া উৎপীড়িত করিবার প্রয়োজন কি? ভূগোল ও ইতিহাসের দিনও সুধীর ভালই লিখিয়া আসিল।

পরীক্ষা চুকিয়া গেল। তরফ্‌দার-পরিবার পুনরায় দেশে

চলিয়া গেলেন। মাসখানিক সুধীর কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। তাহার পর, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সে ততই আবার বিষণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। সকলে পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য ব্যাকুল, সুধীর উদাসীন। সে যদি প্রথম হয়, সে-ই বৃত্তি পায়? কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে তাহাকে প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়া তাহার পাপ-স্বীকার করিতে হইবে। বৃত্তি ত সে পাইবেই না, উপরন্তু লজ্জায় তাহার আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না, এবং তাহার মাতাপিতার সকল আশায় ছাই পড়িবে।

ফলটা অবশেষে বাহির হইল। উহা সুধীরকে জানিতেই হইবে, কারণ সে পাপের উপর আর পাপের ভার চাপাইতে চাহে না, যদি সে 'ফার্ষ্ট' হইয়া থাকে, তাহা হইলে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে গিয়া, সে কি করিয়াছে, তাহা জানাইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে স্কুলে গেজেট দেখিবার জন্য যাইতে হইল। কলিকাতায় পাশের খবর লইয়া "বঙ্গবাসী", "হিতবাদী" দেখা দেন, মফঃস্বলে সে সুবিধা নাই, কাজেই স্কুলে গিয়া গেজেট দেখিয়া আসিতে হয়। সে সুবিধা থাকিলে, সুধীর, বোধ হয়, আজ সহজে স্কুলে যাইত না। সে স্কুলে গিয়া পদার্পণ করিয়াছে মাত্র, অমনই তাহার সতীর্থেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া "হিপ্ হিপ্ হুররে"-শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সুধীরের বুক ধড়্ ধড়্ করিতে লাগিল, সে 'পাশের' তালিকাটি দেখিতে ছুটিল। দেখিল সর্ব্বপ্রথমে তাহারই নামটি স্থান পাইয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, সে তখনই সেখানহইতে, যেখানে দুইচক্ষু যায়, ছুটিয়া পলায়। কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার কোনই সুযোগ ঘটিল না। ছেলেরা তাহাকে ধরিয়া খেলিবার মাঠে লইয়া গেল। সেখানে তাহারা তাহাকে ঘেরিয়া শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটা হাসির গান জুড়িয়া দিল—

"সন্দেশ, গজা, বঁদে, মতিচুর, রসকরা, সরপুরিয়া,
দয়াময় বিধি, গ'ঠেছে কি নিধি, ক'ত না যতন করিয়া!"
—ইত্যাদি।

তাহা শুনিয়া সুধীরের কিছুই আমোদ-বোধ হইল না, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে বলিল,—"আমি কি সত্যি 'ফার্ষ্ট' হয়েছি?"

এমন সময়ে হরিপদও আসিয়া সেখানে দেখা দিল। সে আসিয়া সুধীরের প্রশ্নটির উত্তর দিল,—"হাঁ গো হাঁ। দেখ্ না গিয়ে তোর নামটাই প্রথমে জল্-জল্ ক'র্‌ছে। যা'র 'ফার্ষ্ট' হওয়া উচিত, সে-ই হ'য়েছে; তুই যে 'ফার্ষ্ট' হ'বি, এ ত জানা কথা; অন্য কেউ হ'লে, আমরা বরং আশ্চর্য্য হতুম। তা' হ'লে, দাদা, খ্যাট্‌টা কবে হচ্ছে?"

এই বলিয়া সে প্রফুল্লমুখে গিয়া নিজ অনুরাগোষ্ণ হস্তে সুধীরের তুষারশীতল দক্ষিণ-হস্তখানি ধরিল। তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইল; কারণ সে দেখিল, সুধীর বড় উত্তেজিত হইয়াছে, তাহার এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল।

পরে তাহারা সকলে স্কুলের 'হল'-কামরায় গেল। সেই সময়ে হেড্-মাষ্টার মহাশয়ও আসিয়া দেখা দিলেন। আসিতে আসিতে বলিলেন,—"সুধীর, সুধীর কোথায়?"

সুধীর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, অন্য ছেলেরাও তাহার অনুসরণ করিল। তিনি সহাস্যমুখে সকলকে প্রতিপ্রণাম করিয়া সুধীরকে ইংরাজীতে বলিলেন,—"I congratulate you warmly. You are an honour to our School, and I have no doubt you will be an honour to your College at Calcutta."

সুধীর নতমস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার তখন মনে হইতেছিল, পৃথিবী যদি এখন দু'ফাঁক হইয়া যায়, তাহা হইলে সে তদুদরে প্রবেশ করে। হেড্‌মাষ্টার-মহাশয় তাহাকে বিহ্বল হইতে দেখিয়া হরিপদর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দু'টো স্কলারশিপ থা'ক্‌লে বেশ হ'ত,—তুমিও একটা পেতে।"

তাহার পর তিনি আবার সুধীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আর এখেনে নয়, বাড়ী যাও। তোমার বাবাকে ব'ল, নিষিদ্ধপক্ষীর মাংসটা খেলে, আমার জা'ত যা'বে না!"

সব ছেলে হাসিয়া উঠিল। হেড্-মাষ্টার-মহাশয় ব্রাহ্ম ছিলেন। সুধীর তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। গতি বড় মন্থর। তথাপি সে বাড়ী পহুঁছিল। সে যে 'ফার্ষ্ট' হইয়াছে, এ সুসংবাদ তরফ্‌দার-গৃহে পূর্ব্বেই পহুঁছিয়াছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মা ছুটিয়া কর্ত্তার কাছে গিয়া বলিল,—"সুধীর আ'স্‌ছে!"

পিতা আজ অতিদ্রুতবেগে গৃহহইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়া সুধীরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন,—"বাবা, সত্যি তুমি 'ফার্ষ্ট' হয়েছ?" সুধীর অতি অস্পষ্টভাবে বলিল,—"হ্যাঁ, বাবা!" বলিবামাত্রই তাহার মাথাটা পিতার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িল। পিতা সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"এ কি? কি হ'য়েছে? সুধীর, এমন কচ্চ কেন, বাবা?"

বলিয়া, বৃদ্ধের অঙ্গে তখন যেন শতহস্তীর বল আসিল, তিনি সুধীরকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিলেন। তাহার মাও ছুটিয়া আসিলেন। উভয়ে মিলিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তরফ্‌দার বলিলেন,—"দেখি, কালও যদি এমনই থাকে, রাম-ডাক্তারকে ডেকে আ'ন্‌ব।"

মা বলিলেন,—"থেকে থেকে ছেলেটার কি যে হয়, বু'ঝ্‌তে পারি নে। এমনই আমাদের কপাল, ছেলেটাকে দু'মুটো পেট-ভ'রে খে'তে দিতেও পারি নে। খাটুনি বেশী, খেতে পায় কম।"

৬

পরদিবস প্রভাতে সুধীর অনেকটা সুস্থ হইল। উষোপাসনার পর পিতা বাহিরের ঘরে পড়িতে যাইতেছিলেন, সুধীর পিতার হাত ধরিয়া বলিল,—"বাবা, তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌তে চাই।"

"কি কথা, বাবা ?"

বহিনেরা ও মা সে ঘরহইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মা কি থা'ক্‌বেন ?"

"হ্যাঁ, থাকুন।"

এই বলিয়া সুধীর সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক উভয়কে জানাইল; শেষে বালক অনুতাপে ও ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল। মারও চোক দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সকল কথা শুনিয়া পিতা কিছুক্ষণ নীরবে কক্ষামধ্যে পরিক্রমণ করিলেন। তাহার পর, পুত্রের উভয় স্কন্ধে হাত দিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"বাবা, এখন তোমার কি করা উচিত, তা' বোধ হয়, আমার তোমাকে ব'লে দিতে হ'বে না ?"

"না, বাবা, আমি হেড্‌মাষ্টার-ম'শায় আর হরিকে এ কথা জা'নাব।"

"যত শীগ্‌গির জানাও, ততই ভাল। বাবা, আর যেন তুমি কখন এমন কাজ না কর, তা'র জন্যে এস এখন আমরা প্রার্থনা করি।"

প্রার্থনান্তে সুধীরের হৃদয়ভার লঘু হইয়া পড়িল। সে ইতঃপূর্ব্বে যে কষ্ট সহিয়াছে, তাহার তুলনায় তাহার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য লঘুতর-বোধ হইতে লাগিল।

হেড্‌-মাষ্টারের কথাটা তত দোষাবহ ঠেকিল না। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি তোমার নম্বর আনা'ব। আর হরিকে তোমার কোন কথা ব'ল্‌তে হ'বে না। যা' ব'ল্‌তে হয়, আমিই ব'ল্‌ব।"

দিন-পনের পরে হেড্‌মাষ্টার আসিয়া শশিশেখর-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে গোপনে অনেক কথা হইল। পরে সুধীরের ডাক পড়িল। পিতা সহাস্যমুখে বলিলেন,—"আমি শু'ন্‌চি, সেই 'একষ্ট্রা'টার (সুধীর অধোবদন হইল) নম্বর বাদ দিলেও, তুমিই 'ফাষ্ট' হও। তা' হ'লেও তোমার 'স্কলারশিপ'টা পাওয়া উচিত কি না, তা'ই এতক্ষণ আমরা বুঝে দেখ্‌ছিলুম, হেড্‌-মাষ্টার-মশায় যা' ব'ল্‌ছেন, তা'তে তোমার আর অন্যায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। তা'-ছাড়া এঁর হরির বাপের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। তিনি তাঁ'র ছেলে 'ফাষ্ট-ডিভিসনে পাশ' হয়েছে শুনেই আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ছেলেকে ক'ল্‌কাতায় পাঠা'তে চেয়েছেন। তাই ইনি আর তোমার দোষটা তাঁ'কে জানান্ নি।"

সুধীর একবার সকৃতজ্ঞ ও সাশ্রুলোচনে হেড্‌-মাষ্টারের প্রতি চাহিল। পরে পিতার উদ্দেশে বলিল,—"'স্কলারশিপ'টা তবে কি আমি নেব ?"

"হ্যাঁ, এখন আর নিলে দোষ কি ? মাষ্টার-মশায়, আপ্‌নি কি বলেন ?"

হেঃ-মাঃ। নিশ্চয়ই নেবে; ও-ছাড়া আর কে পা'বে ? আমি, দোষ ব'ল্‌তে চাই নে, ওর সেই মনের সন্দেহটা ভেঙ্গে বলা খুব প্রশংসনীয় মনে করি। আমার স্কুলে এরকম একটী ধর্ম্মভীরু ছেলে আছে জেনে আমি বড় গর্ব্ব-অনুভব ক'র্‌ছি। আর আপনার মত ধর্ম্মভীরু বাপও বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, আপনার মত ধার্ম্মিক লোক আমার বন্ধু, এও আমার পক্ষে কম গর্ব্বের কথা নয় !"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সুধীরকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"ওহে নিষিদ্ধ পক্ষীটার কথা তোমার বাবাকে ব'লেছ কি ?" শশিশেখর-বাবু বলিলেন,—"সে আবার কি, ম'শাই ?"

হেঃ-মাঃ। জানেন না ? তিনি হ'চ্ছেন যামঘোষ। একটী বাড়ীর কাছে থা'ক্‌লে আর ঘড়ীতে 'আলার্ম' দেবার দরকার হয় না।

এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

সম্পূর্ণ।

১। কোন বোতলের গলা ভাঙ্গিয়া যাইলে, ভগ্ন-স্থানের নীচে গোল করিয়া কাটিতে পারিলে অনেক উপকারে আসিতে পারে।

বোতল গোল করিয়া কাটিতে হইলে, প্রথমতঃ, যেপর্য্যন্ত কাটিতে হইবে, সেইপর্য্যন্ত চর্ব্বি বা তৈলদ্বারা পূর্ণ কর,—তাহার পর, একটা লোহার শিক আগুনে পোড়াইয়া লাল করিয়া ঐ তৈল বা চর্ব্বির মধ্যে ডুবাইয়া দাও—ঠিক্ তৈলের দাগ-অনুসারে বোতল কাটিয়া যাইবে।

২। কাচের বড় ছিপি (ষ্টপার)কে ছোট করিতে হইলে, ভিজা বালিদ্বারা একটী গেলাস পূর্ণ করিয়া, তাহার মধ্যে ছিপিটী প্রবেশ করাইয়া এদিক্-ওদিক্ ঘুরাও—দেখিবে কাচ-ক্ষয় হইতেছে;—মধ্যে মধ্যে বালি-পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

৩। প্রথমতঃ, কতকটা সাজিমাটী ও ঠিক সেই পরিমিত নারিকেল-তৈল-গ্রহণ কর, পরে যে পরিমিত সাজিমাটী লইবে তাহার অর্দ্ধেক কলিচূণ লইয়া এই তিনটী একত্রে জলে গুলিয়া ফেল; পরে আগুণে চাপাইয়া বেশ জোর জাল দাও। যখন দেখিবে ঐ পদার্থটী ফুটিতে ফুটিতে বেশ গাঢ় হইতেছে, তখন নামাইয়া ইচ্ছামত ছাঁচে ঢাল—এইপ্রকারেই সাদা সাবান প্রস্তুত হয়।

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

অহমিকা।

(গাথা।)

পুষ্কর-পুলিনে এক বসিয়া মণ্ডুক
সেবিতেছে রৌদ্র—বুক করে ধুক্ ধুক্।
পুকুরের চারিপা'ড়
ছেয়ে দেছে কেয়াঝাড়;
বিকশিত বুকে তা'র শতেক শালুক।
শৈবাল আহরি' খায়
মরাল-মিথুন তা'য়;
জল-কেলি করি' করে কতেক কৌতুক।
মরাল কহিল,—"বধু!
হেথা আর নাহি মধু,
হেথাকার এ হ্রদের ফুরা'য়েছে সুখ।
চল, যাই উড়ি' দূরে,
যথা বায়ু ফুর্‌ফুরে
ফুলে দোল দিয়া তার' হরে রেণুটুক।
বারমাস একযাই
বাস যা'র একঠাঁই
কি তা'র কপাল, ভাই, কি তাহার দুখ!"

২

তা' শুনি মণ্ডুক কয়,—
"আমারও ইচ্ছা হয়,
তোমাদের সঙ্গে যাই দেশ-পর্য্যটনে।"
শুনি' তা' মরালদ্বয়
হাসিয়া আকুল হয়,—
"কি বলিলি, ব্যাঙ্, তুই যাইবি ভ্রমণে?
উড়িবারে পক্ষ চাই,
আমাদের লক্ষ্য চাই,
তোর যে কিছুই নাই—উড়িবি কেমনে?
সাঁতার ছটাক-জলে,
পটু শুধু কোলাহলে,
তুই কি পারিবি দূর নভে বিচরণে?"
আগু আনি' দুই ঠ্যাঙ্,
সরোষে বলিল ব্যাঙ্,—
"হাসিয়া উড়া'য়ে দাও, জান কি জীবনে?
মোর কথা শোন যদি,
দেখিবে আমার কি ধী,—
বিনাপক্ষে উড়ে যা'ব সুদূর গগনে।"

মরালেরা হাসি' কয়,—
"বেশ, বেশ, মহাশয়,
বুঝাইয়া দিন এই মূঢ় দুইজনে।"
ব্যাঙ্ দোঁহে ল'য়ে যায়,
লাফাইয়া প্রতি পায়,
ঘোলা জলে অর্দ্ধমগ্ন ঘন নল-বনে।

৩

"উপ্‌ড়াও একগাছা
মজবুত, মোটা, বাছা—"
কহিল মণ্ডুক দর্পে, "ভাল দেখে' নল;
তুলিয়াছ? বেশ, বেশ!
মোর কাছে ল'য়ে এস,
দোঁহে দুই মুখ ধর, আমি মধ্যস্থল;
এই বেলা বেলাবেলি,
উড়ে চল ডানা মেলি'।"
—মণ্ডুকের বুদ্ধি হেরি' হংসেরা বিহ্বল!
শুনি, মরালীর স্তুতি,
ভেক চাহে ইতিউতি;
সর্ব্ব অঙ্গ ফুলে' তা'র হইল 'ডবল'!
উড়িয়া চলিল ত্রয়,—
মধ্যে ভেক-মহাশয়;
যে দেখে তা', সে প্রশংসে ত্রয়-বুদ্ধিবল।
যায় এক গ্রাম দিয়া,
দেখে লোকে হাঁ করিয়া,
বলে,—"এ'টা কা'র বুদ্ধি? দেখি আচ্ছা কল!
হাঁসের কি এ আক্কেল?
এ যে 'ভানুমতী'-খেল!"
তা' শুনি' মণ্ডুক-বুদ্ধি হইল বিকল।
ফুলিয়া তিনটা হ'য়ে,
আকাশে ঝুলিয়া র'য়ে,
বলে,—"আমার এ বুদ্ধি—আমারি কৌশল!"
বোধহীন পড়ি' ভূমে
মগ্ন হ'ল চিরঘুমে;
গর্ব্বিতের ইহাই ত গরবের ফল!

আঙুর। *

আমাদের দেশেও এই মুখরোচক, সুরসাল ও অম্লমধুর ফলটি, সুলভ না হইলেও, সুপরিচিত বটে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে অনেকেরই "শরীরম্ ব্যাধি-মন্দিরম্", আর ব্যাধি-শয্যার পার্শ্বে গোলাকৃতি দেবদারু-কাঠের তৈয়ারী লঘু বাক্সে তুলা-শয্যায় রসে ভরা আঙুর অনেকেই দেখিতে পাইয়া থাকেন, মধ্যবিত্তের পক্ষেও ইহা নিতান্ত দুর্লভ হয় না; দরিদ্রও এই ফলের রসে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে চাহে না, তাহাদেরও ছিন্ন-মলিন কন্থার উপরে কখন কখন এই ফলপূর্ণ বাক্সটি দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্র ১

ফলটি এ দেশে দার্জ্জিলিঙ-অঞ্চলে কিছু কিছু জন্মে বটে, কিন্তু কলিকাতায় যে আঙুর বিক্রীত হয়, তাহা সুদূর উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশহইতে আসে, আর কাবুলী-ওয়ালাদের কাছে উহা পাওয়া যায়। দাম বড় সস্তা নহে, গোটা-কয়েক আঙুরে পূর্ণ একটী ভাল আঙুরের বাক্সের দাম ছয়-সাত-আনার কম নহে। তাই সুস্থ শরীরে এ ফলটি খাইবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, উহা এদেশে প্রধানতঃ রোগীরই খাদ্য।

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশের প্রায় প্রতি জিলাতেই দ্রাক্ষাকুঞ্জ বা ক্ষেত্র আছে। বড়লোকদের গৃহসংলগ্ন ইন্দারাগুলি সচরাচর দ্রাক্ষাকুঞ্জের দ্বারা ছায়া-স্নিগ্ধ করিয়া রাখা হয়। তদ্ভিন্ন তত্রত্য প্রতি সরকারী উদ্যানেই একটী করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রগুলিহইতে বিগত পঞ্চাশ-বৎসর-যাবৎ পেশোয়ারের বাজারে আঙুর-সরবরাহ করা হইতেছে, সেই আসল ক্ষেত্রগুলি পেশোয়ার-সহরহইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া অবস্থিত; 'আহম্মদ খেল,' 'বাজিদ খেল', 'শেখ মহম্মদী,' 'সুলেমান খেল' এবং আরও কতিপয় গ্রাম দ্রাক্ষাজননের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। এই গ্রামগুলি

* এই প্রবন্ধ ও এতৎসহ মুদ্রিত চিত্রাবলি 'Agricultural Journal of India'র সম্পাদকের সানুগ্রহ-অনুমতিক্রমে উক্ত পত্রিকাহইতে গৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। বালক-সম্পাদক।

পেশোয়ার-তহশীলের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই কয়েকটী গ্রামে প্রচুর-পরিমাণে দ্রাক্ষা জন্মে, এবং এই দ্রাক্ষাক্ষেত্র-পুঞ্জের আঙুরগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা রসনা-তৃপ্তিকর।

শেখ মহম্মদী-গ্রামে চারিশত দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে; সুবেমান খেলের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সংখ্যা একশত, মাশু খেলের ক্ষেত্র-সংখ্যা দেড়শত, বাদ বেরেও সম্ভবত: শতক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রগুলি প্রাচীর-পরিবেষ্টিত এবং উহাদের ভুমি-পরিমাণ ১৫ কাঠা-হইতে প্রায় ৬ বিঘাপর্য্যন্ত। জুলাই ও আগষ্ট-মাসে উক্ত গ্রামের প্রত্যেকটিহইতে শত-শত-মণ দ্রাক্ষা বাজারে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। দীর্ঘদেহ, মুসলমান দ্রাক্ষা-কৃষক চারফিট্ উঁচু ও দুইফিট চৌড়া বৃতিদ্বার দিয়া গুঁড়ি মারিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ও বাহির হইয়া আসে।
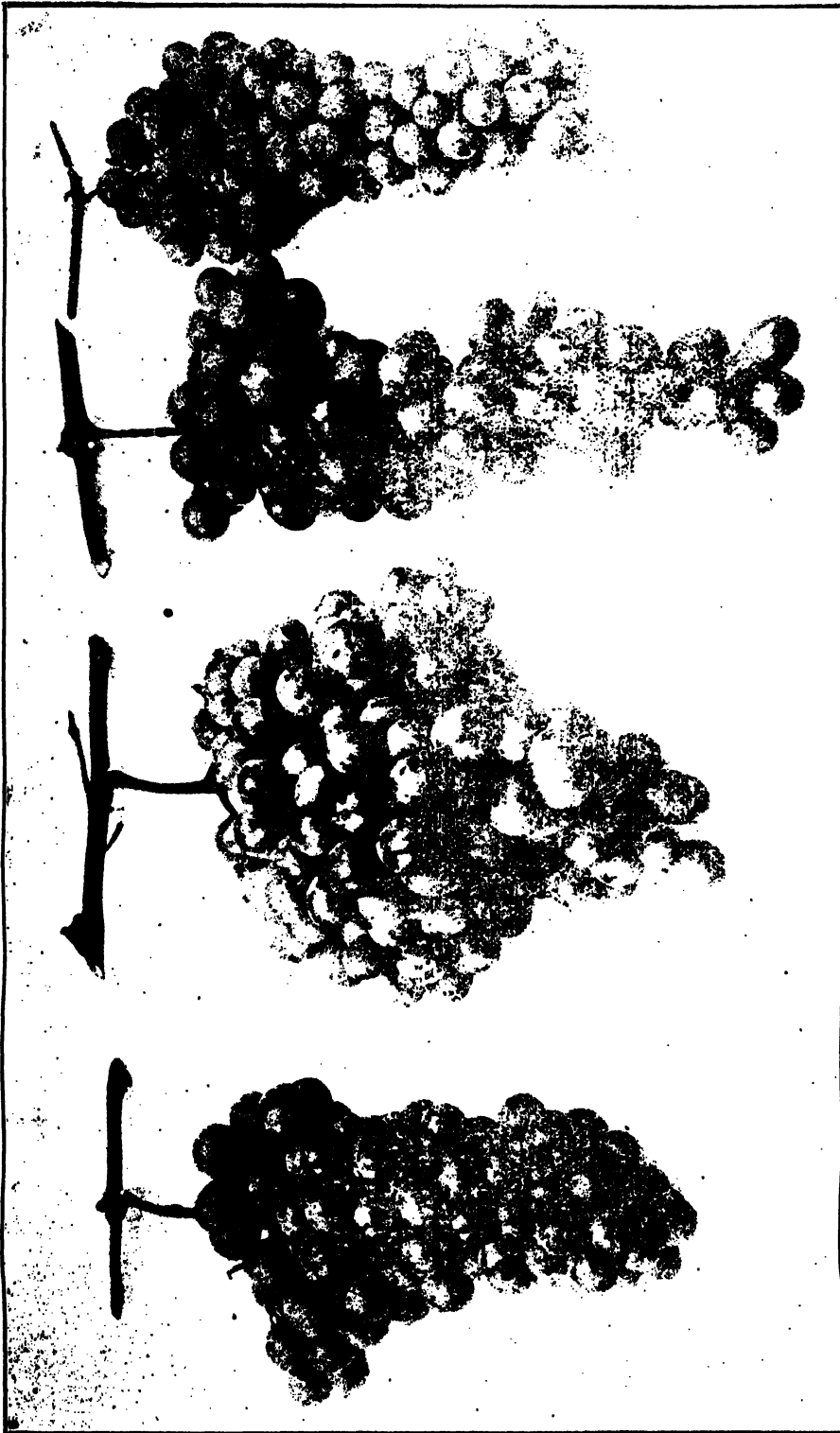
জুলাই ও আগষ্ট-মাসে বড় "গুমোট" হয়, তখন দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রের আবহাওয়ায় কৃষকের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। যেখানে দ্রাক্ষাবিতানের পত্র-পল্লবগুলি অতি ঘনসন্নিবিষ্ট, সেখানেও মধ্যাহ্নে তাপ-পরিমাণ ১৩০° ডিগ্রীর নীচে নামে না। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী-মাসে উহার তাপ-পরিমাণ ২০° ডিগ্রী-হইতে ৮০° ডিগ্রীপর্য্যন্ত হয়।

দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলির নৈসর্গিক পয়ঃপ্রণালীগুলি চমৎকার। তদ্ভিন্ন সমস্ত গ্রামটিতে একটী ক্ষেত্র আর একটী ক্ষেত্রের সমোচ্চ নহে বলিয়া, জল গড়াইয়া গড়াইয়া নিঃসৃত হইয়া যায়। "বারার" জল শীঘ্র উৎপ্লাবিত হইয়া শীঘ্রই নামিয়া যায়। অনেক সময়ে উহা প্রায় শুষ্কতোয়া হইয়া থাকে। তখন অন্যান্য ক্ষেত্রের সহিত দ্রাক্ষাক্ষেত্রেও জলকষ্ট উপস্থিত হয়। ১৫ই এপ্রিলহইতে ১৫ই জুনপর্য্যন্ত দ্রাক্ষা-উৎপাদকেরা প্রতি-দশদিন-অন্তর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে জল সেচিত করে। ফসল কাটিয়া লইবার পর ডিসেম্বর-মাসপর্য্যন্ত বুঝিয়া-শুঝিয়া জল-সেচনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তাহার পর তিনমাসকাল দ্রাক্ষাক্ষেত্র-

গুলিতে সকল কার্য্য স্থগিত থাকে। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীরগুলি দ্রাক্ষালতাগুলিকে দুর্দ্দান্ত শীতবায়ু, চরণশীল পশুকবল ও অন্যান্য আততায়ীহইতে রক্ষা করে। দ্রাক্ষাক্ষেত্রহইতে দ্রাক্ষা-হরণ সে দেশে বড় বিরল ব্যাপার; কারণ দ্রাক্ষাস্বামিগণ দ্রাক্ষা-দানে মুক্তহস্ত, তাহাছাড়া জুলাই-আগষ্টমাসে, মরসুমের সময়, সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিও কিছু দ্রাক্ষা-ক্রয় করিতে সমর্থ হয়।

সুর্সাভাই।।

ডিসেম্বর-মাসে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে দে'ওয়াল-তোলা হয়। তাহার পর, ১৫ই জানুয়ারীপর্য্যন্ত, যতবার সম্ভব, ক্ষেত্রগুলিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারী-মাসের গোড়ায় ক্ষেত্রের এক কেন্দ্রহইতে অন্য কেন্দ্রে ৪ ফিট চৌড়া ও ১ ফিট গভীর অনেক 'জুলি'-কাটা হয়। আর সেই সময়ে দ্রাক্ষার, চারা নহে, শাখা রোপিত হয়। পর বৎসর ফেব্রুয়ারী-মাসে, প্রায় এক বৎসর বাদে, দ্রাক্ষালতাগুলির প্রথম ডাল-ছাঁটাই আরব্ধ হয়। দ্বিতীয় বৎসরে উহার দ্বিতীয় ছাঁটাই হয়। তৃতীয় বৎসরে উহাতে কয়েকগুচ্ছ দ্রাক্ষা ফলে, কিন্তু সপ্তমবর্ষ-হইতেই দ্রাক্ষালতা পূর্ণপরিমাণে ফলপ্রসূ হইয়া উঠে। বাজিদ খেলের একটী উর্ব্বর দ্রাক্ষাক্ষেত্র পঞ্চাশবৎসরের উর্দ্ধকাল বরাবর

বোপ্পী।
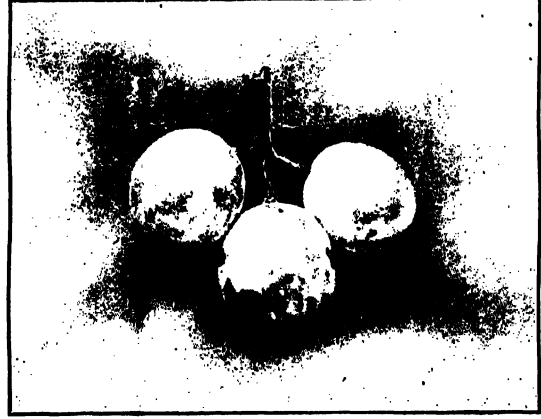
দ্রাক্ষা-প্রসব করিতেছে। পেশোয়ার-তহশীলের অন্তর্গত দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রগুলির অধিকাংশই পরিণতি-লাভ করিয়াছে। দ্রাক্ষালতার প্রত্যেকটিতে এতগুলি করিয়া গুচ্ছ থাকিবে, এইরূপ একটী ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই; যতগুলি গুচ্ছ জন্মে, সকলগুলিই রক্ষিত হয়, তদ্ভিন্ন গুচ্ছগুলির ফলসংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বিরল করিয়া দেওয়া হয় না। এই অপ্রাজ্ঞতার ফলে সব বছরে ফসলের পরিমাণ সমান থাকে না, তারতম্য ঘটে। কোন লতায় ৩০টি গুচ্ছ, আবার কোন লতায় হয়ত শতাধিক গুচ্ছ জন্মে।

বেদানা।।

সবশুদ্ধ সাতরকমের আঙুর জন্মে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ দ্রাক্ষা-কৃষীর মতে এই সাতরকম দ্রাক্ষাই এদেশে আবহমান কালহইতে ফলিতেছে।

ফলসংগ্রহের সময় মজুরদের গুঁড়ি মারিয়া কাজ করিতে হয়। এ বড় পরিশ্রমের কাজ, তাই সেখানকার মজুর সকাল নয়টাহইতে সন্ধ্যা ছয়টাপর্য্যন্ত সেখানে "জোন" খাটিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হয় না। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিকেরা পেশোয়ারের ফলবিক্রেতাদিগকে সাধারণতঃ ২ বৎসরহইতে ১০ বৎসরপর্য্যন্ত ক্ষেত্র "জমা" দিয়া থাকে।

হোসেনী।

মালিকেরা ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য করায়, জমাদারেরা, ফল পাকিলে, আসিয়া লইয়া গিয়া বাজারে বিক্রয় করে। প্রায় দেড়বিঘা জমীর নিমিত্ত ক্ষেত্রস্বামীরা যে মূল্য পায়, ক্ষেত্রানুসারে তাহার সবিশেষ

তূর।

তারতম্য ঘটে। যে ক্ষেত্রে খুব উৎকৃষ্ট ফসল হয়, তন্নিমিত্ত ক্ষেত্র-স্বামী ৪০০৲ টাকা পাইতে পারে। দেড়বিঘা-পরিমিত জমীকে এক 'জরিব' বলে, এক জরিব জমীর ফসলের ২০০৲ টাকা মূল্য বড় কম বিবেচিত হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষস্বামীদিগের মধ্যে ব্যবসায়ি-সুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বড় নাই। সপ্তাহের দুই দিন, মনে করুন সোমবার ও বৃহস্পতি-বার, এক ক্ষেত্রস্বামী বাজারে আঙুর-বিক্রয় করিতে গেল, আর দুইদিন আর একজন গেল, এইপ্রকারে সম্প্রীতির সহিত ব্যবসায়-পরিচালন করা হয়। ফলে বাজারে কোন দিন আঙুরের ছড়াছড়ি হয়

কিস্‌মিস্‌।

না। সন্ধ্যাবেলা ফল কাটিয়া চেটালো খোলা ঝুড়িতে জমা করা হয়। এক-এক-ঝুড়িতে আধমোণহইতে একমোণপর্য্যন্ত

তাসা।

ফল ধরে। যে শ্রেণীর আঙুর উৎকৃষ্ট অথবা বিরলপ্রসূ, সেগুলি আধমোণী ঝুড়িতে রাখা হয়। পরে দুইজন বলিষ্ঠ লোকে খোলা চেটালো হাতগাড়ি করিয়া উহা বাজারে বিক্রয়ার্থে লইয়া যায়। রেলে কোন স্থানে আঙুর পাঠাইতে হইলে, শুক্তিবিশেষের ঝিনুকা-কৃতি একপ্রকার ঝুড়িতে করিয়া পাঠান হয়। ঝুড়ির ভিতরে শুষ্ক, কোমল ঘাস ও দ্রাক্ষাপত্র বিছান থাকে। গুচ্ছগুলি একভাবে রাখিয়া শক্ত করিয়া ঝুড়িবন্দী করিতে হয়। ঐ ঝুড়ীর মুখে ম্লাজা-কার ঢাকনী বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ফলবিক্রেতারাই রেলে মাল পাঠায়।

জলান্তগ যান।

জলান্তগ যানের ইংরাজী নাম—"সাবমেরিণ"। উহা বড় ভয়ানক পদার্থ। যুদ্ধার্থেই এই পোত ব্যবহৃত হয়, শত্রুপোত-সংহারই উহার একমাত্র কার্য্য। এই পোত জলের ভিতরে ডুব দিয়া চলে, তাই আমরা উহার ঐ নাম দিয়াছি।

এই জাহাজ ইস্পাতের তৈয়ারি। ইহাতে জল-প্রবেশের সকল পথই রুদ্ধ, অথচ ইহার মধ্যে প্রায় বারোজন নৌ-সেনা থাকে। কি করিয়া থাকে? দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যায় না? তাহার উপায় আছে। উহার মধ্যে একটী ঘরে নির্ম্মল বায়ু পুরিয়া রাখা হইয়াছে,

তাহা একটু একটু করিয়া ছাড়া হয়, আর দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিবারও উপায় আছে। তদ্ভিন্ন বায়ু-পরীক্ষার্থে উহার মধ্যে একটী যন্ত্রও আছে, বায়ু দূষিত হইয়া উঠিলেই, জলান্তগ যান জলোপরি তুলিয়া ফেলা হয়। উহার অনেক স্থানে কাচ-আঁটা গবাক্ষ আছে, তাহাদ্বারা আলোক-প্রবেশ করে। তদ্ভিন্ন উহাতে "পেরিস্কোপ্" বা সর্ব্ববীক্ষণ বলিয়া একপ্রকার নলাকৃতি যন্ত্র সংলগ্ন আছে, বাহিরের চতুর্দ্দিকের তাবৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব ঐ যন্ত্রসাহায্যে জাহাজমধ্যস্থ একটী মসৃণ মেজে পতিত হয়, তদ্দর্শনে ঐ পোতারোহিগণ তাহাদের পোতের অবস্থান-নির্দ্দেশ করিয়া লয়। পূর্ব্বে এই যন্ত্রটী ছিল না বলিয়া, বহু জলান্তগ যান ধ্বংসিত হইয়াছে। এই পোতের আকার ঠিক একটি চুরুটের মত। তবে উহার উপরিভাগে (ছাদে) যাহাতে লোকে দাঁড়াইতে পারে, তজ্জন্য উহা চেপ্টা। ঐ পোতের একাংশে একটী চোঙও আছে, তাহা দিয়া উহার অভ্যন্তরে যাইতে হয়। ঐ চোঙের মুখে একটা ঢাকনী আছে, উহা যখন জলে ডুবিয়া যায়, তখন উহার মুখ ঢাকিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাই জল-প্রবেশ করিতে পারে না। সাধারণ জাহাজ সাম্‌নে পিছনে চালান যায়, এই জাহাজ শুধু সাম্‌নে পিছনে নহে, উপরে নীচেও উঠান-নামান যায়। ইহাতেও এঞ্জিন আছে, তবে ইহার কল বাষ্পচালিত হয় না, 'পেট্রল' বা 'গ্যাসোলীন'-দ্বারা চালিত হয়। জলের অপেক্ষা ভারী না হইলে, কোন পদার্থই জলে ডুবে না, এ পোত তবে কি করিয়া ডুবে? ইহার তলদেশে ঢাক্‌নী (safety-valve) আছে, তাহা খুলিয়া দিলে, জাহাজের একটা চৌবাচ্ছায় জল ঢুকিয়া উহাকে প্রয়োজনমত ভারী করে, আবশ্যক জল প্রবিষ্ট হইলে, ঐ ঢাক্‌নী বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়।

প্রত্যেক জলান্তগ যানে পাঁচটা করিয়া "টরপেডো" থাকে। "টরপেডো" কি? উহা একপ্রকার গোলা। ঐ গোলার একটী ছুড়িয়া যত বড়ই জাহাজ হউক না কেন নষ্ট করা যাইতে পারে। যখন কোন দেশের কাছে, যুদ্ধার্থে শত্রুপোত আসে, তখন জলে কতকগুলি জলান্তগ যান নিমজ্জিত করা হয়। শত্রুপোত এই জলান্তগ যানের গতিবিধি-অনুভব করিতে পারে না, উহার গোলার আঘাতে ধ্বংসমুখে নিপতিত হয়। জলান্তগ যানের গোলা সোজা-সুজি তাগ্ করা যায় না, জলের বাধায় উহার গতি তির্য্যগ্ হইয়া যাইবেই, তাই যে পোত ঐ গোলার আঘাতে বিনষ্ট করিতে হইবে, তাহাহইতে কিছু অগ্রে ঐ গোলা ছুড়িতে হয়, তাহা হইলে ঐ গোলার সহিত শত্রুপোতের ঠেকাঠেকি হইয়া পোতখানি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। তবে জলান্তগ যানের গোলার লক্ষ্য প্রায় ঠিক হয় না, অনেক সময়েই ফস্‌কিয়া যায়, কারণ উহার তাগ্ বড় আন্দাজ করিয়া করিতে হয়।

জলান্তগ যানের অভ্যন্তরে কি আছে, তাহা বলা বড় সহজ নহে, কারণ উহা প্রত্যেক জাতিই গোপনে রাখে। তবে উহার একমুখে যে গোলা ছুড়িবার জন্য একটা রন্ধ্র আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তদ্ভিন্ন উহাতে দুইপাশে দুইটি বৃহৎ বায়ুপূর্ণ কোষ আছে। উহার মধ্যে মুক্ত স্থান অতি অল্পই আছে, তাই নাবিকগণকে উহার মধ্যে ঠেসাঠেসি করিয়া থাকিতে হয়। যুদ্ধার্থে যতগুলি যান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা ভীষণতম। ব্যোমরথের আবিষ্কারফলে উত্তরকালে হয়ত আকাশেও যুদ্ধ হইবে, তাহা হইলেও ব্যোমরথ লোক-চক্ষুর গোচরে থাকে, তাই তত ভয়াবহ নহে। এই জলান্তগ যানটা কিন্তু বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ। তুমি কিছুই জানিলে না, শুনিলে না, এই পোতটি তোমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিল, তুমি আত্মরক্ষার কোনই সুযোগ পাইলে না। ইহার মধ্যে যদি কিছু বীরত্ব থাকে তো, ইহার নাবিকদিগেরই আছে, নতুবা, আমার মনে হয়, ন্যায়যুদ্ধে এই পোতটার ব্যবহার না করিলেই, ভাল হয়।

যাহা হউক, সুখের বিষয়, এমন একটী যুগের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহার পূর্ণতায় সময় মানুষ আর মানুষের প্রতি হিংসাপ্রকাশ করিবে না, শান্তিময়ের শান্তিই সকল দেশের উপর তাহার শ্বেত-কেতু উড়াইবে, তখন জলান্তগ যানগুলি নিশ্চয়ই অতলতলে চিরনিমজ্জিত হইবে।

ইতরপ্রাণীর ভাষা।

গরু, গাধা, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি ইতরপ্রাণীরা পরস্পর কি করিয়া কথা কয়? কি করিয়া পরস্পরের মনোভাব জানাজানি করে? তাহারা কি মূক, তাহাদের মধ্যে কি কোন ভাবোদয় হয় না? তাহাদের ভাষা অনেক সময়ে মৌন বটে, কিন্তু তাহারা যে মূক, একথা সাহস করিয়া বলা যায় না। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু যে কথা কয়, তাহা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি। হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মানুষের মুখমণ্ডলে যেমন একটী বাহ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, ইতর-প্রাণীদিগের মধ্যেও তেমনি মুখভঙ্গীর বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। আমরা ইতরপ্রাণীদের ভাষার অ, আ, ক, খ জানি না বলিয়া, আমাদের গোল ঠেকে। তাহা হইলেও ইতর প্রাণীদের মধ্যে যে ভাব-বিনিময় হয়, এইরূপ বিশ্বাসের প্রচুর হেতু আছে। এই ভাবব্যঞ্জনার্থে অনেক ইতর জীবও মনুষ্যের ন্যায় শব্দের সাহায্য গ্রহণ করে। তদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে একপ্রকার অস্ফুট মৌনভাষাও

প্রচলিত আছে। এখানে কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, শেষোক্ত-টিকেও কি আমরা ভাষা বলিব? কেন বলিব না? ভাবের যদ্দারা ব্যঞ্জনা হয়, তাহাই স্থূলতঃ ভাষা; তবে তাহাকে ঠিক শাব্দিক-ভাষা বলা সমীচীন হইবে না।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলেন, মনুষ্যের পরেই বানর। সুবিখ্যাত ডারুইন-সাহেব মনুষ্য ও বানর এই উভয় জীবের মধ্যস্থানীয় কোন জীবের অস্তিত্বানুমান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা অনুমানমাত্র; আপাততঃ বানরকেই মানুষের অব্যবহিত নিম্নপদস্থ ধরিয়া লইলে, ক্ষতি নাই। এই বানরেরা কি করিয়া ভাবপ্রকাশ করে?

লণ্ডনের জীবনিবাসে "জেনী"-নামে এক ওরাংউটান-জাতীয় বানরী ছিল। সে তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা শিক্ষিতা হইয়া অনেক মানবসুলভ চাতুর্য্য-প্রকাশ করিত। একদিন সে তাহার খাঁচাহইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। এজন্য তাহার রক্ষক তাহার উপরে যেন বড় রাগ করিয়াছে, এইপ্রকার ভাণ করে। তাহাতে বেচারা তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে এবং তাহার কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল, এবং যত ক্ষণ না তাহার বোধ হইল যে, তাহার রক্ষকের রাগ পড়িয়াছে, ততক্ষণ নিবৃত্ত হইল না। সে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি বলিতেছিল, তাহা অবশ্য সেই বানরীর রক্ষক বুঝিতে পারে নাই, কারণ নরে বানরের ভাষা জানে না, কিন্তু তাহার স্বজাতি যে, তাহার সেই ভাষা বুঝিত, তাহার প্রমাণ সে কথা কহিয়াছিল! শ্রোতা না থাকিলে, বক্তা থাকে কি?

"ব্রেহ্ম্" বলিয়া এক সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পর্য্যটক ও জীবতত্ত্ববিদ্ বানরের ভাবব্যঞ্জনার আর একটী উদাহরণ দিয়াছেন—

তিনি একদা দুইটী সাহসী সারমেয় লইয়া এক বনমধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। পথে একদল বানরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাহাদের দেখিয়া কুকুর-দুইটী পশ্চাদ্ধাবন করিল। মর্কটেরা পলাইয়া গেল, কেবল একটী বানর-শিশু পলাইতে পারিল না। "ব্রেহ্ম্" আশা করিয়াছিলেন যে, কুকুরেরা সেই শিশুটীকে ধরিতে পারিবে, কিন্তু তাহা হইল না; কুকুর-দুইটা সেই বানর-শিশুর সন্নিকট হইবামাত্রই, বানরেরা সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যতক্ষণ অন্য বানরে চীৎকার করিতেই থাকিল, ততক্ষণ একটা বড় ও বুড়া বানর পাহাড়হইতে নিঃশব্দে অথচ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া, বাচ্ছা বানরটিকে কুকুরদুইটার প্রায় মুখহইতেই ছিনাইয়া লইয়া এক নিরাপদ্ স্থানে তুলিয়া দিল। তাহার পর যতক্ষণ না সেই বানর-শিশুটি তাহার মায়ের কাছে যাইতে পারিল, ততক্ষণ তাহাকে আগ্‌লাইয়া রহিল। দুইদিন পরে, ব্রেহ্মের আবার সেই বানর-দলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আবার বানর-দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। ব্রেহ্ম্ বন্দুক ছুড়েন, তাহাতে বানরীরা শিশুসন্তান-দের লইয়া পর্ব্বতান্তরালে লুকাইয়া যায়, বানরেরা কিন্তু পাহাড়ের ধারে আসিয়া চীৎকার করিতে করিতে ব্রেহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকে পাথর গড়াইয়া দিতে থাকে। বানরগুলা তাহাদের দল-পতির আদেশে কার্য্য করিতেছিল। একটা বানর একটা পাথর বগলের নীচে চাপিয়া এক গাছের উপর চড়িয়া গিয়াছিল, উদ্দেশ্য সেখানহইতে ভাল করিয়া তাগ্ করিতে পারিবে!

বানরের সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

সিংহ ও ব্যাঘ্রের মধ্যেও ভাবপ্রকাশের নিদর্শন প্রচুর আছে। সিংহ সচরাচর গর্জ্জন করে; কিন্তু সিংহীর সহিত বাক্যালাপটা চুপি চুপিই হয়!

'বিড়ালের মাসীর' কথা-কহাটা বুঝান বড় সোজা হইবে না। একটী ঘটনার উল্লেখ করি। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে এক শিকারী, শিকারান্তে ক্লান্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল যে, কে যেন তাহাকে মাটীতে গুঁজড়িয়া ধরিল। চৈতন্য হইলে সে দেখিল, এক ব্যাঘ্রী তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়াছে। প্রায় ক্রোশ-খানিক পথ লইয়া গিয়া, সে তাহাকে এক জায়গায় মাটীতে নামাইয়া রাখিল। তাহার বাঁ-কাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে তাহার দক্ষিণহস্তে বন্দুক তখনও ধরিয়াছিল, তথাপি সে নড়িতে সাহস করিল না। তাহাকে নামাইয়া রাখিয়া ব্যাঘ্রী মাথা তুলিয়া একপ্রকার কোমল প্লুত-ধ্বনি করিল। নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গল-হইতে প্রত্যুত্তর আসিল। তাহার পর, দুইটা বাঘের বাচ্ছা বনহইতে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মায়ের পায়ের কাছে একটা মানুষ পড়িয়া আছে দেখিয়া প্রথমে ত তাহারা বড়ই ভয় পাইল। কিন্তু ব্যাঘ্রী মৃদু-শব্দ করিয়া এবং শিকারীকে মুখে করিয়া, বিড়ালে যেমন ইঁদুর ঝাঁকড়ায়, তেমনি আস্তে আস্তে ঝাঁকড়াইয়া বাচ্ছা-দুইটিকে কি করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিল। ঐরকম অনেকক্ষণ ধরিয়া লওয়াইবার পর, শার্দ্দূল-শাবকেরা শিকারীর কাছে আসিয়া তাহা-দের "দুধে দাঁত"-দিয়া শিকারীর পা কামড়াইতে লাগিল। শিকারী তখন একপাশে গড়াইয়া গিয়া ব্যাঘ্রীর বক্ষঃলক্ষ্যে গুলি করিয়া তাহাকে বধ করিয়া আত্মপ্রাণ-রক্ষা করিল।

পোষা বাঘেরা তাহাদের রক্ষককে আহ্বান করিবার জন্য এক-প্রকার মৃদু-শব্দ করে, উত্তর পাইলে, আর একপ্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিয়া আনন্দ-প্রকাশ করে। পিপাসা পাইলে, একপ্রকার আওয়াজ করে, ক্ষুধার সময় আর একপ্রকার শব্দ করে। এ কি ভাষা নহে?

কোন গোপনীয় পরামর্শ করিবার সময়—মানুষেরা যেমন কয়েকজনে মুণ্ড বড় কাছাকাছি করে, ইতরপ্রাণীদিগকেও সেইরূপ করিতে দেখা যায়।

(ক্রমশঃ।)

মার্চ্চমাসের পদ্যরচনার প্রতিযোগিতার ফল।

এইবার নিম্নলিখিত পদ্যটি যিনি (একখানি পোষ্টকার্ডে) লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনিই প্রথম হইয়াছেন; কিন্তু তিনি নাম, ধাম, বয়স প্রভৃতি কিছুই লিখিয়া পাঠান নাই, একারণ তিনি কতদূর পুরস্কার-লাভের যোগ্য তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। অতএব এই কবিতা-পাঠের পর, তিনি অগৌণে আমাকে তাহা জানাইবেন। ইতি—"বালক"-সম্পাদক।

অতি লোভের ফল।

মাংস খণ্ড ল'য়ে মুখে, কুকুর মনের সুখে,
ধীরে বন হ'য়ে যায় পার।
নীচে সুবিমল জল ধীরে চলে অবিরল,
দেখা যায় ছায়া তা'র তা'র।
ভাবে দেখি' ছায়াটায়, অপর কুকুর যায়,-
মাংসমুখে ঝুলিতেছে ওই।

অমনি পড়িল লোভে, ভাবে দুইখানা হ'বে
ওর খানা যদি কেড়ে লই।
এইরূপ ভেবে চিতে, যেই গেল কেড়ে নিতে,—
হা ক'রে গর্জ্জিয়ে তা'র পানে;
কোথা বা দু'খানা আর, মুখে যাহা ছিল তা'র,
তা'ও প'ড়ে ভেসে গেল টানে।

পদ্যরচনার প্রতিযোগিতা।

এই ছবিটি-অবলম্বন করিয়া ছেলেদের উপযুক্ত একটী হাসির কবিতা রচনা করিতে হইবে। কবিতাটি যেন ষোল পংক্তির বেশী বড় না হয়। উহা জুনমাসের শেষতারিখের মধ্যে আমাদের হাতে আসা চাই। কবিতাটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া "বালক"-সম্পাদক, ২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। প্রাপ্ত কবিতাগুলির "বালক"-সম্পাদক যথেচ্ছব্যবহার করিতে পারিবেন। যে লেখকের কবিতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে এক-খানি ইংরাজী-পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে। তাই লেখকগণ তাঁহাদের রচনাগুলির নিম্নে কোন একস্থানে তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
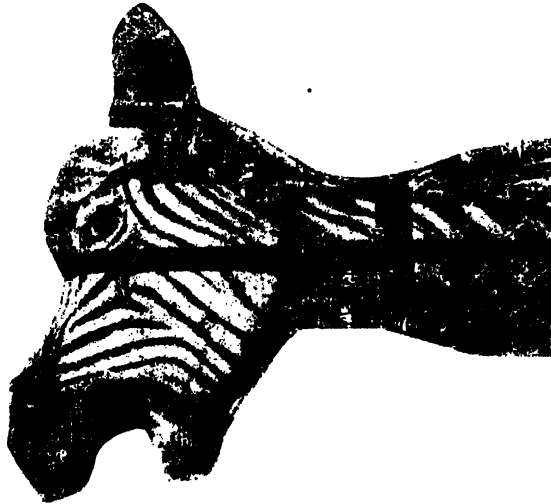
চিঠি-চাপাটি।

"বালক"-সম্পাদক অনেক পাঠক-পাঠিকার নিকটহইতে পত্রাদি পাইয়া প্রীত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে, (১) তাঁহারা যেন "বালকের" নিয়মাবলী একবার মনদিয়া পড়েন, (২) এবং আমাদের এই পত্রের যেন উন্নতির চেষ্টা করেন। যাঁহারা "বালক"-পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবকেও ইহার গ্রাহক করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের এই পত্রের আরও উন্নতি হইবে, এবং আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত হইব।

"বালক"-সম্পাদক।

২য় বর্ষ।]　　　　　　জুলাই, ১৯১৩।　　　　　　[৭ম সংখ্যা।

মার্জ্জনা।

-আখ্যায়িকা।-

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাচ্য আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের তখন উষাকাল। তখনও তাঁহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা বহুদেবার্চ্চনা প্রতিষ্ঠা-লাভ করে নাই। এমন কি তখন তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণেও বিভক্ত হইয়া পড়েন নাই; সকলেই একবর্ণ ও একেশ্বরের উপাসক। তবে তখন তাঁহারা সম্প্রতি সুর ও অসুর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তখনও দেবাসুর-দ্বন্দ্ব সমারব্ধ হয় নাই; সে সমরানল তখনও প্রজ্বলিত হয় নাই, প্রধূমিত হইতেছে মাত্র। তখন আর্য্যগণের ঈশ্বর এক, বেদও এক। সে বেদগাথা তখন শ্রুতিমাত্র, ঋষি ও ঋত্বিক-কণ্ঠে গীত হয়; লিপিবদ্ধ হয় নাই। তখনকার আর্য্যনারীগণ অবগুণ্ঠিতা হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধা থাকিতেন না, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁহারা পুরুষদিগের সহকর্ম্মিনী ছিলেন, "কন্যাকেও পালন ও যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া উচিত", এ উপদেশ তখনকার পুরুষদিগকে দিতে হইত না; কেননা আমরা দেখিতে পাই, বেদের বহু গাথার তাঁহারাও রচয়িত্রী।

তখনকার আর্য্যগণ কৃষাণমাত্র নহেন, তাঁহাদের মধ্যে তখন মণিকার, স্বর্ণকার, কাংস্যকার, কর্ম্মকার, চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি, কুলাল, ত্বষ্টা প্রভৃতি বিবিধ শিল্পী ও কারুকুলের আবির্ভাব হইয়াছে। তখন তাঁহাদের ধন-ধান্যের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঋদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাই তখন তাঁহাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিরও নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; যে শ্রীসম্পন্ন পুরুষের শস্যাগার ও গোশালা ধান্যে, গোধূমে ও পয়স্বিনী গাভীতে পরিপূর্ণ, তিনি আর তখন পর্ণকুটীরে বাস করেন না, একপ্রকার ফেনশুভ্র গিরিমৃত্তিকায় ও প্রস্তরে তাঁহার আবাস নির্ম্মিত হয় এবং তাঁহার দীর্ঘায়ত গৌরতনু কুঙ্কুম-তিলকে, বসনে, উত্তরীয়ে, কর্ণ-কুণ্ডলে, বলয়ে ও কাঞ্চন-মেখলায় ভূষিত থাকে; চরণযুগলও একান্ত নগ্ন থাকে না; তাহাতেও একপ্রকার শ্বেতচর্ম্মের পাদুকা শোভা পায়।

এ হেন সময়ে, একদা এক রৌদ্র-প্রদীপ্ত, শারদীয় দিবসে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত'-প্রদেশের 'তুষার-তোরণ'-দুর্গে ভারি হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

ঐ দুর্গের সভা-কক্ষ্যাটির আয়তন খুব দীর্ঘ, কিন্তু দুর্গটি তত উচ্চ নহে। উহার গৃহপ্রাচীরগুলি বড় স্থূল, কিন্তু গবাক্ষগুলি একান্ত ক্ষুদ্র। শীতবারণার্থে সেই কক্ষ্যায় দুই-তিনটি চুল্লী জ্বলে, কিন্তু ধূমনির্গমের কোনই পথ নাই; ফলে ছাদতল ধূমপাংশু ও ঝুলে পরি-পূর্ণ।

আজ এই দুর্গমধ্যে, পূর্ব্বেই বলি-য়াছি, উৎসব-কোলাহল উঠিয়াছে। চারিদিকে নানালোকে নানা-প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, অস্ত্রাগারে কতিপয় যোদ্ধা অস্ত্রগুলির সংস্কার ও মার্জ্জনা করিতেছে। প্রত্যেক কক্ষ্যাই পরিষ্কৃত করা হইতেছে। দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারের আজ বড়ই ঘটা করিয়া আয়োজন করা হইতেছে, সে কার্য্যে আজ কয়েকজন

তপ্তকাঞ্চনাঙ্গী আর্য্যযুবতী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। তাহাতে মৎস্যের সম্পর্ক নাই, মাংসও এখনও আসিয়া পঁহুছে নাই, কিন্তু পায়স-পিষ্টকের সুমিষ্ট গন্ধে অনেকেরই রসনা আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

সভাকক্ষ্যার মধ্যস্থলে কয়েকখানি সুগন্ধি শষ্পাসন আস্তরিত রহিয়াছে; মধ্যে একটী সিংহ-ক্ষোদিত দারুময় আসনও অদ্য সংস্থাপিত। তাহাতে স্বষ্টার কৃতিত্ব-পরিচায়ক অনেক কারুকার্য্যও পরিলক্ষিত হইতেছে।

এক বর্ষিয়সী বরবর্ণিনী সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার কাক-পক্ষের ন্যায় কৃষ্ণ দীর্ঘকেশের মধ্যে কোথাও কোথাও এক-আধগাছি রৌপ্য-সূত্রবৎ শুভ্রকেশ দেখা যাইতেছে,—সে কেশকলাপ অবেণীবদ্ধ ও উত্তরীয়ে আচ্ছাদিত। তিনি এক সূক্ষ্ম অথচ উষ্ণ পশমী বসন পরিয়া রহিয়াছেন, সেই বসনে তাঁহার দ্রব-দ্রবিণাঙ্গ শালীনতার সহিত আচ্ছাদিত রহিয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে দুর্গদ্বারের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, যেন কাহারও আগমন-প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন; কিয়ৎক্ষণ পরে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "ক্রীড়ামত্ত বালকেরা, দেখিতেছি, সময়ে মৃগমাংস লইয়া উপস্থিত হইতে পারিবে না। তাহা হইলে রাজার আজ পরিতোষরূপে আহারই হইবে না; তাই তো, কি করা যায়?"

এমন সময়ে তিনি অদূরে ভেরী-নিনাদ শুনিতে পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কাহার পদশব্দও শ্রুত হইল। দেখিতে-না-দেখিতে একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক হাঁফাইতে হাঁফাইতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আর্য্যা গৌতমী! আ—আমিই বিদ্ধ করিয়াছি, গলায়, শুনিতেছেন? দশশৃঙ্গ মৃগ!"

বালকের মুখমণ্ডল শ্রমনীরে বিভূষিত, তাহার গৌর-গণ্ডদ্বয় শ্রমাতিশয্যে রক্তিম শ্রী-ধারণ করিয়াছে; মস্তকের মুক্তকুন্তল এলায়িত হইয়া তাহার সেই মুখমণ্ডলের কিয়দংশ আবৃত করিয়াছে। তাহার দক্ষিণহস্তে একটী অনতিবৃহৎ কঞ্চিকা-কার্ম্মুক মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বর্ষিয়সী বলিলেন,—"বৎস, জয়ন্ত, তুমি—তুমি মৃগহনন করিয়াছ?"

সরলহৃদয় ও সত্যসন্ধ বালক উত্তর করিল,—"না, আর্য্যে, আমি কেবল তাহার গলদেশ শরবিদ্ধ করিয়াছি। অরবিন্দের শর তাহার চক্ষুর্মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে সে ধরাশায়ী হইয়াছে। দেখুন, আর্য্যে, আমি যেন এইখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, হরিণটা বনভেদ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, আমি এমনই করিয়া ধনুক ধরিয়া এক প্রকাণ্ড শাল্মলী-তরুর তলে—" গৌতমীর বালকের সকল কথা শুনিবার এখন অবকাশ ছিল না, তাই তিনি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"মৃগটা কি আনা হইতেছে?"

"হাঁ, অরবিন্দ আনিতেছেন। আমার তীরটা খুব দীর্ঘ ছি—"

এমন সময়ে এক যুবক মৃত হরিণকে স্কন্ধে করিয়া দুর্গসমীপে দর্শন দিলেন। তদ্দর্শনে গৌতমী অগ্রসর হইয়া তাহা পাকোপযোগী করণার্থে আদেশ-প্রদান করিতে গেলেন। বালক জয়ন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতভাবে শিকার-কাহিনী বলিতে বলিতে চলিল, গৌতমী তাহার কথা শুনিতেছেন কি না, সে বিষয়ে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। এককথা বার বার বলিতে লাগিল, আর শেষে বলিতে থাকিল,—"এ গল্পটি পিতার নিকটে বলিতেই হইবে। আর্য্যে, আপনি কি মনে করেন, তিনি কি শীঘ্রই আসিবেন?"

কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্গায়তনে দুইজন পুরুষ প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর, বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ; উভয়েই মৃগয়ার বেশ পরিয়া রহিয়াছেন, কটিবন্ধনীতে এক-একটী করিয়া ছুরিকা ও শিঙ্গা ঝুলিতেছে। বয়োজ্যেষ্ঠের স্কন্ধদেশ সুপ্রশস্ত, মুখমণ্ডল রৌদ্রদগ্ধ, লোহিত ও পরুষতা-ব্যঞ্জক। বয়ঃকনিষ্ঠ দীর্ঘদেহ, লঘু, ক্ষিপ্র, উজ্জ্বলচক্ষুঃ ও স্মিতহাস্যসমন্বিত। বয়োবৃদ্ধ গৌতমীর পুত্র যোদ্ধৃবর নক্র-বিক্রম এবং বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁহারই একমাত্র পুত্র অরবিন্দ। লোকপাল বিপত্নীক বৃক-বিক্রম ইঁহাদেরই উপর তাঁহার একমাত্র পুত্র জয়ন্তের শিক্ষাভার সংন্যস্ত করিয়াছেন। তাই এই-খানেই জয়ন্ত অপত্যনির্ব্বিশেষে পালিত ও শিক্ষিত হইতেছে।

তৎকালে রাজগণের মধ্যে এই পদ্ধতি ছিল যে, রাজপুত্রগণ রাজপ্রাসাদে পালিত হইতে পাইতেন না, কোন অধীন সেনানীকেই সে ভার প্রদত্ত হইত। বৃক-বিক্রম নক্র-বিক্রমের উপর এই ভার-প্রদান করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত যে, তাঁহার মাতা ও তিনি স্বয়ং অদ্যাবধি প্রাচীনা আর্য্যভাষারই ব্যবহার করিতেন। ভারতীয় আদিমনিবাসিগণের ভাষার সহিত সংমিশ্রণে যে একটী বিমিশ্র-ভাষায় তখনকার আর্য্যগণ কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে ভাষা-ব্যবহারে একান্ত অনভ্যস্ত ছিলেন। বৃক-বিক্রমের এ ইচ্ছা আদৌ ছিল না যে, তাঁহার পুত্র সেই অপভাষার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়।

অদ্য নরপতি মহাকৃপাণ বৃক-বিক্রমের তুষার-তোরণ-দুর্গে আসিবার কথা আছে। সীমান্ত-প্রদেশে এক সুর-রাজের সহিত এক অসুর-রাজের সংগ্রাম বাধিয়াছে, তিনি সেই যুদ্ধ মিটাইতে যাইবার পূর্ব্বে পুত্রের সহিত একবার দেখা করিতে আসিতেছেন, তাই আজ গৌতমী তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছেন। হরিণটা একটা দীর্ঘ শূলে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে দিয়াই, গৌতমী জয়ন্তের প্রসাধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাকে প্রসাধন-কক্ষ্যায় লইয়া গিয়া, সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা হইলেও, স্বয়ংই তাঁহার কেশসংস্কারাদি করিতে লাগিলেন। বেশভূষা সমাপ্ত হইলে, জয়ন্ত কটিদেশে একটী তীক্ষ্ণ খড়্গ ঝুলাইবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার 'আর্য্যা গৌতমী' তাহাকে তাহা করিতে দিলেন না, বলিলেন,—"বৎস, তোমার আয়ুশেষ হইবার পূর্ব্বে তোমাকে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে, এখনহইতেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইও না।"

জয়ন্ত কহিল,—"আর্য্যে, নিশ্চয়ই তাহা হইতেই হইবে। আমাকে লোকে 'শাণিতকুঠার জয়ন্ত'-নাম দিবে, বোধ করি! আপনি যে মহাবীরগণের কাহিনী আমার কাছে বলিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা বীরত্বে ন্যূন হইতে ইচ্ছা করি না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমার এখনও তাঁহাদের মত রাক্ষসাদি শত্রু হয় নাই।"

গৌতমী বলিলেন,—"তাহার জন্য ভাবিত হইও না, বৎস, জীবনে কাম-ক্রোধাদি বহু শত্রুর সহিত তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহারা রাক্ষসদিগের মতই ভীষণ।"

বালক জয়ন্ত তাঁহার কথার সম্যক্ অর্থবোধ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল,—"আর্য্যে, মিনতি করি, আমাকে একখানি শাণিত কৃপাণ লইতে দিউন, তাহা হইতে আমি দেখি, তাহারা কেমন শত্রু। কিন্তু ঐ শুনুন, বুঝি পিতা আসিতেছেন। হাঁ, ঐ যে তাঁহার বৃকাঙ্কিত পতাকা দেখা যাইতেছে।"

বালক আহ্লাদে আটখানা হইয়া দুর্গ-সোপান দিয়া দুড়্ দুড়্ করিয়া নামিয়া গেল। দুর্গ-তোরণে নক্র-বিক্রম ও অরবিন্দ রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়াছিলেন, জয়ন্তও সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। অরবিন্দের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আর্য্য, আমি আজ মহারাজের অশ্বের বল্গা-ধারণ করিব।" তাহার পর, এক কৃষ্ণ অশ্বারোহণপূর্ব্বক তাহার জনককে দুর্গের প্রথম তোরণ-অতিক্রম করিতে দেখিয়া উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল। একটী মণি-মাণিক্যখচিত কটিবন্ধদ্বারা নৃপতির অরুণাভ রাজবেশ সংবৃত এবং তাঁহার কটিদেশহইতে একটী দীর্ঘতরবারি বিলম্বিত রহিয়াছে। তিনি ঐপ্রকার দীর্ঘ-তরবারি-ব্যবহার করিতেন বলিয়া, তাঁহার উপাধি হইয়াছিল,—"মহাকৃপাণ"। বিহগবিশেষের পালখশোভিত মুকুট তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতেছে। তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর। তাহাতে শোক ও সম্ভ্রম উভয়েরই চিহ্ন দেদীপ্যমান। বনিতা-বিয়োগে তিনি যে বড় বিধুর হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সে শোক যে এখনও সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়, তবে সে সৌম্য মুখমণ্ডলে তাঁহার শান্ত ও সদয় স্বভাবের নিদর্শনও বর্ত্তমান।
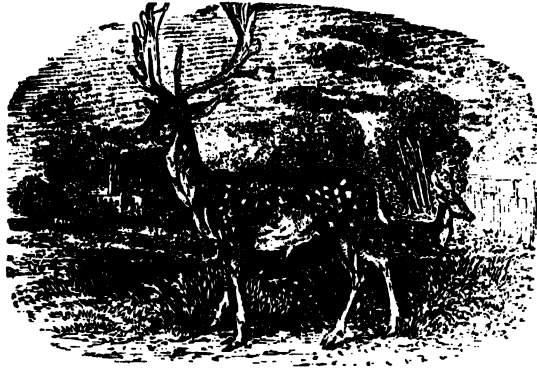
জয়ন্ত এই প্রথমবার পিতৃতুরগের বল্গা-ধারণ করিতে পাইয়া আহ্লাদে ও গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার পর সে তাহার পিতৃচরণ-বন্দনা করিল। তাহাতে তাহার পিতা স্মিতাননে পুত্রকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বৎস, অরুণেশ তোমার উপর করুণা-কিরণবর্ষণ করুন।" অনন্তর তাহাকে তুলিয়া নিজ বক্ষের উপরে চাপিয়া ধরিলেন; পুত্র পিতার গলবেষ্টন করিয়া ধরিল, পিতা পুনঃপুনঃ পুত্রমুখ-চুম্বন করিলেন। এমন সময়ে নক্র-বিক্রম ও অরবিন্দ অগ্রসর হইয়া যথারীতি রাজাকে অভিবাদন করিয়া আদেশাপেক্ষী হইয়া রহিলেন।

তাহার পর, সপার্ষদ রাজ-অভ্যাগতের সহিত দুর্গস্বামীর যে সমস্ত বিশ্রম্ভ আলাপ চলিতে লাগিল, তাহার সকল কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। জয়ন্তকে তাহার পিতা তাঁহার পরিচরবর্গের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলেন, বালক জয়ন্ত তাঁহাদের ভীম-ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে ও সলজ্জভাবে তাঁহাদিগকে দূরহইতে অভিবাদনাদি করিতে লাগিল।

রাজার সঙ্গে এইবার প্রবীণ যোদ্ধা ভীম-ভ্রূ ভল্লবীর্য্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু রক্তাভ, সেই রক্ত কেশ ও শ্মশ্রুর অনেকগুলিই আবার বয়োধর্ম্মে শুভ্রতাপ্রাপ্ত করিয়াছে। তাঁহার তেজোব্যঞ্জক নেত্রযুগল দেখিলে, অতিবড় সাহসিকেরও হৃদয় কম্পিত হয়, সেই চক্ষুযুগল স্থূল ভ্রূ-লোমে আবৃত বলিয়া আরও ভীমশ্রীধারণ করিয়াছে, একটী ভ্রূর উপর একটা খড়্গাঘাত-চিহ্ন বিদ্যমান; সাধে তাঁহার উপাধি ভীম-ভ্রূ হয় নাই, তাঁহার ভ্রূযুগল বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর বটে। অস্ত্রাঙ্গ বজ্র-বহ্নিও এইবার রাজানুচর হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এত শস্ত্রশোভিত ও চাকচিক্যময় যে, তাঁহাকে দেখিলেও, বীরবক্ষ বিকম্পিত হয়। ঐ গুরুভার পরশু, তরবারি, কার্ম্মুক, কৃপাণ প্রভৃতির বহনে তিনি কোনই ক্লেশানুভব করেন না, ঐ অস্ত্রগুলিই যেন, তাঁহার অঙ্গাভরণ। গৌতমী সকলকেই প্রথমে পাদ্য-অর্ঘ দিয়া, পরে সাদরে ভোজনে বসাইলেন। গৌতমী, জয়ন্ত ও অরবিন্দ পরিবেশণ করিতে লাগিলেন। আহারকালে মহারাজ বৃক-বিক্রম ও তাঁহার সম্ভ্রান্ত পার্ষদবর্গ সাগ্রহে যুদ্ধসম্বন্ধেই কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ মহারাজকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এই সুযোগে তিনি তাঁহার রাজ্য-সীমান্তের কয়েকটি গ্রাম, যেগুলি বাস্তবিকই তাঁহারই হওয়া উচিত, অসুর-রাজ বৃত্রের নিকটহইতে দাবী করুন। তদুত্তরে মহারাজ শিরঃসঞ্চালন-পূর্ব্বক কহিলেন,—"না, এই ব্যাপারে আমি স্বার্থচিন্তা করিব না, বিচারকের আস্বোদর-পূর্ত্তিচেষ্টা অধর্ম্মকর।"

বালক জয়ন্তের এই সমস্ত কথোপকথন ভাল লাগিতেছিল না। সে যাহা হউক, অবশেষে আহার সমাপ্ত হইল। তখনও দিবালোক ছিল, তাই কোন কোন যোদ্ধা তাহাদের অশ্বগুলির তত্ত্বাবধান করিতে গেলেন; কয়েকজনে নক্র-বিক্রমের অশ্ব ও সারমেয়গুলি দেখিতে লাগিলেন; কয়েকজনে একত্র হইয়া হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন।

মহারাজের তাই পুত্রপ্রতি মনোযোগার্পণের সুযোগ ঘটিল। জয়ন্ত আসিয়া পিতৃ-জানুপরি উপবিষ্ট হইল। বসিয়া পিতার নিকটে তাহার এই দুর্গবাস-কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল। অন্ধকার দশ-শৃঙ্গ হরিণটাকে সে শরবিদ্ধ করিয়াছে, নক্র-বিক্রম তাহাকে তাহার ক্ষুদ্রকায় অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ায় যাইতে দেন, অরবিন্দ তাহাকে রৌপ্যধারা-নদে স্নান করিতে লইয়া যায়, সন্তরণ শিখায়, সে দুর্গচূড়ে উঠিয়া উৎক্রোশ-পক্ষীর কুলায় দেখে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জয়ন্ত যেমন সানন্দে এই সমস্ত কাহিনী বলিতেছিল, বৃক-বিক্রম তেমনি সহর্ষে এই সমস্ত কাহিনী শুনিতেছিলেন। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, জয়ন্ত, মহর্ষি বশিষ্ঠের বিষয়ে তুমি ত কোন কথা বলিলে না, তাঁহার পুঁথিখানির কথাও তো কিছুই শুনিলাম না। তুমি কি তাঁহার কাছে সেই পুঁথিটি অভ্যাস করিতেছ না?"

জয়ন্ত কণ্ঠ-স্বর নিম্ন করিয়া পিতার হাত লইয়া খেলা করিতে করিতে নতমস্তকে বলিল,—"তাত! গুরুদেবের পুঁথির সেই কর্কটবৎ অক্ষরগুলি পড়িতে আমার আদৌ ইচ্ছা করে না।"

মহারাজ বলিলেন,—"তবুও তুমি সেই পুঁথিটি অভ্যাস কর তো?"

"হাঁ, পিতঃ, কিন্তু উহা বড় দুরূহ, শব্দগুলি বড় কটমট। প্রাতে অরুণালোকে শ্যামশ্রী অরণ্যানীর শোভা যখন লোচন-লোভন হইয়া উঠে, তখন গুরুদেব কোথাহইতে সেই পুঁথিখানা লইয়া উপস্থিত হন, তখন সেই গ্রন্থখানির অনুস্বার, বিসর্গগুলি আমার একান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠে!"

মহারাজ স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন,—"আহা, তাই ত!"

তাহাতে জয়ন্ত ভরসা পাইয়া বলিল,—"পিতঃ, আপনি তো এই পুঁথি-অভ্যাস করেন নাই?"

বৃক-বিক্রম কহিলেন,—"না; কিন্তু ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।"

"খুল্লতাত নক্র-বিক্রমও পড়িতে পারেন না, অরবিন্দও না, কেহই পড়েন না, তবে আমি কেন পড়িব? তবে আমি কেন মসী-জীবীর মত লিখিয়া লিখিয়া আঙ্গুলগুলি মসীমলিন করিব?"

এই বলিয়া জয়ন্ত তাহার পিতার মুখপ্রতি একবার নিমিষের নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়াই লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল; কিন্তু মহারাজ অণুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া উত্তর করিলেন,—"বৎস, পুঁথি-পাঠ বড় দুরূহ কাজ, সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা অভ্যস্ত হইয়া গেলে, পরে সহজ-বোধ হইবে। এখন যে সমস্ত পবিত্র পুস্তকের পাঠনা আমাকে কেবল পাঠকের মুখহইতে শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, সেগুলি স্বয়ং পড়িতে পারিলে, আমি কি না করিতে প্রস্তুত আছি? কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে? সময় নাই।"

জয়ন্ত। কিন্তু রাজা বা গোষ্ঠীপতিগণ তো কেহই অধ্যয়ন করেন না?

বৃক। বৎস, উহাই তোমার মূর্খ থাকিবার কারণ হইতে পারে না। তোমার ভুল হইতেছে—কুসুমপুর-রাজ, কুম্ভুম-প্রদেশাধিপতি, গোষ্ঠীপতি কহ্লন, মহারুপ, কুশধ্বজ এমন কি অমুর-রাজ অষ্টবসুও পড়িতে পারেন। তোমায় বলিতে কি, জয়ন্ত, রাজা মহাবিক্রমকে যখন তাঁহার স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন রাজন্যবর্গের মধ্যে কেবল আমিই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে না পারিয়া বড়ই লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

জয়ন্ত সগর্ব্বে উত্তর করিল,—"কিন্তু আপনার মত বিচক্ষণ ও সদাশয় আর কে? খুল্লতাত নক্র-বিক্রম আমায় এ কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন।"

মহারাজ বৃক-বিক্রম উত্তর করিলেন,—"নক্র-বিক্রম তাঁহার দেশাধিপতিকে এতই শ্রদ্ধা করেন যে, তিনি তাঁহার দোষ-দর্শনে অন্ধ। তোমার গুরু বশিষ্ঠের ন্যায় আমার যদি কেহ গুরু থাকিতেন, তাহা হইলে আমি আরও 'বিচক্ষণ' ও 'সদাশয়' হইতাম। শুন, জয়ন্ত, কনকপুরে কেবল যে রাজ-কুমারেরা শিক্ষিত হইতেছেন, তাহা নহে, কনকপুর-রাজ প্রত্যেক গোষ্ঠীপতিকেই শিক্ষিত হইতে বাধ্য করিয়াছেন।"

জয়ন্ত তাহার স্বভকোত্তলনপূর্ব্বক পরুষভাবে বলিয়া উঠিল,—"কনকপুরবাসিগণকে আমি ঘৃণা করি!"

"ঘৃণা কর? কেন?"

"কারণ উহারা বড় বিশ্বাসঘাতক; অতি অন্যায়ভাবে মহারাজ ভীমখর্পরকে বধ করিয়াছিল। আর্য্যা গৌতমী তাঁহার মৃত্যু-গাথা আমার কাছে গান করিয়া থাকেন। আমি যদি তাঁহার পুত্র হইতাম, তাহা হইলে শত্রুগণের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিতাম। আর যখন সেই বিশ্বাসঘাতক রিপুগণকে কৃপাণ-মুখে খণ্ড খণ্ড করিতাম, তখন কি অট্টহাস্যের রোলই না তুলিতাম!"

জয়ন্তের চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতে লাগিল, সে আপন মনে কয়েকটি বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন আর্য্যগাথা-আবৃত্তি করিতে থাকিল।

মহারাজ বৃক-বিক্রমের মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব-ধারণ করিল।

তিনি বলিলেন,—"আর্য্যা গৌতমী আর কখন তোমার নিকট এই অনার্য্য-সুলভ গাথাগুলি গাহিতে পাইবেন না। আমরা পরমকারুণিক বিশ্বেশ্বরের উপাসক; আমাদের কথা এই—

'কৃপার ভিখারী তুমি? কৃপা কর কা'য়?
কৃপালু যে, সেই বিভু-কৃপামৃত পায়।'

মার্জ্জনাই আমাদের ধর্ম্ম।"

জয়ন্ত তথাপি উদ্ধতভাবে উত্তর করিল,—"পিতঃ, আমি হইলে ভীমখর্পরের শত্রুগণকে কিছুতেই ক্ষমা করিতাম না।"

অনসূয় বৃক-বিক্রম কহিলেন,—"ও ভাবটি ভাল নহে, বৎস; আমার যদি কোন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ হয়, তুমি আমার শত্রুর সহিত শত্রুতা করিও না; তাহাকে তুমি মার্জ্জনা করিলেই, প্রচুর বৈর-

নির্য্যাতন করা হইবে। জয়ন্ত, তুমি বল, তুমি এইরূপ করিবে; আমার কাছে প্রতিশ্রুত হও!"

জয়ন্ত কোমল-স্বরে উত্তর করিল,—"হাঁ, পিতঃ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" এই বলিয়া সে তাহার মস্তক তাহার পিতার স্কন্ধদেশে স্থাপিত করিল। কিছুক্ষণ উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জয়ন্ত আবার পিতার হস্ত লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সহসা একটা রৌপ্য-শৃঙ্খলে তাহার হস্তস্পর্শ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"এটি কি, পিতঃ? এই চাবিটি কোন্ পেটিকার?"

"এই চাবিটি যে পেটিকার, সেই পেটিকায় আমার মহার্ঘতম রত্ন আবদ্ধ আছে।" এই বলিয়া তিনি সেই রৌপ্যশৃঙ্খলসহ চাবিটি পরিচ্ছদমধ্যে প্রচ্ছন্ন করিলেন।

"মহার্ঘতম রত্ন, পিতঃ! সেটি কি তোমার কিরীট?"

"সময়ে তাহা তুমি জানিতে পারিবে।" এই সময়ে তাহার পার্ষদবর্গ আবার আয়তনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহারাজের আর তাঁহার পুত্রের সহিত কথোপকথনের অবসর রহিল না।

পরদিবস প্রভাতে প্রাতরুপাসনার পর, প্রাতরাশ-সমাপন করিয়া মহারাজ রণক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জয়ন্তকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি পক্ষান্তে ফিরিয়া আসিবেন। তাহাকে তিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও যোদ্ধৃবর নক্র-বিক্রমের বাধ্য থাকিতে বিশেষ করিয়া আদেশ করিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ।)

-:*:-

ইতরপ্রাণীর ভাষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দুইটা খ্যাঁকশিয়ালী একটা পাহাড়হইতে নামিয়া দুইএর মাথা এক করিল। দুইএ মিলিয়া কি একটা মতলব আঁটিল। তাহার পর একটা খ্যাঁকশিয়ালী একটা ঝোঁপে গিয়া লুকাইল, অপরটা আবার পাহাড়ে উঠিয়া গেল। অনতিবিলম্বে একটা খরগোশ পাহাড়-হইতে ছুটিয়া নামিতে লাগিল, তাহার পিছনে, যে খ্যাঁকশিয়ালীটা পাহাড়ে উঠিয়া গিয়াছিল, সেইটা ছুটিতেছে। যেখানে আর একটা খাঁকশিয়ালী লুকাইয়াছিল, খরগোশ সেস্থান তীরবেগে অতিক্রম করিয়া গেল, লুক্কায়িত শিয়াল তাহার উপর ঈষৎ বিলম্বে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। ধাবমান শৃগাল শীঘ্রই লুক্কায়িত সঙ্গীর সমীপ-বর্ত্তী হইল, তাহাকে বিফলকাম দেখিয়া হতাশা ও ক্রোধসূচক এক-প্রকার চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার পর আনাড়ী শৃগালকে গিয়া আক্রমণ করিল।

বিড়ালেরাও ভাবব্যঞ্জনায় সবিশেষ পটু। একস্থানে এক দম্পতি রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিলেন। গৃহিণীর একটী পোষা বিড়াল ছিল। বিড়ালটি কথিত রাত্রিতে গৃহিণীর কাছে ম্যাও ম্যাও করিয়া ও আঁচড়াইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। পোষা বিড়াল এমন করিল কেন, ইহা বুঝিবার অভিপ্রায়ে গৃহিণী চারি-দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। দেখিলেন, গৃহকর্ত্তা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে।

এক বাড়ীতে দুইটি বিড়াল ছিল; তাহার মধ্যে একটী বিড়াল একদিন বাহিরে গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। সপ্তাহখানিক পরে একদিন সে প্রাচীর ডিঙাইয়া কোথাহইতে আসিয়া হাজির হইল, বেশ মোটা-সোটা হইয়াছে, চেহারা যেন ফিরিয়াছে। বাড়ীতে ফিরিয়া সে তাহার মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল। তাহার মা শুইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দুইবিড়ালে মাথা এক করিয়া কি যেন পরামর্শ করিল। মুহূর্ত্তেক পরে উভয়েই প্রাচীর ডিঙাইয়া চলিয়া গেল। এক সপ্তাহেরও অধিককাল তাহারা বাহিরে রহিল। তাহার পর, মায়ে পোয়ে বা ঝিএ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিল। সন্তান যে মাকে ঐপ্রকারে "দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা" কোথায় সুবিধাজনক আছে, তাহা জানাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি?

নেকড়ে-বাঘেরা হরিণ-শিকার করি-বার সময়ে বড় বুদ্ধিপ্রকাশ করে। তাহারা সকলে প্রথমে একজায়গায় জড় হয়। একপ্রকারে পরামর্শ করে। তাহার পর বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে এক-একটী স্থানে গিয়া দাঁড়ায়। পরে একটা নেকড়েবাঘ কোন একটা হরিণকে তাড়াইয়া দ্বিতীয় নেকড়ের কাছে আনে। হরিণ বড় দ্রুতগামী, তাহাকে অমন করিয়া ধরিবার জো নাই। তাই প্রথম নেকড়ে হাঁকাইয়া গেলে, দ্বিতীয় নেকড়ে আবার তাহাকে তৃতীয় নেকড়ের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, এইপ্রকারে তাহারা বরাবর হরিণটাকে তাহাদের সঙ্গীদের দিকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া শেষে সে যখন

একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন একটা নেকড়ে তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং সকলে মিলিয়া তাহার মাংস-বণ্টন করিয়া খায়।

হাতীর বুদ্ধি অন্য পশুর বুদ্ধির অপেক্ষা ঢের বেশী। দূরবর্ত্তী সঙ্গীকে কোন কিছু জানাইতে হইলে, উহারা রামশিঙার ন্যায় শব্দ করে। ডবলিউ, টি, হোমাডে বলিয়া মার্কিণ-মুলুকের এক সাহেব হাতী ধরিতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"একদল হস্তীকে আক্রমণ করা হয়; তাহাতে দলটি দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং একদল উত্তরদিকে ও অন্যদল দক্ষিণদিকে গমন করে। আমার তাম্বু এই উভয়দলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ফেলা ছিল। রাত্রে, যখন শুইতে যাইতেছি, তখন হাতীরা রামশিঙার মত শব্দ করিয়া দুইদলের মধ্যে ভাববিনিময় করিতে লাগিল। আমার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইল যে, দুইদলে ঐরূপে কথোপকথন করিয়া এক্ষণে সম্মিলিত হইতে যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ঐরূপে দুইদল সত্য সত্যই একত্র হইল। খাইবার সময় হাতীরা যেপ্রকার শব্দ করে, এখন তাহারা যেপ্রকার শব্দ করিল, এ শব্দ সেপ্রকার নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সে যাহা হউক, হস্তীরা যখন পোষ মানে, তখন তাহারা যে বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশ করে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। দুইটা হাতীকে বোঝা লইয়া একটা খাড়া পাহাড়ের উপর উঠিতে হইতেছিল, পাহাড়টা এমনই খাড়া যে, হাতীরা যাহাতে উঠিতে পারে,

তাহার নিমিত্ত মাহুতদের গাছের গুঁড়ির ধাপ করিয়া দিতে হইয়াছিল। প্রথম হাতীটাকে যখন সেই পাহাড়ে উঠিতে হইতেছিল, তখন তাহার সেই কার্য্যটা আদৌ প্রীতিকর-বোধ হইতেছিল না, সেইজন্য সে, যে হাতীটা নীচে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে চীৎকার করিয়া অসন্তোষ-জ্ঞাপন করিতেছিল। নিম্নস্থিত হাতীটাও সে সময়ে স্থির ছিল না, জিমনাষ্টিকের সময়ে যেমন, যাহারা ধরিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা ও উদ্বেগ দেখা যায়, সেই হাতীটার মধ্যেও তেমনই উদ্বেগ ও চঞ্চলতা দেখা যাইতেছিল। প্রথম হাতীটা অবশেষে পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে সমর্থ হইল; তখন আবার দ্বিতীয় হাতীটা পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সেও তাহার সঙ্গীর ন্যায় ভয় পাইতে লাগিল। পাহাড়স্থিত হাতীটা ব্যগ্র-ভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল, তাহার পর, যেই দ্বিতীয় হাতীটা তাহার সমীপবর্ত্তী হইল, অমনই সে শুঁড় বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া লইল। তখন দুইজনের আনন্দ দেখে কে? উভয়ে উভয়কে শুণ্ডদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখামুখি করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল!

এক শিকারীর এক শূকরী ছিল। সে বনমধ্যে গিয়া তাহার প্রভুকে জানোয়ারদের খোঁজ-খবর আনিয়া দিত, অর্থাৎ তাহার সাহায্যে সেই শিকারী হিংস্র পশুদের গতিবিধি ও অবস্থান জানিয়া লইত। শূকরীটা লক্ষ্য করিয়া দেখিত যে, যখন সে শিকারে যায়, তখন তাহার দুই-একটা করিয়া ছানা কমিয়া যায়। একদা সে তাহার অবশিষ্ট ছানাদের লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। তাহার পালক তাহার সন্ধানে গিয়া দেখিল, সে বনমধ্যে এক নিরাপদ স্থানে তাহার ছানাদের তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে!
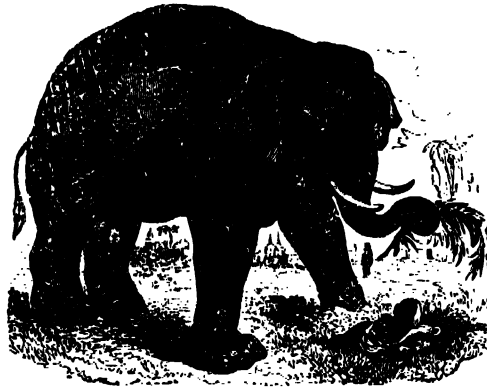
হাটফোর্ডশায়ারে এক ভদ্রলোক শীত-সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এক ব্যাঙ্, না বলা না কওয়া, তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আগুনের কাছে বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিল। আগুনের উত্তাপে তাহার আরাম-বোধ হওয়াতে, সে চোক মিট্‌মিট্ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া ভদ্রলোকটির বড় আমোদ-বোধ হইল; তদবধি তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ব্যাঙ্‌কে ঘরের মধ্যে আসিতে দিতে লাগিলেন। প্রতিরাত্রে আসা-যাওয়া করাতে ব্যাঙের সঙ্গে তাঁহার সৌহৃদ্যটা একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তিনি তাহাকে একরাত্রে একটু চিনি খাইতে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যাঙ্ সমুদয় চিনিটুকু খাইয়া ফেলিল, এক কণাও ফেলিল না। তাহার পরসন্ধ্যায় এক বড় মজা দেখা গেল। ব্যাঙ্ সেদিন তাহার গৃহিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে! ভদ্রলোক কি করেন, উভয়কেই চিনি খাইতে দিলেন। তদবধি প্রায় তিনমাসকাল সেই মণ্ডুক-মিথুন প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত সময়ে চিনি খাইতে ও আগুন পোহাইতে আসিত। এক সন্ধ্যায় ভদ্রলোকটি ব্যাঙের যুড়িটিকে না দেখিয়া মাড়াইয়া ফেলিলেন। ব্যাঙ্ সেদিন একাকী ফিরিয়া গেল। তাহার পর-দিনহইতে সে তাহার স্ত্রীহন্তার গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিতে আসিত না।

ঘোড়া, কুকুর, প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের ভাব-বিনিময়ের কথা অনেকেরই জানা আছে, এখানে সেসম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অলমতি বিস্তরেণ?

সমাপ্ত।

উষ্ণ গৃহে ফুল ম্লান হয় কেন?—পুষ্পমধ্যে যে জল সঞ্চিত থাকে, তাহারই গুণে উহা সুঠাম থাকে। উষ্ণ গৃহের বায়ু অধিকতর আর্দ্রতাশোষক হয়, ফলে সে গৃহে ফুল রাখিলে, গৃহস্থ সেই তপ্তবায়ু উহার আর্দ্রতাটুকু হরণ করে; তাই ফুলটি মুহ্যমান হইয়া পড়ে। তবে ফুলটি যদি একটী জলপূর্ণ ফুলদানিতে চুবাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে উহা তত শীঘ্র ম্লান হয় না। জল ও বায়ু সকল জীবেরই প্রাণ। ফুল মুক্তবায়ুতে জন্মে, কাজেই রুদ্ধবায়ুও তাহার আয়ুঃক্ষয়কর হয়। যেরূপ জলবায়ু উহার সহ্য অভ্যাস, সেরূপ জলবায়ু উহার ক্ষতি করে না, কারণ সে জলবায়ু-সহনোপযোগা তন্তুগুলি উহার মধ্যে বিদ্যমান বলিয়া উহা স্বভাবানুরূপ থাকিতে পারে।

পরলোকপ্রস্থিত অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে

মানুষেই অনন্তকালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে বিভক্ত করিয়াছে, কিন্তু জগতের অধিকাংশ মানুষেরই এমন সাধ্য নাই যে, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল-কণিকাগুলির একটীকেও স্বায়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে; তবে যুগে যুগে দুই-একটী এমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে এই ধরা-পৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা, যে শুভ মুহূর্ত্তে এই মর্ত্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েন, সেই মুহূর্ত্তাবধি অনন্তকালপর্য্যন্ত, এই অবনীতে অমর হইয়া থাকেন। লোকান্তরিত গণিতাধ্যাপক মহাত্মা গৌরীশঙ্কর দে এম এ, বি এল, পি আর এস, সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের অন্যতম ছিলেন।

একজন প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন—

"তরবোঽপি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি"।

তরুলতা জীবন-ধারণ করে, পশু-পক্ষীও জীবন-ধারণ করে; কিন্তু তিনিই জীবিত থাকেন, যাঁহার মন মনন অর্থাৎ মনের ক্রিয়ার দ্বারা জীবিত থাকে।—কথাটা খুবই সত্য। বিশ্ব-স্রষ্টার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মানব; আবার মানুষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু হইতেছে,—মানবের মন। এই মনের সুক্রিয়া মানবকে অমর এবং কুক্রিয়া মানুষকে বিস্মৃতির অতলতলে চিরনিমগ্ন করিয়া রাখে।

সে যাহা হউক, গৌরীশঙ্কর অঙ্ক-শাস্ত্রে অগাধবিদ্য ছিলেন বলিয়াই, কি লোকে অনন্তকাল তাঁহার স্মৃতিচর্চ্চা করিবে? না, তাহা নহে। অঙ্ক-শাস্ত্রে তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; একবার বিলাতহইতে একজন সুপণ্ডিত গণিতাধ্যাপক "জেনেরল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসন"-পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বৰ্দ্ধনার্থে একটী সভা হইয়াছিল, সেই সভায় তিনি সর্ব্বসমক্ষে গৌরীবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন,—"বিলাতে অঙ্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু অধ্যাপক দের মত অঙ্ক-শাস্ত্রের সকল শাখায় ব্যুৎপন্ন কোন অঙ্ক-শাস্ত্রবিদ্ আছেন কি না সন্দেহ।" ঐ অধ্যাপকের ঐ কথাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌরীবাবু অঙ্কশাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার বিদ্যা বা মনীষার সুতীক্ষ্ণতা-নিবন্ধন যে, তিনি মরজগতে অমর হইয়া থাকিবেন, আমার তাহা মনে হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনের ক্রিয়াগুণে মানুষ জীবিত থাকে, কিন্তু মন কেবল মানুষের মস্তিষ্কের উপরেই কার্য্য করে না, তাহার ক্রিয়া সর্ব্বতোমুখী। হৃদয়হীন, চরিত্রহীন বিদ্বান্‌কে কেহ স্মৃতিমন্দিরে স্থান দিতে চায় না। মানুষ অনেক অসার ব্যাপারে লিপ্ত হয়, অনেক অসার বিষয় লইয়া আড়ম্বর করে, তথাপি মানুষ আজও এত অসার হয় নাই যে, কোন পশুপ্রকৃতি উপাধিব্যাধিগ্রস্ত পামরকে হৃদয়ের নিভৃতনিলয়ে সসম্মানে স্থান দিবে। গৌরীশঙ্কর তাঁহার হৃদয়, চরিত্র ও আচরণ-গুণেই জনসাধারণের নিকটহইতে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি-লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ঐ ত অমন বিদ্বান্ ছিলেন, তবু লোকে কখনও তাঁহাতে এতটুকু অহঙ্কার দেখে নাই। তাঁহার মত নিরহঙ্কার লোক এই প্রবন্ধের লেখক মানুষের মধ্যে আর কাহাকেও দেখেন নাই। তিনি যেন বিনয়গুণের আধার ছিলেন। কাহারও সহিত কথোপকথনকালে তিনি অনুচ্চস্বরে কথা কহিতেন এবং বারম্বার হাত কচ্‌লাইতেন। পোষাক-পরিচ্ছদে একটুকুও আড়ম্বর ছিল না, সচরাচর লংক্লথের চোগা-চাপ্‌কান ও জিনের প্যাণ্টালুন পরিতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও সিণ্ডিকেটের মেম্বর ছিলেন। সেনেটের কোন মিটিংএ যাইবার সময়ে একপ্রস্থ কালো আল্‌পাকার চোগা-চাপ্‌কান পরিতেন। ঘরে যখন থাকিতেন, তখন একটী অতি ক্ষুদ্র ধুতি-পরিধান করিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় যে ছাতাটি-ব্যবহার করিতেন, তাহা নিতান্ত বিবর্ণ ও ছিন্ন না হইয়া পড়িলে, তিনি আর একটী কিনিতেন না। অথচ তিনি না ছিলেন নির্ধন, না ছিলেন কৃপণ। তিনি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, নিজেও অধ্যাপনা ও পুস্তক-বিক্রয়দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তদ্ভিন্ন, শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার শ্বশুরের সম্পত্তিও

পাইয়াছিলেন। আজকাল লোকে একটু পদস্থ হইলেই সাংসারিক কার্য্য করা হীনতা-বিবেচনা করিয়া থাকে, গৌরীবাবু প্রতিদিন স্বয়ং আলু-পটোল-মাছ কিনিতে যাইতেন।

এই মহাপুরুষের জীবনের সময়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাও ত্রুটিশূন্য ছিল। তিনি সাতচল্লিশবৎসর-কাল জেনেরেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসন তথা স্কটিশ্‌চার্চ্চেস কলেজে কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি একান্ত অপরিহার্য্য কারণে ২।৪ দিন ব্যতীত কখন অনুপস্থিত থাকেন নাই। অলীক আমোদ ও বিলাস-প্রিয়তা তাঁহার প্রকৃতিতে অণুমাত্রও ছিল না। কঠোর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা তাঁহাকে যোগরত তাপসের ন্যায় অনন্যমনা কর্ম্ম-সাধক করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার প্রকৃতির আর একটা লক্ষ্যযোগ্য বিষয়, তাঁহার মৃদুতা। কেহ তাঁহাকে জীবনে কখন উগ্র হইতে দেখে নাই, কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না, তাঁহার প্রকৃতির প্রশান্তিই তাঁহার সমীপস্থ তাবৎ কোলাহল নিবৃত্ত করিয়া দিত। এইজন্য তিনি জীবনে অক্রোধ, অনসূয় ও অরাতিশূন্য ছিলেন। আমরা কাহারই মুখে কখনও তাঁহার একটী নিন্দা শুনি নাই।

তাঁহার জীবনের নিয়মানুবর্ত্তিতা কখন তাঁহাকে অসুস্থ হইতে দেয় নাই। এই অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লইয়া তিনি দীর্ঘকাল অতি গুরুতর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, কার্য্যে ক্লান্তি ছিল না; কখন তাঁহার ছুটি লইবার প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন হয় নাই। গ্রীষ্মাবকাশেও তিনি কলেজে গিয়া এম এ-শ্রেণীর ছাত্রদিগকে আঁক কষাইতেন। সংযত জীবন-যাপনের উহাই পুরস্কার।

পূর্ব্বে জানাইয়াছি, গৌরীবাবু ধনী ছিলেন। কিন্তু তিনি অর্থগৃধ্নু বা ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। তিনি বড়ই কোমলহৃদয় ছিলেন, তাঁহার প্রয়াণকালপর্য্যন্ত কোন যাচক তাঁহার নিকটহইতে বিমুখ হইয়া ফিরে নাই, কিছু-না-কিছু পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার এই সৎকার্য্য অতীব সংগোপনে নির্ব্বাহিত হইত। এইজন্য তিনি যে বড় করুণহৃদয় ও দানশীল লোকও ছিলেন, তাহা, বোধ হয়, অনেকেই অবগত নহেন।

আজকাল আমাদের দেশের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাই, ধর্ম্মচর্চ্চায় তত অনুরাগী নহেন। অনেকেই বাহিরে বক্তৃতা বা তর্কস্থলে স্ব স্ব পৈতৃক বা অবলম্বিত ধর্ম্মের বড়াই করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু দিনান্তে একবারও শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-স্মরণ করেন কি না সন্দেহ। গৌরীবাবু এ বিষয়েও "যূথভ্রষ্ট" ছিলেন। বৌ-বাজারে কোন একটী স্থানে কয়েকটি ভদ্রলোকে মিলিয়া একটী ধর্ম্ম-সভা স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেখানে ধর্ম্ম-বক্তৃতা হইত না, কয়েকজন ভক্তের সমবেত উপাসনা হইত। গৌরীবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় নিয়মিত সময়ে সেই উপাসনায় যোগদান করিতেন, কখনও কামাই হয় নাই।

এই মহাপুরুষ আবার শিশুর মত সরল ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার জীবনের জ্যোতিঃ যখন চারিদিকে ফুটিয়া উঠিতেছে, তখনও তিনি শিশুর কৌতূহল লইয়া শিষ্যেরও কাছে শিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতেন।

গৌরীবাবুর চরিত্রে কি কোন দোষ ছিল না? তিনি মানুষ ছিলেন, হয়ত তাঁহার কোন কোন দোষ ছিল, জগতে কেহই নির্দ্দোষ বা নিষ্পাপ নাই; কিন্তু সে দোষ বা দোষগুলি কখন সাধারণের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। সেই অগাধবিদ্য মহাপুরুষের বিনয়-নম্র সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেরই লোচনযুগল ভক্তিভরে আনত হইয়া পড়িত, তাঁহার দোষ দেখিবে কে? তাঁহার অবিরত কর্ম্মরত জীবনে দোষ করিবার সুযোগও একান্ত দুর্লভ ছিল। যাহার কিছু করিবার নাই, পাপ তাহাকেই লইয়া মর্কটের নৃত্য করায়; অকর্ম্মণ্যই অকর্ম্ম করে, কর্ম্মীর জীবনে কু-চিন্তা বা কুকর্ম্মের অবসর কোথায়?

অমরতা।

কিছু নহে ভবে নিত্য; নশ্বর বিপুল বিত্ত,
আয়ুঃ যেন দীপ ঝটিকায়!
মহত্তর কীর্ত্তিচয় ক্ষুদ্র-কীর্ত্তি করে লয়,—
ভানূদয়ে চন্দ্রমা লুকায়!
মর্ত্ত্য তনুমনোজাত সকলি ভঙ্গুর, ভ্রাতঃ,
কালে কাল তুলি' লয় গ্রাসে!
পড়ি' দেখ ইতিহাস, ফেলি'ছে অন্তিম শ্বাস
কত কীর্ত্তি মহাকাল-ত্রাসে!
কিছু কি র'বে না ভবে, হ'বে সকলি কি তবে
পরাজিত মহাকাল-পাশে?

তাহা নয়, তাহা নয়! অক্ষয়ে কে করে ক্ষয়,—
কা'র সাধ্য অবিনাশে নাশে?
যাহা স্বরগীয় গুণ, তাহে নাহি ধরে ঘুণ;
মরেনা'ক ভবেশের ভূতি;
মরে নাক দয়া, ক্ষমা ধৃতি, প্রীতি মনোরমা,
মরে নাক স্বর্গেশের স্তুতি।
মরে না ভকতি তাঁ'য়; মরে না সে বসুধায়,
যে দিয়াছে তাঁ'রে তনু-মন।
মরে নাক ভালবাসা,— বিশ্বে সে বেঁধেছে বাসা,
মরেনা'ক পরার্থ জীবন।

জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা।

কলিকাতা সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রিগেডের দ্বিতীয় বিভাগের সম্পাদক ও স্কটিশ চার্চ্চেশ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত

গত নভেম্বর-মাসে শিবপুর-ঘাটে যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ঘটনাটির স্থূল বিবরণ এই—ঘটনার দিন অনেকগুলি ভদ্র যুবক দলবদ্ধ হইয়া শিবপুর-বোটানিকাল-গার্ডেন্সে বন-ভোজন করিতে যান। এই সকল যুবকের অধিকাংশই কলেজের ছাত্র। সেদিন একদল সাহেব-মেমও ঐস্থানে বন-ভোজনের জন্য গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন আমোদ-প্রমোদের পর, অপরাহ্ণে খেয়া ষ্টীমারে করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার জন্য তাঁহারা শিবপুরের ঘাটে আসেন; কিন্তু সে সময়ে ঘাটে জল কম থাকাতে ষ্টীমার ঘাট হইতে অনেক দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সুতরাং সকলে নৌকা করিয়া যাইয়া ষ্টীমারে উঠিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন ঘাটে একখানি ছোট নৌকাভিন্ন অন্য নৌকা ছিল না। সুতরাং সকলে একসঙ্গে যাইতে পারিলেন না, নৌকায় যত জন করিয়া লোক ধরে, তত জন করিয়া পার হইতে লাগিলেন। নৌকা দুইবার আরোহীদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ষ্টীমারে চড়াইয়া দিয়া আসিল, কিন্তু তৃতীয় বারে যখন নৌকা আরোহী লইবার জন্য ঘাটে আসিল, তখন রব উঠিল যে, নৌকা এই শেষবার যাইতেছে, আর যাইবে না। এই কথা শুনিয়া নৌকার উপরে একসঙ্গে বিস্তর লোক লাফাইয়া পড়িলেন। ফলে ক্ষুদ্র নৌকা তত লোকের ভর সহিতে পারিল না, উল্টাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আরোহীরা জলে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সাঁতার জানিতেন না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের পক্ষেও জামা-জুতা পরিয়া সাঁতার দেওয়া সহজ ছিল না, তাহার উপর প্রাণভয়ে পরস্পরকে টানাটানি, জড়াজড়ি করিতেছিলেন। এরূপস্থলে যাহা হইবার, তাহাই হইল, দুই-চারিজনমাত্র দৈবক্রমে রক্ষা পাইলেন, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণ হারাইলেন। যাঁহাদের এইরূপ শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইল, তাঁহাদের মধ্যে দুই-তিনজন সাহেব মেম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই স্কুল-কলেজের ছাত্র।
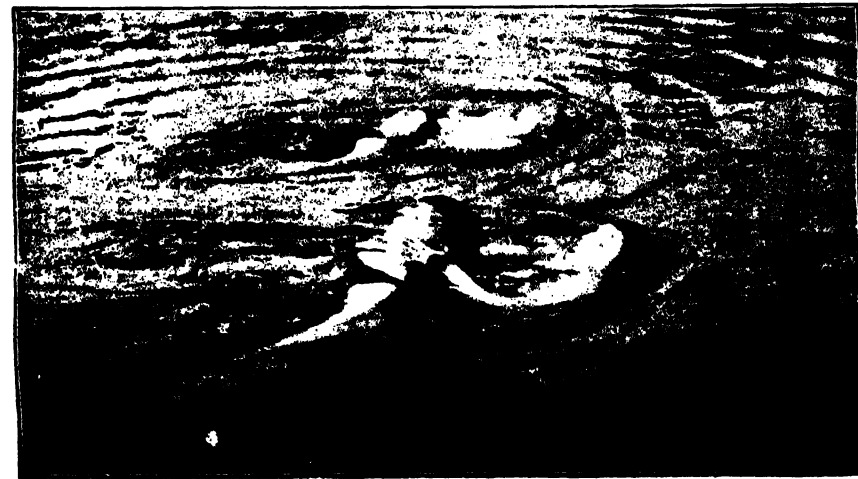
১ নং।

যিনিই এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছেন, তিনিই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল দুঃখিত হইয়া বসিয়া থাকিলে, চলিবে না; এরূপ ঘটনা ভবিষ্যতে যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? প্রথম উপায়, প্রত্যেক বালক-বালিকারই সন্তরণ-শিক্ষা। পল্লীগ্রামের বালক-বালিকারা সাধারণতঃ পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করে, এবং প্রায়ই সন্তরণ-পটু হয়; কিন্তু কলিকাতার ন্যায় সহরে অধিকাংশ ব্যক্তিই কলে স্নান করে, সুতরাং সুযোগের অভাবে সাঁতার শিখিতে পারে না। যে সকল পল্লীগ্রামের লোকেরা কূপের জলে স্নান করে, তাহাদেরও এই অবস্থা। অথচ সাঁতার শেখা অতি সহজ, যে কেহ চেষ্টা করিলেই শিখিতে পারে। অতএব সহরের এবং শেষোক্ত পল্লীগ্রামের বালক-বালিকারা যাহাতে সাঁতার শিখিবার সুবিধা পায়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। সুখের বিষয়, আজকাল ছাত্রদের খেলিবার জন্য সহরের নানাস্থানে খেলিবার জায়গা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া

২ নং।

হইতেছে। আমার মতে সেই সঙ্গে ছাত্রদিগের সন্তরণ-শিক্ষার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পুষ্করিণী-খনন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং শারীরিক স্বাস্থ্যাদি প্রতিকূল না হইলে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লেখা-পড়া শেখার ন্যায় সাঁতার শিখিতে বাধ্য করা উচিত। যে যুবক অগাধ পরিশ্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-লাভ করিতে পারেন, তিনি সামান্য সন্তরণ-শিক্ষার অভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা! আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এ কলঙ্ক, যেমন করিয়া হউক, দূর করিতে হইবে।

৩ নং।

সন্তরণ একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহা রীতিমত অভ্যাস করিলে, শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকে। কিন্তু কেবল আপনার শরীরের স্বাস্থ্যোন্নতি বা জলে আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া সন্তরণ-শিক্ষা করা উচিত নয়, আমার মতে প্রধানতঃ পরের জীবন-রক্ষার উদ্দেশ্যেই সন্তরণ-শিক্ষা কর্ত্তব্য। আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, শিবপুর দুর্ঘটনার সময় ঘাটে একজন সন্তরণ দক্ষতার জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত যুবক উপস্থিত ছিলেন, অথচ তিনি মজ্জমান ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। আশা করি, এ সংবাদ মিথ্যা; কিন্তু যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার অপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর হইতে পারে না। সুখের বিষয়, এরূপ কুদৃষ্টান্তের সংখ্যা অধিক নহে। পরন্তু এই দুর্ঘটনাকালে কতিপয় যুবক যেরূপভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া কয়েকজন লোকের প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, আমাদের যুবক ও বালকগণের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব নাই। আশা করি, তোমরা সকলেই আত্মত্যাগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে।

৫ নং।

কিন্তু ভাল সাঁতার জানিলেই যে, জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার-সাধন করা যায়, তাহা নহে। এ কার্য্যের জন্য বিশেষ কৌশল-শিক্ষা আবশ্যক, নহিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। সেই কৌশল শিখাইয়া দিব বলিয়াই আজ আমি এই প্রবন্ধটি লিখিতে বসিয়াছি। বিলাতে "রয়াল লাইফ্-সেভিং সোসাইটি" বা রাজকীয় জীবন-রক্ষণ-সমিতি-নামে এক সভা আছে, সেই সভার অবলম্বিত কৌশলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সকল ব্যক্তি এই কৌশল-শিক্ষা করেন, সভা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন, কিন্তু এই পুরস্কার-লাভের উপযোগী হইতে হইলে, সুদক্ষ শিক্ষকগণের দ্বারায় রীতিমত শিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত পরীক্ষকগণের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। বিলাতের বহু বিদ্যালয়ে এই কৌশলের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ের বালকগণ-কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর বহু জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণ-রক্ষা হইয়া থাকে। আশা করি, আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহেও এই কৌশল-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে। আমি যে কৌশলের কথা লিখিতেছি, তাহাও এই কৌশল। যে কোন দুইব্যক্তি মিলিয়া ইহা অভ্যাস করিতে পারেন।

৪ নং।

মনে কর, তুমি তীরহইতে দেখিলে, একজন লোক জলে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ অবস্থায় তুমি কি করিবে? তোমার যদি জামা-জুতা পরা থাকে, তাহা হইলে, যত শীঘ্র পার, আগে সেগুলি খুলিয়া ফেলিবে। ইহাতে যে সামান্য সময়টুকু-ব্যয় হইবে, তাহা অপব্যয় বলিয়া মনে করিও না, কারণ

জামা-জুতা পরিয়া জলের ভিতর চলা-ফেরা করা বড়ই অসুবিধাকর, অনেক সময়ে ঐসকল জিনিসগুলির জন্যই কার্য্য পণ্ড হয়। যাহা হউক, জামা-জুতা খুলিবার পর আর বিলম্ব করিবে না, তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে ও মজ্জমান ব্যক্তিকে পশ্চাদ্দিক্‌হইতে ধরিতে চেষ্টা করিবে। পশ্চাদ্দিক্‌হইতে ধরিবার চেষ্টা না করিয়া সম্মুখদিকে তাহাকে ধরিতে গেলে, সে প্রাণভয়ে তোমাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, এরূপভাবে জড়াজড়ি করিয়া দুইজনেই ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। যদি দেখ যে, পশ্চাদ্দিক্‌হইতে তাহার নিকটে যাইবার কোন উপায় নাই, তাহা হইলে সম্মুখে গিয়া কনুইয়ের ঠিক উপরে তাহার দুই বাহু দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিবে এবং দ্রুতভাবে তাহাকে ঘুরাইয়া তাহার মুখ বিপরীতদিকে ফিরাইয়া দিবে। তাহার পর তাহার দুই কাণে দুই হাতদিয়া তাহার মাথাটি জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে, কিন্তু সাবধান, যেন তাহার মুখে ও গলায় কোন চাপ না পড়ে। তাহাকে এইরূপে ধরিয়া তুমি সজোরে চিৎ-সাঁতার কাটিতে কাটিতে তাহাকে তীরে টানিয়া লইয়া আসিবে। লোকটিকে স্থলে তাহার মাথা না ধরিয়া তাহার বাহুদু'টিকে কনুইএর উপরে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া (৩ নং চিত্র দেখ) তাহাকে টানিয়া আনিবে। টানিয়া আনিবার সময় তাহার বাহু, যতদূর সম্ভব, উঁচু করিয়া রাখিবে। যত বাহু উঁচু করিবে, তাহার ফুস্‌ফুসের ভিতরে তত বেশী বায়ু-প্রবেশ করিয়া তাহার দেহভার লঘু করিবে।

যদি দেখ, সে বড়ই হুটাপুটি করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া রাখা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে তাহার বাহু তুলিয়া ধরিবে এবং তাহার নীচে দিয়া তোমার বাহু-প্রবেশ করাইয়া তাহার বুকের উপর তোমার হাতের পাতা রাখিবে (৪ নং চিত্র দেখ)। হাতের পাতা এমনভাবে ছড়াইয়া রাখিবে, যেন তোমার বুড়া-আঙুল-দু'টি তাহার কাঁধে গিয়া ঠেকে। এই সময় যদি তাহার বাহুদ্বয় বেশ উঁচু করিয়া তাহার দেহ তোমার খুব কাছে ঘেঁসিয়া ধরিয়া রাখ, তাহা হইলে সে হুটাপুটি করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবে না। ইহাতে কিন্তু একটা বড় অসুবিধা আছে, সেই ব্যক্তির দেহ নিকটে থাকাতে, তোমার সাঁতার দিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় ও তোমার মাথাটা অধিকাংশ সময় জলে ডুবিয়া থাকে।

৬ নং।

যেখানে হুটাপুটির কোন ভয় না থাকে, সেখানে নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল— যে ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতেছ, তাহাকে বল, সে যেন তোমার কাঁধে হাত দিয়া স্থিরভাবে চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে (৫ নং চিত্র দেখ)। তাহার পর, তুমি বুকে ভর দিয়া সাঁতার কাটিয়া তাহাকে তীরে লইয়া আইস (৬ নং চিত্র দেখ)। কিন্তু সে যদি ভয়ে তোমার গলা জোর করিয়া জাপ্টাইয়া ধরে, তাহা হইলেই বিপদ্। সুতরাং কোন সন্তরণ-দক্ষ লোক সাঁতার দিতে দিতে যদি ক্লান্ত হইয়া পড়ে বা কাহারও হাত-পা একেবারে অবশ হইয়া পড়ে, কেবল তাহাকেই সাহায্য করিবার জন্য এই উপায়াবলম্বন করিবে, অন্যত্রে নহে।

টানিয়া আনিবার সময়ে তাহার মাথাটি কিভাবে ধরিবে, তাহা ১ নং চিত্রটি দেখিলেই, বুঝিতে পারিবে। তাহার পর কেমন করিয়া তাহাকে তীরে লইয়া আসিবে, তাহা ২ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

লোকটিকে টানিয়া আনিবার সময়ে তাহার মাথা যথাসম্ভব জলের বাহিরে রাখিবে। তোমার বাহুদিয়া তাহার পাখ্‌না ঠেলিয়া ধরিয়া এ কার্য্য সহজেই করিতে পারিবে। তাহার মাথা জলের বাহিরে থাকিলে, তোমার ক্ষমতার উপর তাহার বিশ্বাস জন্মিবে। সুতরাং সে প্রাণভয়ে হুটাপুটি করিয়া তাহার রক্ষার পথে বিঘ্ন জন্মাইবে না।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার যে উপায়ের কথা বলিলাম, তাহা বেশ ভাল উপায়; কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ভয় পাইয়া বেশী হুটাপুটি করে, তাহা হইলে ঐ উপায়ে বড় সুবিধা হয় না। এরূপ-

উপরে বলিয়াছি যে, জলমগ্ন ব্যক্তি তাহার উদ্ধারকর্ত্তাকে কোন-রূপে ধরিতে পারিলেই, বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। সেইজন্য তাহাকে পশ্চাদ্দিক্‌হইতে ধরিয়া উদ্ধার করিতে হয়। কিন্তু যদি দৈবাৎ সে ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার হাত ছাড়াইতে নিম্নলিখিত উপায়সমূহ-অবলম্বন করিবে—যদি সে তোমার হাতের কব্জি ধরে, তাহা হইলে তুমি তাহার হাত সবেগে, যতদূর সম্ভব, উঁচু করিয়া ধরিবে (৭ নং চিত্র দেখ), তাহার পর সজোরে কোমর-পর্য্যন্ত হাত নামাইয়া পাশের দিকে হাত ছুড়িয়া দিবে। এরূপ করিলে, সে ব্যক্তির কব্জিতে একটা বিশেষ মোচড় লাগিবে ও সে

তোমার হাত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। সে যাই হাত ছাড়িয়া দিবে, অমনই তাহাকে ঘুরাইয়া তাহার মুখ উল্টা দিকে ফিরাইয়া দিবে, তাহার পর 'যেমন বলিয়াছি' সেইভাবে তাহাকে টানিয়া আনিবে। যদি সে তোমার গলা জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে তুমি তোমার ডাইনহাতের পাতার মধ্যে তাহার থুৎনী রাখিয়া হাতের আঙুলগুলিদিয়া তাহার নাক চাপিয়া ধরিবে ও তাহার মাথা পিছন-দিকে জোরে ঠেলিতে থাকিবে (৮ নং চিত্র দেখ। লোকটি তখন বাধ্য হইয়া নিশ্বাস ফেলিবার জন্য হাঁ করিবে ও তাহার মুখের মধ্যে জল-প্রবেশ করিবে। তাহার পর তুমি তাহাকে বশে আনিয়া সহজেই টানিয়া আনিতে পারিবে।

৭ নং।

সময়ে সময়ে জল-মগ্ন ব্যক্তি উদ্ধার-কর্ত্তার কাঁধ-বুক জাপ্টাইয়া ধরে। এরূপস্থলে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন। যাহা হউক, যদি কেহ এইরূপে ধরে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাহার নাক ও থুৎনী ধরিয়া এবং তাহার পেটে হাঁটু লাগাইয়া তাহাকে পিছন ও নীচের দিকে ঠেলিতে থাকিবে (৯ নং চিত্র দেখ)। সম্ভবতঃ এইরূপে তুমি তাহার মাথা জলে ডুবাইয়া দিতে পারিবে। সে তখন হাঁ করিতে বাধ্য হইবে ও তাহার মুখে জল-প্রবেশ করিবে। তখন তুমি তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে বশে আনিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে পারিবে।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে, চিৎ-সাঁতার জানা একান্ত আবশ্যক। যিনি যত ভাল চিৎ-সাঁতার কাটিতে পারেন, তিনি এ বিষয়ে তত উপযুক্ত হন। বুকে সাঁতার কাটিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সহজ নহে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে জলের ভিতর দিয়া টানিয়া আনিবার দক্ষতা-সম্বন্ধে ইউরোপে একবার একটা প্রতিযোগিতা হয়; সর্ত্ত ছিল যে, সর্ব্বশুদ্ধ সিকিমাইল সাঁতারিয়া যাইতে হইবে, তাহার মধ্যে শেষ পঞ্চাশগজ একজন লোককে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণবিদ্‌গণ এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা বুকে সাঁতার দিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই উচ্চস্থানাধিকার করিতে পারেন নাই। প্রথম অবস্থায় তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু "জলমগ্ন" ব্যক্তিকে টানিবার সময়ে তাঁহারা একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং, আশা করি, সাঁতার শিখিবার সময় তোমরা ভাল করিয়া চিৎ-সাঁতার কাটিতে শিক্ষা করিবে।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে তীরে আনিয়াই ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইবে, কিন্তু ডাক্তার না আসাপর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না; যাহাতে লোকটির নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া ঠিক হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু এ কার্য্যের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন, নতুবা কার্য্য ঠিক হইবে না। কিছুদিন অভ্যাস করিলে, যে কোন বুদ্ধিমান বালক এ কার্য্যে দক্ষতা-লাভ করিতে পারে। কি উপায়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহাইতে হয়, বলিতেছি—

রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াও এবং তুমি তাহার মাথার কাছে হাঁটু গাড়িয়া ব'স। এ সকল সময়ে প্রায়ই অনেক লোক আসিয়া জমে, তাহাদের মধ্যে দুইজন বুদ্ধিমান লোককে বাছিয়া লইয়া একজনকে রোগীর পায়ের কাছে এবং আর একজনকে তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সহায়তা করিতে বল। কে কোথায় থাকিবে, ১০ নং চিত্রটি দেখিলে, বুঝিতে পারিবে। যেখানে ১ নং বালক বসিয়া আছে, সেইখানে তুমি বসিবে, তোমার সাহায্যকারী দুইজন ৩ নং ও ৪ নং বালকের স্থানে থাকিবে।

এইবার লোকটিকে উপুড় করিয়া ফেল, ও তাহার মাথা তাহার বাহুর উপরে রক্ষা কর। মুখের ভিতরে যদি কাদা বা যাহাতে নিশ্বাস-চলাচলের ব্যাঘাত হইতে পারে, এইরূপ কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার জন্যই এইরূপ উপুড় করা আবশ্যক। উপুড় করিবার সময়ে ৪ নং বালক রোগীর পা ধরিয়া থাকিবে ও ৩নং বালক ডা'ন-হাতদিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া উপুড় করিবে, সম্ভবতঃ এ কার্য্যের জন্য তাহাকে সেখানে উপস্থিত অন্য দুই-একজন লোকের সাহায্য-গ্রহণ করিতে হইবে। মুখের ভিতর পরিষ্কার করিবার সময় রোগী কি অবস্থায় থাকিবে ১১ নং চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে।

৮ নং

মুখের ভিতর-পরিষ্কার করিবার পর রোগীকে পুনরায় পূর্ব্বের

স্থায় চিৎ করিয়া শোয়াও, এবং রোগীর মুখ ও হৃৎপিণ্ডের উপর তোমার কাণ পাতিয়া বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, জীবনের কোন লক্ষণ আছে কি না। যদি নিশ্বাস-প্রশ্বাস না বহে বা অতিসামান্যভাবে বহে, তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহাইবার চেষ্টা কর। বায়ু চলাচলের পথ সম্পূর্ণ সরল রাখিবার জন্য রোগীর জিহ্বা টানিয়া বাহির কর, এবং রুমাল বা ফিতা দিয়া তাহা থুৎনীর সহিত বাঁধিয়া দাও; যাহাতে জিহ্বাটি মুখের ভিতর না যাইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখ। এ কার্য্য ৩ নং বালকের বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে। তাহার পর, একটা কোট বা ঐরূপ কিছু বালিসের মত গুটাইয়া রোগীর কাঁধের নীচে রাখ ও রোগীর গলা, বুক প্রভৃতি কোনরূপ কাপড়-চোপড়-দিয়া আঁটা থাকিলে, তাহার বাঁধন আল্গা করিয়া দাও।

৯ নং

এইবার তুমি তোমার দুইহাতদিয়া রোগীর বাহুদ্ব'টিকে ঠিক কনুইএর নীচে আঁকড়াইয়া ধর এবং তাহার মাথার উপরদিয়া বাহুদ্ব'টিকে সোজা তোমার দিকে টানিয়া আনিয়া কনুই মাটীতে ঠেকাও। ইহাতে তাহার বক্ষগহ্বরের পরিসর বাড়িবে ও বাহিরহইতে নূতন বায়ু ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করিবে। তাহার পর বাহুদ্ব'টিকে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আন ও বুকের দুইপাশে মুড়িয়া রাখিয়া জোরে চাপ দাও (১০ নং চিত্র দেখ)। ইহাতে ফুস্‌ফুসের বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপে একবার ফুস্‌ফুস্‌হইতে বায়ু বাহির করিয়া দিয়া আর একবার তাহার ভিতরে বায়ু-প্রবেশ করিতে দিয়া স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার অনুকরণ করিতে থাক। স্বভাবতঃ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া মিনিটে ১৫বার করিয়া হয়, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াও সেইরূপ করিবে।

এই কার্য্যে যে সময় তুমি উপরি-উক্ত উপায়ে রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহাইবার চেষ্টা করিবে, সে সময় ৪ নং বালক (যদি সুদক্ষ হয়, তাহা হইলে) তোমাকে নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য করিতে পারে। সে রোগীর দুইধারে দুই হাঁটু গাড়িয়া বসিবে এবং রোগীর পেটের কড়ার উপর দুই বুড়া-আঙুল রাখিয়া অন্য আঙুলদিয়া তাহার বুকের দুই পাশ ধরিবে। এই অবস্থায় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া বুকে চাপ দিবে; তাহার পর সহসা চাপ ছাড়িয়া পিছাইয়া আসিয়া হাঁটুর উপরে ভর দিয়া খাড়া হইবে। তাহার পর, এক, দুই, তিন বলিয়া পুনরায় সম্মুখে ঝুঁকিয়া বুকে চাপ দিবে। যে সময়ে রোগীর হাত বিস্তৃত করিয়া তাহার ফুস্‌ফুসের পরিসর বাড়াইবে, ঠিক সেই সময় সে চাপ ছাড়িয়া দিবে, আর যে সময়ে তুমি রোগীর হাত গুটাইয়া আনিয়া বুকে চাপ দিয়া নিশ্বাস বাহির করিয়া দিবে, ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বোক্তভাবে সে বুকে চাপ দিবে।

যতক্ষণ না ডাক্তার আসিয়া পঁহুছান বা রোগীর স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া আরম্ভ হয়, ততক্ষণ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ করিবে না বা তাহার মাত্রা কমাইবে না, নিজে ক্লান্ত হইলে, অপরের সাহায্য-গ্রহণ করিবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ না দেখা গেলেও, হতাশ হইও না। দুইঘণ্টা চেষ্টার পরও কৃতকার্য্য হইতে দেখা গিয়াছে। যে সময় এই কার্য্য চলিবে, ৩ নং বালক রোগীর জিহ্বার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, যেন বায়ু-চলাচলের পথে কোনরূপ বাধা না পড়ে। প্রতিবারে বায়ুর আগম নির্গম সম্পূর্ণভাবে হওয়া চাই। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য আরম্ভ হইলেও, কিছুক্ষণ সতর্ক থাকিবে, যদি দেখ আবার তাহা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে আবার কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করিবে।
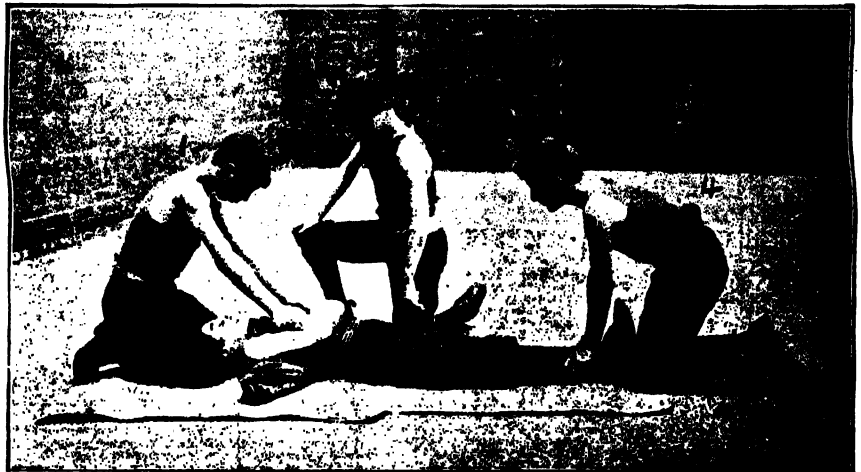
১০ নং।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার যে কৃত্রিম উপায়ের উপরে বর্ণনা করিলাম, সাধারণতঃ সেই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু যদি রোগীর

পঞ্জর বা বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এই উপায় খাটিবে না। পঞ্জর ভাঙিলে বা রোগী নিতান্ত শিশু হইলে, নিম্নলিখিত উপায়াবলম্বন করিবে—

রোগীকে চিৎ করিয়া বা পাশ ফিরাইয়া শোওয়াও; মুখের ভিতর-পরিষ্কার কর; নীচের চোয়াল নামাও ও জিহ্বা টানিয়া বাহির কর; দুই সেকেণ্ড এইভাবে জিহ্বা ধরিয়া রাখিয়া, তাহার পর ছাড়িয়া দাও; তাহার পর আবার তাহা টানিয়া বাহির কর; মিনিটে ১৫বার করিয়া এইরূপ কর।

১১ নং

শ্বাস-প্রশ্বাস বহাইবার নিম্নলিখিত উপায়টি খুব ভাল, ইহাতে রোগীর বাহু লইয়া টানাটানি করিতে হয় না বা প্রথম উপায়ের মত অত হাঙ্গামাও করিতে হয় না। বেশী লোকের সাহায্যেরও দরকার হয় না। ইহাতে রোগীর কাপড়-চোপড় খুলিবার কি আল্গা করিবার প্রয়োজন নাই। রোগীকে উপুড় করিয়া শোওয়াও, কিন্তু মাথাটা একপাশ করিয়া রাখ, যেন নাক-মুখ মাটি ছাড়িয়া থাকে। ১১ নং চিত্রে যেরূপভাবে রোগী শুইয়া আছে, অনেকটা ঐরূপভাবে রোগী শুইয়া থাকিবে। জিব টানিয়া বাহির করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ জিব আপনিই ঝুলিয়া পড়িবে। তাহার পর রোগীর মাথার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার এক পাশে হাঁটু গাড়িয়া ব'স। তোমার দুইহাতের পাতা উপুড় করিয়া রোগীর কোমরের উপর দুই পাশে রাখ, এরূপভাবে রাখিবে যেন তোমার বুড়া-আঙুল-দুইটি শিরদাঁড়ার কাছে আসিয়া মিলিত আর অন্য আঙুলগুলি সবনীচের পাঁজরগুলিপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাহার পর তুমি সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া তোমার সমস্ত দেহ-ভার তাহার কোমর ও পিঠের উপরে দাও, ইহাতে তাহার পেটে চাপ পড়িবে এবং ফুস্ফুস্‌হইতে বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। তাহার পর সহসা পিছাইয়া আসিয়া চাপ ছাড়িয়া দাও, কিন্তু হাত সরাইও না। এইরূপ করিলে, ফুস্ফুসে বায়ু-প্রবেশ করিবে। এইরূপ মিনিটে ১২ বার-হইতে ১৫ বারপর্য্যন্ত করিবে।
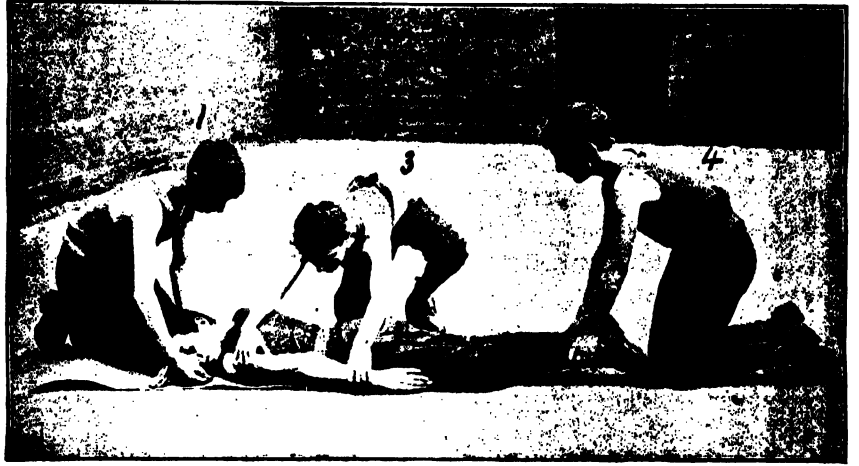
যখন স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য সম্পূর্ণভাবে আরম্ভ হইবে, তখন রোগীর রক্তসঞ্চালনের দিকে দৃষ্টি দিবে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য আরম্ভ না হওয়াপর্য্যন্ত এ কার্য্যে হাত দিবে না। কেমন করিয়া রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার সাহায্য করিতে হয়, ১২ নং চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ৪ নং বালক পায়ের ভিতরদিকে, নীচের দিক্‌হইতে উপরদিকে, চুঁচিবে। ৩ নং বালক বাঁ-হাত ও দেহের দুই পাশ এবং ১ নং বালক ডানহাত, মাথা ও ঘাড় হৃৎপিণ্ডের দিকে চুঁচিবে। এই-রূপ করিলে, চামড়ার নীচে যে সকল শিরা আছে, তাহার ভিতরের দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে যাইবে এবং সেখানহইতে ফুস্ফুসে যাইয়া পরিষ্কৃত হইবে। যতক্ষণ-পর্য্যন্ত স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ ফুস্ফুসে এই রক্ত পাঠাইয়া কোন ফল নাই।

১২ নং।

যখন দেখা গেল যে, রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া বেশ চলিতেছে, তখন রোগীকে কোন গৃহে লইয়া যাইবে ও কম্বল ঢাকা দিয়া বিছানায়

শোওয়াইবে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে—বিশেষতঃ বাহুর নীচে, পাকস্থলীতে ও পায়ের পাতায় গরম ফ্লানেলের কিম্বা গরম জলপূর্ণ বোতলের সেঁক দিবে। যদি রোগী গিলিতে পারে, তাহা হইলে এ সময় তাহাকে একটু গরম জল বা চা বা কফি বা দুধ দেওয়া যাইতে পারে। যদি রোগী ঘুমাইতে চায় ত তাহাকে ঘুমাইতে দিবে, কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাস অবিরাম হইতেছে কি না, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, কারণ ঘুমাইবার সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাস পুনরায় বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ঘরের ভিতর যাহাতে বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু বয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

উপসংহারে একটা কথা বলিয়া রাখি। এই প্রবন্ধটি পড়িলেই, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার দক্ষতা জন্মিবে না। ইহার জন্ত রীতিমত অভ্যাস আবশ্যক। অধিকাংশ কৌশল স্থলেই অভ্যাস করা যায়, কিন্তু জলেও অভ্যাস করিতে হইবে। সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকিলে, ভাল হয়। কিন্তু এখন আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষক বেশী নাই। সুতরাং প্রথম প্রথম অনেকটা নিজের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ইহার পর সকলের এ বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে, আর শিক্ষকের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। অনেকেই এ কার্য্যে সুদক্ষ হইয়া শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবে।

সৎসঙ্গ।

সুচরিত্র লোক সঙ্গদোষে কুচরিত্র হয়, কুচরিত্র লোক সঙ্গগুণে সুচরিত্র হয়। তুচ্ছবস্তু কাচ সুবর্ণসংযোগে মরকত-দ্যুতিঃ-ধারণ করে। দুর্গন্ধময় স্থানে বসোরা-গোলাপেরও সুবাস অনুভূত হয় না। ইহাহইতে এই একটী সত্য অবগত হওয়া যাইতেছে যে, আমি সু বা কু হই, তাহাতে কিছু আসে যায় না, বাহিরহইতে যে ভাবটা আমার উপর আধিপত্য করিবে, সেই ভাবটারই জয় হইবে। অসতের প্রভাবটা যদি আমার উপরে বেশী হয়, তাহা হইলে আমি চন্দন হইলেও পঙ্কে পরিণত হইব, আর সতের প্রভাবটা যদি আমার উপর আধিপত্য-বিস্তার করিতে পায়, তাহা হইলে আমি কাচ হইলেও হীরক-দ্যুতিঃ-ধারণ করিব।

আমাদের প্রত্যেকেরই স্বভাবের এমন একটী স্বাতন্ত্র্য আছে যে, সহজে আমাদের উপরে কোন-কিছুর ছায়াপাত হয় না। আমার যাহা, তাহাই ভাল, এই ধারণা প্রায় সকল মানুষেরই থাকে, উন্নততর জ্ঞান-প্রভাবে, মহত্তর জীবন-সংস্পর্শে সে ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। অতএব পরেরটাকে আমরা বড় সহজে লই না, কিন্তু যখন আবার লইতে আরম্ভ করি, তখন বড় বিচার-বিবেচনা করি না, যাহা-তাহা লইয়া বসি। এ রোগের কি করিয়া প্রতীকার হয়? আত্মপরীক্ষাই উত্তম ঔষধ। কিন্তু তোমরা বালক, তোমরা হয় ত তাহাতে অক্ষম, তোমাদের পক্ষে সহজ উপদেশ এই, যাহাকে দশে ভাল বলে, তাহাকেই সঙ্গী কর, যাহার সম্বন্ধে দ্বিমত দেখিবে, তাহার সহবাসহইতে দূরে থাকিও।

কিন্তু, সৎ হইলেও, সকলের সঙ্গ যে সকলের পক্ষে হিতকর হয়, তাহা নহে। খুব ভাল লোক হইলেও বুড়ার সঙ্গ ছোট ছেলের পক্ষে ভাল নহে। কতকগুলি বস্তু বা বিষয় আছে, যাহা বুড়ার জানা উচিত, বালকের সে বস্তু বা বিষয়সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলেই, কল্যাণজনক হয়। এই কারণে বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ বালকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। যাহার সহিত তোমার প্রকৃতির মিল নাই, যাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সহিত তোমার সহানুভূতি নাই, তাহারও সঙ্গ তোমার শুভজনক হইবে না। যে সাধুর সাধুতা তুমি বুঝিতে পার না, যাঁহার উপদেশ শুনিয়া, আচার-ব্যবহার দেখিয়া তুমি মূঢ়বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়, তাঁহার সঙ্গ ত তোমার পক্ষে কতদূর হিতকর হইবে, বলা যায় না। কোন কোন লোকের চরিত্র এত উন্নত যে, আমরা সে ঔন্নত্যের ধারণাই করিতে পারি না, তাঁহাদের চরিত্রানুকরণে বিফল হইলে, আমরা হতাশ হইয়া পড়ি, এরূপ লোকের সঙ্গ আমাদের হৃদয়-মন উন্নত করে না, বরং এই এক ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, সাধুতার পথ সকলের পক্ষে সুগম নহে। রৌপ্য উজ্জ্বল ধাতু কিন্তু তাহাতে হীরকের সমাবেশ লোচনলোভন হয় না, রৌপ্যসহ নীলার (নীলকান্তমণির) সমাবেশই বাঞ্ছনীয়। তেমনি কোন চরিত্রের সহিত কোন চরিত্রের বেশ সামঞ্জস্য হয়, আবার কোন দুই সুন্দর চরিত্র একত্রাবাসে উভয়ে উভয়কে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে। অতএব সঙ্গী-নির্ব্বাচন-কার্য্যটি বিশেষ বিবেচনার সহিত করা উচিত।

শিরঃপীড়া।

মাথাধরার এতগুলি হেতু আছে যে, ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে একখানি বই লেখা যায়। কিন্তু সচরাচর যে ক্ষয়িত দন্ত হেতুই অনেকের মাথা ধরে, এ কথা অনেক চিকিৎসকেও জানেন না।

যে স্নায়ু কপালে ও মস্তকের সম্মুখভাগে আছে, সেই স্নায়ুই চুয়াল ও দন্তগুলিতে শাখা-প্রশাখা-বিস্তার করিয়াছে। সেইজন্য উহার একাংশে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, অপরাপর অংশেও তাহা বিস্তৃত হয়। সুতরাং কাহারও যদি প্রায়ই শিরঃপীড়া জন্মে, তাহা হইলে প্রথমে তাহার ক্ষয়িত দন্তের চিকিৎসা করা উচিত।

মাথা ধরার দ্বিতীয় কারণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পুস্তক-পাঠ। যাঁহাদের চক্ষুর্দ্বয় উচিতমত আকার ও গঠন-বিশিষ্ট অথবা যাঁহারা কাছে বেশ দেখিতে পান, তাঁহাদের এ কারণে মাথা ধরে না। কিন্তু যাঁহারা দূরের বস্তু বেশ দেখিতে পান, কাছের বস্তু ভাল দেখিতে পান না, তাঁহাদেরই প্রায় এই কারণে মাথা ধরিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সময়ে চস্‌মা লইলে কষ্ট করিয়া বই পড়িতে হয় না, ফলে মাথাও ধরে না।

মাথা-ধরার যে সমস্ত চূর্ণিকা বা বটিকা বাজারে বিক্রীত হয়, সে গুলি ব্যবহার করা কি উচিত? কখনই নয়। কোন চূর্ণিকারই শিরঃপীড়ার প্রকৃত হেতু-নিবারণের ক্ষমতা নাই। ঐ চূর্ণিকাগুলির দ্বারায় মস্তিষ্ককে কিছুক্ষণ অসাড় করিয়া দেয় মাত্র, তাই আমরা আর পূর্ব্বের ন্যায় কষ্টানুভব করি না; কিন্তু প্রকৃত রোগের চিকিৎসা হয় না। ঐ চূর্ণিকার দন্তমূল, দূরদৃষ্টি, যকৃৎদোষাদি দূরীকরণের কোনই শক্তি নাই; ঐ ঔষধগুলি ভয়ানক বিষ। পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে ঐ ঔষধগুলির দ্বারা শরীরের, উপকার হওয়া দূরে থাকুক, ভয়ানক অপকারই হয়। ঐ শ্রেণীর ঔষধ ঔষধালয়ে বিক্রয় করিতে দেওয়া অনুচিত।

বালক

২য় বর্ষ।] আগষ্ট, ১৯১৩। [৮ম সংখ্যা।

মার্জ্জনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আর্য্যা গৌতমী চরকায় সুতা পাকাইতে পাকাইতে জয়ন্তকে উপকথা বলিতেছেন। অরবিন্দ বসিয়া তীর ছুলিতেছেন। জয়ন্ত গল্প শুনিতে শুনিতে একটী পাখীর পালখদিয়া দ্বারপ্রান্তে অর্দ্ধসুপ্ত সারমেয়গুলিকে সুড়্‌সুড়ি দিতেছে, তাহারা তাহাতে একটু-আধটু বিরক্তি-প্রকাশ করিতেছে। বৃদ্ধ নক্রবিক্রম বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন। এমন সময়ে দুর্গতোরণে কাহার ভেরী-নিনাদ শ্রুত হইল।

তাহা শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। সারমেয়গুলি জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, জয়ন্ত উত্তেজিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই পিতা আসিয়াছেন, আমি তাঁহার অশ্বের বল্গা-ধারণ করিতে যাই।"

নক্র-বিক্রম। "না, না, কুমার, এ সময়ে তোমার পিতার আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই; দেখ ত, অরবিন্দ, আগন্তুক শত্রু না মিত্র।"

অরবিন্দ পিত্রাদেশ-পালনে চলিলেন। জয়ন্ত বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন,—"ঐ যে পিতার কৃষ্ণাশ্বের হ্রেষারব শুনা যাইতেছে; তিনি যে আমাকে আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন; তাত, আপনি আমাকেও যাইবার অনুমতি দিউন, নতুবা আমি পিতার অশ্বের বল্গা-ধারণে বঞ্চিত হইব।"

নক্র-বিক্রম। বৎস, জয়ন্ত, স্থির হও। আগে দেখি কে? তুমি অত ব্যস্ত হইলে, চলিবে কেন?

এই সময়ে অরবিন্দ দুইজন যোদ্ধৃসহ আয়তন-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বিজ্ঞপ্তি করিলেন,—"বীরবর ভীমভ্রু ভল্লুবীর্য্য ও যোদ্ধৃপুঙ্গব অস্ত্রাঙ্গ বজ্রবহ্নি।"

নক্র-বিক্রম উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয়কেই যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেবল আপনারা ফিরিয়া আসিলেন যে, মহারাজ কোথায়?"

জয়ন্ত তখন হতাশ ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আয়তন-মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। ভল্লুবীর্য্য নক্র-বিক্রমের কথার উত্তর না দিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়ন্তের পাদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ জয়ন্ত, এ দাস আপনার ভক্ত প্রজা ও অনুগত পরিচর-স্বরূপে আপনার পদপ্রান্তে অবনত হইল।"

বজ্রবহ্নিও সঙ্গীর অনুসরণ করিলেন। নক্রবিক্রম প্রথমে হত-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, পরে ভল্লুবীর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্যই কি মহারাজ আর ই—"

ভল্লুবীর্য্যের চক্ষুযুগল অশ্রু-ধারায় প্লাবিত হইল, তখন নক্রবিক্রমও তিলকমহারাজের কাছে যথারীতি ভক্তিবিজ্ঞাপন ও আনুগত্য-স্বীকার করিলেন। বালক জয়ন্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ব্যাকুলভাবে আর্য্যা গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ইহার অর্থ কি, মাতঃ! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পিতা কোথায়?"

আর্য্যা গৌতমী দরবিগলিত-ধারে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, পরে জয়ন্তের উদ্দেশে কহিলেন,—"জন্মমৃত্যু বিধাতার বিধান। বৎস জয়ন্ত, তোমার পুণ্যবান্ পিতা এক্ষণে পুণ্যলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। যোদ্ধার জীবনই এইপ্রকার।"

জয়ন্ত গৌতমী-বক্ষে মস্তক রাখিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল; সে বালকমাত্র। গৌতমীও তাহার অশ্রুর সহিত নিজ-অশ্রু মিলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; কি সুন্দর সান্ত্বনা!

নক্রবিক্রম অতীব কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভ্রাতঃ, বজ্রবহ্নি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না, যুদ্ধই বা কখন্ হইল, কি করিয়াই বা কোন্ শস্ত্রকুশল শত্রুর দ্বারা সেই মহাবীর ধরাশায়ী হইলেন?" বজ্রবহ্নি তিক্তস্বরে কহিলেন,—"রণক্ষেত্রে সে মহাবীরের পতন হয় নাই।"

নক্র। "তবে কোন্ কালব্যাধি এত শীঘ্র সেই অক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য দেহীর দেহক্ষয় করিয়াছে?"

ভল্লু। রোগে নহে, বিশ্বাসঘাতকের কৃপাণমুখে সেই মহাপুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অসুর-রাজ পাষণ্ড রক্তমুখ তাঁহাকে একাকী এক তরণীমধ্যে পাইয়া কাপুরুষের ন্যায় বধ করিয়াছে।

নক্র। আর সে বিশ্বাসঘাতকের মস্তক এখনও তাহার স্কন্ধোপরি রহিয়াছে?

বজ্র। হাঁ! সে অক্ষতশরীরে তাহার স্বদেশে বসিয়া এই ক্রূর কর্ম্ম করিতে পারিয়াছে বলিয়া নিশ্চয়ই বড় আনন্দানুভব করিতেছে!

নক্র। ভদ্রগণ, আপনাদের বাক্যে আস্থা-স্থাপন অতীব দুরূহ কার্য্য। মহারাজ বিশ্বাসঘাতকের ছুরিকাঘাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত, আপনারা তবে শত্রুকে সমুচিত শিক্ষা না দিয়া কি করিতে এখানে আসিয়াছেন?

ভল্লু। মহারাজের মৃত্যুশীতল দেহপার্শ্বে আমার এ ছার দেহের পাত হইলে, আমার সৌভাগ্যের অবধি থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না। ঘটনাটা এমনই বিচিত্রপ্রকৃতির যে, আমরা কেহই কৃপাণ কোষমুক্ত করিবারও সুযোগ পাই নাই। মহারাজের সে বিয়োগদৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে আমার এ নেত্রযুগল অন্ধ হইলেই, ভাল হইত। তাই নিরুপায় হইয়া নবমহারাজের সাহায্যার্থে এখানে আসিয়াছি। আমি সে পাপ-কাহিনী কহিতে পারিব না। ভ্রাতঃ, বজ্রবহ্নি, তুমিই তাহা বল।

এই বলিয়া ভল্লুবীর্য্য একস্থানে বসিয়া পড়িয়া উত্তরীয়ে মুখাচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

বজ্রবহ্নি বলিতে লাগিলেন,—"সে পাপ-কাহিনী শ্রবণে একদিকে যেমন দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে হয়। ভ্রাতঃ, নক্রবিক্রম, আপনার স্মরণে আছে, দুর্ব্বৃত্ত রক্তমুখের সহিত মহারাজ রক্তস্রোতার মধ্যস্থলে সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কথা ছিল, উভয় পক্ষের দ্বাদশ জন করিয়া যোদ্ধা নিরস্ত্র হইয়া স্ব স্ব রাজার সহচারী হইবেন, রাজদ্বয়ও নিরস্ত্র থাকিবেন। আমরা প্রতিশ্রুতিমত নিরস্ত্রই ছিলাম, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত অসুরেরা প্রবঞ্চকের একশেষ, তাহারা স্ব স্ব দীর্ঘকেশে এক-একটি করিয়া ছুরিকা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। আমরা তাহাদের তরণীর সন্নিহিত হইবামাত্রই মহারাজের প্রতি সেই ক্রূরকর্ম্মা রক্তমুখের সমাদর দেখে কে? বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সেই ভণ্ডের মস্তক আমার এ গদাপ্রহারে এখনও চূর্ণ করিতে পারিলাম না। মহারাজ যাহা বলিলেন, সে তাহাতেই সম্মত হইল, সুররাজ সৌরশুক্রকে সে গ্রামটি প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল, অধিকন্তু সে স্বয়ং মহারাজের আনুগত্য-স্বীকার করিতে চাহিল। ন্যায়নিষ্ঠ মহারাজ অবশ্য সে সম্মান-প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, 'তুমি কুঙ্কুমপ্রদেশাধিপতির অনুগত প্রজা, তাঁহারই প্রতি তোমার ভক্তিপ্রদর্শন কর্ত্তব্য।' কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গেল। আমরা ফিরিয়া আসিতেছিলাম, মহারাজ একটী নৌকায় একাকী ফিরিতেছিলেন। সহসা দুরাশয় রক্তমুখ চীৎকার করিয়া মহারাজকে আর কি কথা বলিবে বলিয়া ফিরিতে অনুরোধ করিল। মহারাজ আমাদিগকে সহচারী হইতে নিষেধ করিয়া একাকীই দুর্ব্বৃত্তের সন্নিকট হইলেন। আমরা তখন বহুদূরে। মহারাজের নৌকা উহার তরণীর সন্নিহিত হইবামাত্রই একেবারে ত্রয়োদশ জনে মস্তকহইতে তেরটি ছুরিকা বাহির করিয়া মহারাজকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল; এবং আমরা তাহাদের সন্নিহিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা নদীপার হইয়া তীরে উঠিল, পরে অশ্বারোহণে পলাইয়া গেল। আমরা প্রতিশোধ লইতে পারিলাম না।"

তচ্ছ্রবণে জয়ন্ত নয়নাশ্রুমার্জ্জন করিয়া ফেলিল, তাহার আয়ত লোচনদ্বয় যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল, কহিল,—"বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি এখন দুর্ব্বল বালকমাত্র। আচ্ছা, একথা আমি ভুলিব না, পিতৃঘাতীর রক্তদ—"

সেই তেজোময়ী উক্তি আর সমাপ্ত করা হইল না। কেননা জয়ন্তের সহসা মনে পড়িয়া গেল যে, পিতা তাঁহার শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইতে তাহাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যোদ্ধৃগণ সেই তেজঃপূর্ণা অর্দ্ধোক্তি শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন। কারণ তাঁহাদের মতে এ স্থলে প্রতিহিংসাই কর্ত্তব্য।

ভল্লুবীর্য্য দাঁড়াইয়া উঠিলেন, উত্তেজিতভাবে কহিলেন,—"মহারাজ, কি বলিলেন, পিতৃঘাতীর রক্তদর্শন করিবেন? হাঁ, আপনার নয়নদ্বয়-নিঃসৃত ঐ তেজঃ-স্ফুলিঙ্গই আমাকে বলিয়া দিতেছে যে, আপনি তাহা পারিবেন।"

জয়ন্তের গৌরব-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অরুণশ্রীধারণ করিল। নক্র-

বিক্রম কহিলেন,—"হাঁ, এই বাল-মহারাজ ইঁহার পিতারই ন্যায় তেজস্বী। পঞ্চ-নদ-পরিধৌত সমগ্র প্রদেশটিতে ইঁহার তুল্য বীর্য্য-বান্ বালক আমি আর প্রত্যক্ষ করি নাই। ভল্লুবীর্য্য, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, এই বাল-নৃপতিও ইঁহার পূর্ব্বপুরুষদেরই ন্যায় যশস্বী হইবেন।"

ভল্লুবীর্য্য। হাঁ, ইহা আমি খুবই বিশ্বাস করি ইনি ইঁহার প্রপিতামহের তুল্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত; ইঁহার সদাশয় পিতার সহিতও ইঁহার সাদৃশ্য বড় অল্প নাই। কি বলেন, মহারাজ জয়ন্ত, আপনি আপনার স্বজাতির অকুতোভয় অধিনায়ক হইবেন তো?

প্রশংসা-শ্রবণে উত্তেজিত হইয়া বালক জয়ন্ত বলিয়া উঠিল,—

"যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, অদ্য রাত্রিতেই আমি আপনাদের পরিচালক হইয়া বিশ্বাসঘাতক রক্তমুখকে দণ্ডপ্রদান করিতে যাইতে সম্মত আছি।"

ভল্লুবীর্য্য। মহারাজ, কাল আপনাকে আমাদের দলপতি হইয়া যাইতে হইবে বটে, কিন্তু শত্রুসংহারে নহে, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে আপনার রাজধানী—রজতপুরে।

শুনিয়া বালক জয়ন্তের সকল উৎসাহই এককালে বিলুপ্ত হইল, কারণ ঐ কথা শুনিয়া সত্যই যে তাহার স্নেহময় পিতা আর ইহ-জগতে নাই, এই সত্যই তাহার মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল। সে মস্তক নত করিল। তাহার চক্ষুযুগল পুনরায় অশ্রুভারাকুল হইয়া উঠিল সে লজ্জায় সেই শোকচিহ্ন গোপন করিবার চেষ্টা করিল।

যোদ্ধৃগণের কথোপকথন শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার পিতার মৃতদেহ রজতপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে; এবং সেই দেহের শটন-নিবারণার্থে তাহাতে এখন একপ্রকার প্রলেপ প্রলিপ্ত হইয়াছে।

যোদ্ধৃগণ নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বালক জয়ন্ত ইত্যবসরে নিদ্রিত হইল।

* * * * * *

প্রভাতের বিহগ-বিরাব শুনিয়া সে জাগিল। তখন রজতপুরে যাইবার জন্য উদ্যোগ হইতে লাগিল। আর্য্যা-গৌতমী জয়ন্তের সহচারিণী হইতে চাহিলেন। তাঁহার পুত্র তাহাতে আপত্তি করিলেন, বলিলেন,—"মহারাজের সহিত এখন শিশুবৎ আচরণ করিলে, প্রজারা হাসিবে। আপনি পরে রজতপুরে যাইবেন।"

ইহাতে স্নেহময়ী গৌতমী অবশ্য একটু মনোকষ্ট পাইলেন। কহিলেন,—"তবে তোমরাই পিতা-পুত্রে পথে বৎস জয়ন্তের সবিশেষ তত্ত্বাবধান করিও; দেখিও, যেন সে কোনপ্রকারে অবহেলিত না হয়।"

তখন জয়ন্ত গৌতমীর নিকট বিদায় লইলেন। গৌতমী এই সামান্যিক বিচ্ছেদটুকুও সহিতে পারিলেন না; বারবার নয়নাশ্রু-মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে জয়ন্তের শুভ্র ললাটে একটী চুম্বনপ্রদান ও তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

জয়ন্ত অশ্বারোহণে চলিল। তাঁহার এক পার্শ্বে ভল্লুবীর্য্য ও অপরপার্শ্বে নক্র-বিক্রমও অশ্বারোহণে চলিলেন। সম্মুখে বজ্রবহ্নি ও পশ্চাতে অরবিন্দ তাহার দেহরক্ষক হইয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া বালক জয়ন্ত তৎকালের নিমিত্ত পিতৃশোক বিস্মৃত হইল। চারিদিকে তাহার প্রজাকুল তাহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। ভল্লুবীর্য্য তাহার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দিয়াছিলেন, সে দীন প্রজাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্রকন্যাদের দেখিলেই তাহাহইতে মুঠি মুঠি মুদ্রা লইয়া পথে পথে ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল।

মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে তাঁহারা এক অধীন শতপতির দুর্গে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া লইলেন। পুনর্যাত্রাকালে সেই শতপতিও জয়ন্তের সহচারী হইলেন। এই সময়ে জয়ন্তের আর একবার পিতার কথা মনে পড়িল। একবার সে এইরূপ রজতপুরে ফিরিয়া গিয়া পিতার শ্রীচরণ-বন্দনা করিয়াছিল, সে কথা মনে পড়িয়া গেল। এবার সে স্বদেশে ফিরিয়া আর পিতার সেই প্রেমপূর্ণ মুখখানি দেখিতে পাইবে না। জয়ন্ত আবার একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা রজতপুরে পঁহুছিলেন। ভল্লুবীর্য্যের আদেশক্রমে এবার জয়ন্ত সর্ব্বাগ্রগামী হইল, যোদ্ধৃগণ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। নগরতোরণের দুইপার্শ্বে প্রজাপুঞ্জ সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা জয়ন্তকে দেখিবামাত্র "জয় বাল-মহারাজ জয়ন্তের জয়" বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ভল্লুবীর্য্যের ইঙ্গিতক্রমে জয়ন্ত তাহাদের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইয়া দিতে লাগিল, ফলে শীঘ্রই অর্থাধার শূন্য হইয়া গেল।

নগরটি প্রাকার-পরিবেষ্টিত। রাজপ্রাসাদ একতল, কিন্তু বৃহৎ ও সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত, তাহাও একটী দুর্গমাত্র। জয়ন্ত দুর্গাভিমুখে অশ্বচালনা করিতে যাইতেছিল, ভল্লুবীর্য্য কহিলেন,—"ওদিকে নয়, মহারাজ, প্রথমে শ্মশান-অভিমুখে চলুন; সেখানে আপনার পিতৃ-চিতা সজ্জিত, আপনাকে মুখাগ্নি করিতে হইবে।"

জয়ন্তের তরুণ মুখখানি আবার একটু হর্ষপ্রফুল্ল হইয়াছিল, আবার মলিন হইয়া গেল। সে বিষণ্ণভাবে পিতৃচিতাভিমুখে অগ্রসর হইল। শ্মশান-সান্নিধ্যে পঁহুছিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে অশ্বহইতে অবতরণ করিলেন। তথনকার ভারতীয় আর্য্যগণ বর্ত্তমান হিন্দুর ন্যায় আচার-বিচার করিতেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়াও পরিচয় দিতেন না; সুতরাং জয়ন্ত কেন অশৌচ-বসন-পরিধান করে নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মৃতের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলেই উষ্ণীষ-উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। তখনকার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বাহ্য অনুষ্ঠানের বড় আড়ম্বর ছিল না, দেহটি সত্বরই যাহাতে ভস্ম-সাৎ হয়, এইটি দেখাই তখনকার একটী বিশিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল, এইজন্য ঘৃত ও কাষ্ঠের প্রচুর আয়োজন করা হইত এবং তখনকার মৃত-দিগকে স্ব স্ব সুবেশে সুসজ্জিত করিয়াই সৎকার করা হইত। ঘণ্টা-খানিকের মধ্যেই মৃতদেহটি ভস্মীভূত হইল, মৃতের চিতাভস্ম সুবর্ণ-স্রোতা-জলে বিসর্জ্জিত করিয়া সকলে রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেইটির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াই এই পরিচ্ছেদটি পরিসমাপ্ত করিব।

মৃতের কাছে পঁহুছিলে, ভল্লুবীর্য্য জয়ন্তের উদ্দেশে কহিলেন,—"মহারাজ, আপনার মৃত পিতার অঙ্গে কত ক্ষত চিহ্ন দেখুন। দেখিলে সেই দুরাশয় রক্তমুখ কি করিয়া আপনার পিতার প্রাণহরণ করিয়াছে, তাহা কতক অনুভব করিতে পারিবেন।"

জয়ন্ত দেখিল; দেখিয়া তাহার আয়তলোচনদ্বয় ক্রোধে জলিয়া উঠিল। সে দন্তে দন্তঘর্ষণপূর্ব্বক বদ্ধমুষ্টি হইয়া বলিয়া উঠিল,—"দুরাত্মা রক্তমুখ, এই শোণিতপাতের পরিশোধে আমার এই কৃপাণও তোমার বক্ষঃশোণিতপিপাসু হইয়াছে—কেবল এ বাহু-যুগলে বলের অপেক্ষা—আমি প্রতি—"

জয়ন্তের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। এক শুভ্রকেশ ঋষিকল্প ব্যক্তি তাহার পিতার মস্তক-সন্নিধানে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তখন জয়ন্ত সভয়ে দেখিল যে, তিনি মহামুনি বাদরায়ণ—রাজকুলপুরোহিত, মিত্র ও মন্ত্রী। তাঁহাকে দেখিয়াই জয়ন্তের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"কি বলিলেন, নব-মহারাজ, মস্তক নত করিতেছেন? তাহাই করুন; যাহা মুখে আনিতেছিলেন, তাহা মুখেই থাকুক। ওকথা কহিয়া যিনি অনন্তধামের পথে যাত্রী, তাঁহার প্রতি অসম্ভ্রমপ্রকাশ করিবেন না। আজ যদি আপনার এই পিতা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আপনার মুখে ওকথা শুনিলে ইনি কি বলিতেন? ভাবুন তো!"

জয়ন্ত উভয় পাণিদ্বারা তাহার মুখাচ্ছাদন করিল। তাহার দুইচক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

ভল্লুবীর্য্য শশব্যস্তে কহিলেন,—"মহামুনে, কি বলিতেছেন আপনি? এই তরুণ মহারাজ আপনার ন্যায় স্থবির ব্রহ্মচারী নহেন, রাজাতে রাজবিক্রম থাকে, ইহাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? আপনি মহারাজকে নির্বীর্য্য করিতে চাহেন কেন?"

বাদরায়ণ কহিলেন,—"ভল্লুবীর্য্য! আমরা বর্ব্বর অনার্য্য, না ক্ষেমঙ্কর ঈশ্বরের উপাসক আর্য্য? একথা যদি নাও ধরি, এই যে মহাপুরুষ এক্ষণে এখানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, ইঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল কি? ইনি আততায়ীকে রক্ষার্থে ভিন্ন কখন অস্ত্রধারণ করিয়াছেন কি? অদ্য আপনি ইঁহারই সম্মুখে ইঁহার কুলধ্বজকে কুশিক্ষা দিয়া ইঁহার প্রতি অসম্ভ্রম-প্রকাশ করিতেছেন? এই কি আপনার মৃতমহারাজের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন?"

ভল্লুবীর্য্য লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তখন আবার বাদরায়ণ কহিলেন,—"বীরবর, আমি জানি, এ রাজ্যে আপনার তুল্য রাজহিতৈষী অতি অল্প লোকই আছেন। মৃত মহারাজ-প্রতি ভক্তিবশতঃ আপনি ভ্রান্ত হইবেন না। প্রতিহিংসা ধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে, উহা বর্ব্বরের ধর্ম্ম। ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম। বৎস, জয়ন্ত, প্রতিশোধ লইবার কর্ত্তা ঈশ্বর, তুমি নহ। তোমার প্রজা-কুলকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য, কিন্তু যে বিষয়ে তোমার স্বার্থ

জড়িত আছে, সে বিষয়ের ভার তুমি ভগবানের চরণে ন্যস্ত করিতেই অভ্যস্ত হও।"

জয়ন্ত তখন কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল, নীরব রহিল। তাহার পর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-শেষ হইলে, ভল্লুবীর্য্য জয়ন্তের হাত ধরিয়া শ্মশানস্থলী-ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ জয়ন্তের অভিষেক। নগরময় উৎসব হইতেছে। নক্রবিক্রম জয়ন্তের শোকবাস ছাড়াইয়া তাহাকে রাজবেশে ভূষিত করাইলেন। তাহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয়, স্কন্ধে অরুণাভ চেলোত্তরীয়, অঙ্গুলিতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়, পরিধানে রক্তাভ ক্ষৌমবসন, চরণে সুন্দর পাদুকা শোভা পাইতে লাগিল। কটিদেশহইতে তাহার পিতার সেই দীর্ঘ তরবারি ঝুলিতে লাগিল। এই বেশে ভল্লুবীর্য্য তাহাকে সভাকক্ষ্যায় লইয়া গেলেন। সেই কক্ষ্যায় রাজন্যবর্গ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ভল্লুবীর্য্যের ইঙ্গিতক্রমে জয়ন্ত সভাকক্ষ্যায় পদার্পণ করিয়াই মস্তকের কিরীট খুলিয়া সকলকে অভিবাদন করিল। সামন্তগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া যথারীতি তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তাহার পর জয়ন্ত অগ্রে, পশ্চাতে রাজন্যবর্গ স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজপ্রাসাদহইতে নিঃসৃত হইলেন। অভিষেকার্থে একটী স্থানে চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হইয়াছিল, সকলে তথায় গমন করিলেন। জয়ন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, অভিষেকক্রিয়া আরব্ধ হইল। প্রথমে রাজপুরোহিত তাঁহাকে ধান্য ও দূর্ব্বাদিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক রাজ-মুকুট পরাইয়া দিলেন। পরে প্রত্যেক দলপতি আসিয়া সিংহাসনতলে জানু পাতিয়া রাজানুগত্য-স্বীকার করিতে লাগিলেন, রাজাও রাজধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর-সাক্ষী করিয়া রক্ষা করিতে শপথ করিতে লাগিলেন। চপল-স্বভাব জয়ন্তের বসিয়া বসিয়া এই অনুষ্ঠান-পালন করিতে করিতে বড়ই বিরক্তি ও ক্লান্তিবোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে সময়ে একটু-আধটু বাল-সুলভ চাঞ্চল্য-প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ভল্লুবীর্য্যের কঠোর দৃষ্টি তাহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যে মনোযোগী করিতে লাগিল।
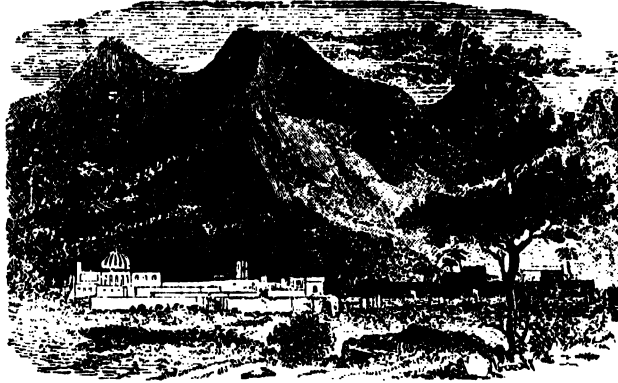
অবশেষে অভিষেক-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। জয়ন্ত তখন 'ধড়াচূড়া' ছাড়িতে পারিলে বাঁচে; কিন্তু তাহা হইল না। তাহাকে আবার শোভাযাত্রাপূর্ব্বক সদলবলে প্রাসাদে ফিরিতে হইল।

প্রাসাদে ফিরিয়া সেনানীগণ রাজনীতিসম্বন্ধে নানা কথা-আরম্ভ করিয়া দিলেন। শত্রুকবলহইতে কি করিয়া এই বালরাজের রাজ্য-রক্ষা করা যাইবে, ইহাই তখন তাঁহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল। ভল্লুবীর্য্য কহিলেন,—"এ কার্য্য সুধু সামর্থ্যের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না, অর্থেরও সবিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজ রাজ-কোষে কিরূপ অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত জানি না।"

এই কথা শুনিয়া কয়েকজন গোষ্ঠীপতি চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তাহার পর তন্মধ্যে একজন কহিলেন,—"মৃত মহারাজের কণ্ঠে এই রৌপ্যশৃঙ্খলবদ্ধ চাবিটি পাওয়া গিয়াছে; হয়ত এই চাবিটির দ্বারা যে পেটিকাটি খুলা যায়, সেইটিতে মহারাজের ধনরত্ন আছে।"

তচ্ছ্রবণে সকলে মৃত নৃপতির শয়ন-কক্ষ্যায় গিয়া রাজ-কোষপরীক্ষা বিহিত বিবেচনা করিলেন।

বৃক-বিক্রমের শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা দেখিলেন,—সে কক্ষ্যাটি আদৌ রাজোচিতভাবে সজ্জিত নহে, তাহাতে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। রাজা একটী দারু-খণ্ডে শয়ন করিতেন। তদ্ভিন্ন দুইটি পেটিকামাত্র সেই কক্ষ্যায় রহিয়াছে। প্রথম পেটিকাটি উদ্ঘোচিত হইলে, তাহাতে কতকগুলি রাজবেশ পাওয়া গেল। সেই রূপার চাবিদিয়া দ্বিতীয় পেটিকাটিও খুলা হইল; তখন দেখা গেল, তাহাতেও বিশেষ কিছু নাই, কেবল মুনি-পরিধেয় একপ্রস্থ বল্কল-বসন রহিয়াছে।

ভল্লুবীর্য্য বলিয়া উঠিলেন,—"আরে, এ যে কিছুই নয়! মহারাজ বৃক-বিক্রম আপনাকে কি বলিয়াছিলেন, মহারাজ!

জয়ন্ত। এই পেটিকায় তাঁহার মহার্ঘতম রত্ন আছে।

ভল্লুবীর্য্য। হা, হা, হা!

মহামুনি বাদরায়ণও সেখানে ছিলেন, বলিলেন,—"বীরবর, হাসিবেন না। এই বল্কল-বসনকেই মহারাজ তাঁহার মহার্ঘতম রত্ন মনে করিতেন। তখন তাঁহার তরুণ বয়স। বদরিকারণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। দুইজন সন্ন্যাসী একস্থানে বসিয়া কিছু খাদ্যপাক করিতেছিলেন। মহারাজ মৃগয়া-ক্লান্ত হইয়া তাঁহাদের প্রসাদপ্রার্থী হয়েন। কিন্তু সে খাদ্য তিনি মুখে দিতে না পারায় হাসিয়া উঠিয়া পড়েন। পরে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া এক বন্যবরাহকর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া পুনরায় সেই সন্ন্যাসিদ্বয়ের আশ্রমে আনীত হয়েন; সেবাব্রত যতিদ্বয় তাঁহার সবিশেষ শুশ্রূষা করিয়া

তাঁহাকে মাসখানিকের মধ্যে সুস্থ করেন। তদবধি বৃক-বিক্রমের মন ভগবচ্চরণে সংলগ্ন হইয়া যায়। তিনিও তপস্বী হইতে চাহেন, কিন্তু তাপসদ্বয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, যতদিন না তাঁহার পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হন, ততদিন তাঁহার রাজধর্ম্ম-পালনই কর্ত্তব্য, কারণ তদর্থেই ঈশ্বর তাঁহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। বৃক-বিক্রম অগত্যা সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু আসিবার সময়ে তিনি মুনিদ্বয়ের নিকট একপ্রস্থ কষায়-বসন চাহিয়া লইয়া আসেন। তাঁহার মনের বাসনা এই ছিল যে, বর্ত্তমান মহারাজ প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলেই, তিনি তপশ্চর্য্যায় মন দিবেন। এইজন্যই তিনি এই বসন-গুলিকে মহামূল্য মনে করিতেন। তিনি সেই তাপসদ্বয়ের আশ্রমটি বহু অর্থব্যয়ে সংস্কৃত করিয়া দেন এবং অবকাশ পাইলেই তাঁহাদের পাদ-বন্দনা করিতে যাইতেন। কিন্তু তিনি যে স্বয়ংই এক রাজর্ষি ছিলেন, তাহা অবগত ছিলেন না; ভগবান্ এক্ষণে তাঁহাকে তাঁহার অমৃততরুচ্ছায়স্নিগ্ধ, সুখশান্তিময়, শান্তশ্রী স্বর্গীয় তপোবনে তুলিয়া লইয়াছেন।"

ঐ কথা শুনিয়া সকল সেনানীরই মন ভগবৎপ্রেমরসে সিক্ত হইল; জয়ন্তের চক্ষুযুগল অশ্রুশিশিরময় হইয়া উঠিল। গত রাত্রিতে সে যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিল, সেই প্রকোষ্ঠে বসন-পরিবর্ত্ত করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে অরবিন্দ ডাকিলেন,—"মহারাজ, দেখুন কে আসিয়াছেন!" জয়ন্ত ফিরিয়া দেখিল,—"আর্য্যা গৌতমী!" শোককাতর ও শ্রমক্লিষ্ট বালক গৌতমীর আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষঃ অশ্রুনীরে প্লাবিত করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ।)

পুত্র-পরিচয়

যে পুত্র মাতার মনে দেয় সদা দুখ,
যে পুত্র মলিন করে জনকের মুখ,
যে পুত্র সতত করে কুপথে গমন,
যে পুত্র মাতার তা'র উদ্বেগ-কারণ,
যে পুত্রের দোষে বংশ হয় ছারখার,
সেই কুলাঙ্গার পুত্র প্রার্থনীয় কা'র?

যে পুত্র সতত পালে পিতার বচন,
যে পুত্র সতত তুষে জননীর মন,
যে পুত্র সতত রত বিদ্যা-উপার্জ্জনে,
যে পুত্র সতত রহে সুলোকের সনে,
যে পুত্র জনমি' বংশ সমুজ্জ্বল করে,
সেই তো সুপুত্র, তা'রে সবে সমাদরে।

কাজি মোফাজ্জেল আহাম্মদ।

—*—

উপমা

সদয় হৃদয়গুলি—ফুলের বাগান,
সদয় ভাবনাগুলি—মূল;

সদয় বচনগুলি—কুঁড়ির সমান,
সদয় করমগুলি—ফুল!

—•—

মনোহর-মৎস্য।

("বনিটো")

এই মৎস্যের ইংরাজী নাম,—'বনিটো'। বনিটো-শব্দটা স্প্যানিশ ভাষায় পাওয়া যায়, উহার অর্থ সুন্দর। স্পেন-দেশীয় নাবিকেরাই ঐ মৎস্যের ঐ নামকরণ করে। উহা বর্ণ-বিলাস-মৎস্যের ন্যায় দেখিতে সুন্দর নহে। তবে ঐ মৎস্য বর্ণবিলাসের

অপেক্ষা অধিকতর মানুষ-ঘেঁসা ও উহার স্বাদ মুখরোচক; তাই, বোধ করি, স্প্যানিশ নাবিকেরা উহার ঐ নাম দিয়াছিল।

এই মৎস্যের গাত্রবর্ণ গাঢ় নীল। ইহাও গভীর সমুদ্রের মৎস্য, তবে জলের উপরিভাগের নিকটেই বিচরণ করে। এই মৎস্য সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে এবং ঝাঁকগুলিতে অসংখ্য মৎস্য থাকে। ইহা ওজনে ১৪।১৫ সেরের অধিক হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মৎস্য সুস্বাদু, কিন্তু ইহা 'লোণা' করা যায় না, করিলে তাহা আর খাদ্য থাকে না। মৎস্যমাত্রেরই শোণিত শীতল, কিন্তু এই মৎস্যের শোণিত নাকি উষ্ণ। মনোহর-মৎস্য প্রায় সকল সমুদ্রেই পাওয়া যায়। এই মৎস্যটি সমুদ্রে না থাকিলে, অনেক নাবিককে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

অধ্যবসায়।

অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন একটা নূতন কাজ পাইলে, লোকে তাহা বেশ আগ্রহের সহিত, মন দিয়া করে। এইরূপে কাজ করা তত কঠিন নহে, কিন্তু উক্ত কাজটার নূতনত্বটুকু অন্তর্হিত হইলে, তাহা অধ্যবসায়ের সহিত করা কিছুতেই সহজ নহে। কিন্তু তদ্দ্বারাই, মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ফুটবল খেলিবার সময়ে অনেক টীম্ এমন

আগ্রহের সহিত খেলাট আরম্ভ করে যে, দর্শকদের বোধ হয় যেন তাহারা অতি সহজেই জিতিতে পারিবে। কিন্তু একটু পরে দেখা যায়, তাহাদের আগ্রহ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে; তাহারা আর তেমন আগ্রহের সহিত খেলিতেছে না; অধ্যবসায়ের অভাবে তাহারা অকৃতকার্য্য হয়। লেখা-পড়াসম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ হয়; অনেক ছেলে কিছুদিনের জন্য বেশ মন দিয়া পড়িয়া শেষে ঢিল দিতে আরম্ভ করে। যত্ন ও পরিশ্রম করিলে, তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান-লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা সহজে ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাই তাহাদের উন্নতি হয় না।

ছেলেরা যেমন শীতকালে আগ্রহের সহিত পড়ে কিংবা কাজ বা খেলা করে, গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে তেমন আগ্রহ-প্রকাশ করে না, কাজেই এই সময়ে সতর্ক হওয়া দরকার। আলস্য অতি ঘৃণার্হ অভ্যাস; তোমরা সাবধান হইবে, যেন অলস না হইয়া পড়। কাজ একটু কঠিন হইলে, অনেক ছেলে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। তোমরা ঐপ্রকার নিরুদ্যম হইও না, বরং তোমাদের কাজ যত কঠিন হইবে, তোমরা তত আগ্রহের সহিত কাজ করিবে। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব, ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। 'বালকের' প্রত্যেক পাঠক যেন এইপ্রকার বীরত্বেরই পরিচয় দেয়, ইহা আমাদের ইচ্ছা ও আন্তরিক প্রার্থনা।

পরেশ পাথর।

উপকথা।

সে অনেক দিনের কথা; আমাদের এই ভারতবর্ষেই একটী লোক ছিল, সে জানোয়ারদের বড় ভাল বাসিত। তাহার একটী পোষা সাপ, একটী বিড়াল ও একটী কুকুর ছিল। সে তাহার সেই পোষা জীব-তিনটীকে এত ভাল বাসিত যে, তাহাদের যাহা খুসি হইত, তাহাদিগকে তাহাই করিতে দিত।

একদিন সাপ তাহাকে কহিল,—"মুনিব-মশাই, আর আমার এখেনে ভাল লা'গ্‌'ছে না, আমি পাতালে নেমে চল্লুম, আর আ'স্‌ব না।"

লোকটি কহিল,—"না, না, তুমি যেও না, যেও না; তবে তুমি যদি একান্তই যেতে চাও, তা'হ'লে, আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব।"

সাপ বলিল,—"মুনিব-মশাই, আপ্‌নি আমার সঙ্গে যা'বার চেষ্টা কি আমি চ'লে যাচ্ছি ব'লে দুঃখু ক'র্‌বেন না। বিদায়-উপহার-স্বরূপে আমি আপনাকে একখানি 'পরেশ পাথর' দিয়ে যা'ব, তা'র কাছে আপ্‌নি যা' চাইবেন, তা'ই পা'বেন।"

এই লোকটি যে দেশে থাকিত, সে দেশের রাজার একটী খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল, রাজা তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন; তা'ই তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে একরাতের মধ্যে তাঁহাকে একটী সোণার অট্টালিকা করিয়া দেখাইতে পারিবে, তাহারই সঙ্গে তিনি তাঁহার মেয়েটির বিবাহ দিবেন। তাঁহার সকল প্রজাই তাঁহার এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়াছিল। তাই তাহারা রাজার অসাক্ষাতে তাঁহার সেই অদ্ভুত পণের কথা লইয়া বড় হাসিতামাসা করিত। পরেশ পাথর পাওয়া-অবধি, যে লোকটির কথা আমরা এখন বলিতেছি, সে লোকটি কিন্তু ঐ কথা লইয়া আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত না।

একদিন, তাহার কি খেয়াল গেল, সে ভাবিল,—"দেখিই না কেন, আমি যা' চাই, পরেশ পাথর আমাকে কেমন তা'ই এনে দেয়।" এই ভাবিয়া সাপ তাহাকে যে কথা বলিয়া পরেশ পাথরের কাছে সব জিনিস চাহিতে শিখাইয়া গিয়াছিল, সে সেই কথা বলিয়া উহার উদ্দেশে কহিল,—

"পরেশ পাথর, পরেশ পাথর, কোথা' আছ শুয়ে?
দাও হে সোণার অট্টালিকে,—উঠুক আকাশ ছুঁয়ে।"

ঐ কথা যাই বলা, আর অমনি দেখিল,—রাজবাড়ীর মাঠে, রাজবাড়ীর ঠিক গায়েই মস্ত একটা সোণার বাড়ী উঠিল, সেটি এমনি উঁচু যে, যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে! লোকটী রাজবাড়ীর মাঠে দাঁড়াইয়া রাতের বেলা ঐ কথা বলিয়াছিল। রাজা সকাল-বেলা ঘুমথেকে উঠিয়া দেখেন যে, তাঁহার প্রাসাদের মাঠে মস্ত একটা বালাখানা বাড়ী উঠিয়াছে, তাহাতে রোদ আসিয়া লাগাতে বাড়ীটি এমনই ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতেছে যে, তাহার দিকে চোক মেলিয়া চাওয়া যাইতেছে না। দেখিয়া রাজা তো একেবারে অবাক্! তখনই মন্ত্রীকে তলব করিলেন। মন্ত্রী আসিয়া অভিবাদন করিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মন্ত্রি, এ বাড়ীটা কে ক'রেছে ব'ল্‌তে পার?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! একটী লোক এই অট্টালিকাটি ক'রেছেন, তিনি রাজকুমারীর পাণি-প্রার্থী।"

রাজা বলিলেন,—"আচ্ছা, তা'কে এখনই আমার সাম্‌নে হাজির কর; সে, দেখ্‌'ছি, ভারি অদ্ভুত লোক, আমি তা'কে দেখ্‌তে চাই।"

লোকটি যখন রাজার সুমুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, তখন রাজার মনটি একেবারে দমিয়া গেল, ভাবিলেন,—"লোকটার চেহারা তো 'দে'খ্‌'ছি' ভারি খারাপ; তবে কথা যখন দিয়েছি, তখন রাজকুমারীকে এরই হাতে দিতে হ'বে।"

এমন সময়ে রাজকুমারীও সেখানে আসিয়া হাজির। সব কথা শুনিয়া ও লোকটির কুৎসিত চেহারা দেখিয়া সে কহিল,—"বাবা, তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে? আমি এই কুৎসিত লোকটাকে কিছুতেই বিয়ে ক'র্‌তে পা'র্‌ব না।"

রাজা গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"সে কি কথা?

'ফুটে যদি কভু পদ্ম পর্ব্বত-উপরে,
উঠে যদি কভু সূর্য্য পশ্চিম-অম্বরে,
শুষ্ক যদি হয় সিন্ধু, বহ্নি শৈত্য লভে,
তথাপি না সাধু-বাক্য বিচলিত হ'বে!

আমার যে কথা, সেই কাজ। কি ক'রব, মা, তোমার অদৃষ্ট; তোমাকে এই কুৎসিত পুরুষকেই সুপুরুষ মনে ক'রে বিয়ে ক'র্‌তে হ'বে।"

কুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তঃপুরে রাজমহিষীর কাছে গেল। রাজা খুব ধূমধাম করিয়া সেই লোকটির সঙ্গেই রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন।

কুমারী মনের দুঃখে সেই লোকটির সঙ্গে ঘরকন্না করে। লোকটি এখন তাহার স্বামী, কিন্তু সে তাহাকে দু'চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। ভাবে,—"লোকটা কি ক'রে এই সোণার বাড়ীটা ক'রেছে, তা' আমাকে, যেমন ক'রে হ'ক, জা'ন্‌তেই হ'বে।" রোজ 'তাকে তাকে' থাকে, কিছুই জানিতে পারে না।

লোকটাকে কত ফুস্‌লায়, কিন্তু, "ভবী ভুলিবার নয়," সে কিছুই সন্ধান-সুলুক বলে না।

একরাতে কুমারী লোকটির পাশে শুইয়া আছে, ঘুমায় নাই। লোকটি ঘুমাইতেছে, এমন সময়ে সে শুনিল, লোকটি ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে—

"পরেশ পাথর, পরেশ পাথর, কোথা' আছ শুয়ে?
দাও হে সোণার অট্টালিকে,—উঠুক আকাশ ছুঁয়ে।"

শুনিয়া কুমারী ভাবিল,—"তবে এই মুখ-পোড়া মিন্‌সে কি একটা পাথরদিয়ে এই বাড়ীখানা ক'রেছে! আচ্ছা, আজথেকে আমায় দে'খতে হ'বে, সে পাথরখানা এ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।"

আবার আর একরাতে দু'জনে শুইয়া আছে। লোকটি ঘুমাইতেছে, তাহার কোমরের কাপড় একটু আল্‌গা হইয়া পড়িয়াছে; কুমারী ঘুমায় নাই, শুইয়া শুইয়া নিজের পোড়া-কপালের কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার লোকটির কোমরের দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল, তাহার ঘুন্‌সীতে একটা গেঁজিয়া আট্‌কান রহিয়াছে; তাহার মধ্যে কালোমত কি একটা জিনিস রহিয়াছে। লোকটি খুব নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল, কুমারী খুব সাবধানে তাহার কোমরথেকে গেঁজিয়াটা খুলিয়া লইল, সে টের পাইল না। গেঁজিয়া খুলিয়া কুমারী দেখিল, কালোমত জিনিসটা একটা পাথর। এই বুঝি বা সেই পরেশ পাথর! পাথরটি লইয়া কুমারী পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরহইতে বাহির হইয়া গেল। ছাদে উঠিয়া সে বলিয়া

"পরেশ পাথর, পরেশ পাথর, নিয়ে চল সাতসমুদ্দুরপার;
আর সেথা মোরে রেখে এস তৈরি ক'রে বড়বাড়ী এম্নি চমৎকার!"

যাই ঐ কথা বলা, আর অমনি কে রাজকুমারীকে উড়াইয়া একেবারে সাতসমুদ্রপারে একটা সোণার অট্টালিকার ছাদে নামাইয়া দিল। রাজকুমারী ভারি খুসী! "আঃ বাঁ'চলুম—মড়িপোড়া মিন্‌সেটার হাত-এড়ান গেল! সে এখানে এসে আর আমায় জ্বালাতন ক'রতে পা'রবে না।" কুমারী আহ্লাদে আট্‌খানা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীর সমস্ত ঘরগুলি দেখিতে লাগিল!

তাহার পর সে মনের সুখে সেই বাড়ীতে একলা বসবাস করিতে থাকিল, তাহার যখন যা' দরকার হইত, পরেশ পাথরকে হুকুম করিলেই, সে আনিয়া দিত।

৩

এদিকে রাজা সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন, কোথায় বা সোণার অট্টালিকা, কোথায় বা রাজকুমারী, সেই লোকটী সুধু রাজবাড়ীর মাঠে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। রাজা একটা লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, তোমার এমন অবস্থা কেন? আমার মেয়ে কোথায়? তোমার সে সোণার বাড়ীখানিই বা কি হ'ল?"

লোকটির তো ভ্যাবাচ্যাগা লাগিয়া গিয়াছে, সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিল। রাজা তাহাতে রাগিয়া গিয়া চোক পাকাইয়া তাহাকে বলিলেন,—"দেখ, তুমি যদি একমাসের মধ্যে আমার মেয়েকে আমার সাম্‌নে না হাজির কর, আর আবার সোণার অট্টালিকা তৈরি ক'রে তা'কে না রাখ, তবে তোমার গর্দ্দান নোব।"

লোকটি কি করে? তাহাই করিবে বলিল। কিন্তু সে যতই ভাবে, কোনই কূল-কিনারা পায় না। তবে সে বুঝিতে পারিল যে, এ তাহার স্ত্রীরই কাজ। শেষে সে তাহার প্রিয় জানোয়ার-দুইটীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, যদি দরকার হয়, বিড়াল আর কুকুর সাতসমুদ্রপারপর্য্যন্ত গিয়া রাজকুমারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার নিকটহইতে পরেশপাথরটি চুরী করিয়া আনিবে। বিড়াল-কুকুর দু'জনেই বলিল,—"মুনিব-মশাই, আপ্‌নি কিছু ভা'ব্‌বেন না; এই আমরা চল্‌লুম, একমাস না যেতে যেতে আপনার পরেশ পাথর এনে হাজির ক'র্‌ব।" এই বলিয়া তাহারা তাহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

৪

ডাঙায় বিড়াল ও কুকুর দু'জনেই বেশ চলিল। জলপথে পঁহুছিয়া বিড়াল বলিল,—"কুকুর-ভাই, আমি তো ভাল সাঁতার জানি নে, এ সাতসমুদ্দুর পার হই কেমন ক'রে?"

কুকুর বলিল,—"আরে, তা'র ভাব্‌না কি? তুমি আমার পিঠে চড়, আমি সাঁত্‌রে সাতসমুদ্দুর পার হ'য়ে যা'ব।"

বিড়াল তা'ই করিল। সাতসমুদ্রপারে পঁহুছিয়া দেখে যে, মস্ত একটা সোণার বাড়ী। লোকপরম্পরায় শুনিল যে, সেই বাড়ীতেই কে এক বিদেশিনী রাজকুমারী থাকে। কুকুরে বিড়ালে চোক-টিপাটিপি করিয়া সেই অট্টালিকার কাছে গেল। গিয়া দেখে, বাড়ীর ফটক ভিতরহইতে বন্ধ। বাড়ীখানা খুব উঁচু প্রাচীর-ঘেরা। কুকুর বলিল,—"বিড়াল-ভাই, এইবার তো মুস্কিল হ'ল। এত উঁচু পাঁচীল তো আমি ডিঙোতে পা'রবো না—কি করি?"

বিড়াল বলিল,—"তা'র জন্যে ভা'ব্‌ছ কেন? তুমি নাই বা বাড়ীর মধ্যে গেলে, আমি একলাই পাথরখানা চুরী ক'রে আ'ন্‌ছি।"

বিড়াল সহজেই প্রাচীর টপ্‌কাইয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া রাজকুমারী যে ঘরে ঘুমাইয়াছিল, সেই ঘরে গেল। দেখিল, রাজকুমারী একখানি মুক্তার ঝালরলাগান, হাওয়াই, রেশমী কাপড়ের মশারি খাটাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার কাছেই দেওয়ালে পরেশ পাথরটা ঝুলান রহিয়াছে। বিড়াল নিঃশব্দে লাফাইয়া উঠিয়া পরেশ পাথরটি কামড়াইয়া ধরিল, তাহার পর তাহা মুখে করিয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরহইতে বাহির হইয়া গেল, কুমারী কিছুই টের পাইল না। পরে সে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া কুকুরের কাছে আসিল।

স্থলপথে দু'জনে বেশ চলিল। জলপথে কুকুর আবার বিড়ালকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিতে লাগিল। এই সময়ে পরেশ পাথরটি কে মুখে করিয়া লইয়া যাইবে, এই লইয়া ঝগড়া বাধিয়া গেল। কুকুর বলে,—"আমি নিয়ে যা'ব।" বিড়াল বলে,—"আমি নিয়ে যা'ব।" শেষে কুকুরই সেটা মুখে করিয়া লইয়া চলিল। চারিটা সমুদ্র সাঁতারিয়া পার হইয়া কুকুর হাঁফাইয়া পড়িল। তখন সে মুখ হাঁ করিয়া যেই দম্ লইতে গেল, অমনি পরেশ পাথরটা সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। তখন কুকুর ঘেও আর বিড়ালে ম্যাও করিয়া উঠিল। বিড়াল তখন কুকুরকে খুব বকিতে লাগিল। কিন্তু বকাবকি করিয়া কি হইবে? শেষে দুই জনে ডাঙ্গায় উঠিয়া সমুদ্রের রাণীকে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—

"সিন্ধুরাণী, সিন্ধুরাণী, করি এ মিনতি,
সমুদ্র শুকিয়ে তুমি দাও গো সম্প্রতি।
পরেশ পাথর মোরা খুঁজে' ক'রে বা'র,
মুনিবের হাতে দিয়ে রাখি প্রাণ তাঁর।"

সিন্ধুরাণী দয়া করিয়া সমুদ্রের জল একেবারে শুকাইয়া দিলেন, তলার বালিতে রোদ ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। তখন বিড়াল আর কুকুর খুঁজিয়া খুঁজিয়া অতিকষ্টে পরেশ পাথরটি পাইল। এইবার বিড়াল তাহা মুখে করিয়া লইয়া চলিল। শেষে তাহারা দেশে পঁহুছিল। তখন একমাস পূর্ণ হইতে একটি দিনমাত্র বাকী; এই একমাসে লোকটি পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। বিড়াল গিয়া তাহার পায়ের কাছে পরেশ পাথরটি রাখিল। দেখিয়া লোকটি আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। তখনই সে পরেশপাথরকে বলিল,—

"পরেশপাথর, পরেশপাথর, কোথা আছ শুয়ে?
দাও হে সোণার অট্টালিকে,—উঠুক আকাশ ছুঁয়ে।"

তখনই সোণার অট্টালিকা হইল। তখন সে আবার পরেশ-পাথরকে বলিল,—

"পরেশপাথর, পরেশপাথর, বউকে আন ধ'রে,
সাতসমুদ্দুর পারথেকে গো চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে।"

পরেশপাথর তৎক্ষণাৎ কুমারীকে হাজির করিল। সে তাহার স্বামীর কাছে মাফ চাহিল, বলিল,—"আর কখন এমন কাজ ক'র্‌ব না।"

কথায় আছে—

"ভোরের মেঘের ডাকে, ছাগলের লড়াইয়ে,
স্বামীস্ত্রীর ঝগড়ায় 'তাত' শুধু বড়াইয়ে।"

ঝগড়াঝাঁটি থামিয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী এইবার মনের মিলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল

"আমার কথাটি ফুরালো,
নটে-গাছটি মুড়ালো।"

ইত্যাদি

-:*:

টাকা

সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই অর্থোপার্জ্জনের জন্য আজিকালি একটা উন্মাদিনী উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে অধুনা যেমন লোকে অর্থকেই পরমার্থ মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন আর কোন দেশে, কতকগুলি অর্থগৃধ্নু ও ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত, কেহ কখন মনে করে নাই, এখন করিতেছে না, পরেও কখনও, বোধ করি, করিবে না। আমাদের একটী জাতীয় দুর্ব্বলতা এই যে, আমরা যখন যে বিষয়ে মনঃসংযোগ করি, তখন সেই বিষয়টি লইয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া থাকি। ফলে যেখানে অমৃত উঠিবার কথা, সেখানে অতিমন্থনহেতু হলাহলই উঠিয়া থাকে। ছেলেকে লেখাপড়া শিখাও, কেন? সে ডেপুটী হইবে, মুন্সেফ হইবে; উকিল হইবে, ব্যারিষ্টার হইবে; ডাক্তার হইবে, মোক্তার হইবে; শিক্ষক হইবে, অধ্যাপক হইবে; হইয়া টাকা-রোজগার করিবে। মেয়ের চেয়ে ছেলে ভাল; কেন? মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ হয়, ছেলের বিয়েতে টাকা পাওয়া যায়। ভাল খাইও না, ভাল পরিও না; ছেলে-মেয়েদের যত্ন করিয়া লেখা-পড়া শিখাইও না; দীন-দুঃখীদের মুখ চাহিও না; আত্মোন্নতির জন্য সাহিত্য, ললিত-কলা, সঙ্গীত-বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির চর্চ্চা করিও না; টাকা জমাও; টাকা জমাইয়া সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখিলে বার্ষিক শতকরা সাড়েতিনটাকা হারে সুদ পাওয়া যাইবে। না হয় অনেক যৌথ কারবারের অংশ কিনিলে, বন্ধকী কারবার করিলে, "চোটায়" খাটাইলে, হু হু করিয়া টাকা বাড়িয়া যাইবে। কিছু না পায়, 'রেস্' খেল,—'ডার্ব্বি রেসের' টিকিট্ কেন। অমুক 'সুইপ,' জলের খেলা, "কটন ফিগার" প্রভৃতিতে টাকা খাটাও, একটাকায় সাত-টাকা পাওয়া যাইবে। স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিও না, কাহারও মুখ চাহিও না, চক্ষুলজ্জার ধার ধারিও না, হৃদয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিও না, টাকা-রোজগার কর। কেন? টাকায় সব হয়! কি হয়? কেন টাকা থাকিলে ভাল খাওয়া যায়, ভাল পরা যায়, বাড়ী-গাড়ী করা যায়, রাজা-রায়-বাহাদুর হওয়া যায়, সকলে বড়-লোক বলিয়া খাতির করে, দেশ-বিদেশে বেড়ান যায়, নানা আমোদ-প্রমোদ করা যায় ইত্যাদি, ইত্যাদি, টাকা থাকিলে—কি না হয়?

উক্ত উক্তিগুলির মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, একবার বুঝিয়া দেখা যাউক। কৃপণের বিস্তর টাকা থাকে, তবে সে ভাল খাইতে, ভাল পরিতে পায় না কেন? যাহার সুর-বোধ নাই, সে ধনী হইলেও কোন বিখ্যাত গায়কের গীতালাপ শুনিয়া আনন্দোপভোগ

করিতে পারে না কেন? যে ধনী চিত্রবিদ্যার কোনই ধার ধারে না, সে পাঁচজনের দেখাদেখি নিজ বিলাস-কক্ষ সুচিত্রে সজ্জিত করিতে পারে বটে, কিন্তু সে সেই ললিত-কলার রসোপলব্ধি করিতে পারে কি? অর্থ যুবককে বৃদ্ধ করিতে পারে, বৃদ্ধকে যুবক করিতে পারে কি? সুন্দরকে কুৎসিত করিতে পারে, কুৎসিতকে সুন্দর করিতে পারে কি? আজন্ম অন্ধকে অর্থ চক্ষু

দিবে কি? চিরবোধহীনকে অর্থ বোধ দিবে কি? হতভাগ্য উন্মাদকে অর্থ চেতনা দিতে পারে কি? এই সকল প্রশ্নেরই উত্তরে আমাদিগকে "না" বলিতে হয়। তাহা হইলে দাঁড়াই-তেছে এই, অর্থ থাকিলেই হয় না, সোজা কথায় আমরা যাহাকে "মুরোদ" বলি, প্রথমে সেইটিই থাকা দরকার। টাকা বড় নয়, মানুষের শক্তিই বড়। টাকা মানুষকে বড় করিতে পারে না, মানুষই সোণা, রূপা, তামা, নিকেল, কড়ি, কাগজ প্রভৃতিকে মুদ্রা-নাম দিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ যদি ঐ ধাতুপ্রভৃতির আদর না করিত, তাহা হইলে ওগুলিদিয়া একটী তণ্ডুল-কণাও ক্রয় করা যাইত না। তবে যাহাকে আমরাই বড় করিয়াছি, আমরাই আবার তাহার দাসত্ব করি কেন—তাহার শ্রীচরণে আত্ম-সম্মান বলি দিই কেন—দয়াধর্ম্ম-বিসর্জ্জন দিই কেন—দুর্লভ মানব-জীবন ধূলি-ধূসরিত করি কেন? টাকা যখন মানুষের মত মানুষের হাতে পড়ে, তখনই উহা সুখসম্পদ্, শোভা-সৌন্দর্য্য, জ্ঞান-ধর্ম্ম, আরাম-আনন্দের উপাদান হইয়া উঠে। সুতরাং টাকার সহিত আমাদের এইরূপ একটী সম্বন্ধ হওয়া উচিত যে, সে দাসীর ন্যায় আমাদের সেবা করিবে, আমরা তাহাকে অঙ্গুলী-হেলনে আমাদের মার্জ্জিত মন ও উন্নত-হৃদয়ের শিক্ষাদীক্ষানুযায়ী উপার্জ্জন করিব, ব্যয় করিব ও রাখিব। সে যে স্বয়ং কিছু নয়, আমরাই যে তাহাকে বড় করিয়াছি, একথা আমরা কখন ভুলিব না, এবং

যাহার মূল্য আমরাই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার বিনিময়ে আমাদের অমূল্য আত্মাকে কখনই বিক্রয় করিব না।

আমাদের সুবিধার জন্যই আমরা মুদ্রার প্রচলন করিয়াছি। অতএব উহাকে কিছুতেই আমাদের অসুবিধার,—আমাদের দুঃখের—উদ্বেগের—অস্বাস্থ্যের—হীনতার হেতু হইতে দিব না।

আমাদের কল্পনা যাহার মূল্য-নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহার জন্য পিতা সন্তানকে ঘৃণা করে, সন্তান পিতাকে ঘৃণা করে; বনিতা স্বামীকে অবহেলা করে; আত্মীয় আত্মীয়কে অনাদর করে; বন্ধু বন্ধুকে উপেক্ষা করে; মানুষ মানুষকে হতশ্রদ্ধা করে—এ কি গভীর পরিতাপের কথা! তুমি লক্ষপতি, কিন্তু তোমার ঐ লক্ষমুদ্রার শতগুণ মুদ্রার জন্যও যদি তোমার কিঙ্করগণ কার্য্য করিতে না চাহে, কৃষক তোমায় খাদ্য দ্রব্য না দেয়, সূত্রধর তোমার আসবাব-তৈয়ার না করে, রজক তোমার বসন ধুইয়া না দেয়, ক্ষৌরকার তোমার ক্ষৌরকার্য্য না করে, তাহা হইলে তোমার ঐ লক্ষ-মুদ্রা, তোমার কি কার্য্যে লাগিবে? ইহার জন্য ভাই ভাইএর বুকে ছুরী বসায়, নারী নারীধর্ম্ম-বিসর্জ্জন দেয়, সত্যসন্ধ মনুষ্য সত্যের অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরেরই মস্তকে পদাঘাত করে—এ সকল কি হেয় কার্য্য!

"বালকের" পাঠকপাঠিকাগণ! তোমরা এমন করিয়া আত্মাবমাননা করিও না। লেখা-পড়া শিখিতেছ—ভালই করিতেছ; কিন্তু তোমাদের এই বিদ্যাচর্চ্চার লক্ষ্য শুধু অর্থোপার্জ্জন যেন না হয়। ঈশ্বরের অভিপ্রেত এই, মনুষ্যমাত্রেই যেন মনুষ্যত্ব-অর্জ্জন করে। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতিরোধ করিয়া মনুষ্যের কোন কল্যাণ হয় না। তোমরা টাকা-রোজগার করিও; কিন্তু দেখিও, টাকা যেন তোমাদের রোজগার করিয়া অর্থাৎ গোলাম করিয়া নাকে দড়ি দিয়া না খাটায়। পৃথিবীতে টাকার দরকার আছে; স্বর্গে নাই। মানুষ পৃথিবীর লোক নহে, স্বর্গের লোক। পৃথিবীতে সে পথিক, দু'দিন আছে; শীতকালে লোকে লেপমুড়ি দেয়; গ্রীষ্মকালে উহার কোনই প্রয়োজন হয় না। যতদিন পৃথিবীতে আছি, টাকাটা—ঐ "হাতের ময়লাটা" লইয়া আমাদের নাড়াচাড়া করিতেই হইবে, তবে আমরা তাহার জন্য প্রাণ দিব না, প্রাণ নিব না। অমরধামের যাত্রী আমরা, তুষারবর্ম্মে লৌহদণ্ডের প্রয়োজন হইতেছে, যাই তুষারাঞ্চলটুকু অতিক্রম করিব, অমনই ঐ বোঝা ফেলিয়া যাইব, উহার জন্য মায়া কি, মমতাই বা কেন?

পেশী-প্রবর্দ্ধন।

[কলিকাতায় ওয়াই, এম, সিএর কলেজ-বিভাগের বালক-শাখার স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ডাক্তার জে, আর, গ্রে, এম-ডি মহোদয়কর্ত্তৃক লিখিত।]

বালকেরা সর্ব্বত্রই সমান। আমাকে যে বিষয়ে তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয়, সে বিষয়ে আমি দেখিয়াছি, তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রায় এক। বাল্যকালে আমি বীর-পূজক ছিলাম, অর্থাৎ কোন একটী লোক বা আমার অপেক্ষা বয়সে বড় বালককে আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা এবং সকল বিষয়ে তাঁহার অনুরূপ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম; কারণ তখন আমার এই ধারণা ছিল যে, আমার তাঁহারই মত হওয়া উচিত। তোমরা যদি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত নিজ নিজ হৃদয়-পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে, আমি যেমন বাল্যে করিতাম, তোমরাও তেমনই কোন-না-কোন ব্যক্তি বা বয়োবৃদ্ধ বালককে তোমাদের নেতা করিয়া তুলিয়াছ, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। যাঁহার পন্থানুসরণ করা অন্যায় ও অসম্ভব নহে, তাঁহাকে অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইলে, দোষ হয় না। এইজন্য প্রত্যেক বালকেরই উপযুক্ত লোককেই স্ব স্ব নেতা-নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া উচিত। কাহাকেও নেতারূপে মনোনীত করিবার পূর্ব্বে পিতা, অভিভাবক বা শিক্ষকের পরামর্শ-গ্রহণ করিলে, ভাল হয়। কারণ তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অল্প, ভুল-ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা বড় বেশী। নিজ বিবেচনানুযায়ী কিছুদিন কাহারও পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া যদি বুঝ যে, বড় ভুল করিয়াছ, তখন হয়ত দেখিবে ক্ষতিটা বড়ই বেশী হইয়াছে, প্রতীকারের কোনই উপায় নাই, ফলে তখন পরিতাপের পরিসীমা থাকিবে না।
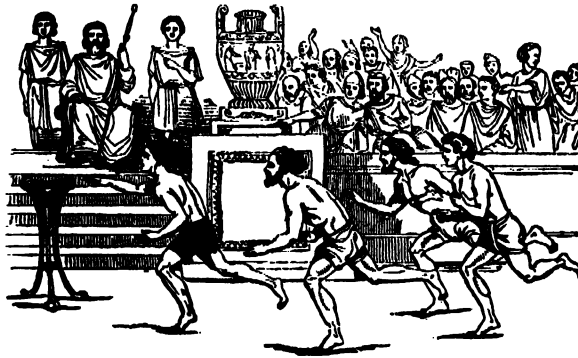
পেশী-প্রবর্দ্ধনসম্বন্ধে এই কথাটি খুবই সত্য; সুতরাং পেশী ও উহার প্রবর্দ্ধন-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিব, আশা করি, তোমরা সেগুলি মনে রাখিবার চেষ্টা করিবে।

আমার যতদূর জানা আছে, অধিকাংশ বালকই তাহাদের জীবনের কোন এক সময়ে পেশী-প্রবর্দ্ধন করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং অনেকে তাহাতে অক্ষম হইলে, বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। তাহারা পথে যাইতে যাইতে যে দোকানে "স্পোর্টিং" দ্রব্যগুলি বিক্রীত হয়, সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হয়ত কোন স্থূল মাংসপেশীযুক্ত কোন পুরুষের ছবি দেখিতে দেখিতে

ভাবে, আহা আমারও পেশীগুলি এইরকম প্রবর্দ্ধিত হইলে বেশ হয়। কিম্বা তাহারা ব্যায়ামসম্বন্ধে যদি কোন পুস্তিকা পায়, তবে তাহা অতীব আগ্রহের সহিত পাঠপূর্ব্বক সহসা সংকল্প করিয়া বসে যে, তাহারা সেই পুস্তিকার উপদিষ্ট পন্থানুসারে ব্যায়ামপূর্ব্বক তাহাদের পেশীগুলিকে প্রবর্দ্ধিত করিবে। অথবা হয়ত তাহারা কাহারও মুখে শুনে যে, যদি তাহারা আড়াই-সেরী ডাম্‌বেল্‌ ভাঁজে বা অমুকপ্রকারের "ডেভেলপার" লইয়া ব্যায়াম করে, তাহা হইলে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

"বালকের" পাঠকগণকে আমার এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করিবার বাসনা নাই। তোমরা যেমন চাও, আমিও তেমনি চাই যে, তোমরা যেন শারীরিক বলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হও, এবং সেইজন্যই এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে কয়েকটি পরামর্শ দিতে চাই। প্রথমতঃ তোমরা মনে রাখিও যে, তোমাদের কাহারও সহিত কাহারও শরীরের গঠন ও স্বাস্থ্যের ঠিক সমতা নাই। হয়ত তুমি হাজার মেহনৎ করিলেও, তোমার বন্ধুটির মত পেশী-প্রবর্দ্ধন করিতে পারিবে না, এ দিকে সে কিন্তু হয়ত অল্পদিনের মধ্যেই স্যাণ্ডোর ন্যায় স্থূলপেশী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য তোমার দুঃখিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই; তখন কেহ যদি তোমায় বলে যে, তুমি অমুক লোকের মতে ব্যায়াম করিও না, অমুক লোকের মতে কর, তাহার কথায় কাণ দিও না, কারণ, এমন হইতে পারে যে, তোমার পক্ষে ঐসকল উপায়ের একটীও ফলপ্রদ হইবে না। তাহাছাড়া দ্বিতীয়তঃ তুমি স্মরণ রাখিও যে, কাহারও সাধারণ স্বাস্থ্য স্থূল মাংস-পেশী-লাভের উপরেই যে নির্ভর করে, তাহা নহে; উহার একটীর সহিত আর একটীর কোন একটী অনুপাত নির্দ্দিষ্ট নাই। অপুষ্ট পেশী লইয়াও তুমি সুস্থ থাকিতে পার, কিন্তু পেশী প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুমি হয়ত দেখিবে, তাহাতে তোমার শরীরের বিশেষ অনিষ্টই হইয়াছে; তুমি না পার সেগুলির পোষণ করিতে, না পার সে-গুলিকে খেলাইতে, সেগুলি আছে বলিয়া তুমি বরং সুস্পষ্টরূপে অসুস্থই হইয়া পড়িয়াছ। আমি একটী যুবকের কথা জানি, স্যাণ্ডো যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন সে স্যাণ্ডোর শিষ্য হইয়া কয়েকমাসের মধ্যেই অতি বিপর্য্যয় পেশী-প্রবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়। সে স্যাণ্ডোর অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্রতর ছিল; তদ্ভিন্ন তাহাকে ঐ ফললাভজন্য প্রত্যহ ৭।৮ ঘণ্টা কঠোর ব্যায়ামে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। স্যাণ্ডো যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, ঐ যুবকটিকে তিনি তাঁহার ব্যায়াম-পদ্ধতির নিদর্শন-স্বরূপে প্রদর্শন করিতেন। ঐ বিপর্য্যয় ব্যায়ামের নিমিত্ত যুবকটিকে তাহার হৃদয়ও বড় স্ফীত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? তাহার সেই সাময়িক স্বাস্থ্যোন্নতি সকলেরই বড় চমৎকার ঠেকিতে লাগিল। স্যাণ্ডো চলিয়া গেলে, যুবকটি নিরুপায় হইয়া পড়িল; তখন কিন্তু তাহার সেই স্থূল মাংসপেশীগুলি তাহার ভারস্বরূপই হইয়া উঠিল। আমার সঙ্গে যখন তাহার দেখা হয়, তখন তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে; সে স্বয়ংই আমার কাছে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার শরীরস্থ মাংসপেশীগুলির অতিরিক্ত প্রবর্দ্ধনের ফলেই তাহার ঐ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

তাহার পর, তৃতীয়তঃ, তোমরা মনে রাখিও যে, কৌশলের সহিত অপুষ্ট মাংস-পেশীর কোনই সম্পর্ক নাই। এ কথা সত্য যে, কৌশল-প্রদর্শন করিতে হইলে, মাংসপেশীগুলিকে কিছু প্রবর্দ্ধিত করিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলেও স্থূল মাংসপেশীযুক্ত ব্যক্তি না ক্ষিপ্র, না নির্ভুল, সে বরং "পেশীবদ্ধ"। যাহার পেশীর বৃহদাকার ও কাঠিন্যপ্রযুক্ত তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে ব্যাঘাত জন্মে, তাহাকে পেশীবদ্ধ বলে। তাহাছাড়া স্থূল পেশীগুলি প্রায়ই গাঁঠ পাকাইয়া যায়।

আমি একটী গবর্ণমেণ্ট-স্কুলের একজন কুচ্‌কাওয়াজ-শিক্ষকের কথা জানি, তিনি পেশীবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন, এখন আর তেমন নাই।

চতুর্থতঃ, তোমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে, পেশী পুষ্ট হইলেই, গায়ে জোর হয় না। পেশী প্রবর্দ্ধিত করিলে, গায়ে জোর হয় না, হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌ বিকশিত করিলেই, গায়ের জোর বাড়ে। কোন কোন লোকের শক্তি-পরীক্ষা করিবার সময়ে কখন কখন দেখা যায় যে, যদি তাহারা প্রবর্দ্ধিত পেশীযুক্ত লোক হয়, তবে তাহাদের পেশীগুলির যথা-প্রয়োগ-জন্য হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌হইতেও অন্তর্বলের কিয়দংশ-প্রয়োগ করিতে হইতেছে। উহা অন্তর্বলের অপব্যয়-ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ ঐ অন্তর্বল মহত্তর কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারিত। সুতরাং পেশীসহ হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌ পরিণত না হইলে, শরীরের শক্তিপরীক্ষাকালে স্থূল-পেশীসমূহ সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্নই জন্মাইয়া থাকে।

অতএব উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যাহাতে আমাদের শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হয়, তৎপ্রতিই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত; তাহা হইলে আমরা কেবল সুস্থই থাকিব না, সবল ও কুশলীও হইয়া সমাজের হিতসাধনে সমর্থ হইব।

"বালকের" কোন ভবিষ্যসংখ্যায় পেশীসম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিবার বাসনা রহিল।

-:০:-

তিনখানি চিঠী।

মার্চ্চ-মাসের পদ্যরচনার প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে আমরা নিম্নোদ্ধৃত চিঠী-তিনখানি পাইয়াছি। দ্বিতীয় পত্রের লেখকের হাতের লেখা আর বিগত জুনমাসে প্রকাশিত "অতি লোভের ফল"-শীর্ষক কবিতার লেখকের হাতের লেখা এক; সুতরাং দ্বিতীয় পত্রের লেখক যে সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তৃতীয় পত্রের লেখক গদ্যেই দুইছত্র শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না, সুতরাং সে যে উক্ত কবিতার রচয়িতা নহে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

"বালক"-সম্পাদক।

মহাশয়, জুন-মাসের "বালক"-পাঠে মার্চ-মাসের পদ্যরচনার ফল অবগত হইলাম। উক্ত পদ্যসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ঐরূপ একটী পদ্য বহুদিন পূর্ব্বে "মুকুল"-নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং আরও একখানি পুস্তকেও ঐরূপ হইয়াছিল। যিনি "বালকে" উক্ত পদ্য প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মোট কথা ভাব ও লিখন-ভঙ্গি তিনি নকল করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস উক্ত কারণ-বশতঃই তিনি স্বীয় নাম-প্রকাশ করেন নাই। আমার বিশ্বাস, আপনাদের "পদ্য-রচনার প্রতিযোগিতা"-প্রকাশের উদ্দেশ্য বালকেরা যেন পদ্য লিখিতে চেষ্টা করে, এবং ভবিষ্যতে যাহারা কবি হইতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন উৎসাহপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা আপনাদের উদ্দেশ্য নহে যে, বালকেরা পুরস্কারের লোভে এবং স্বীয় কৃতিত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত অন্যের পদ্য নকল করিয়া স্বীয় নীচতা-প্রকাশ করেন। আশা করি আপনারা এই বিষয়ে কিছু বিবেচনা করিবেন। ইতি বশংবদ—

কৃষ্ণনগর। জনৈক পাঠক।

২

মহাশয়, আমি একখানি পোষ্টকার্ডে "অতিলোভের ফল"-নামক মার্চ্চ-মাসের পদ্য-রচনার প্রতিযোগিতার ফল-স্বরূপ দিয়াছিলাম কিন্তু উহা আমার স্বরচিত নহে। সেইজন্য নাম ও বয়স দেই নাই এবং দিব না।

মহাশয়, এইবারকার পদ্যটি আমি লিখিয়াছিলাম ঐটি দেখিবার পর পদ্য বানাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং শেষে কৃতকার্য্য হইয়া গেলাম, ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়ায় নিজ ঠিকানা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এবং নিকটই ডাকে দিবার পর মনে হইল, এই ভুল হওয়াতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম।

শ্রী

মালোপাড়া, রাজসাহী।

জুন-মাসের পদ্যরচনার প্রতিযোগিতার ফল।

এইবারও দুইজন বালক পদ্যরচনার প্রতিযোগিতায় সমান হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহাদের কবিতা-দুইটি মুদ্রিত করিলাম। ইতি—"বালক"-সম্পাদক।

১। খোকাবাবুর জেব্রা।

হক্-সাহেবের বাজারে গিয়ে খোকাবাবুর তরে
দাদা-ম'শায় আ'ন্‌লেন এক জেব্রা-ক্রয় ক'রে।
সেটা কিন্তু দে'খ্‌তে ঠিক জেব্রার মত নয়;
হাঁ-করা মুখ, উচ্চ কান, দে'খ্‌লে রাগ হয়।
খোকাবাবু চাবুক হাতে জেব্রাসঙ্গে করি'
গম্ভীরভাবে চ'ড়্‌বার তরে এলেন তাড়াতাড়ি।
"হাঁ-করা মুখ" দেখে খোকার বড্ড হ'ল রাগ
চাবুক মেরে' বলে,—"শূয়ার, মুখ বুজিয়ে থাক্"
যত চাবুক মারে খোকা, মুখ নাহি বোজে,
তখন খোকা দাদার ছোরা নিয়ে এল খুঁজে'
ছোরা নিয়ে জেব্রার গলা কেটে ফেলে দিল,
মাথা যায় গড়াগড়ি, তবু মুখ না বুজিল।
"যে স্বভাব হাড়ে-মাসে জড়াইয়া রয়,
তাহারে টানিয়া ফেলা সোজা কাজ নয়।"

ফিনিকবাজার থানা, কলিকাতা। শ্রীসত্যসাধন মুখোপাধ্যায় (বয়স ১২ বৎসর।)

পৃষ্ঠপ্রদর্শন-চেষ্টা

আফ্রিকাতে কাফ্রিসাথে জেব্রা মাতে দৌড়ে;
ঘোড়ার মতন গড়ন যেমন, তেমনি লম্ফে চৌড়ে।
অঙ্গে ডোরা, নইলে ঘোড়া কইবে ভেবে চিন্তে,
দৌড়-ধাপে কারুর বাপে পা'র্‌বে না তা'য় জিন্‌তে!
স্বাধীন বড়; যদিও ধর, পোষ মানে না শেষ্‌টায়;
তা'রি এ ছানা গাড়িতে টানা হ'য়েছে নানা চেষ্টায়
গলায়, মাথায় লাগাম গাঁথায়, কর্ণে টুপি তুর্কি
দিতেই ওগো কর্‌ছে গোঁ গোঁ, ষাঁড়ের মত সুর কি!
তোমরা ভাবুক, কও ত চাবুক কেমন করে খায় সে—
ধড়টি থু'য়ে ঘাড়টি ল'য়ে জঙ্গলেতে যায় সে?

শ্রীপরিমল গোস্বামী,
(বয়স ১৪ বৎসর); পোতাজিয়া (পাবনা)।

নূতন প্রতিযোগিতা

বর্ত্তমানবর্ষের "বালকে" প্রকাশিত স্বর্ণসূত্র-নামক রূপক আখ্যানের মর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়া "বালকের" অর্দ্ধপৃষ্ঠা-পরিমিত একটী নিবন্ধ-রচনা করিতে হইবে। যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে একখানি ইংরাজী পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইবে।

(১) কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

(২) রচনাটি ৩১শে আগষ্টের মধ্যে

"বালক"-সম্পাদক,
২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা
—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

(৩) প্রবন্ধ-শেষে লেখকের নাম, ধাম ও বয়স স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে।

"হা, হা, হা! কি মজা,
আমি প্রাইজ পেয়েছি!"

বালক

২য় বর্ষ।] সেপ্টেম্বর, ১৯১৩। [৯ম সংখ্যা।

মার্জ্জনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সমস্ত অনুগত পদস্থ প্রজা জয়ন্তের অভিষেকের সময় তাহার কাছে আনুগত্য-স্বীকার করিতে আসিয়াছিলেন, জয়ন্ত তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারই প্রায় সমবয়স্ক একজন বালককে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিল। জয়ন্তের তখনই তাহার সহিত সবিশেষ পরিচিত হইবার বাসনা জন্মিয়াছিল, তাই সে নক্র-বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সেই বালক-যোদ্ধাটির নাম কি, আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সে কে, তাতঃ! কোথাকার অধিপতি ?"

নক্র-বিক্রম। ও, তুমি উষাপুরাধিপতি বালক মহাকার্ম্মুকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, বোধ হয়? উহার পিতা মৃত মহারাজের সহিত এক যুদ্ধে গিয়া রণক্ষেত্রে তনুত্যাগ করেন। সেই বৎসরেই তোমার জন্ম হয়, তখন ঐ বালক মাত্র দুইবৎসরের ছিল; অগত্যা অতি অল্প বয়সে উহাকে উষাপুরাধিপতি হইতে হইয়াছে।

জয়। সে কোথায় থাকে? আর কি আমার তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না? উষাপুর কোথায়?

নক্র। উষাপুর তরলা-নদীর তটে। সে তাহার বিধবা মাতার সহিত তথায় থাকে। বোধ হয়, এখনও দেশে ফিরিয়া যায় নাই। সে তাহার অভিভাবক বৃষকেতুর সহিত আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ এখনও এই নগরে বাসা করিয়া আছে। অরবিন্দ, দেখ ত নগরে তাহাকে কোথাও পাও কি না। যদি দেখা পাও, বলিও, 'মহারাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।'

জয়ন্ত জন্মাবধি কখন তাহার কোন সমবয়স্ক সঙ্গীর সহিত খেলা করে নাই। একারণ মহাকার্ম্মুকের সহিত কথোপকথন করিবার তাহার বড়ই বাসনা হইতে লাগিল। সে জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে দেখিল, অরবিন্দ ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সহিত এক বৃদ্ধ ও মহাকার্ম্মুকও আসিতেছে। দেখিয়া জয়ন্ত সানন্দে দুর্গদ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। মহাকার্ম্মুক তাহাকে দেখিয়া মস্তক নত করিয়া অতিমাত্র অবনত অঙ্গে অভিবাদন করিল। তাহার পর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জয়ন্তও তন্মুহূর্ত্তে কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। দুইজনে নির্ব্বোধের মত মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়ের আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য তখন বিলক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মহাকার্ম্মুকের মস্তকের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, জয়ন্তের কেশ ঈষৎ লোহিতাভ; উভয়ের চক্ষুও একপ্রকার নহে, জয়ন্তের দৃষ্টি চঞ্চল, মহাকার্ম্মুকের দৃষ্টি স্থির। জয়ন্ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মহাকার্ম্মুক দুর্ব্বলাঙ্গ; জয়ন্ত দীর্ঘকায়, মহাকার্ম্মুক খর্ব্বকায়।

কিছুক্ষণ উভয়ে মৌন থাকিয়া উভয়কে দেখিতে লাগিল। নক্র-বিক্রম বলিলেন,—"মহারাজ কি অভ্যাগতকে সাদর-সম্ভাষণ করিবেন না ?" কিন্তু তথাপি জয়ন্তের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

আর্য্যা গৌতমী কহিলেন,—"বালকেরা বড় লাজুক হইয়া থাকে।" তাহাতে দুই বালকেরই মুখমণ্ডল অরুণিম হইয়া উঠিল। গৌতমী মহাকার্ম্মুককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মা কেমন আছেন, বৎস ?" মহাকার্ম্মুকের মুখমণ্ডল তৎশ্রবণে আরও আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে গৌতমীকে প্রণাম করিয়া আন্তরিক-

ভাষায় বিড়বিড় করিয়া বলিল,—"আমি সৌর-ভাষা অবগত নহি।"

জয়ন্ত এতক্ষণে একটা কথা কহিবার অবসর পাইল, সে গৌতমী কি বলিতেছেন, তাহা সানন্দে মহাকার্ম্মুককে বুঝাইয়া দিল। তাহা শুনিয়া মহাকার্ম্মুক বিনীতভাবে উত্তর দিল, তাহার মাতৃ-ঠাকুরাণী ভাল আছেন। তাহার পর গৌতমীর প্রতি এমন একটী সম্ভ্রমসূচক অভিধা-প্রয়োগ করিল, যাহা গৌতমী সেই প্রথমবার শুনিলেন। অনন্তর সে আবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে গৌতমী কহিলেন,—"মহারাজ, ইহাকে অশ্বশালায় অশ্ব দেখাইতে লইয়া যান, সারমেয়দের দেখান, কিম্বা যাহা আপনার অভিরুচি হয়, গিয়া করুন, অতিথির মনোরঞ্জন করা উচিত।"

জয়ন্ত এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইল। মহাকার্ম্মুককে লইয়া বাহির হইয়া গেল। তখন উভয়েরই লাজুকতা দূর হইল। জয়ন্ত মহাকার্ম্মুককে তাহার টাট্টু-ঘোড়া দেখাইল। মহাকার্ম্মুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহারাজ, আপনি রেকাবে পা না দিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিতে পারেন ?"

না, জয়ন্ত তাহা পারে না। সে অরবিন্দকেও তাহা করিতে দেখে নাই। এইরূপ আসুরিক শৌর্য্যবীর্য্য সুরদিগের পরিজ্ঞাত নহে।

জয়ন্ত তাহাকে বলিল,—"তুমি পার ? করিয়া দেখাও দেখি !"

ম-কা। আমি আমার নিজের ঘোড়ার উপর ওরকম করিয়া চড়িতে পারি; কারণ আর্য্য বৃষকেতু অন্য কোনরকমে আমায় ঘোড়ায় চড়িতে দেন না। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি আপনারও ঘোড়ার উপরে সেরকম করিয়া চড়িবার চেষ্টা করিতে পারি।"

জয়ন্তের টাট্টুকে জিন পরাইয়া আস্তাবলের বাহিরে আনা হইল। মহাকার্ম্মুক তাহার ঘাড়ের চুল ধরিয়া টপ্ করিয়া জিনের উপর উঠিয়া বসিল। অরবিন্দ ও জয়ন্ত তাহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাহোবা—বাহা !"

মহাকার্ম্মুক অশ্বহইতে অবতরণপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিল,— "এ কাজ তেমন প্রশংসনীয় নয়; আর্য্য বৃষকেতু বলেন, এ তেমন কঠিন কাজ নয়, তিনি যখন যুবা ছিলেন, তখন তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এইভাবে অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন। আমারও তাহা করা উচিত।"

জয়ন্ত তখন তাহাকেও সেইপ্রকারে ঘোড়ায় চড়া শিখাইতে মহাকার্ম্মুককে অনুরোধ করিল। মহাকার্ম্মুক আবার সেইপ্রকারে ঘোড়ায় চড়িয়া জয়ন্তকে দেখাইল। তখন জয়ন্তও সেইভাবে ঘোড়ায় চড়িবার চেষ্টা করিতে গেল, কিন্তু অশ্ব আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। মহাকার্ম্মুক তাহাকে জানাইল যে, সে প্রথমে কাঠের ঘোড়ায় অভ্যাস করিয়াছিল। তাহার পর, দুই বালকে আরও নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তা ও আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিল। শেষে যখন তাহারা আহার করিতে আসিল, তখন দুইজনেরই বড় ভাব হইয়া গিয়াছে।

আহারের সময়ে জয়ন্তের বড় ইচ্ছা হইল যে, মহাকার্ম্মুক তাহার পাশে বসে; কিন্তু তাহা হইল না; তাহার একপাশে ভল্লুবীর্য্য বসিলেন, তবে আর এক পাশে গৌতমী রহিলেন।

আহার করিতে করিতে ভল্লুবীর্য্য বলিলেন,—"মহারাজ, মহাকার্ম্মুক আপনার ক্রীড়া-সঙ্গী হইলে, কেমন হয় ?"

জয়ন্ত সাগ্রহে বলিল,—"বেশ হয়, বেশ ভাল হয়, তবে ও কি আমার কাছে থাকিবে ?"

ভল্লু। এ দেশে সকলেই আপনার আজ্ঞাপালনে বাধ্য।

জয়ন্ত উল্লাসে দাঁড়াইয়া উঠিল, মহাকার্ম্মুকের কাছে গিয়া বলিল,—"তুমি কি আমার সঙ্গী হইবে, আমার ভাইএর মত আমার কাছে থাকিবে ?"

মহাকার্ম্মুক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জয়ন্ত বলিল,—"তুমি বল, থাকিব। আমি তোমাকে ঘোড়া দিব, শ্যেনপক্ষী দিব, নানাপ্রকার ক্রীড়নক দিব; তোমাকে খুব ভালবাসিব, অরবিন্দকে যেমন ভালবাসি, প্রায় তেমনই ভালবাসিব; থাক তুমি আমার কাছে—থাকিবে, অ্যাঁ ?"

মহাকার্ম্মুক বলিল,—"আমি আপনার আদেশপালনে বাধ্য, কিন্তু—"

ভল্লুবীর্য্য বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু কেন, অসুর-বালক, যাহা বলিতে চাও, প্রাণ খুলিয়া বল; যদি পার, আর্য্যোচিত আচরণ কর !"

এই কথা শুনিয়া মহাকার্ম্মুক সাহস পাইল, ভল্লুবীর্য্যের মুখপ্রতি চাহিয়া সুস্পষ্টভাবে বলিল,—"আমায় এখানে না থাকিতে হইলেই, ভাল হয়।"

"তোমার দেশনায়কের সেবা করিবে না ?"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে উঁহার সেবা করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমি এখানে থাকিতে চাই না। আমার মাতৃঠাকুরাণীর আমা-বই আর কেহ নাই, তাহাছাড়া আমি কেশরীদুর্গেই থাকিতে ভালবাসি।"

ভল্লুবীর্য্য প্রসন্নচিত্তে বলিয়া উঠিল,—"বা! বেশ সাহসী বালক তো, বেশ সত্যপরায়ণ।" তাহার পর তিনি মহাকার্ম্মুকের অভিভাবকের উদ্দেশে কহিলেন,—"ইহার জননীকে আপনি আমার নমস্কার জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি তাঁহার এই পুত্রকে মহারাজের সহিত প্রতিপালন করাইতে চান কি না। এ যখনই আসিবে, মহারাজ তখনই ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাকার্ম্মুক, তুমি আসিবে ত ?"

মহাকার্ম্মুক উত্তর দিল,—"মা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।" তাহার পর, সকলকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া সে বিদায়গ্রহণ করিল।

* * * * *

জয়ন্ত প্রতিদিন মহাকার্ম্মুকের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশা করে;

প্রতিদিনই দিবাশেষে সে নিরাশ মনে গৃহে প্রবেশ করে। অবশেষে একদিন সে দেখিল, দূরে একটী বালক ও একটী বৃদ্ধ রাজদুর্গাভিমুখে আসিতেছে। তাহারা সমীপবর্ত্তী হইলে, সে দেখিল,—মহাকার্ম্মুক ও বৃষকেতু।

সে ছুটিয়া গিয়া মহাকার্ম্মুককে আলিঙ্গন-দান করিতে করিতে কহিল,—"তোমার মা তোমাকে পাঠাইয়াছেন দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম।"

ম-কা। মা বলিলেন, তিনি আমার মত সৈনিকবৃত্ত বালককে নারী হইয়া প্রতিপালন করিতে পারিবেন না।

জয়ন্ত। এখানে আসিতে হইয়াছে বলিয়া, তুমি কি দুঃখিত হইয়াছ?

ম-কা। মার জন্য একটু মন কেমন করিতেছে;—আপনি যদি ছাড়িয়া দেন, আর্য্য বৃষকেতু বলিয়াছেন, তিনি তিনমাস-অন্তর আসিয়া আমাকে একবার করিয়া লইয়া যাইবেন।

যাহা হউক, মহাকার্ম্মুককে পাইয়া জয়ন্তের আনন্দের আর অবধি রহিল না। সে প্রতিদিন তাহাকে লইয়া কত ক্রীড়া করিত; কিন্তু জয়ন্ত সকল ক্রীড়াতেই প্রাথমিকতার দাবী করিত, কাজেই অনেক সময়ে বালক মহাকার্ম্মুক সেই সমস্ত ক্রীড়ায় সোৎসাহে যোগদান করিত না, ইহাতে জয়ন্ত বিরক্ত হইত। একদিন সে তাহার বিরক্তির কথা মহাকার্ম্মুককে জানাইল।

ম-কা। "ক্রীড়ায় আমরা যদি আমাদের পদ-মর্য্যাদার কথা স্মরণে রাখি, তাহা হইলে আমোদ হইবে না। আমি দেশে আমার প্রজাদের পুত্রদের সহিত খেলা করিবার সময় এ কথা মনে রাখিতাম না, খেলিয়া বেশ আমোদ পাইতাম।"

জয়ন্ত বলিল,—"তবে আমিও তাহাই করিব।"

তদবধি বালক-দ্বয় খেলিবার সময় রাজাপ্রজা-সম্বন্ধ ঠিক রাখিত না—খেলিয়া বেশ আমোদ পাইত। অন্য সময়ে কিন্তু মহাকার্ম্মুক জয়ন্তের প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম-প্রকাশ করিত। সে স্বভাবতঃ জয়ন্তের অপেক্ষা শিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন তাহার আর একটা গুণও জয়ন্তের অপেক্ষা ভাল ছিল—সে বেশ পাঠানুরাগী ছিল, কিন্তু জয়ন্ত কেবল বাদরায়ণের ভয়েই বশিষ্ঠের কাছে পড়িতে যাইত।

জয়ন্তের আরও একটী কাজ করিতে ভাল লাগিত না। স্থির হইয়া মন্ত্রণা-সভায় বসিয়া থাকিতে তাহার বড় বিরক্তি-বোধ হইত। অধিকন্তু যেদিনহইতে সে বুঝিল যে, তাহার মন্ত্রিগণ তাহার পিতৃঘাতীকে কোনপ্রকারে দণ্ড দিবে না, সে দিন-অবধি তাহার মন্ত্রণা সভায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে হাই উঠিত; সে নানাপ্রকারে চাঞ্চল্যপ্রকাশ করিতে থাকিত; সেই সময়ে সে ভল্লুবীর্য্যের ভয়ে সংযত হইত; কিন্তু ঐ কারণে সে ভল্লুবীর্য্যকে দেখিতে পারিত না, এবং সে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যেদিন আমি প্রাপ্ত-বয়স্ক হইব, সেই দিনই ভল্লুবীর্য্যকে রাজ-কার্য্যহইতে অবসর-গ্রহণ করাইব।

* * * * *

শীতকাল পড়িয়াছে; ভল্লুবীর্য্য কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। অরবিন্দ বালকদ্বয়কে লইয়া প্রত্যহ মৃগয়ায় গমন করিয়া থাকেন। অদ্যও গিয়াছিলেন। বৈকালে রাজদুর্গে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহারা অশ্বক্ষুরধ্বনি ও জন-কোলাহল শুনিতে পাইলেন। অরবিন্দ কহিলেন,—"ইহার অর্থ কি? বোধ হয়, আজ অনেকগুলি গোষ্ঠীপতি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

জয়ন্ত সকরুণ-স্বরে উত্তর দিল,—"এই সপ্তাহে ইতোমধ্যেই একটা মন্ত্রণা-সভা হইয়া গিয়াছে। আঃ কি যন্ত্রণা! আবার বুঝি আর একটী সভা হয়!"

অরবিন্দ। এইরূপ গোলোযোগের অবশ্যই কোন একটী অসামান্য হেতু আছে। দুঃখের বিষয়, এ সময়ে ভল্লুবীর্য্য এখানে নাই।

ইহাতে জয়ন্ত অবশ্য দুঃখিত হইল না। মহাকার্ম্মুক কিছু আগাইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, যাহারা আসিয়াছে, তাহারা দেবভাষাভাষী নহে, যেন কুশোত্তরবাসী বলিয়া বোধ হইতেছে।

অরবিন্দ কহিল,—"তাহা হইলে মহারাজের আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই। এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত, তাহা যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে ভাল হইত।"

এই বলিয়া অরবিন্দ তাহার ললাটে পাণি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বালক-দ্বয় সাগ্রহে তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। অরবিন্দ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে রাজ-দুর্গহইতে একজন দৌবারিক অশ্বারোহণে আসিয়া জানাইল,—"নব মহারাজের আনুগত্য-লাভাশায় ছত্রপতি মহারাজ ভাস্করবীর্য্য আসিয়াছেন।"

অরবিন্দ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ছত্রপতি?"

দৌবারিক। হাঁ, মহারাজ ভাস্করবীর্য্য স্বয়ং সদলবলে আসিয়া-

ছেন—আগমনের উদ্দেশ্য তত সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে না; কেননা আমাকেও এখানে একাকী আসিতে দিল না, দেখুন না, সঙ্গে একজন কুশ-সৈনিক পাঠাইয়াছে—পাছে আমি আপনাদের সতর্ক করিয়া দি।

দৌবারিক ইহা কুশ-সৈনিকের অবোধ্য ভাষায় বলিল। সে ভ্রুকুঞ্চিত করিল, দৌবারিকের আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া তাহার কথার অর্থবোধ করিবার চেষ্টা করিল।

জয়ন্ত বলিল,—"আমাকে এখন তবে কি করিতে হইবে?"

অরবিন্দ। চলুন, দুর্গে যাওয়া যাউক, এখন আর উপায়ান্তর নাই। মহারাজ, ছত্রপতিকে যথারীতি অভিবাদন করিবেন।

জয়ন্ত দুর্গ-প্রবেশের পূর্ব্বে ছত্রপতিকে অভিবাদনের রীতি-অভ্যাস করিয়া লইল। তাহার পর, প্রথমে সে, পরে অরবিন্দ ও মহাকার্ম্মুক সভাগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে কুশ-সৈনিকের এত ভীড় যে, অরবিন্দকে "মহারাজ, মহারাজ" হাঁকিতে হাঁকিতে অগ্রগমন করিতে হইতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে জয়ন্ত সভাকক্ষ্যার মধ্যবর্ত্তী হইল।

আয়তনের অপরপ্রান্তে ছত্রপতি ভাস্করবীর্য্য রাজসিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন; তিনি শীর্ণকায়, পাণ্ডুবর্ণ; তাঁহার বয়ক্রম অনুমান ২৮।২৯ বৎসর, তিনি এক মহার্ঘ, নীল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। নক্র-বিক্রম ও অন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ভাস্করবীর্য্য তখন রাজ-পুরোহিত বাদরায়ণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। জয়ন্তকে সভাস্থ হইতে দেখিয়া বাদরায়ণ ও নক্র-বিক্রম তাহার প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি-ক্ষেপ করিল। জয়ন্ত অগ্রসর হইয়া জানু পাতিল। তাহার পর, সে বলিতে যাইতেছিল,—"ছত্রপতি মহারাজ ভাস্করবীর্য্য, আমি—"

এমন সময়ে ভাস্করবীর্য্য তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন,—"এই কি আমার চিরমিত্র মৃত মহারাজ বৃক-বিক্রমের পুত্র? আকৃতি দেখিয়াই আমার তাহা অনুমান করিয়া লওয়া উচিত ছিল। এস, বৎস, তোমায় পুনরায় আলিঙ্গন করি।"

জয়ন্ত একটু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার এই ধারণা হইল যে, ভাস্করবীর্য্য বড় ভাল লোক। ভাস্করবীর্য্য তাহার দৈর্ঘ্য, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদির বড় প্রশংসা করিতে থাকিলেন এবং দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিজের পুত্রেরা এরূপ বলিষ্ঠ ও সুন্দর নহে। তিনি জয়ন্তকে বার বার আদর করিতে লাগিলেন, তত আদর গৌতমীও তাহাকে করেন না। তখন জয়ন্তের মনে হইতেছিল, ভল্লুবীর্য্য বড় অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, আমাকে ছত্রপতিপর্য্যন্ত ভাল বলিতেছেন, কিন্তু তিনি প্রায়ই আমার নানাদোষ ধরিয়া থাকেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জয়ন্ত তাহার পিতার শয়ন-মন্দিরেই শয়ন করিত। মহাকার্ম্মুক তাহার বাল-পরিচর হইয়াছিল, সুতরাং সে তাহার পদতলে শুইত, আর অরবিন্দ সেই শয্যাগৃহের দ্বারদেশে ঘুমাইতেন, তাঁহার দেহের সহিত ঐ গৃহের দ্বার সংলগ্ন হইয়া থাকিত, তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার তরবারি থাকিত। সুতরাং তাঁহাকে অতিক্রম না করিয়া কাহারও সেই গৃহ-প্রবেশের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। আজও তাঁহারা ঐভাবে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে অরবিন্দের গাত্র-লগ্ন দ্বার ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। তন্মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁহার তরবারিতে হাত দিলেন এবং তাঁহার স্কন্ধদ্বারা দ্বারটি চাপিয়া রহিলেন; এমন সময়ে শুনিলেন, তাঁহার পিতা চুপি চুপি স্বীয় মাতৃভাষায় বলিলেন,—"আমি, দ্বারমোচন কর।" অরবিন্দ দ্বার ছাড়িয়া দিলেন, নক্র-বিক্রম কক্ষ্যামধ্যে নগ্নপদে প্রবিষ্ট হইয়া অরবিন্দের শয্যার উপরে বসিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"অরবিন্দ, তুমি সতর্ক আছ—ভালই আছ। বিপদ্ এখন চারিদিকে। কুশবাসীদের অভিসন্ধি অতি মন্দ। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, এখানে আসিবার পূর্ব্বে, ভাস্করবীর্য্যের সহিত অসুররাজ রক্তমুখ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল।"

অরবিন্দ বিড়বিড় করিয়া বলিল,—"অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক! পিতঃ, আপনি উহার অভিসন্ধি কি, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন?"

"হাঁ, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। উদ্দেশ্য বাল-মহারাজকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে, দেশে লইয়া গিয়া এই রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন করিবে।"

"আপনি কি উহাকে তাহা করিতে দিবেন?"

"আমরা জীবিত থাকিতে নয়! তবে এখন কুশসৈনিকে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াছি, আমাদের বাধা-প্রদান বিফলই হইবে। জড় করিলে, আমাদের লোক দুর্গে দ্বাদশজনের অধিক হইবে না, এদিকে উহাদের অসংখ্য লোক; আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তথাপি আমরা বিনা বাধায় মহারাজকে এই দুর্গহইতে লইয়া যাইতে দিব না।"

অরবিন্দ। ভাস্কর খুব সুবিধা বুঝিয়াই আসিয়াছে।

নক্র। হাঁ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভল্লুবীর্য্য একবার সংবাদ পাইলে, সৈন্যসামন্ত-সংগ্রহ করিতে পারিত।

অর। অদ্য রাত্রিতে কি তাঁহাকে কোনপ্রকারে সংবাদ দেওয়া যায় না?

নক্র। জানি না, কুশীয়েরা দুর্গের সমুদয় দ্বারেই প্রহরী বসাইয়াছে। বাহিরে আমাদের প্রজাদিগকে সংবাদ-প্রেরণ সহজ কথা নহে। দুর্গের কোন লোককে ছাড়া যায় না, কেননা কল্য প্রভাতেই হয়ত সকলেরই প্রয়োজন হইবে।

কে একজন নগ্নপদে পিতাপুত্রের সন্নিকট হইয়া বলিল,—"আমার আপনাদের কথোপকথন শুনিবার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু আমি জাগিয়া আছি—কাজেই শুনিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এখনও বালক, মহারাজের সপক্ষে অস্ত্র-ধারণের ক্ষমতা আমার এখনও হয় নাই; কিন্তু আমি বার্ত্তাবহের কার্য্য করিতে পারি।"

মহাকার্ম্মুক ঐ কথা বলিল।

অরবিন্দ। পিতঃ, ইহাকে পাঠাইলে, কেমন হয়? কোন-প্রকারে আমরা যদি ইহাকে দুর্গের বাহির করিয়া দিতে পারি, এই বালক বাদরায়ণ বা চৌরণদ্ধরিকের কাছে যাইয়া অশ্ব ও পথপ্রদর্শক-সংগ্রহ করিয়া ভল্লুবীর্য্যের কাছে যাইতে পারে।

নক্র। দেখি, আমি একবার ভাবিয়া দেখি।......হাঁ, ইহাই কর্ত্তব্য। ভল্লুবীর্য্য সংবাদ পাইলে, আমি কতক নিশ্চিন্ত হই।

ম-কা। আমি দুর্গের পূর্ব্বদিক্‌কার প্রাচীর বাহিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে পারি।

নক্র। ভাল, অসুর-যোধ, তুমি চেষ্টা করিয়া দেখ।

মহাকার্ম্মুক অরবিন্দের কাণে কাণে কহিল,—"আমাকে উনি 'অসুর' বলেন কেন?"

নক্র-বিক্রম তাহা শুনিতে পাইলেন, হাসিয়া কহিলেন,—"ভাল, বৎস, এ'বার তুমি তোমার সুরত্ব প্রতিপন্ন কর।"

অরবিন্দ। কল্য প্রাতে যদি মহারাজকে দুর্গের পশ্চাদ্দিক্ দিয়া নগরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি নিরাপদ্ হন। অন্ততঃ যতক্ষণ না ভল্লুবীর্য্য আসেন, ততক্ষণ তিনি বাদরায়ণের আশ্রমে থাকিতে পারেন; তাহার পর ভল্লুবীর্য্য আসিলে, তিনি কুশরাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

নক্র। হাঁ, তাহা হইতে পারে; কিন্তু সে কার্য্যে যে তুমি সফল হইতে পারিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কুশীয়েরা বড় সতর্ক হইয়া রহিয়াছে। তুমি দেখিবে, সকল দ্বারেই তাহাদের প্রহরী রহিয়াছে।

অর। কিন্তু কুশীয়মাত্রেই মহারাজকে চিনে না। একজন যোদ্ধা ও তাহার বাল-পরিচর দুর্গের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিলে, কোন সৈনিকই, হয়ত, বাধা দিবে না।

নক্র। কিন্তু মহারাজ বাল-পরিচর সাজিতে সম্মত হইবেন কি? সে আশা বড় নাই। তাহাছাড়া ছত্রপতি কুশরাজ কাল তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া এমনই বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, তিনি তাহার কাছ ছাড়িয়া ভল্লুবীর্য্যের কাছে যাইতে সম্মত হইবেন কি না, সন্দেহ। অভাগ্য বালক, কে তাঁহার প্রকৃত মিত্র কেই বা শত্রু, তাহা তিনি শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।

এমন সময়ে মহাকার্ম্মুক আসিয়া কহিল,—"আমি প্রস্তুত হইয়াছি।"

নক্র-বিক্রম তাহাকে আবশ্যক উপদেশ দিলেন, তাহার পর তিনি স্বয়ং জয়ন্তের শয়ন-মন্দির-রক্ষা করিতে লাগিলেন। অরবিন্দ মহাকার্ম্মুককে দুর্গনিঃসৃত হইতে সাহায্য করিতে চলিলেন। তাঁহারা যে যে প্রকোষ্ঠে কুশীয়েরা শয়ন করিয়াছিল, সে সে প্রকোষ্ঠ-পরিহার করিয়া সাবধানে লঘুপদে এক জানালার কাছে উপস্থিত হইলেন। সেই গবাক্ষের পরিসর এত ক্ষুদ্র যে, মহাকার্ম্মুকের ন্যায় এক কৃশকায় বালকমাত্র তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে, অন্যে নহে। অরবিন্দ মহাকার্ম্মুককে স্কন্ধে করিয়া সেই গবাক্ষ-কুহরে তুলিয়া দিলেন। মহাকার্ম্মুক সেই কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দুর্গটি একতল, মহাকার্ম্মুক যত উচ্চ, উহা তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে। সুতরাং সেই ব্যায়ামকুশল বালক সহজেই লাফাইতে পারিয়াছিল। তাহার পর, সে পরিখা পার হইয়া দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাজপথে নামিয়া পড়িয়া চৌরণদ্ধরিকের গৃহাভিমুখে ছুট দিল।

অরবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে অব্যাহতি দিলেন। জয়ন্ত অঘোরে ঘুমাইতেছে, সে শত্রুবর্গের ষড়যন্ত্র প্রভৃতির কথা কিছুই অবগত নহে। অরবিন্দ ইহা মঙ্গলজনকই মনে করিলেন; কারণ জয়ন্ত বড় অসহিষ্ণু, সে আত্মসম্বরণ করিতে জানে না। সুতরাং সে এই বিপদের কথা না জানিলেই, ভাল। জানিলে, তাহাকে লইয়া পলায়ন একান্ত দুষ্কর হইবে।

* * * * *

প্রভাতে জয়ন্ত জাগরিত হইয়া মহাকার্ম্মুককে দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইল। অরবিন্দ তাহাকে লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক এক প্রহরীর কাছে অবমানিত হইয়া নক্রবিক্রমের কাছে অভিযোগ করিতে আসিল। নক্রবিক্রম তখন তাহাকে সকল ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তাতঃ! তবে আপনি কি আমায় এই বিশ্বাসঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিবেন?"

নক্র। জীবন থাকিতে নয়! মহাকার্ম্মুক ভল্লুবীর্য্যকে এই বিপদ্-সংবাদ দিতে গিয়াছে। আপনাকে আমরা যে প্রকোষ্ঠে রাখিয়া রক্ষা করিতে চাই, আপনি এখন তথায় চলুন।"

জয়ন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে নক্রবিক্রমের অনুসরণ করিল। তিনি তাহাকে যুদ্ধকালে শত্রুদের গতিবিধি-লক্ষ্যার্থে নির্ম্মিত এক অতি ক্ষুদ্র কক্ষ্যায় তুলিলেন। সেখানে গিয়া জয়ন্ত দেখিল, আর্য্যা গৌতমী বসিয়া বসিয়া মালা-জপ করিতেছেন, দুই-তিন-জন পরিচারিকা ও দুইজন সেনানীও তথায় রহিয়াছে।

অরবিন্দ সেই কক্ষ্যাদ্বারে বসিয়া জয়ন্তকে জানাইলেন যে, যতক্ষণ না ভল্লুবীর্য্য আসেন, ততক্ষণ তাঁহারা তাহাকে এই কুঠরীর মধ্যে রাখিয়া শত্রুকবলহইতে রক্ষা করিবেন।

জয়। তাহা হইলে তুমি প্রভাতে আমাকে কৌশল করিয়া দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলে?

অর। হাঁ, মহারাজ!

জয়। আর আমি যদি রাগিয়া না উঠিতাম কিম্বা আত্মপরিচয় না দিতাম, তাহা হইলে আমরা পলাইতে পারিতাম?

অর। সম্ভবতঃ!

জয়। তাতঃ, আপনি আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবেন না?

গৌতমী। নক্র সাধ্যানুসারে প্রাণদিয়া তোমাকে রক্ষা করিবে। কিন্তু, বৎস, এখন সকলই সেই শ্রীভগবানের উপরে নির্ভর করিতেছে!

(ক্রমশঃ।)

প্রার্থনীয় পেশী।

[কলিকাতা ওয়াই, এম, সি, এর কলেজ-বিভাগের বালক-শাখার অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জে, এইচ, গ্রে, এম ডি-মহোদয় কর্তৃক লিখিত।]

আগষ্টমাসের বালকে আমি মাংসপেশী ও উহার প্রবর্দ্ধন-সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, আশা করি, সে কথাগুলি তোমাদের মনে আছে। যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, আর একবার সে প্রবন্ধটি পড়িয়া লও, তাহার পর, বর্ত্তমান নিবন্ধটি একটু মনোযোগের সহিত পড়, কারণ ইহাতে আমি যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তাহা যে কেবল তোমাদের বর্ত্তমান জীবনেই প্রয়োজনে লাগিবে, তাহা নহে, ভবিষ্যতে যখন তোমরা পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য হইয়া উঠিবে, তখনও, এই উপদেশগুলি মনে রাখিলে, তোমাদের উপকার হইবে।

তোমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ ছেলে-বুড়াদের দিকে যদি তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কেহ বড় মোটা, আর সে যেন দিন দিন আরও বেশী মোটা হইতেছে; কেহ বড় রোগা, আর সে যেন দিনের পর দিন আরও রোগা হইয়া যাইতেছে; কেহ বড় ঢেঙা, আর সে যেন দিন দিন আরও বেশী ঢেঙা হইতেছে; কেহ বড় বেঁটে, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতেছে, সে যেমন তেমনই আছে, একটুও লম্বা হইতেছে না। তাহার পর, তুমি পেশীপ্রবর্দ্ধন-সম্বন্ধে যে বই ইচ্ছা সেই বই কিনিয়া পড়, তুমি দেখিবে, অধিকাংশ গ্রন্থকারই বলিতেছেন যে, তাঁহার পদ্ধতিমতে পেশীপ্রবর্দ্ধনের চেষ্টা করিলে, সেই একটিমাত্র উপায়েই, মোটা—রোগা হইবে, রোগা—মোটা হইবে, ঢেঙা—বেঁটে হইবে, বেঁটে—ঢেঙা হইবে।*

কোন কোন গ্রন্থকার আবার তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে একটি নক্সা (chart) নিবেশিত করিয়া বলেন যে, তাঁহার পদ্ধতিমতে ব্যায়াম করিলে, লোকের দৈর্ঘ্য ও ভার এত হইবে। ফলে তুমি তাঁহার পদ্ধতিমতে প্রাণপণে ব্যায়াম করিতে থাকিলে, এবং শেষে যখন দেখিলে যে, তুমি প্রায় সেই গ্রন্থানুরূপ দৈর্ঘ্য ও ভারলাভ করিয়াছ, তখন তোমার আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাহার পর, সেই গ্রন্থে নিবেশিত আর একটি নক্সায় হয়ত বলিতেছে যে, তোমার হাতের গুলী'টি এত ইঞ্চি মোটা হওয়া উচিত, তুমি তাঁহার পদ্ধতিমতে ব্যায়াম করিয়াও যখন উক্তবিধ স্থূল হাতের গুলী-লাভ করিতে পারিলে না, তখন আবার তোমার দুঃখের অবধি রহিল না। ঐ নক্সাগুলি বেশ আগ্রহোদ্দীপক এবং উহাদের কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু ঐ নক্সাগুলিতে যে দৈর্ঘ্যের ও ভারের কথা লেখা থাকে, তাহা প্রকৃত দৈর্ঘ্য ও ভার নহে—গড়পড়তা। সুতরাং কেহ ঐরূপ দৈর্ঘ্য ও ভার-লাভ করিলে, তাহার গর্ব্বানুভবের কোনই কারণ নাই, কেহ লাভ না করিলে, তাহার ক্ষুণ্ণ হওয়াও উচিত নহে, কারণ পেশীর আকার কত ইঞ্চি, অমুকের মত স্থূল কি না—ইহাই কাহারও জীবনের মুখ্য জিজ্ঞাস্য নহে।

তোমার এমন কি কেহ বন্ধু আছে, যে খুব যত্ন করিয়া তাহার হাতের গুলী ও বক্ষঃ স্থূল ও বিস্তৃত করিয়াছে? তোমার তাহাকে কেমন লাগে? তাহার সৌহৃদ্য কি তোমার প্রীতিকর—বাঞ্ছনীয়? আমি তো দেখি, যাহার যত বিস্তৃত বক্ষঃ ও স্থূল গুলী, সে তত অহঙ্কারী। সে যেন গুমরে ফাটিয়া পড়িতেছে! এরকম কোন ছেলে বার বার আমার কাছে আসিয়া বুক ফুলাইতে ও হাতের গুলী টিপাইতে থাকিলে, আমার বড় ক্লান্তি ও বিরক্তি জন্মে। আমি দেখি, আগে তাহার সহিত আমার যেমন বনিত, এখন আর তেমন বনে না; কারণ সে এখন বড় গর্ব্বিত, বড় আত্মপ্রশংসাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। স্থূল পেশীযুক্ত সঙ্গীই শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয় না, তাহার সঙ্গও সকল সময়ে ভাল লাগে না।
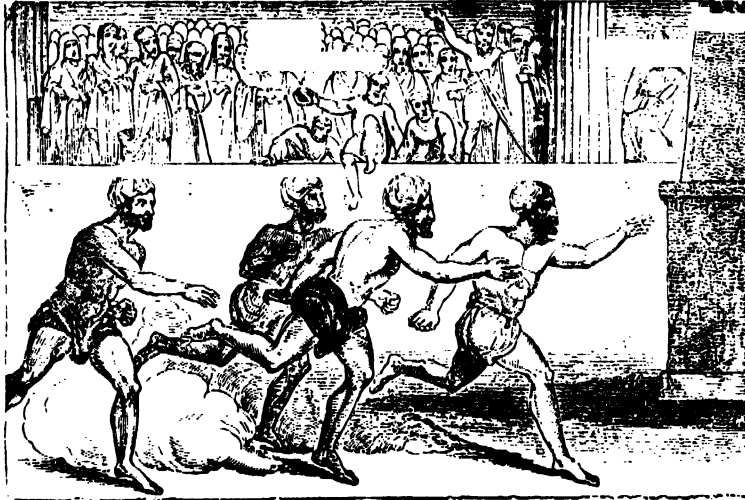
তাহার পর, আর একটী কথা এই, তুমি যদি কখন তোমার দুই হাত মাপিয়া থাক, তবে তুমি দেখিয়াছ, তোমার একটী হাত ছোট, আর একটী হাত বড়। ইহা দেখিয়া তুমি হয়ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছ; কারণ প্রাগুক্ত কোন কোন পুস্তকে তুমি হয়ত দেখিয়াছ যে, তোমার সমাঙ্গগুলি সমান হওয়া উচিত। একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়াম-শিক্ষকের তরুণ-বয়সে এই ভ্রম ছিল। একদিক্‌কার অঙ্গ-

* কোন সময়ে আমি একটী ব্যায়াম-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতাম। স্থূলকায়, সূক্ষ্মকায়, দীর্ঘকায় ও খর্ব্বকায়—সকল ব্যায়ামার্থীকেই আমি একটিমাত্র পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিতে উপদেশ দিতাম। তাহারা সকলে একদিন সুসংবদ্ধ হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিল,—"একই পদ্ধতিতে মোটা—রোগা, রোগা—মোটা, ঢেঙা—বেঁটে, বেঁটে—ঢেঙা কি করিয়া হইতে পারে?" আমার সেদিন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল!

গুলি পরিণতিলাভ করিতেছে, আর একদিক্‌কার অঙ্গগুলি তদ্রূপ পরিণতি-লাভ করিতেছে না, ইহা দেখিলে, তাঁহার অস্বস্তি-বোধ হইত। তিনি উভয় দিকের অঙ্গগুলির তুল্য পরিণতি-বিধানার্থে অনবরত ব্যায়ামানুশীলন করিতে থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারেন। তখন তিনি বুঝিলেন,—যুগ্ম অঙ্গের তুল্য পরিণতি স্বভাবের নিয়ম নহে; কোন মানুষ সুস্থ ও সর্ব্বাঙ্গে সবল হইলে পর, সে যাহাতে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়, ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রেত; সম্পূর্ণরূপে তুল্যস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তাঙ্গ হওয়ার চেষ্টা অনর্থক কালক্ষেপ। কোন ছবি বা মুখোসে যখন আমরা দেখি যে, মুখের দুইদিক্ ঠিক এক, তখন সে মুখছবি বা মুখোস আমাদের চোখে কি অস্বাভাবিক ঠেকে! কাহারও মুখের উভয় পার্শ্ব একপ্রকার নহে; যদি কাহারও তাহা থাকে, সে দেখিতে নিশ্চয়ই বড় আজগবী। অতএব শরীরের যুগ্মাঙ্গমাত্রেরই সাম্য-বিধানার্থে বৃথা চেষ্টা করা উচিত নহে, বরঞ্চ মানানের দিকেই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে লোকে অধিকতর সুন্দর ও কর্ম্মক্ষম হয়।

শেষ-কথা এই, পেশীর স্থূলতার প্রতি তত অবহিত হইও না। উহা অমুকের মত হইতেছে কি না, ইহা জিজ্ঞাস্য নহে। এই, ব্যায়াম করিয়া আমি কিপ্রকার অনুভব করি? আমার মধ্যে কি কিছু তেজঃ আছে? আমার পেশীগুলি দৃঢ় ও মজবুত কি? বলা বাহুল্য, সেগুলি কাঠ বা লোহার মত শক্ত না হইলেও, ক্ষতি নাই, এবং সেগুলির দ্বারায় আমোদার্থে পাথর ভাঙিতে না পারিলেও, লজ্জা নাই। তুমি যদি উপযুক্ত পরিমিত খাদ্য-ভক্ষণ, বিশ্রাম-গ্রহণ ও ব্যায়ামানুশীলন করিয়া থাক, তোমার দেহাকৃতি যেপ্রকারই হউক না, তজ্জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই বরঞ্চ তদ্রূপ দেহলাভ করিয়াছ বলিয়া তুমি গর্ব্বানুভব করিতে থাক, কারণ উত্তম, নির্ম্মল, সরল আচরণময় জীবনযাপনের ফলেই তুমি উহাকে লাভ করিয়াছ। ইহাও মনে রাখিও যে, তুমি চিরকাল একরকম দেখিতে থাকিবে না, বয়োবৃদ্ধিসহ তোমার দেহাকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যাহা উচিত, তাহা যদি করিয়া থাক, কিছুতেই উদ্বিগ্ন হইও না, যেরকম ব্যায়াম তোমার ভাল লাগে, সেইরকম ব্যায়াম করিয়া জীবনে আনন্দোপভোগ করিতে থাক, অবশিষ্ট যাহা, তাহা প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দাও।

"এ্যাসোসিয়েশন্-ফুট্‌বল্।"

(প্রাপ্ত।)

আমার ঠিক তারিখ মনে নাই, কিন্তু আমি যদি বলি, সে প্রায় পঁচিশবৎসরের কথা, যখন আমি প্রথম ভারতীয় ফুট্‌বল-"টীমের" সহিত পরিচিত হই, তাহা হইলে, বোধ হয়, তত ভুল করিব না। সেই "টীমটির" খেলোয়াড়েরা লোক ভাল ছিল,—সকলেই বেশ প্রফুল্লচিত্ত এবং আলাপ ও আপ্যায়ন-পটু ছিল। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি, তাহারা ভাল খেলোয়াড় ছিল না। আমরাও তাহাদের কাছে কখন ভাল খেলা-প্রত্যাশা করিতাম না।

আর একটি জিনিসও আমরা কখন প্রত্যাশা করি নাই। আমরা প্রত্যাশা করি নাই যে, "ন্যাশান্যাল এ্যাসোসিয়েশন", কেবল একবার যেন "বিড়ালের-ভাগ্যে-শিকা-ছিঁড়িয়াছে"-গোছ করিয়া নয়, ১৯০২ সালে দ্বিতীয়বার "ট্রেড্‌স্ কাপ্" পাইবে এবং পরে "মোহন-বাগান" ১৯০৬, ৭ ও ৮ সালে উপরি উপরি তিনবার "ট্রেড্‌স্ কাপ্" পাইবে, তাহার পর আবার ১৯১১ সালে অসংখ্য দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ক্রীড়া করিয়া ক্রীড়ায় জয়ী হইয়া ভারতীয় "ফুট্‌বল এ্যাসোসিয়েশনের" অতীব দুষ্প্রাপ্য জয়-চিহ্ন "শিল্ড"খানি পাইবে। সেই স্মরণীয় ক্রীড়া-দর্শন করিয়া আমি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ বসুর "টীমের" কিসের—সফলতার অথবা উদ্যম ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিব, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।

এ দেশে তবে ফুট্‌বল-খেলা স্থায়ী হইতে চলিল। পার্সিরা ক্রিকেট-খেলায় পটু, রাজপুতেরা "পোলো"-খেলায় দক্ষ, কিন্তু বাঙ্গালীদের "এ্যাসোসিয়েশন-ফুট্‌বল"-খেলাই মনোমত হইয়াছে।

আমার নিজের ইচ্ছা এই, এ দেশে যেন "রাগ্‌বী"-ফুট্‌বল-খেলাও প্রতিষ্ঠালাভ করে। সম্প্রতি বাঙ্গালীদিগের "রাগ্‌বী"-ফুট্‌বল-খেলার দিকেও মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে। "মোহন-বাগান", "ওরিয়েণ্ট্যাল", "রোভার্স" প্রভৃতি "টীম"গুলি "রাগ্‌বী" খেলিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি "এ্যাসোসিয়েশন"-ফুট্‌বল-সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিবার অভিপ্রায় করিয়াছি।

সফলতালাভ করিলে, কার্য্যের উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া যাওয়া মানুষের স্বভাব। ফুট্‌বল-খেলায় অনবরত জিতিতে থাকিলে, আমরা ঐ খেলারও উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া যাইতে পারি। "ন্যাশান্যাল"-দল তেতাল্লিশটি "টীম"কে হারাইয়া গত মরসুমে "ট্রেড্‌স কাপ্" পাইয়াছে। "ক্যাল্‌ক্যাটার" সহিত খেলিবার সময় গত বৎসর "মোহন-বাগান"ও খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

এই "এ্যাসোসিয়েশন"-ফুট্‌বল-খেলার ক্রীড়া-জগতে স্থান—প্রকৃত স্থান কোথায়? এই খেলাটিই কি উদ্দেশ্য, না উপায়মাত্র? আমি বলি, ইহা উদ্দেশ্য নহে, উপায়মাত্র।

প্রথমতঃ ও মুখ্যতঃ আমাদের কার্য্য-তৎপরতার যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্যই আমরা ফুট্‌বল খেলি। সমাজে যেই কেহ উন্নত হয়,

অমনিই তাহার অভাবগুলিও ক্রমশঃ উচ্চভাবান্বিত হইতে থাকে। সেই অভাবগুলির মধ্যে একটি হইতেছে—কার্য্যতৎপরতা, মনুষ্যের শারীরিক সমুন্নতিসাধন। কেহ কেহ পারদর্শিতার অনুরোধেই পারদর্শী হইতে চায়। আর আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা ফুট্‌বল-খেলায় কৃতিত্ব প্রকাশ পায় বলিয়াই, ফুট্‌বল খেলিতে ভাল বাসেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকে, আমার এই ধারণা, ব্যায়ামার্থেই এই খেলায় যোগ দেন। যদি ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে, তাহা হইলে ফুট্‌বল-খেলা বাঞ্ছনীয় বটে।

কিন্তু ফুট্‌বল-খেলার একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। মানব-জীবন-রূপ খেলার এই খেলাটি নিদর্শন। জীবনে আমরা কি দেখিতে চাই? চরিত্রবান্ মনুষ্য,—এমন সমস্ত মনুষ্য, যাঁহারা কোন অসৎকার্য্য করিবার জন্য আপনাদিগকে অবনত করিতে চান না। ফুট্‌বল-খেলায়—বিশেষতঃ ফুট্‌বল-খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

"রয়েল আইরিস রাইফ্লস্।"

এইবার এই "টীম" "চ্যালেঞ্জ-শিল্ড"-খানি পাইয়াছেন।
বামদিক্‌হইতে দক্ষিণে—দাঁড়াইয়া: কন্ডওয়েল, ক্লার্ক, বোল্যাণ্ড, পোর্টার। মধ্যে—গিবসন্, নেপিয়ার, মেরিডিথ।
সম্মুখে—ফুলান, ম্যাক্‌ডন্যাল্ড, ফাউলার, গ্রেহাম, লেথাম।

ব্যায়ামার্থেই যদি এই খেলা খেলিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ যতক্ষণ খেলিলে ব্যায়াম পূর্ণ হয়, ততক্ষণই ইহা খেলা উচিত; দ্বিতীয়তঃ উহা স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে থাকিলে, তৎক্ষণাৎ পরিহার করা কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত শ্রমহেতু যদি তোমাকে কষ্ট পাইতে হয়, তাহা হইলে "কাপ্" বা "শিল্ড" পাইয়া কোনই লাভ নাই। এতদ্দ্বারা যদি তোমার পড়া-শুনার, কার্য্যের অথবা কোন বিশিষ্ট কর্ত্তব্যপালনের অসুবিধা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত ফুট্‌বল-খেলার কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। তবে ফুট্‌বল খেলিয়া বিদ্যার্থী যদি পড়া-শুনা ভাল করিয়া করিতে পারে, কাজের লোক সাধু আচরণ করিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। তুমি কোনরকম জুয়াচুরী করিয়া কোন "শিল্ড" বা "কাপ্" পাইতে পার; কিন্তু তুমি জুয়াচুরী করার অপেক্ষা "শিল্ড" বা "কাপ্" না পাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে কর। ফুট্‌বল খেলিলে যে সমস্ত নীতি-শিক্ষা হয়, তাহার মধ্যে এইটি প্রথম।

দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে এই যে, সেরা খেলোয়াড় যে, সেই অগ্রবর্ত্তী হউক, ফুটবল খেলিলে এই মনোভাবটি যত পরিস্ফুট হয়, এমন আর কিছুতে হয় না; যদি ভাল খেলোয়াড় পাওয়া যায়, খারাপ খেলোয়াড়কে ইস্তফা দিতেই হয়। তদ্ভিন্ন বিপক্ষ সদুপায়ে

খেলায় জয়ী হইলে, প্রীতিপ্রকাশ করিতেই হয়। আমরা একবার এমন একটি "টীমের" সহিত ফুটবল খেলিতেছিলাম, যাহাদের জয়ী হইবার খুবই আশা ছিল। খুব রোখ্ করিয়া খেলিয়া সেবারে আমরাই জয়ী হইলাম, তাহারা হারিয়া গেল, দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত। এমন অবস্থায় যখন বিপক্ষদলের কাপ্তেন আসিয়া আমাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিল,—"তোমার জয়ে খুব আনন্দিত হইয়াছি, তোমারই জয়ী হওয়া উচিত," এবং উহা বলিয়া যখন আমার করমর্দ্দন করিল, তখন আমার কি আনন্দ-বোধ হইয়াছিল, বুঝিতেই পার।

কিন্তু ফুটবল খেলিলে, লোকের সর্ব্বাপেক্ষা এই উপকার হয় যে, তাহার মনহইতে স্বার্থপরতা-বিষ একেবারে বিদূরিত হয়। তোমার দলের উত্থানে, তোমার উত্থান; পতনে, তোমার পতন হয়। আমি যে কি বছরই খে'লব, এরকম আশা ক'রবেন না।" তখন যদি আমি আমার সেই বালক-বন্ধুকে বলি যে, তোমার এ কথাটা বড় স্বার্থপরের মত বলা হইয়াছে, সে কতই না আশ্চর্য্যান্বিত হয়! যে ক্লাবের তুমি মেম্বর, চিরকাল সেই ক্লাবেরই মেম্বর থাক। উহার সহিত উন্নত ও অবনত হও। এই ভাবে তুমি কাজে নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিতে পারিবে। ১৯১১ সালে "মোহন-বাগান" "শিল্ড" পায়, কিন্তু ঐ "ক্লাব"টি ২২ বৎসর পুর্ব্বে সর্ব্বজন-পরিচিত মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুকর্ত্তৃক গঠিত হয়।

মাঠে আমরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখি। তাহারা কি বিনা চেষ্টায় ও অভ্যাসে ঐপ্রকার ভাল খেলোয়াড় হইয়াছে? ঐ খেলার সময় উহারা যে নানাপ্রকার কৌশলাবলম্বন করে, উহা কি উহাদের স্বাভাবিক, না অনুশীলনের ফল? অবশ্যই অভ্যাস ও অনুশীলনের ফল।

"আর্গাইল এণ্ড সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার্স।"

"শিল্ডম্যাচের ফাইন্যালে" এই "টীম" "রয়েল আইরিসের" কাছে হারিয়া গিয়াছেন।

দণ্ডায়মান ক্রীড়কবৃন্দ (বামদিক্‌হইতে দক্ষিণে)—ডাফি, হুষ্টন, টমসন্, ষ্টুয়ার্ট, ম্যাকক্, বুক্যানন।
উপবিষ্ট " " —ম্যাক্‌লেলেন, সার্জেণ্ট কিং, এবং পেইন।
সম্মুখে " " —ম্যাক্‌ডল্ডাল্ড ও হাণ্টার।

নিঃস্বার্থপর হও—এই কথাটি আমরা অনেকেই বড়ই লম্বাচৌড়া করিয়া বলিয়া থাকি, কিন্তু নিঃস্বার্থপরতা-অভ্যাস না করিলে, আমরা কি করিয়া নিঃস্বার্থপর হইবার আশা করিতে পারি? ফুটবল-খেলায় স্বার্থপরতা-দমনের অনবরত অবকাশ পাওয়া যায়। "এ মরসুমে আমি ফুট্‌বল খে'লব না"—এইপ্রকার একটি নির্ব্বোধের মত প্রতিজ্ঞার কথা কোন কোন বালকের মুখে শুনা যায়। সেই বালককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,—"কেন, কি হ'য়েছে?" অমনি এই উত্তর পাই,—"যে টীম কি বছরই হারিয়া যায়, সে টীমে

খেলা শিখাইবার জন্য প্রথমে "উইং"এর খেলোয়াড়দের দরকার। তাহাদের দ্রুত ছুটিবার শক্তি থাকা চাই। তাহাদের শিক্ষিতব্য বিষয় হইতেছে, বল্‌টি লইয়া, যতদূর সম্ভব, দ্রুত ধাবন। বাম "উইং"এর খেলোয়াড়দের বাঁ পা-দিয়া বলে পদাঘাত করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া "পেনাল্টি এরিয়ায়" পহুঁছিলে, বল্ "সেণ্টার" করিবার দক্ষতা থাকা উচিত। ঐ "উইং"এর খেলোয়াড় যদি বাঁ পা-দিয়া বলে পদাঘাত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার প্রত্যহ উহা অভ্যাস করা উচিত। ডা'ন পা-দিয়া বলে

পদাঘাত করা সহজ ; তবে দক্ষিণ "উইং"এরও বল লইয়া দ্রুতভাবে ছুটিবার অভ্যাস করা চাই।

"রাইট-উইং" কি করিয়া ধাবনার্থে "বল্‌টি" যোগাড় করিয়া লইবে? ইহা সে "রাইট-হাফের" সহযোগিতায় সম্পন্ন করিবে। "রাইট-হাফ্" "রাইট উইং"কে বল্ "পাস" করিবে, বিপক্ষ তদ্দর্শনে তাহার বল্‌টি কাড়িয়া লইতে আসিবে, তখন সে বল্‌টি আবার "রাইট-হাফ্"কে "পাস" করিয়া দিবে, বিপক্ষ "রাইট-হাফের" কাছে যাইবে, "রাইট-হাফ্" পুনরায় বল্‌টি "রাইট উইং"কে "পাস" করিয়া দিবে, সে তখন তাহা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিবে।

ভিতরকার লোকদের বল্‌টি নিজেদের কাছে না রাখাই মুখ্য কর্ত্তব্য। তাহাদের বল্‌টির চালন-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া চাই। এই কার্য্যে দক্ষতালাভ করিতে হইলে, উভয় পদদ্বারা বলে আঘাত করার অভ্যাস থাকা চাই। মনে হয়, "পাস" করা বড় সহজ, কিন্তু ঠিক সময়ে ও ঠিক জায়গায় "পাস" করা আসল কাজ, প্রকৃত কর্ত্তব্য।

মধ্যের অন্যান্য খেলোয়াড়ের সহিত "সেণ্টার-ফরওয়ার্ডের"ও নির্ভুলভাবে "শূট" করিবার অভ্যাস থাকা উচিত। ভুল "শূট" করার ফলে বিস্তর "গোল" মাটী হইয়া যায়। কোন "টীম" যখন খেলা "প্র্যাক্‌টিস" করে, তখন তাহারা মনে মনে বলের নানাপ্রকার অবস্থান আঁচ করিয়া লইয়া "শূট" করে; কিন্তু আসল খেলায় বল্‌টি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইবার কোনই সুযোগ পাওয়া যায় না, তখন যদবস্থায় বল্‌টি পাওয়া যায়, তদবস্থাতেই "কিক্" করিতে হয়। তাহাছাড়া ছুটিতে ছুটিতে বলে "কিক্" করিতে হয়। অতএব "সেণ্টার-ফরওয়ার্ডের" ছুটিতে ছুটিতে বলে পদাঘাত করা অভ্যাস করা উচিত। সে, বল্‌টি যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, উভয় পদদ্বারা উহাতে পদাঘাত করিতে অভ্যাস করিবে। আর বল্‌টি কেবল "গোল-কীপারের" বাঁ-দিক্-তাগ্ করিয়া "শূট্" করা উচিত নহে, সোজাসুজি ও কোণাকোণি ভাবে "শূট" করিতে অভ্যাস করা উচিত। "মোহন-বাগান-টীম" যখন আমার "টীম"কে হারাইয়া দেয়, তখন আমার "গোল-কীপার" আমাকে বলিয়াছিল, সে গোলটি বাঁচাইতে পারে নাই, এইজন্য যে, বল্‌টি গোলের আড়কাঠার একটু নীচে দিয়া গলিয়া গিয়াছিল। ভাদুড়ীর ঐ সাফল্যের মূলে যে, প্রচুর অভ্যাস আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দেখিয়া বোধ হয়, খালিপায়ে খেলিলে, বল্‌টি যেন খেলোয়াড়দের হুকুমে চলে। শিবদাস যখন বল্ "পাস" করেন, তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিও, বোধ হইবে, তিনি যেন হাত দিয়া বল্ "পাস" করিতেছেন! যাহা হউক, মধ্যের খেলোয়াড়দের বল্ সুধু "পাস" করা উচিত, "ড্রিব্‌ল" করা কর্ত্তব্য নহে। মাঠের মধ্যস্থলে "উইং"এর লোকদেরই কাজ করিতে দেওয়া উচিত। "গোলের" মুখে পহুঁছিলে, মধ্যের লোকদের দায়িত্বগ্রহণ করিতে হইবে।

যে "ব্যাক্" লম্ফমান বলে "কিক্" করিতে পারে, সেই "ব্যাক্"কেই আমি পছন্দ করি। কারণ পড়িয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক সেকেণ্ডের বিলম্বে বল্‌টি বিপক্ষ দশহাত আগাইয়া লইয়া যাইবে। লম্ফমান বলে "কিক্" করিতে হইলে, উভয় পদ ও সময়ে সময়ে মস্তক-ব্যবহার করা চাই। "ব্যাকে"র ডা'ন-দিক্ বা বাঁ-দিক্-লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই, সে সুধু বলে "কিক্" করিতে পারিলেই, চলিবে। সময়ে সময়ে এমন হইবে যে, "ব্যাক"-কে "কর্ণার" করিতে বাধ্য হইতে হইবে। দেরি করার চেয়ে, "কর্ণার" করা ভাল। অন্য সময়ে হয়তো "ব্যাক"কে বল্‌টি "কিক্" করিয়া নিজের আয়ত্তের বাহিরে বিক্ষেপ করিতে হইবে, দেরি করার চেয়ে তাহাও করা ভাল।

হারিয়া গেলে, লোকে "গোলকীপার"কেই বেশী দোষ দেয়; তাহার কি করা উচিত? আমার পদ্ধতি এই, আমি তাহাকেই "গোলকীপার" করি, যে "শিকড় গাড়িয়া" "গোলপোষ্ট"-দুইটীর মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকে; যে সময়ে সময়ে "গোল" ছাড়িয়া বলে "কিক্" করিয়া "পায়ের সুখ" করিতে যায়, তাহাকে আমি পছন্দ করি না। আমার ধারণা এই, কবি যেমন জন্মাবধি কবিত্ব শক্তি লইয়া আসেন, "গোলকীপার"ও তেমনই আজন্ম উক্ত শক্তিসম্পন্ন।

তথাপি, "গোলকীপার"-নির্ব্বাচন করিবার সময়ে, যে লোক ভীত-স্বভাব নহে, তাহাকেই বাছিয়া লওয়া উচিত। তাহার প্রকৃতির সেই প্রশান্তি তাহাকে, কতদূর ছুটিয়া যাওয়া উচিত, কখনই বা ছুটিয়া যাওয়া উচিত, সেসম্বন্ধে প্রকৃত বোধ-প্রদান করিবে।

দ্বিতীয়তঃ "গোল-কীপারের" বিপক্ষের চোখে ধুলি-প্রক্ষেপের পটুতা থাকা চাই। এ কারণে "প্র্যাক্‌টিস" করিবার সময় কখন কখন "গোল-কীপারের" উপর "চার্জ্জ" করা উচিত। এরূপ করিলে, "গোলকীপারের" তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে যাহা কঠিনতম, তাহা সম্পন্ন করিতে অভ্যাস জন্মিবে। কিন্তু সকলের অপেক্ষা প্রয়োজন "গোল-কীপারের" ঘুসির জোর; বল্‌টি ছুটিয়া আসিলে, তাহার কিলাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া চাই।

একজন প্রবীণ "গোল-কীপার" আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি কখন, বিপক্ষ "পেনাল্‌টী কিক্" করিবার সুযোগ পাইলে, সেই বল্ "গোলের" মধ্যে ঢুকিতে দেন নাই। যেই বিপক্ষদলের "সেণ্টার-ফরোয়ার্ড" বলে "কিক্" করিতে ছুটিত, অমনি তিনিও সোজা তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতেন।

এই পদ্ধতি-অবলম্বনের যুক্তিটুকু বেশ সহজে বুঝা যায়। "গোলের" দুই দিক্‌কার ২৪ হাত স্থান আগ্‌লাইতে হয়, ছুটিয়া গেলে, কখন কখন হয়ত ১৬ হাত আগ্‌লাইতে হয়। উপরন্তু "গোল-কীপার" রুখিয়া আসিতেছে দেখিলে, বিপক্ষ অনেক সময়ে ভড়্‌কাইয়া যায়।

"রেফ্রির" খেলা ভাল করিয়া বুঝা ও দোষ দেখিলেই প্রদর্শিত করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম হয়ত ইহা বিরক্তিকর হইবে, কিন্তু শেষে ইহার ফল ভালই হইবে।

আত্ম-চেতনা

ভীরুতা, লাজুকতা ও আত্ম-চেতনা তিন বহিন। তিনটি বহিনে বড় ভাব। একটি বহিন যেখানে যায়, অপর দুইটি বহিনও সেখানে হাজির হয়। এরা যে মানুষের মনের ভিতরে ঢুকে, সে মানুষের মনে শান্তি থাকে না; জীবনে সুখ কিম্বা উন্নতি হয় না। তুমি যদি কেবল আপনার বিষয়ে চেতনাটিকে জাগাইয়া রাখিয়া অহরহঃ আপনার কথাই ভাবিতে থাক, জীবনে তুমি একটিও বড় কাজ করিতে পারিবে না। লাফাইয়া উঁচুতে উঠিতে হইলে, প্রথমে আপনার শরীরটাকে যেমন কোঁকড়াইয়া ছোট করিয়া লইতে হয়, তেমনি যে আপনাকে ধনে, মানে বড় করিতে চায়, তাহাকে প্রথমে আপনার ভাবনাটুকুকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে হইবে। আমি কি কি পারি, এ বিচার করিবার সময়ে আপনাকে বুঝিয়া-পড়িয়া দেখা চলে; কিন্তু আমি অমুক অমুক কাজ করিতে পারি না, এইরকম যদি অনবরত ভাবা যায়, তাহা হইলে কিছু দিন বাদে দেখিতে পাওয়া যায়, আমি কিছুই পারি না! আপনার ক্ষমতার বিষয়ে কখন কখন ভাবা ভাল; আপনার অক্ষমতার বিষয়ে কখনই ভাবা উচিত নয়।

যাহারা সর্ব্বদা ভয়ে মরে আর ভারি লাজুক, তাহারাই কেবল সর্ব্বদা আপনার বিষয়ে ভাবিয়া বিষণ্ন হইয়া থাকে। এরকম লোকগুলা যেন মনে করে, জগৎশুদ্ধ লোকের আর কোন কাজ নাই, তাহারা কেবল তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছে। তাহাদের ভাবনাগুলার মুখ ভিতরদিকে; তাই তাহারা অনবরত আপনাদেরই তৌল করিতেছে—চিরিতেছে-কাড়িতেছে। ইহারা লোকের কথায় বাঁচে, আবার লোকেরই কথায় মরে! এই লোকগুলা একবার যদি কোনরকমে আপনাদের ভাবনা ভুলিতে পারে; তাহা হইলে তাহারা যে কি স্বাধীনতা, স্বচ্ছন্দতা ও স্ফূর্ত্তি-লাভ করিতেছে, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে। তখন তাহারা আপনাদের সফলতায় আপনারাই চমৎকৃত হইবে।

অনেক তরুণ ও তরুণী—পাছে লোকে কিছু বলে, এই ভয়ে মনের ইচ্ছা মনেই লোপ পাওয়াইতেছে। ইহাদের হৃদয়ে একটুও তাপ সহে না, তাই ইহারা আপনাদিগকে আপনাদের মধ্যেই সর্ব্বদা লুকাইয়া রাখিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে। 'লোকের কথা সহিতে পারিলে, আমার এ দুর্দ্দশা হ'বে কেন?'—এইরূপ একটি আক্ষেপ অনেকেরই মুখে শুনা যায়। লজ্জাবতী-লতার মত হৃদয় লইয়া ইহারা শেষে ভীরু ও ক্লীব হইয়া পড়ে।

যে পুরুষ বা স্ত্রী আপনাকেই কি-যেন-কি মনে করিয়া থাকে, সে-ই বড় অভিমানী হয়। এই ভাবটাকে ঠিক গর্ব্ব বা আত্মাদর বলা যায় না, তবু এই ভাবটা যাহার হৃদয়ে থাকে, সে আপনার ভাবনা লইয়া এমনই অস্থির হইয়া থাকে যে, আর সমস্ত ভাবনা তাহার মনে ঠাঁই পায় না। তাহার ভয় এই, সে যেন হাটের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তা, কাজ-কর্ম্ম করিতেছে, আর সকলে হাঁ করিয়া তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। সে মনে করে, লোকের আর খাইয়া-দাইয়া কাজ নাই, তাহারা কেবল তাহারই কথা লইয়া ঘোঁট পাকাইতেছে, ঠাট্টা-মস্করা করিতেছে; এদিকে হয়ত লোকে সে সব কিছুই করিতেছে না। সে বুঝে না যে, সব লোকেরই নিজের নিজের এক-একটা কাজ আছে, তাহার কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার তাহাদের একটুও ফুরসৎ নাই। এইজন্য এমন হইতে পারে যে, সে যে তাহাদের প্রতিবেশী, এ কথাটাও হয়ত তাহাদের সকল সময়ে খেয়ালের মধ্যে থাকে না। এরকম লোকের সব থাকিতেও নাই; কারণ এমন লোক আপনার শক্তিকে বিশ্বাস করে না।

যাহা হউক, এ রোগের দাওয়াই কি? আপনার বিষয়ে, যত পার, কম ভাবিবে, পরের বিষয় বেশী করিয়া ভাবিবে। লোকদের সঙ্গে খুব মিলা-মিশা করিবে। আপনার বিষয়ে ছাড়া অন্যের বিষয়ে মন দিবে। লোকে একটা কথা বলিলেই, সে কথাটি লইয়া মনে মনে অনবরত তোলা-পাড়া করিতে থাকিও না। লোকের সর্ব্বদাই লোকের মনে কষ্ট দিবার ইচ্ছা হয়, মানুষকে এমন নীচ ভাবিও না। যে লোক আপনার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝে, আর প্রতিবেশীদেরও তেমনই খাতির করে, সে লোকের আত্ম-চেতনা তত সজাগ হয় না। যে যুবক বড় অভিমানী, তাহাকে একটা বড় আফিসে বা কারখানায় কাজ করিতে পাঠান উচিত। তাহা হইলে সে বুঝিবে যে, সে-ছাড়া জগতে আরও ঢের লোক আছে, তাহাদেরও একটি-না-একটি কাজ আছে, তাহারা সে কাজ লইয়াই ব্যস্ত; ভুল করিলে, তাহাদেরও লোকে ঠাট্টা করে, তাহারা তাহাতে মূর্চ্ছা যায় না—হাসে। তখন সেও সঙ্গগুণে মানুষের কথা বরদাস্ত করিতে শিখিবে।

কেরাণী যদি বড় বেশী অভিমানী হয়, তাহা হইলে সে কোন জায়গায় দুই দিনের বেশী টিকিতে পারিবে না। লেখক যদি অভিমানী হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকার হইবার সাধে তাহাকে শীঘ্রই জলাঞ্জলি দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক যদি অভিমানী হয়, তাহা হইলে ছেলেরাই তাহার চাকরী ঘুচাইয়া দিবে। গায়ক, চিত্রকর, বক্তা প্রভৃতি যদি অভিমানী হয়, তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না।

তুমি যাহাই হও না কেন, এই কথাটি মনে রাখিও, তুমি যত সামান্য কারণে হৃদয়ে ব্যথা পাও, জগতের লোক তত সামান্য কারণে নিষ্ঠুর হইতে চাহে না। সকলেই আপনার আপনার মাথার ঘায়ে পাগল। তাহাদেরও পুত্র-পরিবার আছে। তুমিত কেবলই বলিতেছ—"ছুঁয়ো না আমায়!" কিন্তু কাহাকে বলিতেছ? কেহ তোমাকে ছুঁইতে চাহেই না। তাহারা তাহাদের কাজে মন দিয়া আছে, তুমিও তোমার কাজে মন দাও, মনের ও রোগটা শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।

আব্‌দুল

লাহোরের—ইস্‌লামিয়া বোডিংএর দ্বিতীয় মৌলভী-মহাশয় যে ঘরে উক্ত বোডিংএর প্রবেশিকা-শ্রেণীর ছেলেরা পড়িতেছিল, সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আব্‌দুল কোথায়?"

চারি-পাঁচজন বালক একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"জি, জানি না!" মৌলভী সাহেব কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন,—"জান না? এ হপ্তায় কারুরি বাইরে যা'বার হুকুম নেই, তাও কি জান না? আব্‌দুল কেন হুকুম মানে নি? কখন্ সে বা'র হ'য়ে গেছে? আবু, তুমি কি জান, ঠিক ঠিক 'বাতাও'।"

সর্দ্দার-পড়ুয়া আবু কহিল,—"সে ঘণ্টাখানিক আগে বা'র হ'য়ে গেছে। তা'র পরথেকে আমি আর তা'কে দেখি নি। তা'ই আমি আপনাকে একথা জানা'ব মনে কচ্ছিলুম।"

এই বলিয়া সে একটু ঘৃণা-সূচক মৃদু হাস্য করিল।

প্রকোষ্ঠের পিছন-হইতে লুৎফর তাহার সেই হাস্য-লক্ষ্য করিল, তাহার আবুর উপর বেশ একটু ক্রোধোদ্রেক হইল। আব্‌দুল ও লুৎফরে বড় বন্ধুতা। লুৎফর জানিত যে, আবুর আব্‌দুলের ও তাহার অনুগত বয়ঃকনিষ্ঠ বালক লতিফের উপর বড় রাগ। বোর্ডিংএর ছুটি হইলে, আব্‌দুল লুৎফরের বাড়ীতেই গিয়া থাকে, কারণ তাহার কেহ নাই; তাহার এক দূরাত্মীয় দয়া করিয়া তাহার বোর্ডিংএর ব্যয়টুকুমাত্র বহন করেন, ছুটীর সময় লুৎফর তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে না লইয়া গেলে, তাহাকে বোর্ডিংএই পড়িয়া থাকিতে হইত। আব্‌দুলের পড়াশুনায় খুব মন; সকলেই জানে, সে আমীরালি-বৃত্তিটি লাভ করিয়া আলিগড়-কলেজে পড়িতে যাইবার জন্ত বড় যত্ন করিতেছে।

মুর্‌সিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব।

আব্‌দুল এই বোর্ডিংএর বোর্ডারমাত্রেরই প্রিয়পাত্র। তাই তাহারা প্রায় সকলেই আশা করিত যে, আব্‌দুলই ঐ বৃত্তিটী পাইবে; তবে তাহার কয়েকজন প্রতিদ্বন্দী ছিল, তাহারা অবশ্য সে আশা করিত না। আব্‌দুলের উচ্ছৃঙ্খল সাহস ও ক্রীড়াকৌতুক-পটুতার মধ্যে এমন কিছু একটা মোহ ছিল, যে কারণে প্রায় প্রত্যেক বালকেই তাহাকে তাহাদের নায়ক করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রিকেট-খেলায় সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দাঁড় টানিতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা পটু, সন্তরণে তাহারই 'দম' সবচেয়ে বেশী, ফচ্‌কিমী-ফিচ্‌লেমী, দুঃসাহসের কার্য্যে সে-ই অগ্রণী। কিন্তু হেডমৌলভীসাহেব আজিকালি আর তাহাকে দেখিতে পারেন না। কারণ বোর্ডিংএ যখন যে গোলোযোগ উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে আব্‌দুল কোন-না-কোন-প্রকারে জড়িত থাকিবেই। তদ্ভিন্ন সকলকার দোষ ঢাকা তাহার একটা বিশ্রী রোগ! এই-জন্য হেডমৌলভীসাহেব তাহাকে অনেকবার "ইয়াদ" করাইয়া দিয়াছেন যে, এইবার কোন "কানুনের বরখেলাপ" হইলে, তাহাকে বোর্ডিংহইতে বিতাড়িত হইতে হইবে।

হেডমৌলভী, নাজির উদ্দিন খোন্দকারসাহেব, পূর্ব্বে আব্‌দুলকে ভাল বাসিতেন, তাহার কারণ, সে পড়া-শুনায় ভাল, তা-ছাড়া সে পরুষপ্রকৃতি বালকদিগকে বশীভূত করিতে বিলক্ষণ পটু। কিন্তু মধ্যে তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া একটা দুরন্তপনাতে লিপ্ত হওয়া-অবধি তিনি আর তাহাকে দু'-চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না।

দ্বিতীয় মৌলভী সকল কথা শুনিয়া সেই প্রকোষ্ঠহইতে যখন গম্ভীরমুখে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, তখন লুৎফরের তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া বড় অস্বস্তি-বোধ হইতেছিল। তিনি যেই বাহির

হইয়া গেলেন, অমনি সে আবুর প্রতি রোষ-কষায়িত-লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বেইমান!"

তচ্ছ্রবণে আবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বেইমান কি, আবদুলটা 'আওয়াল নম্বরের গাদ্‌ধা'। যে নিজেই নিজের 'আখের বরবাদ' কচ্ছে—আমীরালি-জলপানি পা'বে না। আমি তা'র কি করেছি?"

লুৎফর ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"না পায়, নাই পা'বে; তোর কি? হিংসেয় 'কলিজে' ফেটে যাচ্ছে, না? তোর নসীবে খোদা যে 'খিজমতী' লিখে রেখেছেন, সে খবর কি রাখিস্?"

রাগে আবুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। সে একগাছা "রুল" হাতে করিয়া লুৎফরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। অন্য ছেলেরা তাহার দলে নয়, সকলেরই আবদুলের প্রতি অনুরাগ; তাহাদের ধারণা আবুর হৃদয় বড় নীচ, তা'ছাড়া কয়দিনের কানুনের কড়া-কড়িতে তাহাদের মেজাজও বড় গরম হইয়া আছে, তাহারা বেশ একটী খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে প্রস্তুত, এমন সময়ে একজন নিম্ন-শ্রেণীর মৌলভী তাহাদের পড়া-শুনা দেখিতে আসিলেন। ফলে সে যুদ্ধোদ্যম অজাযুদ্ধে পরিণত হইল।

হেডমৌলভীর ঘরে বসিয়া দ্বিতীয় মৌলভী অনেকক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

হেডমৌলভী বলিতেছিলেন,—"নূরুদ্দিন-মিঞা, এবার ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে, হেস্তনেস্ত একটা কিছু না করিলে, চ'লবে না। আবদুল-ছোক্‌রা অনেকবার আমাকে 'নারাজ' করেছে। 'কানুনের তাঁবে' সে 'মুছলমে' থাক্‌তে চায় না। আমি তা'কে আগেই ব'লে দিয়েছিলুম যে, এইবার তা'র কোন 'কসুর' পেলে, আর আমি তা'কে বোর্ডিংএ রা'খ্‌ব না। এই চুরীটাতে আমার আবদুলের উপরই বড় 'শুভা' (সন্দেহ) হচ্ছে।"

দ্বিতীয় মৌলভী কহিলেন,—"আব্দুল-ছোক্‌রা বড় 'বে-আদব' বড় 'বে-খেয়াল', এ আমিও মানি; অন্যের 'কসুর' ঢা'কবার জন্যেই ও ঐরকম করে; কিন্তু সে যে 'চোরী' ক'রবে, এটা আমার মন নিচ্ছে না।"

হেড। খোদা করে, তা'ই যেন সত্য হয়, কিন্তু আমার 'শুভা'টা এবার বড় বেশী হচ্ছে। ওর টাকার খাঁকৃতি বড় বেশী; অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। তাঁ'র ওপরে, দেখুন, আজ রাত্রে ও আবার কোথায় গিয়েছে। আপনি 'তল্লাস' করুন, কিন্তু একটু দাঁড়ান, আপনি এই চিঠিখানাও পড়ে যান।

সেই চিঠিখানি পড়িয়া দ্বিতীয় মৌলভীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। চিঠিখানা 'টাইপ'-করা, বেনামী; কিন্তু কা'কে ধরা যায়, প্রবেশিকা-শ্রেণীর সকল ছেলেরই "হেরই-টাইপরাইটার"-ব্যবহার করিবার হুকুম আছে। চিঠিখানিতে কোন বৈরিতাত্মক ভাব নাই, উহা যেন প্রবেশিকা-শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্রে মিলিয়া লিখিয়াছে। শেষে লেখা আছে, আবদুল প্রায়ই নিয়মলঙ্ঘন করে, তাহাকে অন্ততঃ একবার নিরীহতা প্রতিপন্ন করিতে বলা উচিত। সমস্ত চিঠিখানি পড়িয়া নূরুদ্দীন-মিঞা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—এ কোন 'হারামীর' কাজ। ওক্লাসে এরকম কোন ছেলে আছে, এ তাঁহার 'মালুম' ছিল না। হেডমৌলভী-'সাহাব' কি 'ফরমাইতেছেন'?

হেডমৌলভী-সাহেবের মত এই হইল যে, আবদুলকে 'জবাব-দিহি' করিতে হইবে। আজ যদি সে সত্য কথা না বলে, তাহা হইলে তাহাকে বোর্ডিংহইতে 'নিকাল' দেওয়া হইবে।

৩

যাহাকে লইয়া এত গোল হইতেছে, সেই আবদুল এখন কোথায়?—ইসলামিয়া বোর্ডিংএর কাছে, কান্‌হাইয়া বলিয়া এক অর্থগৃধ্নু, ইতরপ্রকৃতি বেণিয়ার দোকান আছে। সেই দোকানে সে কি যে না বিক্রয় করে, তাহাই বলা দুষ্কর। আবদুল এখন এক গৃহান্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিপণিপ্রতি খর-দৃষ্টিপাত করিতেছে। আবদুল ঐ ঘৃণিত বেণিয়ার দোকানে বড় যায় না। কারণ সে কানহাইয়াকে দু'চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। ১ম কারণ, ব্যাঘ্র যেমন নরশোণিতপ্রিয়, সে তেমনি সুদপ্রিয়। ২য় কারণ, উহার সহিত তাহার পরমশত্রু আবুর বড়ই বন্ধুতা। ৩য় কারণ, ঐ বেণিয়া দিনের পর দিন তাহার প্রিয়-বন্ধু লতিফকে কলে কৌশলে তাহার মুঠার ভিতর করিয়া ফেলি-তেছে। লতিফের পুরাণো ডাক-টিকিট-সংগ্রহের একটা বিষম বাতিক ছিল, তাই সে প্রায়ই কান্‌হাইয়ার দোকানে যাইত, ঐ বেণিয়া উহারও কারবার করিত; ইহাতে তাহার সুহৃদ্ আবদুলের প্রাণে উদ্বেগ-সঞ্চার হইতেছিল।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আবদুল ভাবিতেছিল,—"এখন বু'ঝতে পা'চ্ছি, লতিফের ডাক-টিকিট কি ক'রে অত বেশী হ'য়েছে।" লতিফ অগ্র সন্ধ্যাবেলা নিয়মলঙ্ঘন করিয়া কেন বাহিরে যাইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য আবদুল আপনিও নিয়ম-লঙ্ঘন এবং তাহার নিজের পড়া-শুনার ক্ষতি করিয়াছে, সে বোর্ডিংএর লাইব্রেরীহইতে একখানা বই লইয়া পড়িবার ঘরে পড়িতে যাইতে-ছিল, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, লতিফ খিড়কীর দরজা খুলিয়া পলাইতেছে, এবং সে বাহির হইয়া গেলে, আবু খিড়কীর দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিল।

তাহা দেখিয়া আবদুল আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"ঐ ছোঁড়া-টাকে আমি 'জাহান্নমে' যেতে দিতে পারি নে; এখন ওর কোথায় নেমাজ প'ড়ে ঘুমোতে যা'বার কথা, তা' না কোথায় বেরুল, 'হারামী' আবুটা সঙ্গে আছে। আমাকে ও 'গাদ্‌-ধার' পিছু নিতেই হ'ল।"

তাই সে বাহিরে আসিয়াছে। যাহা হউক, সে দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে লতিফ তাড়াতাড়ি দোকান-হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন আবদুলের প্রায় গায়ের উপরই আসিয়া পড়িল।

আবদুল কহিল,—"কে রে, লতিফ, তুই? এ সময়ে কানহাইয়ার দোকানে তুই—কি কচ্ছিলি?—অ্যাঁ?"

লতিফ। আ—আমি—কিচ্ছু না। ছেড়ে দাও, দেরি হয়ে গেছে—

আবদুল। কি, আমার কাছে ভাঁড়াচ্ছিস্? কবুল যা'বি নি? অত ডাক-টিকিট তুই কোত্থেকে পেয়েছিস, আমাকে বল্‌তেই হ'বে।

লতিফ। টিকিট? কই, কোথায়? ওঃ, সে আমি কিনেছি।

আবদুল। কিনেছিস? হাঁ, তা' হ'তে পারে! কিন্তু পয়সা কোত্থেকে পেলি? শোন্, লতিফ, আমার কাছে তোর 'ঝুট' ব'লে কি লাভ হচ্ছে—আমার 'আঁখে' কি তুই 'গার্দ্দা' দিতে পারিস? সব কথা ভেঙে চূরে বল্, 'কুছ্ ভি ডর' নেই। ওই সয়তান কানহাইয়ার সঙ্গে তোর কি হ'চ্ছে? তুই আজ 'কানুন বরখেলাফ' ক'রে বাইরে এসেছিস কেন?

লতিফ। 'তুমহারা কসম, আবদুল-ভেইয়,' এতে আমার 'পুরা কসুর' নেই। তুমি কি আমার নামে 'চুগলী খাবে'?

আবদুল। না; কিন্তু তোর আমাকে 'তামাম হাল বাৎলান' চাই।

লতিফ। তুমি ঠিক ব'লছ 'চুগলী খাবে না'? 'বেইমানী' ক'রবে না? আল্লার কিরে?

আবদুল। 'কিরা' আমি খা'ব না, তবে আমি ব'লছি, আমি একথা কাউকে ব'লব না। আমি কি 'চুগল্-খোর'? সেই টিকিটগুলো তুই কোত্থেকে পেয়েছিস?

লতিফ। কানহাইয়ার কাছথেকে।

আবদুল। দাম দিয়েছিস্?

লতিফ। হাঁ, তা'র মানে আমি তার কতকগুলো টিকিট এখনই ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলুম।

আবদুল। লতিফ, দেখ্, তুই এখনও অনেক কথা 'ছিপাচ্ছিস্'। আমার ওপর তোর 'ইমান্' নেই? তুই বিশ্বাস করিস্ আর নাই করিস্, আমি তোকে বাঁচা'বার জন্যেই আজ বা'র হ'য়ে এসেছি।

লতিফ। 'মেরে পিয়ারা ভাইয়া', আমি তা' জানি। কিন্তু সত্যি তুমি এসব কথা কারুর কাছে বেফাঁস ক'রবে না?

আবদুল। আবার অবিশ্বাস কচ্ছিস্? আমি কি কখনও কারুর সঙ্গে 'বেইমানী' করেছি? লতিফ, তুই এমন 'বে-ইনসাফী' কেন? আমাকে সব কথা খুলে' বল্, আমি যদি পারি, তোকে 'বেশাক' বাঁচাব।

তখন অভাগ্য লতিফ আগাগোড়া সকল কথা খুলিয়া বলিল,—আবুর প্ররোচনায় সে বার বার কানহাইয়ার নিকটহইতে ধার করিয়া করিয়া দেশবিদেশের পুরাণো ষ্ট্যাম্প-ক্রয় করে, শেষে সে কানহাইয়ার মুঠার ভিতর হইয়া পড়িল। কানহাইয়া বলিল, আমি যাহা তোমাকে করিতে বলি, তাহা তুমি যদি না কর, তাহা হইলে তুমি যে আমার কাছে কত ধার, তাহা মৌলভীসাহাবকে জানাইয়া দিব। মৌলভী-সাহাব একদিন কানহাইয়ার সামনে একটি বাক্সে দুইটি অঙ্গুরীয় রাখেন। কানহাইয়া তা'ই লতিফকে বলে,—ঐ আঙটী-দুটি আমার চাই, তুমি অমুক দিন রাত বারোটার সময়ে মৌলভীসাহেবের দফ্‌তরের অমুক দিক্‌কার জানালা খুলিয়া দিবে। লতিফ তখন সেই 'চোট্টার' হাতে, সে তাহাই করিতে সম্মত হয়।

আবদুল। তা' হলে তুইই আংটী-চুরী করেছিস্?

লতিফ। না, 'ভেইয়া'। আমার দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি, কে জানলা আর ডেস্ক দুইই খুলেছে।

আবদুল। তা' হ'লে তুই কিছু করিস্ নি?

লতিফ। না; তবে কে একজন আমাকে সে রাত্রে সে ঘর-থেকে বা'র-হ'তে দেখেছে, সে আমারই ঘাড়ে দোষ চাপা'বে।

আবদুল। কিন্তু আজ তুই তবে কানহাইয়ার দোকানে কেন গিয়েছিলি?

লতিফ। আমি সেদিন তা'কে জানলা খুলে দিইনি ব'লে, আজ আমাকে সব ষ্ট্যাম্প তা'কে ফিরিয়ে দিতে যেতে হ'য়েছিল—

"কে ওখানে? আবদুল?"—দ্বিতীয় মৌলভীসাহেব আসিয়া এই প্রশ্ন করিলেন। লতিফ তখন মৌলভীসাহেব তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে ভাবিয়া ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! আর নিতান্ত কাতরস্বরে আবদুলকে চুপি চুপি অনুনয় করিয়া কহিতেছে,—"দোহাই, আবদুল-ভাইয়া, আমাকে ধরিয়ে দিও না।"

আবদুল বলিল,—'গাদ্‌ধা' কোথাকার! অন্ধকারে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাক—'চিল্লাস' নি।" এই বলিয়া সে অন্ধকারহইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—"'জি-সাহাব', আপনি কি আমাকে খুঁজচেন?"

"'বড়া' মৌলভীসাহাব তোমাকে তল্লাস করছেন, শীগ্‌গির এস!"

এই বলিয়া দ্বিতীয় মৌলভীসাহেব তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে হেড্-মৌলভীর কুঠরীর অভিমুখে লইয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ।)

——:০:——

গাধার পাঁচালী

(বালকের রচনা।)

এক যে ছিল বুড়ো গাধা, গায়ে নাইক মোটেই বল,
ভারী মোট তার ঘাড়ে দিলে, ব্যস! হ'য়ে পড়লো অচল।
তার মনিব সদাই ভাবে মনে, কেমনে আপদ্ করি দূর,
প্রভুর ইচ্ছা বুঝতে পেরে গাধার বুক কাঁপে দুরদুর্।
অসহ্য হ'ল তার প্রভুর গৃহে হ'য়ে থাকা চিরবন্দী,
তাই সে অনেক ভেবে চিন্তে বাহির করলে এক ফন্দী।
মনে মনে ব'লে সে, গায়ে নাই যদিও বল,
গলা বড় মিষ্টি আমার, খুল্‌বো পাঁচালীর দল।
এই ভেবে সে হাসিমুখে সহর-পানে ধায়,
পথে দেখে, কুকুর এক অতি রুগ্ন, শীর্ণকায়।
গাধা তখন জিজ্ঞাসে তারে, কোথায় গেল তোমার তেজ,
পথের ধারে আছ কেন পড়ে গুটিয়ে লম্বা লেজ?
কুকুর বলে, বৃদ্ধ বয়সে শিকার নাহি পাই,
এই দোষে প্রভু তাড়িয়ে দেছে, ভাবছি কোথা যাই।
গাধা বলে, তোমার বরাত মন্দ, তা করবে কি আর ভাই?
তোমার আমার সমান দশা, চল একসাথে মোরা যাই।
গলা দেখ্‌ছি, তোমার মন্দ নয়, ক'রে দিক্ না প্রভু দূর,
আমি গাইব যখন মধুর গান, তুমি দিও তখন সুর।
দুজনে মিলে দেখ্‌তে পায় অনেক দূর গিয়ে,
বৃদ্ধ বিড়াল কাঁদ্‌ছে পথে মাথায় হাত দিয়ে।
গাধা বলে, ওগো বিড়াল, তোমার হল কি!
গরম দুধ জোটে না বুঝি? তাই কাঁদ্‌ছ ছিঃ!
বিড়াল বলে, বুড়ো হয়েছি, দাঁতে নাইক ধার,
ধ'র্‌লে ইঁদুর পালিয়ে যায়, কর্ত্রী দেন প্রহার।
কোথায় গেলে হাড় জুড়োবে, তাই ভাব্‌ছি মনে,
সবাই বলে, শান্তি আছে বাস করলে বনে।
শুনে বলে গাধা, কি দুঃখেতে তুমি হবে বনবাসী?
আমার দলে যোগ দাও এসে, ফুটবে মুখে হাসি।
মহানন্দে যাচ্ছে তা'রা বিড়াল ল'য়ে সাথে,
দেখ্‌তে পেলে এক মোরগ চীৎকার করে পথে।
বলে গাধা, ওহে মোরগ, এত চেঁচাও কেন ছাই,
সবাই ঘুমোয় দুপুরবেলা তাদের জাগাও কেন ভাই?
মোরগ বলে, কি ব'লব দুঃখের কথা, বুক যাচ্ছে ফেটে,
মনিব আমার লোক খাওয়াবে সাঁঝে মোরে কেটে।
গাধা ব'লে, মোর সাথে যাও যদি, বাঁচবে তোমার প্রাণ,
জোর গলা দেখ্‌ছি তোমার, গাইতে পারবে গান।
তারা দল বেঁধে গাইলে কত, কতই করলে নৃত্য,
গাধা হ'ল দলের মালিক, আর সব তার ভৃত্য।
কিছুদূর না যেতে যেতে হ'য়ে এল রাত্রি,
গাছের উপর করলে বাসা চারটী সহর-যাত্রী।
উঠ্‌ল মোরগ গাছের মাথায়, বিড়াল রইল ডালে,
কুকুর আর গর্দ্দভ মিলে রইল বৃক্ষের তলে।

অনেক দূরে জ্বল্‌ছে আলো, মোরগ তাই দেখে,
ভয় হ'ল তার মনে মনে, দিলে সকলে ডেকে।
মাথা নেড়ে বলে গাধা, কোন ভয়ের কারণ নাই,
আহার কিছু মিলতে পারে, চল ওখানে যাই।
বনের মাঝে মস্ত বাড়ী, বাজছে কত বাদ্য,
দস্যুর দল আহারে বসেছে, সম্মুখে মধুর খাদ্য।
এরকম দেখে ব'ল্‌ল গাধা, মধুর বাদ্য হয়,
প্রস্তুত হও সবাই মিলে, করবো প্রথম অভিনয়।
জানালা ধ'রে দাঁড়ায় গাধা, তার পৃষ্ঠে কুকুর রয়,
তার উপরে রইল বিড়াল, চূড়ায় মোরগ-মহাশয়।
গাধা ডাকে, গাঁ গাঁ, কুকুর ডাকে, ঘেউ,
মোরগ ডাকে, কোকর-- কোঁ, বিড়াল ডাকে, মিউ।
সবার ডাক্ মিলে হ'ল আওয়াজ বিটকিচ্ছি,
দস্যুর দলে চমকে উঠে, ভাবে, এ আবার কি?
ভয়ে কারও কথা সরে না, এ ওর মুখের পানে চায়,
সবাই ভাবে মনে মনে, আজ প্রাণটী বুঝি যায়।
খাবার দাবার রইল পড়ে, তারা ছুটল প্রাণপণে,
অনেক মাঠ পেরিয়ে গিয়ে আড্ডা করলে এক বনে।
এদিকে গাধার দল মহাসুখী, তাদের হাসির নাইক শেষ,
বাড়ী ঢুকে ভাবে তারা, বাঃ—মজা হ'ল ত বেশ।
হরেক রকম খাবার সব সাজান ছিল ঘরে,
এমন কসে খেলে তারা, শেষে ঢেকুর তুলে মরে।
পেটটী ভরে খেয়ে তারা শেষে শোবার চেষ্টা দেখে,
উনানে ছিল ছায়ের গাদা, তার মধ্যে বিড়াল ঢোকে।
উঠানেতে রইল গাধা, কুকুর দুয়ার-ধারে,
পায়রার খোপের মধ্যে মোরগ গেল শোবার তরে।
চারদিক্ সব চুপ্‌চাপ্ দেখে ডাকাত-সর্দ্দার কয়,
না দেখে শুনে কেন মোরা মান্‌লুম পরাজয়?
এখন দেখ্‌ছি, চুপ্‌চাপ্ সব, গোলমাল মোটে নাই,
কি ব্যাপারটা হয়েছিল, দেখে আস্‌তে পার ভাই?
সিন্দুকভরা মণিমুক্তা, কত কষ্টের ধন,
পরের হাতে তুলে দিবে কেন অকারণ!
এই না শুনে দলের মধ্যে বেশী সাহস যার,
বাড়ীর পানে ছুটল সে, দেখ্‌তে কি ব্যাপার।
গিয়ে দেখে আঁধার সব, দেখা নাহি যায়,
আগুন্ আন্‌তে ডাকাত তাই রসুই ঘরে যায়।
সেথা অন্ধকারে বিড়াল-চক্ষু আগুনের মত জ্বলে,
টপ্ করে তাই ধরে ডাকাত গরম কয়লা ব'লে।
মজা তখন দেখে কে! লাফিয়ে উঠে ছুলো,
আঁচড় কামড় দিয়ে তারে, আবার গিয়ে শুলো।
ভয় পেয়ে ডাকাত তখন পালিয়ে যেতে চায়,
ঘরের পাশে কুকুর ছিল, কামড়ে নিল পায়।

পা বেয়ে রক্ত পড়ে ঝর্ ঝর্ ঝর্ ক'রে,
তবু ডাকাত দিচ্ছে ছুট, নাহি পেছন ফেরে।
ঘর-বাড়ী সেই পার হয়ে উঠান-পানে গেছে,
গাধা অমনি কসায় লাথি সটান্ তার পেটে।
তবু ডাকাতের হুঁস নাই, সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে,
গোলমাল ও চীৎকারে মোরগ জেগে উঠে।
চোখ বুজে' হাই তুলে' সে ডাকে কোকর—কোঁ,
ডাকাতের প্রাণ শুকিয়ে গেল, ছুটল—বোঁ বোঁ।
একদৌড়েতে হাজির হ'ল সর্দ্দারের কাছে,
ব্যাপার দেখে' সর্দ্দার বলে, এখনও তারা আছে?
নিশ্বাস ছেড়ে' ডাকাত বলে, তথায় বিষম কাণ্ড,
ভূত প্রেত আর দত্যি দানব করুচে লণ্ড ভণ্ড।
সেই গিয়েছি রান্নাঘরে আগুন আন্‌বার তরে,
উনানে ছিল এক শাকচুন্নী, আমার হাতটী কামড়ে ধরে।
হাত যখন ছাড়িয়ে নিলুম, সে বেটী তখন হাসে,
একদৌড়েতে আমি তখন এলুম দুয়ারের পাশে।
সেথা ছিল, এক মস্ত ভূত ছুরী হাতে ক'রে,
প্যাঁক্ ক'রে দিলে পাটা কেটে, এই দেখুন রক্ত ঝরে।
কাঠের পা গড়াব ভাবলুম, যদি বাঁচি প্রাণে,
একলম্ফেতে এলুম আমি বাড়ীর উঠানে।
ওঃ—বাবা, সে কথা বল্‌তে গেলে শিউরে উঠে গা,
উঠানে ছিল এক ব্রহ্মদত্যি, এত বড় তার হাঁ!
হাতে ছিল লোহার গদা, মারলে তাই পেটে,
মনে মনে ভাবলুম আমি, গেল পেটটা ফেটে'।
অনেক কষ্টে কাঁদতে কাঁদতে এলুম যখন বাহিরে,
কর্ত্তা ভূত চেঁচিয়ে বলে, ধর ত কেউ ওরে।
চেঁচানির কথা বল্‌ব কি গো, কাঁপল ঘর-দোর,
প্রাণে যে আমি বেঁচে গেছি, নেহাৎ বরাত জোর।
তাই শুনে সর্দ্দার বলে, দরকার নেই ধনে,
টাকা-কড়ি কত হ'বে, যদি বাঁচি প্রাণে।
ভূতের সঙ্গে পেরে উঠা সহজ কি গো কাজ?
অন্য দেশে ক'রব বাস, চল সবে আজ।
এদিকে সকালে উঠে' মোরগ সবায় জিজ্ঞাসা করে,
বল্‌তে পার, গোলমাল হ'ল রাত্রে কিসের তরে?
বুক ফুলিয়ে ব'লে গাধা, বিশেষ কিছু নয়,
গানের বায়না দিতে কেউ এসেছিল বোধ হয়।
সেইদিনথেকে আর কোন উপদ্রব নাহি হ'ত,
গাধার দল রইল তথা সুখে রাজার মত!

শ্রীদাশরথী চৌধুরী।

চিত্র-প্রতিযোগিতা।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "গাধার পাঁচালী"-শীর্ষক হাসির কবিতাটির কোন একটি উপযুক্ত অংশ-অবলম্বনে একটি হাস্যোদ্দীপক চিত্রাঙ্কণ করিতে হইবে। ঐ চিত্রটি বর্ত্তমান-মাসের শেষ-তারিখের মধ্যে

"বালক"-সম্পাদক,
২৩ নং চৌরঙ্গী রোড; কলিকাতা

—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যাহার চিত্রটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহার চিত্রটি "বালকে" প্রকাশিত হইবে। ঐ চিত্রের এক কোণে চিত্রকরের নাম, ধাম ও বয়স লিখিতে হইবে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রকর একখানি ইংরাজী পুস্তক-পুরস্কার পাইবেন। প্রতিযোগিতার নিমিত্ত প্রেরিত চিত্রমাত্রই "বালক"-পরিচালকগণের সম্পত্তি হইবে।

"বালক"-সম্পাদক।

বালক

২য় বর্ষ।] অক্টোবর, ১৯১৩। [১০ম সংখ্যা

মার্জ্জনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জয়ন্ত আসিয়া বৃদ্ধা গৌতমীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আমার তবে ক্রোধ না করিলেই, ভাল হইত।" তাহার পর কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণমুখে নীরব থাকিয়া গৌতমীর দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে কহিল,—"কিন্তু আপনি কি করিয়া এত উঁচুতে উঠিলেন ?"

গৌতমী হাসিয়া কহিলেন,—"আমার মত বৃদ্ধার পক্ষে এই স্থানটি দুরারোহ, সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিষয়ে নক্র আমাকে সাহায্য করিয়াছে ; দুর্গের মধ্যে এই স্থানটিই সে এখন সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ বিবেচনা করে।"

অরবিন্দ কহিল,—"ঐ শুনুন, কুশীয়েরা কি ভয়ানক পদশব্দ করিতেছে! উহারা, বোধ হয়, এখন মহারাজের অন্বেষণ-আরম্ভ করিয়াছে।"

নক্র-বিক্রম কহিলেন,—"অরবিন্দ, সোপান-মুখে গিয়া দাঁড়াও। ঐ সংকীর্ণ সোপান-মুখে একটিমাত্র লোক উহাদিগকে অনেকক্ষণ বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে।"

জয়ন্ত চুপি চুপি বলিল,—"যদি উহারা আমাকে খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে হয়ত আমি দুর্গমধ্যে নাই মনে করিয়া দুর্গত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।"

ইতোমধ্যে অরবিন্দ ও অপর দুইজন যোদ্ধা অপরিসর সোপান-মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে অরবিন্দ শুনিলেন, একটি লোক সেই সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। লোকটা উপরে উঠিয়া অরবিন্দের সম্মুখীন হইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওহে সুর-যুবক, তুমি এখানে কি করিতেছ ?"

অরবিন্দ সংক্ষেপে উত্তর করিলেন,—"আমার কর্ত্তব্য। আমি এখানে এই সোপান-রক্ষা করিতেছি এই বলিয়া তিনি তাঁহার কৃপাণ কোষমুক্ত করিলেন।

তদ্দর্শনে সেই কুশীয় সৈনিক পশ্চাৎপদ হইল। সে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীচে কাহারা ফুসফুস্ করিয়া কি কথোপকথন করিল। তাহার পর আর একজন কুশীয় উপরে উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"ভ্রাতঃ সুর-যুবক, সদাশয়—"

অরবিন্দ উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা করুন।"

কুশীয়। সে কি ভ্রাতঃ, এ কিপ্রকার আচরণ হইতেছে ? ছত্রপতি কুশরাজ এক্ষণে আপনাদের গৃহে অতিথি, আর আপনারা এক্ষণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজকে একটি প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এ কি ভাল হইতেছে ? কুশরাজ এই মুহূর্ত্তেই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

অরবিন্দ উত্তর করিলেন,—"ওহে কুশীয়, তোমাদের রাজা মহারাজকে রাজবন্দী করিয়া রাখিতে চাহেন তাহা কি করিয়া হইতে পারে, আমার পিতা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই দেশের প্রজাপুঞ্জ তাঁহারই হস্তে আপাততঃ বাল-মহারাজকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের আদেশ ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারেন না।"

কুশীয়। অর্থাৎ উদ্ধত, বিদ্রোহী সুর-যুবক, তুমি বাল-মহারাজকে এইস্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া স্বীয় করতলগত করিয়া রাখিতে চাহ। আমি বলিতেছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেই তুমি ভাল করিবে, তাহাতে তাঁহারও ভাল, তোমাদেরও ভাল। ঐ বালক

আপাততঃ রাজবন্দী, এখানে থাকিয়া তিনি কেবল বিদ্রোহাচরণই শিক্ষা করিবেন।

এই সময়ে দুর্গের বাহিরে একটা শ্রবণবধিরকারী ভয়ানক নিনাদ উঠিল। সে ধ্বনি অরবিন্দের প্রভাতে ভৈরবীর আলাপের ন্যায় মধুর লাগিল।

উহা সুরদিগের জয়-ধ্বনি। তচ্ছ্রবণে দুর্গমধ্যস্থিত অন্য সমুদয় সুরগণের হৃদয়ও আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল! জয়ন্ত তো আহ্লাদে উন্মত্তবৎ হইল। তাঁহারা সকলে তাঁহাদিগের ভক্ত প্রজাগণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু নানা চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাহাদের জয়ধ্বনিতে যেন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা ক্রমশঃ রুদ্রমূর্ত্তি-ধারণ করিতে লাগিল। অবশেষে অরবিন্দ সংবাদ দিলেন,—এইবার একজন কুশীয় গোষ্ঠিপতি আসিয়া মিনতি করিতেছেন যে, মহারাজ যেন কুশরাজের কাছে যান।

নক্র-বিক্রম কহিলেন,—"উহাকে বল যে, এই রাজ্যের মন্ত্রণা-সভার অনুমতিব্যতিরেকে আমরা মহারাজকে কুশরাজ-হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না।"

কিয়ৎকাল পরে আবার অরবিন্দ সংবাদ দিলেন,—"এই লোকটি বলিতেছেন যে, আপনি যত ইচ্ছা আপনার লোক লইয়া মহারাজকে পাহারা দিতে পারেন। তিনি জানাইতেছেন যে, কুশরাজের কোন অসদাভিসন্ধি নাই। তিনি বাল-মহারাজকে তাঁহার প্রজাদিগকে দেখাইতে চাহেন, নতুবা তাহারা বলিতেছে যে, দুর্গটি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিতেও ইতস্ততঃ করিবে না। আমি কি লোকটিকে একজন প্রতিভূ পাঠাইতে বলিব?"

নক্র-বিক্রম কহিলেন,—"উহাকে এই উত্তর দাও যে, মহারাজ যে উহাদের হস্তে নিরাপদে থাকিবেন, এই বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি-ভিন্ন তাঁহাকে উহাদের হস্তে দিতে পারি না। একজন মিষ্টভাষী গোষ্ঠিপতি গতকল্য কুশরাজের দক্ষিণে বসিয়া আহার করিতেছিল, তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিতে বল, তাহা হইলে মহারাজকে আমরা উহাদের হস্তে সমর্পণ করিব।"

অরবিন্দ কুশীয় রাজন্যকে ঐ উত্তরই দিলেন। সে সেই সংবাদ লইয়া নীচে নামিয়া গেল। ইতোমধ্যে বহির্দ্দেশে কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন আর একটি অভিনব জয়ধ্বনিও শ্রুত হইল।

তখন নক্র-বিক্রম একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"ঐ, ঐ, বালকটি খুব দ্রুতগামী তো! ভল্লবীর্য্য আসিয়াছেন। এইবার আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম।"

অরবিন্দ সংবাদ দিলেন,—"ভল্লবীর্য্য আসিতেছেন।" কিন্তু ভল্লবীর্য্য নয়, এক স্থূলকায় কুশ-রাজন্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে উঠিল, তাহার অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী দেখিয়াই অনুভূত হইতেছে যে, সে অতি অনিচ্ছায় এইখানে আসিয়াছে। নক্র-বিক্রম তাহার সহিত কোন কথা না কহিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক একটী দারু-পেটিকা দেখাইয়া তদুপরি বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর তাঁহার জননীর উদ্দেশে কহিলেন,—"মাতঃ, মহারাজের যদি কোন অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে আপনার কর্ত্তব্য কি হইবে, জানা রহিল। আসুন, মহারাজ, এইবার আমরা যাই।"

জয়ন্ত অগ্রসর হইল। নক্র-বিক্রম তাহার করগ্রহণ করিলেন। অরবিন্দ তাহার অব্যবহিত পশ্চাতে রহিলেন। তাহার পর, যে কয়জন যোদ্ধাকে লইয়া গেলে, গৌতমী প্রতিভূকে বশে রাখিতে পারেন, সেই কয়েকজন যোদ্ধাকে মহারাজের প্রহরী-স্বরূপে লইয়া সোপানাবতরণ করিতে লাগিলেন।

জয়ন্তকে সুবৃহৎ মন্ত্রণা-কক্ষ্যায় লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে কুশরাজ তখন মনের উদ্বেগে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন; কারণ বাহিরের কোলাহল শুনিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক-একটী প্রস্তর-খণ্ড আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িতেছে।

যে মুহূর্ত্তে জয়ন্ত মন্ত্রণা-কক্ষ্যায় প্রবিষ্ট হইল, ঠিক প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই অন্য এক দ্বারদিয়া ভল্লবীর্য্যও সেই কক্ষ্যাপ্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরের কোলাহলও তন্মুহূর্ত্তে যেন একটু প্রশমিত হইল।

তাঁহাদিগকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া কুশরাজ সক্ষোভে কহিলেন, —"যোদ্ধৃগণ, এসকলের অর্থ কি? আমি ভাল ভাবিয়া আমার মৃত মিত্র বৃক-বিক্রমের অপোগণ্ড পুত্রের ভার-গ্রহণ করিতে এবং কি করিয়া তাঁহার হন্তাকে শাস্তি দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আপনাদের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। তদ্বিনিময়ে আপনারা বালককে অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন, আর তাহার প্রজাদিগকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। আপনারা এইরূপেই কি ছত্রপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন?"

ভল্লবীর্য্য। মহারাজ, আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা এইমাত্র জানি, বাল-মহারাজের প্রজাবৃন্দ আপনার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছে—তাহারা এতদূর উত্তেজিত হইয়াছে যে, আমি এই সময়ে অনুপস্থিত ছিলাম বলিয়া, আমাকেই খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহারা বলিতেছে, আপনি তাহাদের নৃপতিকে তাঁহারই দুর্গে আবদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ না করিলে, তাহারা এই দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

কুশরাজ কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল,—"আপনি সত্যশীল, আমার ভক্তপ্রজা—আপনি আমার সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছেন। আপনি কখন বিদ্রোহাচরণ করিয়া এই দেশকে দুর্নামগ্রস্ত করিবেন না। আপনিই আমাকে পরামর্শ দিউন, কি করিতে হইবে—আমি কি করিয়া এই রুষ্ট লোকগুলাকে শান্ত করিতে পারি—আপনিই তাহা বলিয়া দিউন।"

ভল্লবীর্য্য। আপনি আমাদের বাল-মহারাজকে লইয়া জানালার

উপরে দাঁড় করান, আর ইঁহার প্রজাবর্গের সমক্ষে শপথ করুন যে, আপনি ইঁহার কোন অনিষ্টেচ্ছা করেন না।

কুশরাজ। এস, এস, বৎস জয়ন্ত, আমার নিকটহইতে সরিয়া যাইতেছ কেন? কি করিয়াছি আমি, যে তুমি আমাকে ভয় করিতেছ? তুমি আমার সম্বন্ধে কুকথায় কর্ণপাত করিয়াছ। ভয় কি, এখানে এস, বৎস!

ভল্লুবীর্য্যের ইঙ্গিতে নক্র-বিক্রম জয়ন্তকে কুশ-রাজের কাছে লইয়া গেলেন। কুশরাজ তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে একটী জানালার উপরে তুলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। বাহিরে নিনাদিত হইল,—"জয় মহারাজ জয়ন্তের জয়!"

ইতোমধ্যে ভল্লুবীর্য্য নক্র-বিক্রম ও অরবিন্দকে জানাইলেন যে, সুরদিগের এখন শক্তি-সামর্থ্য অল্প। ছত্রপতির প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং আপাততঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধাইবার আবশ্যকতা নাই। এমন সময়ে অরবিন্দ বলিলেন,—"ঐ শুনুন, কুশরাজ কি বলিতেছেন।"

কুশরাজ বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয় প্রজাগণ, তোমাদের বাল-মহারাজের প্রতি তোমাদের ভক্তি দেখিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমাদিগের প্রজাপুঞ্জ সকলেই এইপ্রকার রাজভক্ত হয়, ইহাই আমরা বাসনা করি। কিন্তু আমাকে তোমরা ভয় করিতেছ কেন? আমি কি এই বালকের কোন অনিষ্ট করিতে পারি? আমি কি করিতে এখানে আসিয়াছি? ইহার পিতৃঘাতী কি করিয়া দণ্ড পায়, তদ্বিষয়ে তোমাদের সহিত পরামর্শ করিতে। স্বর্গীয় মহারাজ বৃক-বিক্রমের কাছে আমি যে উপকার-ঋণে আবদ্ধ আছি, তাহা অপরিশোধনীয়। তিনিই আমাকে নির্ব্বাসনহইতে স্বদেশে আসিতে সাহায্য করেন, তাঁহারই সহায়তায় আমি কুশরাজ ও ছত্রপতি হইয়াছি। তাই তাঁহার কোন প্রত্যুপকার করিবার অবসর না পাইয়া তাঁহার পুত্রের অভিভাবক হইতে আসিয়াছি। প্রিয় বন্ধু বৃক-বিক্রম এখন লোকান্তরিত, এক্ষণে আমিই আমার মৃত মিত্রের পুত্রের ভারগ্রহণ করিতে বাধ্য।"

এই বলিয়া ভণ্ড কুশরাজ জয়ন্তকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করি-লেন। তখন এই মহানিনাদ সমুত্থিত হইল,—"জয় ছত্রপতি মহারাজ ভাস্করবীর্য্য! জয় মহারাজ জয়ন্তের জয়!"

ইতোমধ্যে নক্র-বিক্রম ভল্লুবীর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি বালককে উঁহার সহিত যাইতে দিবেন?"

"উঁহার কোন অনিষ্ট করিবে না, এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না পাইলে, যাইতে দিব না। সমরার্থে আমরা উপস্থিত প্রস্তুত নহি। মহারাজকে যাইতে দিলেই, আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত থাকিতে পারে।"

নক্র-বিক্রম ইহা শুনিয়া অসন্তোষসূচক অস্ফুট-ধ্বনি করিলেন। কিন্তু ভল্লুবীর্য্য যে কথা বলিলেন, তাহার সারবত্তা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইল।

এই সময়ে কুশরাজ জয়ন্তকে জানালাহইতে নামাইয়া কহি-লেন,—"আপনারা যাহা যাহা পবিত্র মনে করেন লইয়া আসুন। আমি সকলই স্পর্শ করিয়া আপনাদের মহারাজের বিশস্ত বন্ধু হইতে শপথ করিতে প্রস্তুত আছি।" জয়ন্তের সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গ ইতোমধ্যে আরও পরামর্শ করিয়া কয়েকজন পুরোহিতের দ্বারা কয়েকটি পবিত্র বস্তু আনাইল। কুশরাজ তৎসমুদায় স্পর্শ করিয়া জয়ন্তের বন্ধু হইবে বলিয়া শপথ করিলেন।

অতঃপর আরও নানা কথার পর, কুশরাজ জয়ন্তকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

ভল্লুবীর্য্য তাহাতে কহিলেন,—"আমরা একবার মহারাজের

সহিত বিরলে পরামর্শ না করিয়া আপনার এ প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারি না।"

কুশরাজ। আচ্ছা, তাহাই হউক। যাও, জয়ন্ত, তোমার বিশ্বস্ত প্রজা ভল্লুবীর্য্যের কাছে যাও। তুমি অতি সৌভাগ্যবান্ যে, এমন ভক্ত প্রজালাভ করিয়াছ।"

অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে, জয়ন্তের যাওয়াই উচিত, তবে অরবিন্দ তাহার সহচারী হইবেন। ভল্লুবীর্য্য যদি এই রাজ্যের আশাস্থল বাল-মহারাজকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, নক্র-বিক্রম তাহা হইলে তাঁহার দেহরক্ষার্থে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন?

গৌতমী অরবিন্দকে নানা উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন। ভল্লুবীর্য্যও, তাঁহার কি কর্ত্তব্য হইবে, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। জয়ন্ত ও অরবিন্দ সজলনয়নে সকলের নিকটহইতে বিদায় লইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে প্রথমে কুশরাজ জয়ন্তের প্রতি সবিশেষ সমাদর ও স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জয়ন্তের রাজ্যসীমা-অতিক্রম করিবামাত্রই তাহার প্রতি অন্যরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। জয়ন্ত তাহাতে বড়ই অপমান-বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু অরবিন্দের ইঙ্গিতে আত্মসংযম করিয়া রহিল। পথিমধ্যে এক দুর্গাধিপতির শান্ত-স্বভাবা দুহিতা তাহার প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার করিয়া তাহার আতিথ্য-সৎকার করিল, তাহাতে কিছুক্ষণের নিমিত্ত সে তাহার অবমাননার কথা ভুলিয়া গেল।

তাহার পর তাহারা এক অতি পিচ্ছিল স্থান দিয়া চলিল। কুশীয়েরা সেইস্থান-অতিক্রম করিতে একটুও সাহায্য করিল না। অরবিন্দ তাহা দেখিয়া নিজ অশ্বহইতে অবতরণ করিয়া জয়ন্তের ঘোড়ার মুখ ধরিয়া লইয়া চলিল। তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দেশ-বাসী দুইজন সহিসও ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন অরবিন্দের অশ্বের মুখ ধরিয়া লইয়া চলিল।

পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটিল না। অবশেষে তাহারা কুশরাজপ্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইল। কুশরাজ প্রাসাদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু জয়ন্তকে কেহই অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক—প্রাসাদ-প্রবেশের পথপর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিল না। তদ্দর্শনে অরবিন্দ একজন প্রতিহারীকে বলিলেন,—"ইনি ব্রহ্মাবর্ত্তপতি, ইঁহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাউন।"

প্রতিহারী সসম্ভ্রমে জয়ন্তকে রাজপ্রাসাদে লইয়া চলিল। তাহাতে জয়ন্ত সন্তুষ্ট হইল। জয়ন্ত কুশপুর-রাজ-মহিষীর সম্মুখে নীত হইল। মহিষীর আকৃতি-দর্শনে জয়ন্তের অভক্তির উদ্রেক হইল। অরবিন্দ তাহা অনুভব করিতে পারিয়া জয়ন্তকে রাজ্ঞীপ্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ চুপি চুপি অনুরোধ করিল।

রাজা তাহাকে দেখিয়া রাণীর উদ্দেশে কহিল,—"ঐ যে, সে আসিল।"

রাণী কহিলেন,—"একটাকে হস্তগত করা গেল। উহার পিছনে ও আবার কে?"

তাহা শুনিয়া রাজা চুপি চুপি তাঁহাকে কি বলিলেন। ইতোমধ্যে অরবিন্দ রাণীকে প্রণাম করিতে জয়ন্তকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

জয়ন্ত। না, আমি তাহা পারিব না। দেখ, ও আমার প্রতি কিপ্রকার ক্রুর-দৃষ্টিপাত করিতেছে—আমার উহার প্রতি একটুও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতেছে না।

এই কথাগুলি জয়ন্ত সৌভাগ্যক্রমে তাহার মাতৃভাষাতেই কহিল। রাণী বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি জয়ন্তের আকার-প্রকার দেখিয়া তাহা অনুভব করিয়া লইতে পারিলেন। তাঁহার মুখভাব আরও অপ্রসন্ন হইল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"বন্য ব্রহ্মাবর্ত্তের বন্য ভল্লু। যেমন দেশের লোকগুলি অসভ্য, তেমনই দেশের রাজাও অসভ্য। এদিকে এস, মহারাজ্ঞীর প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন কর। তুমি এখন কোথায় আসিয়াছ, তাহা ভুলিও না।"

অরবিন্দ মস্তক নোয়াইয়া দিল বলিয়া, জয়ন্ত রাণীকে অভিবাদন করিল। এই ঔদ্ধত্য-প্রকাশের জন্য পরে তাহাকে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন কিছু হইল না। রাণী তাহার অভিবাদন-লাভজন্য নির্ব্বন্ধ-প্রকাশ করিলেন না। রাজা ও রাণীতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা সম্ভবতঃ ব্রহ্মাবর্ত্তের ঘটনা রাণীর কাছে বর্ণনা করিতেছিলেন। জয়ন্তকে কেহ বসিতে বলিল না, সে দাঁড়াইয়াই রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাগে অভিমানে ফুলিতে লাগিল।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। তাহার পর, পরিচারকেরা রাজার ভোজনার্থে আয়োজন করিতে আসিল। জয়ন্ত তখনও দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে একজন প্রতিহারী হাঁকিল,—কুমার বিচিত্রবীর্য্য ও কুমার শার্দ্দূলবীর্য্য। সেই কক্ষার একটী ক্ষুদ্র দ্বার মুক্ত হইল,—দুইটি বালক কক্ষ্যামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা কৃশকায়, পাণ্ডুবর্ণ, ও চটুলাকৃতি। জয়ন্ত তাহাদের আকারপ্রকার দর্শনে সগর্ব্বে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান হইল।

তাহারা আসিয়া যথারীতি তাহাদের পিতাকে অভিবাদন করিল। তিনিও তাহাদের শিরশ্চুম্বন করিলেন। রাজা তখন তাহাদের কহিলেন,—"দেখ, তোমাদের একজন ক্রীড়াসঙ্গী আনিয়াছি।" কুমার বিচিত্র-বীর্য্য (সে প্রায় জয়ন্তের সমবয়সী) কহিল,—"কে, ঐ ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ক্ষুদ্র বালকটি?"

এই বলিয়া সে জয়ন্তের প্রতি মহতের নীচের প্রতি কৃপাসূচক দৃষ্টিক্ষেপ করিল। তাহাতে জয়ন্ত অপমান-বোধ করিল। কি, তাহার অপেক্ষা একজন ক্ষুদ্রতর বালক তাহাকে ক্ষুদ্র বলিল!

রাণী বলিলেন,—"হাঁ, তোমার পিতা উহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।

শার্দ্দূলবীর্য্য জয়ন্তের সহিত আলাপ করিবার জন্ম আগাইয়া আসিতেছিল, তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাকে ধাক্কা দিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"আমি বড় ভাই, আমারই অগ্রবর্ত্তী হওয়া উচিত। তবে, সুর-বালক, তুমি আমাদের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছ?"

জয়ন্ত এই গর্ব্ববাক্য শুনিয়া বিস্ময়ে এত অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে কেবল তাহার আয়ত লোচন-দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া রাজকুমারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"কি, কথার উত্তর দিতেছ না যে? শুনিতে পাও না? তুমি কি কেবল তোমার বর্ব্বর-ভাষাতেই কথা কহিতে পার?"

"দেবভাষা বর্ব্বর-ভাষা নহে! আমরা তোমাদের তুল্যই কিম্বা তোমাদের অপেক্ষাও সভ্য!"

অরবিন্দ। কি বলেন, মহারাজ, চুপ করুন!

রাজা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কি হে বালক! ইতোমধ্যেই রাজকুমারের সহিত কলহ-আরম্ভ করিলে? আমি তোমাকে উপযুক্ত সময়েই এখানে আনিয়াছি। সেনানী-মহাশয়, আপনার এই মহারাজকে শিষ্টতা শিখান, নতুবা আমি উহাকে অনাহারে শুইতে পাঠাইব।"

অরবিন্দ চুপি চুপি কহিলেন,—"মহারাজ, মহারাজ আপনি আমাদের সকলকেই লজ্জায় ফেলিতেছেন।"

জয়ন্ত। উহারা আমার প্রতি শিষ্টাচরণ করিলেই, আমিও উহাদের প্রতি শিষ্টাচরণ করিব।

এই বলিয়া সে মোরিয়া হইয়া বিচিত্র-বীর্য্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। বিচিত্র-বীর্য্য তাহার দিকে কোপ-দৃষ্টি করিয়া রাজ্ঞীর কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজ্ঞী বলিলেন,—"বড় অসভ্য, শরীরেও ভয়ানক বল, কোন্ দিন রাজকুমারদিগকে মারিয়া বসিবে।"

রাজা। সে ভয় করিও না। উহার উপরে লক্ষ্য রাখা হইবে।

তাহার পর চুপি চুপি বলিলেন,—"আপাততঃ লোক দেখাইয়া উহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশ করিতে হইবে। আমার অনেক শত্রু আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। এখন এই বালকের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিলে, বৃদ্ধ ভদ্রবীর্য্য নয়নের নিমেষে উহার সমস্ত প্রজা-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিবে। এখন উহাকে হস্তগত করা গিয়াছে, আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। চল, আহার করা যাউক।"

আহারকালে জয়ন্ত শার্দ্দূলবীর্য্যের পার্শ্বে বসিয়াছিল। শান্ত-স্বভাব শার্দ্দূলবীর্য্য জয়ন্তের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। সে বিচিত্রবীর্য্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা জয়ন্তকে মৃদুভাবে বুঝাইয়া দিল। আহার-শেষ হইবার পূর্ব্বে এই দুই বালকের মধ্যে খুব সম্প্রীতি হইয়া গেল।

শয়নার্থে তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র কক্ষ্যা পাইয়াছিলেন, সেরূপ ক্ষুদ্র কক্ষ্যায় তাঁহারা কখন বাস করেন নাই। উভয়েরই সেই কক্ষ্যায় শয়ন করিতে কষ্ট হইতেছিল। অরবিন্দ একটী জানালা খুলিয়া দিলেন। তখন শীতলবায়ুস্পর্শে তাঁহারা ঘুমাইতে পারিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অরবিন্দ দেখিলেন যে, সম্প্রতি কুশ-রাজ্যে জয়ন্তের কোন বিপদ্ নাই। ভাস্করবীর্য্য তাঁহার শপথ-পালন করিতে লাগিলেন। জয়ন্ত রাজ-পরিবারের সহিতই আহার করিত এবং সে রাজ-কুমারদিগের ক্রীড়াসঙ্গীও ছিল। রাজা জয়ন্তের পদমর্য্যাদানুযায়ীই তাহার প্রতি ব্যবহার করিতেন। কেবল রাজ-দম্প-তির নিজের আচরণ তাহার প্রতি স্নেহ বা সম্ভ্রম-সূচক ছিল না। রাজ্ঞী তাহাকে প্রথম দিনাবধিই দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তজ্জন্য কেবল তাঁহাকেই দোষ দেওয়া যায় না; জয়ন্তেরও দোষ ছিল।

রাজকুমারদিগের মধ্যে শার্দ্দূলবীর্য্যের সহিতই জয়ন্তের সম্প্রীতি হইয়াছিল। জয়ন্ত তাহার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখিত, কিন্তু সে দুর্ব্বল ছিল বলিয়া, তাহার প্রতি কোনপ্রকার অসদ্ব্যবহার করিত না। সে বরং তাহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নিকটাপেক্ষা জয়ন্তের কাছেই ভাল ব্যবহার পাইত। এইজন্য সে দিন দিন জয়ন্তের অনুগত ও স্নেহপ্রার্থী হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাহার আদৌ বনিত না। বিচিত্র-বীর্য্য তাহার মাতার অত্যাদরে দুর্ব্বিনীত, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার কোন দোষসংশোধনের চেষ্টা করিত না। সে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির উপরও বড় অত্যাচার করিত। তজ্জন্যও কেহ তাহাকে তিরস্কার করিত না।

মূক ইতরপ্রাণীদিগের প্রতি তাহার নিষ্ঠুরতার সীমা থাকিত না।

একদিন এক শ্যেনপক্ষী তাহার হাতহইতে একখণ্ড মাংস খাইতে গিয়া তাহার একটী অঙ্গুলিতে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করে, ইহার জন্য বিচিত্রবীর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নেত্রযুগলে তপ্ত লৌহ-শলাকা প্রবেশ করাইতে আদেশ করে। জয়ন্ত তাহার সেই নিষ্ঠুরতার বাধা দিতে উদ্যত হইলে, সে ক্রোধবশে তাহার এক গণ্ডে সেই তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা আঘাত করে। তাহাতে জয়ন্তও ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাহাকে ধরিয়া মেঝ্যায় ফেলিয়া দেয়। অরবিন্দ তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া না লইয়া গেলে, এক মহানর্থ বাধিয়া যাইত। যে সময়ে অরবিন্দ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সুযোগে শ্যেনপক্ষী উড়িয়া পলায়। তদ্দর্শনে জয়ন্ত শান্ত হয়। তাহার পর তাহার বিচার হয়। বিচারে প্রমাণিত হয় যে, জ্যেষ্ঠ-রাজকুমারই অন্যায় করিয়াছিল, তাই রাজা কাহাকেও কোন দণ্ড দেন নাই। তদবধি বিচিত্রবীর্য্য জয়ন্তকে উত্তেজিত করিতে সাহসী হইত না।

(ক্রমশঃ।)

ষট্-সেতু।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমি তোমাদের ছয়টি সেতুর কথা বলিব। ছুতারমিস্ত্রি বা রাজ-মিস্ত্রির কাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত, শোভাসমন্বিত কার্য্য হইতেছে—সেতু-নির্ম্মাণ। তাই কবিগণ এই সেতুগুলির বিষয়ে কবিতা-রচনা করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইংরাজী ভাষায় সেতু-সম্বন্ধে কয়েকটি অতি উপাদেয় কবিতা রচিত হইয়াছে। মার্কিণ-কবি লংফেলো, ইংরাজ-কবি সেক্সপীর, বাইরণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ও মেকলে প্রত্যেকেই সেতু-সম্বন্ধে একএকটি উপাদেয় কবিতা-রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেতুগুলির সহিত দেশের ইতিহাসও জড়িত থাকে। অতএব এই সেতু-কথা, আশা করি, তোমরা পড়িয়া প্রীত হইবে। অদ্য এই নিবন্ধে আমি এই মহাদেশের কোন সেতু,—শোন-সেতু, শ্রীনগরের বিপণি-সেতু প্রভৃতির কথা বলিব না। অদ্য আমি কয়েকটি বিলাতী-সেতুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ব্রিটানিয়া ও ফোর্থ-সেতু।

প্রথমে "ফোর্থ"-সেতুর কথা বলি। ইহা যে নদীর উপর নির্ম্মিত, সেই নদীর সর্ব্বোচ্চ ঢেউএর অপেক্ষা ১৫০ ফিট উচ্চ। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ৫৪,০০০ টন লৌহের,৩২৫০,০০০ টন চূণ-সুরকী-ইটের প্রয়োজন হইয়াছিল। ৫০০০ কারিকরদ্বারায় এই কারুকার্য্য সুসমাহিত হয়। ইহার বিভিন্ন অংশ সংযোজিত করিবার নিমিত্ত ৮,০০০,০০০ লৌহ-কীলকের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর উহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে কুবেরের ধন, ৩৮,৭৫০০০০ টাকা, ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতু এবং উহা বিজ্ঞানের এক মহাগরীয়সী কীর্ত্তি। এই সেতুটির বিষয়ে কোন কবি কবিতা-রচনা করেন নাই, সত্য; এবং উহা চিত্রবৎ সুদৃশ্যও নহে, কিন্তু ঐরূপ সেতু-নির্ম্মাণ যে এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। এই সেতুনির্ম্মাণ-কার্য্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হয়, এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড উহা সাধারণের ব্যবহারার্থে প্রথম খুলিয়া দেন। সার জন ফাউলার ও সার বেঞ্জামিন বেকার উহার

নির্ম্মাতা; সার উইলিয়ম এ্যারল ঐ সেতুনির্ম্মাণের ঠিকা লইয়াছিলেন।

এইবার আর একপ্রকার সেতুর—ক্লিফ্‌টনের বিলম্বিত সেতুর—কথা বলি। এই সেতুটিও অদ্ভুত ব্যাপার। এইপ্রকার চমৎকার বিলম্বিত সেতু, বোধ হয়, জগতের আর কুত্রাপি নাই। ইহা এ্যাডন-নদীর উপরে স্থাপিত। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দপর্য্যন্ত এই সেতুটির নাম ছিল—হাঙ্গারফোর্ড-সেতু এবং ইহা টেম্‌স্‌-নদীর উপরে ছিল। পরে লণ্ডনে এই সেতুর কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ না হওয়াতে উহা ক্লিফ্‌টনে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় নির্ম্মিত করা হয়। দূরহইতে এই সেতুটিকে মাকড়সার সুতার ন্যায় দেখায়। উহা অতি উর্দ্ধে, যেন মহাশূন্যে, ঝুলিতেছে। উহার ওজন ১,৫০০০ টনমাত্র, তথাপি উহা ৭,০০০ টন পরিমিত ভারসহ। উহার প্রসার ৭০২ ফিটেরও অধিক এবং জলহইতে ২৮৭ ফিট উচ্চ। উহার প্রত্যেক স্তম্ভ জলের উপরে সত্তর ফিট উচ্চ এবং জলের ভিতরেও সত্তর ফিট ডুবিয়া আছে। উহার শৃঙ্খলে ৪২০০টি কড়া আছে এবং ঐ শৃঙ্খল ১৬২ টি খুব মজবুত লৌহদণ্ড-বহন করিতেছে, এই সেতুনির্ম্মাণে সর্ব্বসমেত ১৫০০০০০৲টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই সেতুটি দেখিতে অতিশয় সুদৃশ্য। যে স্থানে এই সেতুটি বর্ত্তমানে স্থাপিত, সেই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও মনোজ্ঞ। তজ্জন্য এই সেতুটির শোভা আরও মনোলোভা বোধ হয়।

লণ্ডন সেতু।

আর একটি সেতুর কথা শুনিবে? এই সেতুটিও একহিসাবে অদ্ভুত। কারণ ইহার উপর অনেক সেকেলে বাড়ী আছে। "বাথে" এই সেতুটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সেতুর নাম পুলটেনী-সেতু। এই

সেতুটির চিত্র দেখিলে, তোমরা যত ভাল করিয়া ইহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবে, আমার বর্ণনা-পাঠে, বোধ হয়, তত ভাল ধারণা জন্মিবে না। এই সেতু, বোধ হয়, বিগত চারিশত বৎসরযাবৎ ঐ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। তবে ঐ সেতুটি অবশ্য অনেকবার পুনর্গঠিত হইয়াছে। নর্ম্মাণেরা ঐ সেতু প্রথমে নির্ম্মিত করে। উহাকে ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়া এক্ষণে ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে।

উহার পর আর একটী লণ্ডন-সেতু নির্ম্মিত হয়, তাহাও গিয়াছে। এক্ষণে লণ্ডনে যে সেতুটি আছে, উহা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন রেণির দ্বারায় কল্পিত হইয়া তাঁহার পুত্রগণের দ্বারায় নির্ম্মিত হয়। উহা গ্র্যানিট-প্রস্তরের, লম্বে ১০০০ ফিট্ এবং উহার পাঁচটি খিলান আছে। এক্ষণে ঐ সেতুটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত করা হইয়াছে, তথাপি লোক-জনের ও গাড়ী-ঘোড়ার এত ভীড় যে, সেতুটি অপ্রশস্ত মনে হয়। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম উহা প্রথমে সাধারণের ব্যবহারার্থে খুলিয়া দেন। এবং কোন বিখ্যাত যুদ্ধে (Peninsular War) ব্যবহৃত কামানগুলি ভাঙিয়া ইহার বায়ুবালোক-স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সেতুটি দেখিতে সুদৃশ্য নহে, ইহা কোন প্রাকৃতিক শোভাময় স্থানেও প্রতিষ্ঠিত নহে। তথাপি এই সেতুর গৌরব বড় অল্প নহে। ইহা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভার ও জনবাহী সেতু। এইজন্য ইহাকে "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেতু" এই আখ্যা দিলে, অত্যুক্তি হয় না।

সেতুর উপরে গির্জ্জা বিলাতে তিনটি সেতুতে আছে—একটী ওয়েকফিল্ডে, একটী রদারহামে, আর একটী ব্র্যাড্ফোর্ড-অন-এ্যাভনে। তন্মধ্যে ওয়েকফিল্ডের সেতুটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ফল্ডারএর উপরিস্থিত এই সেতুটি অতি পুরাতন। ইহার উপরে সেণ্টমেরীর গির্জ্জাটি রহিয়াছে। ইহা তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময়ে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। চতুর্থ এডোয়ার্ড গির্জ্জাটির একাংশের পুনর্নির্ম্মাণ করেন। ষষ্ঠ এডোয়ার্ড যখন প্রার্থনামন্দিরগুলি উঠাইয়া দেন, তখন এই গির্জ্জাটিরও লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ও সেতুর ভিত্তি এক, তদ্ভিন্ন ইহা ওয়েকফিল্ড-নগরীর সম্পত্তি বলিয়াও লুপ্ত হয় নাই।

তোমাদের হয় ত জানা আছে যে, আগেকার নগরগুলির "দ্বার" থাকিত, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের মধ্যে কেবল একটী সেতুর উপর নগর-দ্বার আছে। ঐ সেতুটি প্রায় দেড়হাজার বছরের পুরাতন। ঐ সেতুপরিস্থিত নগরদ্বারটি এখনও খুব মজবুত আছে। উহা মোনমাউথের মোননাউ-সেতু।

আরও অনেক সেতুর কথা বলা যাইতে পারে—মানবমনীষার আরও অনেক পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু

"কোথা মম অবকাশ
রঞ্জিতে আকাশ ?"

অতএব এইখানেই ইতি।

লণ্ডন-টাওয়ার

[স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ-মহোদয়-কর্ত্তৃক সংকলিত।]

তোমরা সকলেই লণ্ডন-নগরের নাম শুনিয়াছ, কেহ কেহ হয়ত নগরটি দেখিয়াছ। এত বড় নগর পৃথিবীর আর কোথাও নাই। কলিকাতা ভারতবর্ষের প্রধান নগর, এখানকার লোক-সংখ্যা দশ-বার-লক্ষের অধিক নহে। কিন্তু লণ্ডন-নগরে পঁয়তাল্লিশলক্ষেরও অধিক লোক বাস করে। সহরতলী-সুদ্ধ ধরিলে, লণ্ডনের জন-সংখ্যা প্রায় ৬৬ লক্ষ। নগর ত নয়, যেন একটী রাজ্য! ভারত-বর্ষে যে সকল দেশীয় রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে এক নিজাম-রাজ্যে ভিন্ন আর কোথাও এত লোক বাস করে না। এমন বাণিজ্যের স্থানও পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। ফলে সহরের মধ্যে যেখানটা ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান, সেখানে সমস্ত দিন এত গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় হয় যে, পথিকের পক্ষে রাস্তা পার হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে রাস্তার এপারহইতে ওপারপর্য্যন্ত মাটির ভিতর দিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন-নগরে অনেক দেখিবার জিনিস আছে। তন্মধ্যে একটী অতি-প্রাচীন দুর্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমি এই দুর্গটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

এই দুর্গের নাম "লণ্ডন-টাওয়ার।" খাস সহরের মধ্যে—টেম্‌স্-নদীর ধারে ইহা অবস্থিত। কথিত আছে, এইস্থানে প্রায় দুইসহস্রবৎসর পূর্ব্বে রোমানগণ-কর্ত্তৃক এক দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও এস্থান খুঁড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, বর্ত্তমান দুর্গটিও বড় কম প্রাচীন নহে। ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে-আটশত বৎসর হইল, ইংলণ্ডের প্রথম নর্ম্ম্যাণ রাজা, বিজয়ী উইলিয়াম, ইহার প্রধান অংশটির নির্ম্মাণ-আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম তাহা সমাপ্ত করেন। দুর্গের এই অংশটি দুর্গের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার নাম "হোয়াইট-টাওয়ার" বা শ্বেতদুর্গ। নিম্নে ইহার একটী চিত্র দেওয়া হইল (৫নং চিত্র দেখ)।

অন্যান্য দুর্গের ন্যায় লণ্ডন-টাওয়ারও চতুর্দ্দিকে পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব্বে এই পরিখা সর্ব্বদা টেম্‌স্‌নদীর জলে পূর্ণ থাকিত,
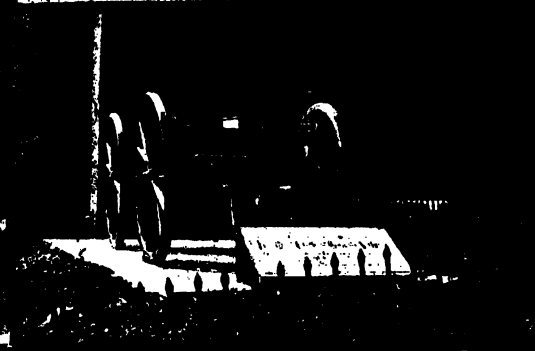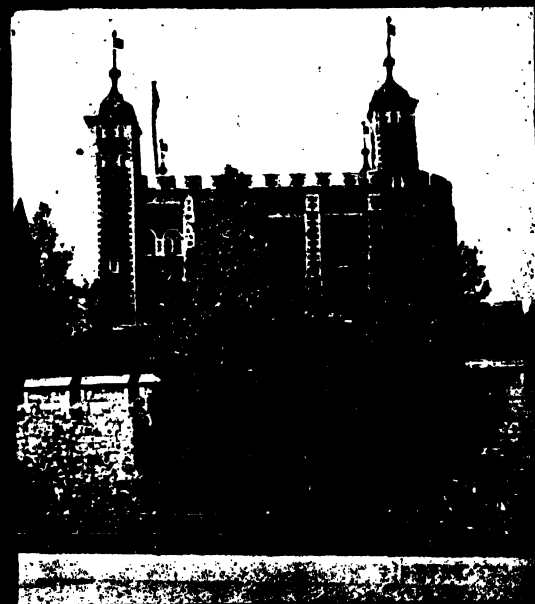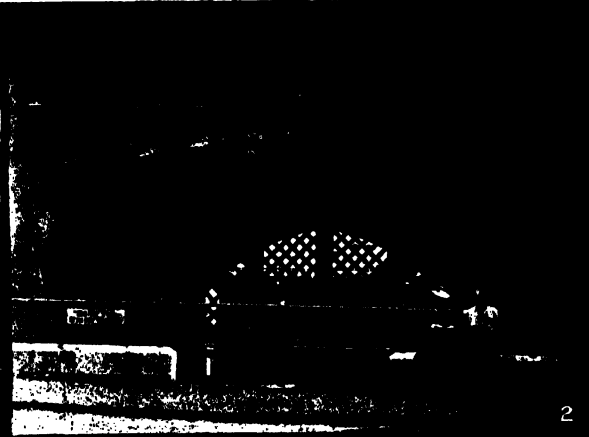
এখন ইহা শুষ্ক অবস্থায় রহিয়াছে। সেকালে রাজারা নদীপথে নৌকা করিয়া আসিয়া এই দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীপর্য্যন্ত লণ্ডন-টাওয়ার অন্যতম রাজ-প্রাসাদ-রূপে ব্যবহৃত হইত। তৎকালে প্রত্যেক রাজা তাঁহার অভিষেকের পূর্ব্বরাত্রে এই স্থানে বাস করিতেন এবং এই স্থানহইতে শোভাযাত্রা করিয়া ওয়েষ্টমিন্ষ্টার আবিতে গিয়া অভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু দুর্গটি ইতিহাসে কারাগার-রূপেই বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। বহু বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এই স্থানে বন্দিরূপে বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাণী ক্যাথারিন, রাণী এলিজাবেথ, রাণী এন্ বোলিন, রাণী জেন্ গ্রে, রাজা প্রথম জেম্‌সের খুল্লতাত-কন্যা আরাবেলা ষ্টুয়ার্ট, রাজা পঞ্চম এডোয়ার্ড ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রিচার্ড, রাজকুমার ডিউক-অফ্-মন্‌মাথ্, সুধীশ্রেষ্ঠ সার টমাস্ মোর ও সার ওয়াল্টার র‍্যালে, রাজমন্ত্রী আর্ল্ অফ্ ষ্টাফোর্ড ও টমাস্ ক্রমওয়েল্, ধর্ম্মাধ্যক্ষ আর্চ্চবিশপ লড্, রাণী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র আর্ল্-ও-এসেক্স্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের জীব-লীলা এই দুর্গের মধ্যেই শেষ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িলেই, ইঁহাদের কথা তোমরা জানিতে পারিবে। যাহা হউক, লণ্ডন-টাওয়ার আর রাজবাটী বা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হয় না। এখন ইহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সকলেই ইহার ভিতর রক্ষিত নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যাদি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন।

উপরে বলিয়াছি, 'হোয়াইট-টাওয়ার' এই দুর্গের কেন্দ্র। খুব উচ্চ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট অট্টালিকাকে ইংরাজিতে 'টাওয়ার' বলে। উক্ত 'হোয়াইট-টাওয়ার'-ব্যতীত লণ্ডন-দুর্গের মধ্যে আরও অনেক 'টাওয়ার' আছে, তন্মধ্যে দুর্গের পশ্চিমদিকে অবস্থিত মিড্‌ল্ বা মধ্যবর্ত্তী টাওয়ারটি দুর্গ-প্রবেশের প্রধান দ্বার। এই 'মিড্‌ল্ টাওয়ারের' নিম্নেই 'লায়ন-গেট' বা সিংহদ্বার। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দপর্য্যন্ত রাজকীয় পশু-শালা এখানে অবস্থিত ছিল, তাহার পর তাহা রিজেন্ট-পার্কে স্থানান্তরিত করা হয়। পশুশালায় তখন প্রধানতঃ সিংহ ও ভল্লুক থাকিত, তাহাহইতেই এই দ্বারের নাম সিংহদ্বার হইয়াছে। 'মিড্‌ল্ টাওয়ারের' মধ্য দিয়া গিয়া এক প্রস্তরনির্ম্মিত সেতুদ্বারা পরিখা পার হইয়া 'বাই-ওয়ার্ড টাওয়ারের' ভিতর দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে "ইওমেন-অফ-দি-গার্ড" বা "বীফ্-ইটার"-নামক দুর্গরক্ষকগণকে দেখিতে পাইবে। এই রক্ষকগণের পরিচ্ছদ বড়ই বিচিত্র। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত চিত্রকর হোল্‌বেন এই পরিচ্ছদ-উদ্ভাবন করেন।

দুর্গের দক্ষিণদিকে টেম্‌স্-নদী। এই নদীহইতে দুর্গ-প্রবেশ করিবার দ্বারটি "ট্রেটারস্ গেট্" বা রাজদ্রোহীর দ্বার-নামে অভিহিত (২নং চিত্র দেখ)। বিশেষ সম্ভ্রান্ত বন্দিগণ এই দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে নীত হইতেন। পূর্ব্বে যে সকল সম্ভ্রান্ত বন্দির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে এই দ্বার দিয়াই দুর্গ-মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই কারণে ইতিহাস-পাঠকের নিকট এস্থান বিশেষ আদরণীয়। কিন্তু এখন এখানে যে দরজাটি দেখা যায়, তাহা আধুনিক, পুরাতন দরজাটি আমেরিকানেরা কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণে তাহা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে রহিয়াছে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিগণের শিরশ্ছেদের জন্য দুইটি বধ্যভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। একটী দুর্গের বাহিরে 'টাওয়ার-হিল'-নাম্নী উচ্চ ভূমিতে, আর একটী দুর্গের ভিতরে "সেন্ট-পিটার-এড্-ভিন্‌কুলা"-নামক গির্জ্জার সম্মুখস্থ "টাওয়ার গ্রীণ্"-নামক প্রাঙ্গণে। "টাওয়ার-হিলে" বধ-কার্য্য সাধারণের সমক্ষেই নির্ব্বাহিত হইত। টমাস ক্রমওয়েল, আর্চ্চবিশপ লড্, আর্ল অব্ ষ্টাফোর্ড, ডিউক অব মন্‌মাথ্, সার টমাস মোর প্রভৃতির শিরশ্ছেদ এইস্থানেই হইয়াছিল। পণ্ডিতবর সার টমাস মোর যেমন বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, নির্ভীক, অকপট ও উন্নতচরিত্র ছিলেন, তেমনই কৌতুকপ্রিয়ও ছিলেন। জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তা সমানভাবে ছিল। যখন তিনি বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিতেছিলেন, তখন তিনি সহাস্যে রক্ষককে বলিলেন,—"দেখ, যা'তে আমি নিরাপদে উঠ্‌তে পারি, সেদিকে তুমি দৃষ্টি রেখ। নাব্‌বার সময় আর তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হ'বে না, আমি নিজেই সব ঠিক ক'রে নেব।" তাহার পর যখন তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহার মস্তক বধ্য-কাষ্ঠের উপর রক্ষিত হইল, তিনি মাথাটা অল্প তুলিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, আমার দাড়ীটা একটু সরিয়ে নি,—এ বেচারা ত রাজদ্রোহিতা করে নি, মাথার সঙ্গে একে কা'ট্‌লে বড় দুঃখের কথা হ'বে।"

প্রাণদণ্ড অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ্যভাবে করিতে হইলে, 'টাওয়ার গ্রীণে' তাহা সম্পন্ন হইত। রাণী ক্যাথারিণ, রাণী এন্ বোলিন্, রাণী জেন্ গ্রে, আর্ল অফ্ এসেক্স প্রভৃতির শিরশ্ছেদ 'টাওয়ার গ্রীণেই' হইয়াছিল। কিন্তু ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আর্ল অফ্ এসেক্সের প্রাণ-দণ্ডের পর এখানে আর কাহাকেও বধ করা হয় নাই। 'টাওয়ার হিলে'র বধ্যভূমি এক্ষণে প্রস্তরাচ্ছাদিত করিয়া চতুর্দ্দিকে রেলিং দিয়া ঘেরিয়া রাখা হইয়াছে (৮নং চিত্র দেখ)। 'টাওয়ার হিল' বা 'টাওয়ার গ্রীণে' যে সকল ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইত, তাঁহাদিগকে উপরি-উক্ত "সেন্ট-পিটার-এড্-ভিনকুলা"-গির্জ্জায় কবর দেওয়া হইত। সুতরাং এই গির্জ্জাটি ছোট হইলেও, ইহাতে যত বড় লোকের কবর আছে, এক "ওয়েষ্ট-মিন্‌ষ্টার আবি"-ভিন্ন, ইংলণ্ডের আর কোন গির্জ্জায় তত নাই।

"ট্রেটারস্-গেটের" উপর "সেন্ট-টমাস-টাওয়ার" অবস্থিত (৩ নং চিত্র দেখ)। ইহারই বামপার্শ্বে "ওয়েক্‌ফিল্ড-টাওয়ার" (৪নং চিত্র দেখ)। এই শেষোক্ত অট্টালিকায় রাজার মুকুট ও রত্নাভরণাদি রক্ষিত আছে। এই সকল উজ্জ্বল ও বহুমূল্য মণি-

মাণিক্যাদি দেখিলে, চোকে ধাঁধা লাগিয়া যায়। কোন কোন রত্নের সহিত আবার নানা মনোরম গল্প ও ইতিহাস জড়িত। দুঃখের বিষয়, সে সকল গল্প বলিবার স্থান এখানে নাই। এই সকল রত্ন সাধারণে ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারেন, কিন্তু এগুলিকে লইয়া মধ্যে মধ্যে নানা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে একবার টাওয়ারে আগুন লাগে। সে সময় সমস্ত রত্নই একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত, কেবল পিয়ার্স-নামক একজন পুলিস কনেষ্টবলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের বলেই সেগুলি ধ্বংসমুখহইতে রক্ষা পাইয়াছিল। রত্নগুলি দৃঢ়-লৌহ-দণ্ড-পরিবেষ্টিত আধারে রক্ষিত থাকে। গৃহে যখন আগুন লাগিল, তখন পিয়ার্স একটা বক্রাগ্র শাবল দিয়া সবলে রত্নাধারের দুই চারিটি লৌহদণ্ড খুলিয়া ফেলিল। এইরূপে একটী সঙ্কীর্ণ পথ করিয়া কোনক্রমে সে আধারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং রত্নগুলিকে বাহির করিয়া দিল। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে, সকলই পুড়িয়া যাইত, কারণ যে কাপড়ের উপর রত্নগুলি ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়াছিল।

১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ব্লড্-নামে এক ব্যক্তি রত্নগুলিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং সে চেষ্টা প্রায় সফল হইয়াছিল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! তখন এডোয়ার্ডস-নামে এক বৃদ্ধের হস্তে রত্নাধার-রক্ষার ভার ছিল। ব্লড্ পুরোহিতের ছদ্মবেশ পরিয়া ও এক ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করিয়া রত্নাধার দেখিতে আসে। দেখিতে দেখিতে মহিলাটি সহসা পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখান এবং এডোয়ার্ডস্-পত্নীর পরিচর্য্যায় তৎক্ষণাৎ আরোগ্যলাভ করেন। এই সূত্রে ব্লডের সহিত এডোয়ার্ডসের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মে। ক্রমে এডোয়ার্ডস্কন্যার সহিত ব্লডের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। একদিন ব্লড্ তাঁহার "ভ্রাতুষ্পুত্র"কে এডোয়ার্ডস্কন্যার সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল; তাহার সহিত আর দুইটি বন্ধুও আসিল। ব্লড্ তাহার বন্ধু দুইটিকে ভিতরে লইয়া আসিয়া তাহাদিগকে রত্নগুলি দেখাইবার জন্য এডোয়ার্ডসকে অনুরোধ করিল। সেই সময় "ভ্রাতুষ্পুত্রটি" বাহিরে চৌকী দিতে থাকিল। এদিকে এডোয়ার্ডস্ ব্লড্ও তাহার বন্ধুদ্বয়কে লইয়া যেমন রত্নগৃহে প্রবেশ করিল, অমনই তাহারা গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া এডোয়ার্ডসকে একটা মোটা চাদর দিয়া মুড়িয়া ফেলিল। এডোয়ার্ডস্ চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়া থামাইয়া দিল। তাহার পর রত্নগুলি বাহির করিয়া ব্যাগে পূরিতে তাহাদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু, রাজদণ্ডটি তাহাদের ব্যাগে ঢুকিল না, সুতরাং তাহারা তাহা উখাদ্বারা ঘষিয়া দ্বিখণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই সময়ে এডোয়ার্ডসের পুত্র কোথাহইতে ঘটনাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর কি? দৌড়! কিন্তু বুড়া এডোয়ার্ডস্ মরে নাই, সে উঠিয়া সকল কথা বলিয়া দিল এবং সঙ্গীসহ ব্লড্ শীঘ্রই ধরা পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা, চার্লস্, ব্লড্কে ক্ষমা করেন। ব্লড্ নাকি বলিয়াছিল যে, সে প্রাণ-দণ্ডকে তুচ্ছ-জ্ঞান করে এবং তাহার যদি প্রাণ-দণ্ড হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার অনেক বন্ধু প্রস্তুত হইয়া আছে।

রত্নাগারহইতে বাহির হইয়া বামদিকে একটী কামানের গাড়ী দেখা যায় (৭ নং চিত্র দেখ)। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই গাড়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃতদেহ তাঁহার গোরস্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

'টাওয়ার গ্রীণের' পূর্ব্বদিকে "বো-চ্যাম্প-টাওয়ার" অবস্থিত। এখানে 'লণ্ডন-টাওয়ারে' আবদ্ধ সম্ভ্রান্ত বন্দিগণ-কৃত অনেক ক্ষোদিত লিপি ও কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানহইতে "টাওয়ার গ্রীণ" পার হইয়া "ব্লডি-টাওয়ারে" যাওয়া যায় (৬নং চিত্র দেখ)। এই 'টাওয়ারে' এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হওয়াতে, ইহার নাম "ব্লডি" বা রুধিরাক্ত "টাওয়ার" হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ডের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র পঞ্চম এডোয়ার্ড রাজা হন। কিন্তু পঞ্চম এডোয়ার্ড তখন দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালকমাত্র, সুতরাং রাজ্যের ভার তাঁহার খুল্লতাত তৃতীয় রিচার্ডের হস্তে পড়ে। অল্পদিন পরেই রিচার্ড নিজেকে রাজা বলিয়া প্রচার করেন, ও পঞ্চম এডোয়ার্ড ও তাঁহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা রিচার্ডকে 'লণ্ডন-টাওয়ার'মধ্যে আবদ্ধ করেন। তাহার পর 'টাওয়ারের' অধ্যক্ষ সার জেম্স্ টিরেলের সহযোগে দুইজন লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করান। শুনা যায়, পাষণ্ডেরা বালিশ চাপা দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নিরপরাধ বালকগণকে মারিয়া ফেলে। প্রায় দুইশতবৎসর পরে তাহাদের কঙ্কাল "হোয়াইট-টাওয়ার"-সংলগ্ন এক সোপানশ্রেণীর তলায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিণাম ভীষণ হইয়াছিল। তৃতীয় রিচার্ড যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হত হন, রাজদ্রোহিতাপরাধে সার জেম্স্ টিরেলের "টাওয়ার হিলে" শিরশ্ছেদ হইয়াছিল ও হত্যাকারী দুইজন ঘোর দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়া রোগে ও অনাহারে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছিল।

"ব্লডি টাওয়ারের" ভিতরে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী, ঐতিহাসিক ও কবি সুধীবর সার ওয়াল্টার র‍্যালে এই "টাওয়ারের" মধ্যে তেরবৎসর আবদ্ধ ছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিয়া কাল কাটাইতেন।

"লণ্ডন-টাওয়ারের" আর একটী দ্রষ্টব্য পদার্থ,—"হোয়াইট-টাওয়ার"স্থ অস্ত্রাগার। এইস্থানে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দহইতে ব্যবহৃত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম্মাদি-সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে জল্লাদেরা যে কুঠার-ব্যবহার করিত ও যে কাষ্ঠ-খণ্ডের উপর অপরাধীর মস্তক-ছেদন করা হইত, তাহা এখানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সেকালে অপরাধীকে যন্ত্রণা দিবার জন্য যে সকল

যন্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার নানাবিধ নমুনা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

"হোয়াইট-টাওয়ারের" উপর তলের জানালাহইতে নানাবিধ-জলযানপূর্ণা টেম্‌স্‌-নদীর দৃশ্য বড় চমৎকার দেখায়। বিশেষতঃ নদীর উপর 'টাওয়ার ব্রিজ্‌'-নামক সেতুটি সহজেই দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। এই সেতুটির নির্ম্মাণ-কৌশল অতি সুন্দর। দুইদিকে দুইটি গগনস্পর্শী "টাওয়ার" দণ্ডায়মান, মধ্যে দ্বিতল সেতু। উপরের তল দিয়া পথিকগণ সর্ব্বদাই অবাধে নদী পার হইতে পারে। কিন্তু নিম্নতলটি দুইখণ্ডে বিভক্ত, যন্ত্র-সাহায্যে এই দুই-খণ্ডকে অতি সহজে স্বেচ্ছামত উঠান, নামান যায়। যতক্ষণ ঐ দুইটি খণ্ড নামান থাকে, ততক্ষণ উহারা পরস্পর সংযোজিত থাকিয়া সেতুর কার্য্য করে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই, তাহাদিগকে তুলিয়া সেতুর নিম্নে জাহাজ চলাচলের পথ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে (৯নং চিত্র দেখ)। আমাদের হাবড়া পুলের 'পুল খোলার' মত অত হাঙ্গামা করিয়া সাধারণের অসুবিধা ঘটাইবার প্রয়োজন হয় না।

"টাওয়ার-ব্রিজ্‌"হইতে "লণ্ডন-টাওয়ার"কে যেরূপ দেখায়, তাহা ১নং চিত্রে ও "লণ্ডন-টাওয়ারের" উদ্যানহইতে "টাওয়ার-ব্রিজ্‌" যেরূপ দেখায়, তাহা ৯নং চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

আব্‌দুল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৪

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরবর্ত্তী অর্দ্ধঘণ্টা আব্‌দুলের পক্ষে বড় সঙ্গীন সময়। কিন্তু আব্‌দুল সকলই সনির্ব্বন্ধ সাহসের সহিত সহ্য করিল, তদ্দর্শনে হেড-মৌলভী ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। আব্‌দুল স্বীকার করিল যে, সে তাহাদের বোর্ডিংএর "কানুন" অনেকবার "বরখেলাপ" করিয়াছে, এবং এমন সমস্ত ব্যাপারে জড়িত ছিল যে সমস্ত ব্যাপার বোর্ডিংএ ঘটাতে হেডমৌলভীকে "নারাজ" হইতে হইয়াছে; কিন্তু সে কি কারণে অন্য রজনীতে বোর্ডিংএর বাহিরে গিয়াছিল, তাহা কিছুতেই বলিল না।

সে দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল,—"বড়ামৌলভীজি, এ 'সওয়ালের' জবাব আমি দিতে পা'রব না। আর আপনি অন্য যে সমস্ত ঘটনার কথা ব'লছেন—তা'তে আমি কারুর কিছু 'খারাবী' করি নি।"

হেড্‌মৌলভী গর্জ্জিয়া উঠিল,—"'খারাবী' করিস্‌ নি! তুই তোর আর এই বোর্ডিংএর বদ্‌নাম করেছিস্‌। তুই 'খারাবী' করিস্‌ নি, তোর অনেক 'কসুর' আমি মাফ্‌ ক'রেছি। কিন্তু 'ব্যস্‌ হো গিয়া', আমি আর তোর কসুর মাফ ক'র্‌ব না। তুই তবে আজ কেন বাইরে গিয়েছিলি, ব'ল্‌বি নি?"

আব্‌। জি সাহাব, না—আমি ব'ল্‌তে পারি না।

তখন হেড্‌-মৌলভী-সাহেব ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই 'টাইপ'-করা চিঠিটা আব্‌দুলকে দেখাইয়া কহিলেন,—"তবে আমি বলি, এই চিঠিতে লিখ্‌ছে যে, তুই-ই আংটী চুরী করেছিস্‌। তোর যদি 'সাফাই' কিছু না থাকে, শনিবারদিন তোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেব।"

আব্‌দুল হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"'কিয়া বোল্‌তেহেঁ', জি, আমি 'চোরী' করেছি? তাড়ি'য়ে দেবেন?"

হেড্‌। হ্যাঁ, আমি তাই বল্‌ছি। আমি তোকে পুলিশে দোব না; কিন্তু তুই সব কথা ভেঙে না ব'ল্‌লে—অন্য কারণে তাড়িয়ে দোব।"

তখন আব্‌দুল মোরিয়া হইয়া উত্তর করিল,—"তবে আমি কিছু ব'লব না।"

তখন হেড্‌মৌলভী ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন,—"নূরুদ্দিন-মিঞা, একে 'দোমহল্লাকে ছোটা শোনে কা কামরামে' নিয়ে যান। সেখেনেই ওকে 'শনিচর'-পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে রাখ্‌বেন, এর মধ্যে যদি 'তামাম বাত দেল্‌ খুলাশা' ক'রে বলে, তা' হ'লে ছেড়ে দিতে পারেন।"

৫

তিনদিন আব্‌দুল সেই ঘরে একাকী বন্ধ রহিল। কোন কথা ভাঙিল না। এই তিনদিন কখন সে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল, কখন বা একান্ত মোরিয়া হইয়া উঠিতেছিল। আব্‌দুলের অনেক দোষ ছিল; সে উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব ও দুর্ঘটনাপ্রিয়, কড়া আইন-কানুন তাহার ভাল লাগিত না। কিন্তু তাহার হৃদয় খুব ভাল ছিল; সে অকৃত্রিম বন্ধু ও উত্তম ছাত্র ছিল। তাহার দুর্ভাগ্যক্রমেই হেড্‌-মৌলভীর "কসুরের কিতাবে" তাহার নাম উঠিয়াছিল। হেড্‌-মৌলভী সম্পূর্ণরূপেই তাহাকে ভুল বুঝিতেছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য আব্‌দুল লতিফের নামে "চুগলী কাটিতে" পারে না।

আব্‌দুল একাকী বসিয়া তার "আখিরের" কথা ভাবিতেছিল। এই হাঙ্গামায় পড়িয়া সে একদিন পরীক্ষা দিতে পারিল না। শয়তান আবুটাই বৃত্তিটা পাইবে। বৃত্তিটা তাহার প্রাপ্য হইলেও, মৌলভী-সাহেব তাহাকে দিতেন না।

এখন তাহার কি করা উচিত?

সে সেই প্রকোষ্ঠের জানালার কাছে বসিয়াছিল। সেই জানালা

ভূমিহইতে ৪০ ফিট্ উচ্চ। সুতরাং তথাহইতে পলায়ন একেবারে অসম্ভব কার্য্য। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা কি একটা জিনিস শন্‌শন্ করিয়া তাহার মাথার উপরদিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। নীচে ঝোঁপের মধ্যে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে সেই দ্রব্যটি গৃহের মেঝিয়াহইতে তুলিয়া লইল। সে দেখিল, উহা এক টুক্‌রা পাথরে জড়ান একখানি চিঠি। গোধূলির "আধেক আলো, আধেক আঁধারে" সে কষ্টে পড়িল, চিঠিখানিতে লেখা রহিয়াছে—"লতিফ তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছে। সে বলিয়াছে যে, তুমিই আংটী-চুরী করিয়া কান্‌হাইয়াকে দিয়াছ। হেড মৌলভী বোর্ডিংএ জানাইয়াছে যে, তোমাকে তাড়াইয়া দিবে। তাই তোমাকে সব কথা ভাঙিয়া বলিতে অনুরোধ করিতেছি।"

পত্র-পাঠ করিয়া আব্দুলের হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ হইল। সহসা তাহার এই সংকল্প হইল যে, ঐরূপ অবমানিত হইবার পূর্ব্বে সে তাহার প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিবে। সে অনুমান করিল যে, চিঠীখানি নিশ্চয়ই তাহার "দোস্ত" লুৎফরের নিকটহইতে আসিয়াছে। সে গতপ্রায় গোধূলির আলোকে এই কয়েকটি কথা পেন্সিল দিয়া আঁচড়াইয়া একটুক্‌রা কাগজে লিখিল—"লেকেন্ তার আগে আমি এ দুনিয়া থেকে চ'লে যা'ব। লতিব-ছোক্‌রাকে দেখো। কেউ তা'কে নাচাচ্চে। তবে সেলাম, দোস্ত্।"

চিঠিখানা পাথরে জড়াইয়া সূতায় বাঁধিয়া আব্দুল নীচেকার ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া ঢুকাইয়া দিল! সে ঘরে আব্দুল, লুৎফর ও আর একটী বালক শুইত। তাহার পর সে, সেই ঘরে মৌলভী-সাহেবের যে একটী পুরাণো মর্চ্চাধরা পাখীমারা বন্দুক ছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল দিয়া সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত, এমন সময়ে সে শুনিল, নীচে লুৎফরের সঙ্গী সুকণ্ঠ সেখ সাদীর একটু মধুর "গজল্" গায়িতেছে। পরমুহূর্ত্তে সে শুনিল, গায়ক বিছানার উপর গিয়া শুইয়া পড়িল। সে আজ অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত পড়িতেছিল তো। বন্দুকটি ঠাসা আছে দেখিয়া আব্দুলের একপ্রকার উৎকট আনন্দ জন্মিল—তবু—তবু এ আত্মহত্যা কি কাপুরুষতা—"গুনাহ্" নয়?

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সে বন্দুকহাতে করিয়া এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

তৎপরে সহসা সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"না, এ কাজ করা হ'বে না। দে'খব কি হয়। মৌলভীসাহাব আমাকে তাড়িয়ে দিতে চা'ন, দেবেন। আমি বিদেশে চ'লে যা'ব।"

এ বড় উত্তম সংকল্প। কিন্তু এই সময়ে তাহার মস্তিষ্কে এক-প্রকার অকথ্য যন্ত্রণা-বোধ হইল। অতি অধ্যয়ন ও নৈরাশ্যের ফলে তাহার শরীরে আর কিছু নাই। সে ধড়াস্ করিয়া পড়িয়া গেল। বন্দুকটা তাহার হাতহইতে ছিট্‌কাইয়া ঘরের এক কোণে গিয়া পড়িল, তাহার মস্তকে আঘাত লাগিল, সে তাই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

৬

এই সময়ে লুৎফর নিয়ে নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তাহার সঙ্গী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ও কি ও!"

লুৎ। আবদুলের ঘরে বোধ হয় কিছু হ'ল। আমার ভয় হচ্ছে—আহা, বেচারা!—শব্দটা মৌলভী-সাহাবের সেই বন্দুকটার মত নয়? 'আবদুল তো কুছ্ কিয়া নেহি'? লুৎফরের সঙ্গীর নাম এম্‌দাদ্-হোসেন, সে বলিল,—"তাই কি? মৌলভী-সাহাবের বন্দুকটা কিন্তু ঐ ঘরেই থাকে।"

লুৎ। আবদুল এক-একসময়ে হঠাৎ কোন কোন কাজ ক'রে বসে, কিন্তু আপনার জান্ নেবে কি?

এম্‌দাদ্। চল মৌলভীসাহাবকে গিয়ে বলি, কিছু একটা হ'য়েছে।

লুৎ। মৌলভীকে গিয়ে ব'লব? আমি মিনিট-কুড়ি ধ'রে আবদুলের জন্যে ওকালতী কচ্ছিলেম, 'মেরা বাৎ' মা'নলে না, মানলে না। 'আরে ইয়ে মৌলভী এক জানবর হ্যায়'! আবদুল যদি কিছু গোঁয়ারতমী ক'রে থাকে—

এম্‌দাদ্। হ্যা দেখ, লুৎফর, ওকে কোনরকম ক'রে ওঘর-থেকে বা'র ক'রে দিতে হ'বে। 'লেকেন' আর আওয়াজ তো শুনা যাচ্চে না।

লুৎফর। মৌলভীর হুকুম 'জাহান্নমে' যা'ক, আমি গিয়ে ওকে একবার দে'খব।

এই বলিয়া সে উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিল, আবদুলের ঘরের দ্বারে তালা লাগান রহিয়াছে। ভিতরহইতেও দরজায় হুড়্‌কা দেওয়া, সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না।

নীচে নামিয়া আসিয়া সে এম্‌দাদকে এই সংবাদ দিল।

এম্‌দাদ্। তবে? তবে কি হ'বে?

লুৎফর। 'কই-সুরৎসে' ওর ঘরে যেতেই হ'বে। এই বলিয়া লুৎফর জানালা টপ্‌কাইল। তখন সে আবদুলের চিঠিখানি পাইয়া তাড়াতাড়ি পড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"ইয়ে আল্লা! এম্‌দাদ্ জল্‌দি, জল্‌দি, এই চিঠি প'ড়ে দেখ, আমরা যা ভয় কচ্ছিলুম, আবদুল তাই ক'রেছে। আমাকে একটু 'মদৎ' কর; আমি এই লোহা (বজ্রপাতনিবারণার্থে যে লৌহ উচ্চ গৃহে সংলগ্ন থাকে, সেই লৌহ; কথিত কক্ষ্যা-দুইটি বাড়ীর এক কোণে ছিল) ধ'রে, ওপরে উঠ্‌ব"। এম্‌দাদ্ তাড়াতাড়ি চিঠিখানি পড়িয়া লুৎফরকে 'মদৎ' অর্থাৎ সাহায্য করিতে আসিল।

লুৎফর সেই লৌহ ধরিয়া উপরে উঠিল, তাহার পর একপ্রকার ব্যায়ামকৌশলে আবদুলের ঘরের জানালার বহিঃস্থিত প্রস্তর-কার্ণিসে লাফাইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে কার্ণিস ভাঙিয়া পড়িল না, পড়িলে তাহার জীবন-সংশয় হইত। এম্‌দাদ্ নীচে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যাহা হউক, লুৎফরকে নিরাপদে কক্ষ্যামধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল।

প্রকোষ্ঠ এক্ষণে অন্ধকারাচ্ছন্ন। লুৎফর দিয়াশলাই জ্বালিয়া দেখিল। মুহূর্ত্তেক সে কিছুই দেখিতে পাইল না। ভয়ে তাহার কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল। তাহার পর, সে দেখিল কে একজন ঘরের মেঝিয়ায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে আবদুল, এক্ষণে নিস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ভয়ে আবদুলকে গতাসু মনে করিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে সেই প্রকোষ্ঠস্থিত মধূথবর্ত্তিকাটি জ্বালিয়া ফেলিল। তাহার পর আস্তে আস্তে গিয়া বন্দুকটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, উহা তখনও ঠাসা রহিয়াছে। গিয়া আবদুলের নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি দিল। না, তাহার এখনও নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, মরে নাই। তাহাকে তুলিয়া বিছানার উপরে শোওয়াইল। তাহার পর, কাহাকেও ডাকিতে জানালার দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে আবদুল তাহার চক্ষু খুলিয়া একটু কাতরোক্তি করিল। চিঁচি করিয়া বলিল,—"কে, লুৎফর?"

লু। হ্যাঁ! তোর কি হ'য়েছে?

আ। কিছু না, আমি একটু নিরাশ হ'য়ে প'ড়েছিলুম, কিন্তু আমি ও বন্দুকটা ব্যবহার করি নি। বোধ হয়, আমি প'ড়ে গিয়েছিলুম। লুৎফর, চিঠির কথা ভু'লে যা। 'ময়, দেখুঙ্গা মেরা কিয়া হোগা। পিছু ইয়ে বোর্ডিং ছোড়্‌কে কাঁহি চলা যাউঙ্গা।' 'দোস্ত্', তুই কি ক'রে এখানে এলি?

লুৎ। 'ডরো মৎ, দোস্ত্। খোদা হ্যায়', যে 'গুনাহ্‌গার', সেই ধরা প'ড়বে। আমরা সব উঠে প'ড়ে লেগেছি। মৌলভীকে কে সেই চিঠিটা লিখেছে, তা আমরা টের পেয়েচি। হারামী আবুর ওপর আমি নজর রেখেছি। এখন তুই ঘুমো'বার চেষ্টা দেখ্। আমি নীচেথেকে শুনলুম, এই ঘরে কি একটা শব্দ হ'ল। তাই ঐ লোহা ধ'রে ওপরে উঠে এসেছি। আমি এখন এখানে কিছুক্ষণ থাক্‌ব। তুই শো দেখি।

আবদুল কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল। লুৎফর তখন আস্তে আস্তে আবার সেই জানালা টপ্‌কাইয়া লোহা ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আব্‌দুলকে কি তবে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে? সকলেরই মুখে এই প্রশ্ন; উত্তর কেহ জানে না। সকলেই আব্‌দুলেরই দলে। হেড্-মৌলভীর নিকটহইতে হুকুম আসিল যে, বেলা দশটার সময় সব ছেলেকেই মাদ্রাসার 'হলে' গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তখন সকল বালকই বুঝিল যে, একটা কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিবে। লুৎফর ঘণ্টাখানিকযাবৎ হেড্-মৌলভী আফিস-ঘরে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বালকের সেইখানে ডাক পড়িয়াছে—তন্মধ্যে লতিফ ও আবুও ছিল। কিন্তু ব্যাপার কি, এখনপর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, অবশেষে লুৎফর ফিরিল। তখন অন্য সকল বালকে তাহাকে "ছাঁকাবাঁকা" করিয়া ধরিল। সকলেই তাহাকে একএকটী প্রশ্ন করিতে লাগিল—"কি হ'ল?", "আব্‌দুলকে ছেড়ে দিয়েছে?" ইত্যাদি।

লুৎ। আব্‌দুল বেকসুর খালাস পেয়েছে।

আবার নানা প্রশ্ন হইতে লাগিল। তখন লুৎফর বলিতে বাধ্য হইল যে, তাহার মুখ একটিমাত্র! অনন্তর সে জানাইল, প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, আবু কানহাইয়াকে জানালা খুলিয়া দেয়। আবুই "টাইপ" করিয়া চিঠী লেখে। কারণ তাহার আব্‌দুল ও লতিফের উপর ভারি রাগ ছিল।

ঘণ্টাখানিক পরে হেড্-মৌলভী অতি গম্ভীরমূর্ত্তি ধরিয়া "হলে" শুভাগমন করিলেন। প্রথমে তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি বালকের গোঁয়ার্ত্তমীর জন্য তাহাদিগকে মৃদুভর্ৎসনা করিলেন। তাহার পর তিনি কহিলেন,—"তোমাদের মধ্যে একটী ছোক্‌রা আছে—খুব সৎসাহসী—তা'কে তোমরা সকলেই 'তারিফ' কর, সে অন্যকে বাঁচা'তে গিয়ে নিজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ক'রে তুলেছিল, আর একটু হ'লে, তা'র 'আখির বরবাদ' হ'য়ে যেত। সে, অবশ্য বোকামি ক'রে, একটী ছোট ছেলেকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রেছিল। তোমরা সব কথা জান, তাই আমার বিশেষ ক'রে কিছু ব'লবার দরকার নেই। আমি সুধু এইমাত্র তোমাদের জানা'তে চাই যে, চুরীর ব্যাপারটা সন্তোষজনকভাবে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। তোমরা যেমন, আমিও তেম্‌নি প্রবঞ্চিত হ'য়েছিলুম। চোর আব্‌দুল নয়—আবু। সে হারামীকে বিদেয় করে দিয়েচি। আমি চাই, এই বোর্ডিংএর ছেলেরা আব্‌দুলেরই মত সৎসাহসী হয়, তবে ওর মত গোঁয়ার হওয়া উচিত নয়। এইবার 'ইন্‌তিহানের' (পরীক্ষার) কথা বলি,—আব্‌দুলই এ বছর আমীরালি-বৃত্তিটি পা'বে।"

এমন সময়ে আব্‌দুল একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া সেই 'হলে' প্রবিষ্ট হইয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইল—তাহার তপ্তকাঞ্চনগৌর গণ্ডযুগল রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে।

সব ছেলে উল্লাসে করতালী দিয়া উঠিল। মৌলভীসাহেব আব্‌দুলকে আলিঙ্গন-দান করিলেন।

* * * * *

তাহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। আব্‌দুল এখন বি-এ পাশ করিয়া "একষ্ট্রা এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিসনা"র হইয়াছে। লুৎফরও বি-এল্ পাশ করিয়া মুন্সেফ হইয়াছে। দুই বন্ধুর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহারা সেই "কালরাত্রির" কথা তুলে, আব্‌দুল লুৎফরের সেই প্রাণসংশয় লৌহদণ্ডারোহণের কথা তুলিয়া তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করে। লুৎফরও আব্‌দুলের সৎসাহসের বিস্তর সুখ্যাতি করে।

কবিতা।

"বালকে" প্রকাশার্থে আমরা প্রায়ই কবিতা পাইয়া থাকি। সেগুলি আর যাহাই হউক না কেন, কবিতা নহে। কাহারও কাহারও এই ধারণা আছে যে, চিত্তচমৎকারিণী চিন্তা ছন্দোবদ্ধ করিয়া দিলেই কবিতা হয়, ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত-ধারণা কিছুই হইতে পারে না। কোন একটী ভাল ভাব পাইলে, তাহাকে বহুকাল ধরিয়া মনের মধ্যে পরিপাক করা চাই, সেই ভাবটির মধ্যে কতটা কল্পনার লীলা,—কতটা জ্ঞানের আলোক, ব্যঞ্জনা-কালে কতটা অভিনব ভঙ্গী প্রবিষ্ট করান আবশ্যক, তাহা ক্রমে ক্রমে ভাবিয়া ঠিক করিতে হইবে। ভাবটিকে ভালবাসিতে হইবে, ভাবটিকে লইয়া উন্মত্ত হইতে হইবে, তাহাতে মজিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর, কলম ধরিলে, যাহা বাহির হইবে, তাহা কবিতা হইতে পারে। তখন তাহার মিল-দোষ ঘুচাইবার চেষ্টা কর, ঘসিয়া-মাজিয়া তাহাকে, যত দূর পার, চকচকে ঝক্‌ঝকে করিয়া তুল। দিনকতক ফেলিয়া রাখ, তাহার পর তাহাকে, যদি পার, আরও একটু মাজা-ঘষা করিয়া লোক-চক্ষুর গোচর কর। কবিমাত্রেরই একটি নূতন জ্ঞান, একটী নূতন তথ্য, একটী নূতন সত্য, একটী নূতন বার্ত্তা দেশবাসীকে দিবার থাকে। যাহার তাহা নাই, তাহার ছন্দোময়ী রচনা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, কবিযশঃপ্রার্থী হওয়ার চেষ্টা বিফলই হইবে। চেষ্টা করিলে, সকলে ছন্দে লিখিতে পারে, সকলে কবি হইতে পারে না। এক বালকের কবি হইবার সাধ হইয়াছিল। অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টা করিল, বিষয়-নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারিল না। সে চাষার ছেলে, একদিন দেখিল,

তাহার পিতা গরুর জন্য বিচালি কাটিতেছে। দেখিয়া তাহার ভাবোদয় হইল,—

"পিতামাতা পরম গুরু।"

ছন্দঃ আর মিলে না—শেষকালে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর লিখিয়া ফেলিল,—

"'কাট্‌না' কাটে সরু সরু!"

"গুরু" আর "সরু"তে একটু মিলদোষ জন্মিল, তাই পিতার উপযুক্ত পুত্র সংশোধন করিল,—

"পিতামাতা পরম গরু,
কাট্‌না কাটে সরু সরু!"

কেমন কবি?

বস্তুতঃ কাহাকেও ঘষিয়া-মাজিয়া কবি করা যায় না, কবিত্ব সহজাতশক্তি। তুমি অকবি, সন্ধ্যাকালে আকাশে তারা দেখিয়া লিখিলে—

কিবা শোভা মনোলোভা সন্ধ্যা-তারকার।
নিরখি ও শোভা মুগ্ধ নহে আঁখি কা'র?

কবি হয়ত লিখিবেন—

"শুনেছি মানুষ মরি' হয় গিয়া তারা;
দেখি নভে এত তারা হই দিশাহারা।
কোথা তুমি বল মোরে দয়া ক'রে, বোন!
আজি তুমি আলোকিছ কোন্ নভঃ-কোণ?
তখনো বালিকা তুমি ছাড়ি' গেছ মোরে,
ভাসাইয়া বক্ষঃ মোর লোচনের লোরে।
ক্ষুদ্রা তুমি সুনিশ্চয় নীহারিকাপ্রায়,
জ্যোতিঃ তব শুভ্র অতি, দ্বিধা নাহি তা'য়।
ওই বুঝি তুমি—ওই দীপ্ততারা পাশে,
দুলালী দুহিতা তা'র পিতৃপাশে হাসে!"

এখানে পিতৃহীন ও ভগিনীবিরহিত কবির সুপ্ত শোক সন্ধ্যা-তারকাদর্শনে জাগরূক হইয়াছে। ভাবটি যে মুহূর্ত্তেকে পুষ্ট ও কবিতাকারে ব্যক্ত হয় নাই,—তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কবি যে সন্ধ্যা-তারকাগুলিকে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও সহজেই অনুমেয়। এইরূপ ভাববিহ্বলতা জন্মিলে, ছন্দোময়ী রচনা কবিতা হইয়া উঠে।

আগষ্ট-মাসের প্রতিযোগিতার ফল।

[আগষ্ট-মাসের প্রতিযোগিতায় নিম্নোদ্ধৃত নিবন্ধটি প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছে।—"বালক"-সম্পাদক।]

স্বর্ণ-সূত্র।

রূপকের মর্ম্ম-ব্যাখ্যা।

স্বর্ণ-সূত্র-নামক আখ্যানটি সুন্দর আধ্যাত্মিক-শিক্ষায় পূর্ণ। উহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, প্রথমে "চরিত্রগুলির" রূপক ভাঙ্গিতে হইবে।

প্রথমতঃ কুমার পরেশ সিংহ—পরেশের সহিত ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানবের তুলনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রাজা প্রবর সিংহ—রাজা, জীবগণের নিয়ন্তা পরমেশ্বর। আর স্বর্ণ-সূত্রটী "ঈশ্বরের আজ্ঞাবহতা"রূপ সূত্র। এই সূত্র ধরিয়া রাখিলে আপদে, বিপদে, সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে পিত্রালয়ে—রাজ-প্রাসাদে যাইতে পারা যায়। অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন, সেই সকল আজ্ঞাপালন করিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকিলে, আমরা বিপথে,—পাপের কুহকে না যাইয়া সত্যপথে চলিয়া অবশেষে আমাদের পিতা ঈশ্বরের নিকট—সুখময়স্থান স্বর্গে যাইতে পারি।

অনন্তর "অরণ্য"—অরণ্য এই সংসার, এই সংসারে পাপরূপ দস্যু বাঘা, মায়াজাল-রূপ বৃদ্ধা ও কিশোরী, বিলাসরূপ প্রজাপতি, বনফুল সর্ব্বদাই দেখা যায়। যে দুর্ব্বল-হৃদয়, সে সহজেই বিপদে পতিত হয়, কিন্তু যে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ ও পাপহইতে দূরে রহিতে যত্নবান্, সেই কেবল শেষপর্য্যন্ত স্থির থাকে।

কুমার পরেশ, এই অরণ্যে প্রজাপতি, বনফুল প্রভৃতি আহরণ করিতে গিয়া স্বর্ণ-সূত্র হারাইয়া ফেলিল এবং পথ-হারা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমরাও কত সময়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ আজ্ঞাবহতারূপ সূত্র হারাইয়া ফেলি, এবং পুষ্প বা প্রজাপতিরূপ জগতের মায়া ও বিলাসিতায় আকৃষ্ট হইয়া, সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া আকুল হই। তখন চতুর্দ্দিকে পাপজনিত ভীতি ও নিরাশার ঝটিকা প্রবাহিত হয়। এবং অনেকেই পরেশের ন্যায় কর্ত্তব্য না বুঝিয়া দস্যুরূপ পাপের কবলে পতিত হই এবং তখন যদি সম্পূর্ণরূপে পাপের বশ্যতা-স্বীকার না করিয়া অনুতাপ করিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা চাই, তাহা হইলে আমরা পাপের কবলহইতে মুক্ত হই। এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাবহতারূপ স্বর্ণ-সূত্র পুনঃপ্রাপ্ত হই, অর্থাৎ পুনরায় ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী চলিতে আরম্ভ করি। কিন্তু অনেকে দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত পুনরায় সুন্দর-পক্ষী-ডিম্বরূপ পাপের কুহকে ভুলিয়া পথভ্রষ্ট হয়, তখন যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া বল-ভিক্ষা করি, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের মার্জ্জনা করিবেন। এবং পুনঃ আমরা সত্যপথে চলিতে আরম্ভ করিব। যদিও সত্যপথে চলা কষ্টকর, তথাপি ভীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পাপ তখনও যদি "বাঘার" ন্যায় পশ্চাদ্ধাবন করে, তথাপি কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না; কারণ ঈশ্বর সহবর্ত্তী। এক নূতন সঙ্গী পরেশের সহযাত্রী হইল, সে চিতু; তাহার সহিত ঈশ্বরে নব-বিশ্বাসীর তুলনা করা যাইতে পারে। অবশেষে সে নিরাপদে মনোহর হরিৎদ্বীপের মধ্যস্থিত পিতার আরণ্যক অসিতাক্ষের বাটীতে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ তখন আমরা সংসার-মরুহইতে "ঈশ্বরের মণ্ডলী"রূপ দ্বীপে উপস্থিত হই, এবং আরণ্যক অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশ্বাসী সেবক আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থিত করেন। অনন্তর কয়েক দিন তথায় থাকিলে পর, পরেশের ন্যায় আমরাও শোভাময়ী জীবন-নদী পার হইয়া পিত্রালয় স্বর্গে উপস্থিত হইব। আর স্বর্গদূত গাহিবেন:—

মুক্ত-আত্মা এইস্থানে নিজগৃহে ফিরি
সুখ অনুপম ভুঞ্জে অবিরত;
নাহি আর প্রলোভন, পাপের কুহক,—
সদানন্দে সবে থাকিবে সতত।

শ্রীপ্রভাকর দাস,
বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর।
৯।১ সাউথ রোড, ইটালী,
কলিকাতা।

বালক

২য় বর্ষ।] নভেম্বর, ১৯১৩ [১১শ সংখ্যা

মার্জ্জনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মধ্যে এক মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা কুশরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি বৃকবিক্রমের পরমবন্ধু ছিলেন। তিনি জয়ন্তের গণ্ডে তপ্ত লৌহশলাকার চিহ্ন দেখিয়া যান। জয়ন্ত তাঁহার দ্বারা ভল্লুবীর্য্যের কাছে, পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি পরুষ-ব্যবহার করিত বলিয়া, ক্ষমা চাহিয়া পাঠায়। সেই যোদ্ধা, জয়ন্ত কুশরাজ-প্রাসাদে কেমন আছে, তাহা জানিতে আসিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত তাঁহার গোপনে অনেক কথা হয়। তিনি শেষকালে বলিয়া গেলেন,—"আপনি বাল-মহারাজের কোন বিপদ্ দেখিলেই আমাকে সংবাদ দিবেন।"

পরে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। একদিন জয়ন্ত ও অরবিন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, দুর্ব্বৃত্ত অসুর-যোদ্ধা রক্তমুখ রাজপ্রাসাদে আসিয়াছে। তাহার সম্মানার্থে এক মহাভোজের আয়োজন হইতেছে।

রাত্রিকালে সেই ভোজে উপস্থিত হইবার জন্য একজন রাজানুচর বলিতে আসিল। অরবিন্দ তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাহাতে বিচিত্রবীর্য্য জয়ন্তের নিকটে সংবাদ পাঠায়,—"তুমি যদি এই ভোজে না আইস, তাহা হইলে অদ্য রাত্রিতে তোমাকে উপবাসী থাকিতে হইবে।"

তদুত্তরে জয়ন্ত বলিয়া পাঠায়,—"আমি তোমার মত পেটুক নহি। পিতৃঘাতীর সহিত আহার করার অপেক্ষা উপবাসী থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি।" অধিক রাত্রিতে শার্দ্দূল-বীর্য্য লুকাইয়া তাহার নিমিত্ত একটী স্থূল রোটিকা আনিয়া দেয়। জয়ন্ত ও অরবিন্দ তাহাই ভাগ করিয়া খান। তখন তাঁহারা তাহারই মুখে শুনেন যে, তাঁহাদের বিশ্বস্ত অশ্বপাল-দুইজনকে রক্তমুখের সৈনিকেরা, তাহাদিগের সহিত মিছামিছি কলহ বাধাইয়া, বধ করিয়াছে। শুনিয়া জয়ন্ত নিরুপায় ক্রোধে ক্রন্দন করিতে থাকে।

অরবিন্দ তাহাতে মহাভাবিত হইলেন। কারণ ঐ অশ্বপালদিগের দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের সুবিধা ছিল।

বিপদ্ ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একদিন জয়ন্ত ও অরবিন্দ স্নানার্থে প্রাসাদের বাহিরে এক নদীতে যাইতেছিলেন। রাজা রক্তমুখের সঙ্গে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর হস্তে তখন দুর্গের ভার ছিল। তিনি অরবিন্দ ও জয়ন্তকে ফিরাইয়া আনিয়া বলিলেন যে, যতদিন না রাজা ফিরিয়া আসেন, ততদিন জয়ন্তের প্রাসাদহইতে বহিঃনিসৃত হইবার আদেশ নাই; হইলে তাহার নেত্রযুগল উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইবে। অন্য সময় হইলে, জয়ন্ত ক্রোধে আত্মহারা হইতেন; কিন্তু এখন তিনি অবস্থানুযায়ী চলিতে শিখিয়াছেন। এই সময়ে বিচিত্রবীর্য্য একটী অবমাননা-সূচক কথা বলাতেও, সে ক্রোধ-প্রকাশ করিল না। সে অরবিন্দকে বলিল,—"উহাদের আদেশ অমান্য করিলে, উহারা হয়ত তোমাকেও মারিয়া ফেলিবে। কাজ নাই, আমি আর প্রাসাদের বাহিরে যাইব না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

এক নিদাঘ-সন্ধ্যায় জয়ন্ত ও শার্দ্দূলবীর্য্য প্রাসাদ-তোরণের সন্নিকটে কন্দুক-ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী প্রাসাদ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, ললাটে বিভূতি-বিন্দু, হস্তে—দক্ষিণ-হস্তে ত্রিশূল, বামহস্তে কমণ্ডলু, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধান শার্দ্দূলচর্ম্ম। তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া

গম্ভীর উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরে এই ভগবৎ-স্তোত্রটী গায়িতে লাগিলেন,—

জয় জগদেক গতি, সত্য, জ্যোতিঃ।
জয় একমেব দৃশ্য বিশ্বপতি।
জয় সোম-সূর্য্য-স্রষ্টা,
জয় তারাস্তোম-স্রষ্টা,
জয় পরম-পাবন, প্রেমময় অতি।
বিশ্ব শান্ত, সমাহিত,
অর্ক ক্লান্ত, অস্তমিত,
অহং পান্থ দূরনীত
বিশ্ব-পথি,—
প্রভো, শৃণু মে মিনতি,
অহং অভাগ্য, অগতি,
পাহি দুরিত-দ্রোহাৎ,
দেহি শুদ্ধমতি।

গান শুনিয়া বালকদ্বয় মুগ্ধ হইল। উভয়ে ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"ভগবান্ বিশ্বনাথ কুমার-যুগলকে প্রেমামৃত-প্রদান করুন।" তাহা শুনিয়া জয়ন্ত সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—"একি সন্ন্যাসী-ঠাকুর যে আমার মাতৃ-ভাষায় কথা কহিলেন! যতিপ্রবর, আপনি কি আমাদের ব্রহ্মাবর্ত্তহইতে আসিয়াছেন? অরবিন্দ, অরবিন্দ, ইনি আমাদের স্বদেশের লোক!"

সন্ন্যাসী। মহারাজ, আমি এরূপ আনন্দোপভোগের প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী জয়ন্তকে অভিবাদন করিল।

"এ কি তুমি রাজশিকারী মহামল্ল যে! আর্য্যা গৌতমী কুশলে আছেন তো? আর আর সকলে কেমন আছেন?"

"হাঁ, তাঁহারা সকলে ভালই আছেন, আপনার কুশল-সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া আছেন।"

এমন সময়ে কে মহামল্লের পিছনহইতে কহিল,—"এ সকল কি হইতেছে? কে আমার পথরোধ করিতেছে? এখানে জয়ন্তই রাজা না কি?"

বিচিত্রবীর্য্য আসিয়া ঐ কথা বলিল। সে মৃগয়ায় গিয়াছিল, একটিও পশু-বধ করিতে পারে নাই, তিক্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়াছে।

শার্দ্দূলবীর্য্য কহিল,—"এ ব্যক্তি ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী, জয়ন্তের অনুগত রাজন্য।"

বি—বী। ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী, সত্য নাকি? আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরা অসভ্য সুরদিগের হাত এড়াইয়াছি। এই দস্যুদিগের মুখ আর আমরা সন্দর্শন করিতে চাহি না। কে আছ, এই দস্যুটাকে উত্তমরূপে কশাঘাত করিয়া বিদায় করিয়া দাও—রাজকুমারের পথরোধ করিবার ফলভোগ করুক।

একজন রাজানুচর সাহসপূর্ব্বক কহিল,—"কুমার, ইনি যে সন্ন্যাসী, ইঁহাকে কি করিয়া কশাপ্রহার করা যাইবে?"

"সন্ন্যাসী, না ছদ্মবেশী গুপ্তচর? আমি বলিতেছি, এই কুক্কুরটাকে কশাঘাত করিয়া দূর করিয়া দাও, ঘৃণিত চরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেছ কেন? জয়ন্ত তীরবেগে কশাপ্রহারোদ্যত অসুর ও মহামল্লের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আমার সমক্ষে কাহার সাধ্য যে, সে কোন ব্রহ্মাবর্ত্তবাসীর অঙ্গস্পর্শ করে?"

ফলে উদ্যত কশাঘাতে জয়ন্তের অঙ্গের এক স্থান চিহ্নিত হইয়া গেল! তদ্দর্শনে বিচিত্রবীর্য্যের আমোদ দেখে কে?

মহামল্ল কহিলেন,—"এ আপনি কি করিলেন, মহারাজ? দাস থাকিতে আপনি কেন অনর্থক প্রহারিত হইতে গেলেন?"

তাঁহার বাক্য মহাক্ষোভব্যঞ্জক!

কিন্তু জয়ন্ত কশা-ধারণ করিয়া মহামল্লের উদ্দেশে কহিল,—"এই বেলা পলাও, শীঘ্র, শীঘ্র, দেরি করিও না।" অরবিন্দ, শার্দ্দূল-বীর্য্য, অন্য সমস্ত অসুরেরাও তাঁহাকে উহাই করিতে অনুরোধ করিলেন। মহামল্ল গত্যন্তর না দেখিয়া রাজাজ্ঞা-পালন করিল। অসুরেরা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসীর অবমাননা কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাতে বিচিত্রবীর্য্য বড়ই উষ্মা-প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে সে মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া, একজন গুপ্তচরকে ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া, বড়ই আত্মপ্রশংসা ও আস্ফালন করিতে থাকিল।

বিচিত্রবীর্য্য মহামল্লকে গুপ্তচর মনে করিয়া নিতান্ত অন্যায় করে নাই। মহামল্ল জয়ন্তের অবস্থা অবগত হইবার জন্যই সন্ন্যাসিবেশে আসিয়াছিলেন। তিনি আরও কয়েক দিন কুশদেশে লুকাইয়া রহিলেন, কিন্তু কোন সুযোগে অরবিন্দের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত দেশবাসিগণকে জানাইলেন। দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল। সর্ব্বত্র মহারাজের কল্যাণ-কামনা করিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি হইতে লাগিল। মহাকার্ম্মুকের নিকটও এ সংবাদ পঁহুছিল। সেও নিজদেশে জয়ন্তের মঙ্গলার্থে নানা পূজা-হোমাদি করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে কুশরাজপ্রাসাদে সংবাদ আসিল যে, কুশরাজ শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিবেন। শুনিয়া জয়ন্ত অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইল। সে আশা করিল যে, কুশরাজ ফিরিয়া তাহাকে কারামুক্ত করিবে।

কিন্তু অনভ্যস্ত কারাবাসহেতু সে শীঘ্রই ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়িল। দুই-তিনদিন সে অজ্ঞান হইয়া রহিল, তাহার পর প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অরবিন্দের তন্নিমিত্ত উদ্বেগের পরিসীমা রহিল না। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যার কিছুই জানিতেন না। এদিকে তাঁহার ধারণা হইল যে, কেহ মহারাজকে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছে, কাজেই তিনি জয়ন্তের রোগের কথা-গোপন রাখিলেন এবং তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কেবলই সোদ্বেগে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া অতি কষ্টে রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, এইবার বুঝি জয়ন্ত ইহলোক-ত্যাগ করিয়া যায়। উদ্বেগে তাঁহার এমনই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তিনি শিরে করাঘাত করিয়া সশব্দে রোদন করিবেন, কিন্তু জয়ন্তের মুখ চাহিয়া সে ইচ্ছা দমিত করিতে লাগিলেন।

সমস্ত রাত্রি জয়ন্ত অস্থির হইয়া রহিল। প্রভাতেও তাহার রোগের বিশেষ কিছু উপশম হইল না। তখন আর তাহার রোগের কথা-গোপন করা চলিল না। রাজ্ঞী তাহার ব্যাধির কথা শুনিয়া এক বৃদ্ধা ধাত্রীকে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত পাঠাইতে চাহিলেন; কিন্তু অরবিন্দ কাহাকেও সেই কক্ষ্যামধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। ধাত্রীর কথা শুনিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, এইবার সেই ডাকিনীকে দিয়া মহারাজের শেষ-নিশ্বাসটুকু হরণ করিয়া লইতে চায়।"

সেই দিন ও তাহার পরদিবস জয়ন্ত অত্যন্ত অসুস্থ রহিল। তাহার পরদিন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল, তাহা দেখিয়া অরবিন্দ অতীব আহ্লাদিত হইলেন, নিজ মনে কহিলেন,—"এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। দুরাত্মাদিগকে আর আমি বিষপ্রয়োগের কোনই অবকাশ দিব না।" জয়ন্ত এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, কথাপর্য্যন্ত কহিতে পারিত না। অরবিন্দ অতীব যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজভাণ্ডারহইতে প্রেরিত কোন খাদ্যই জয়ন্তকে খাইতে দিতেন না। এক পাচকের সহিত সৌহৃদ্য করিয়া স্বয়ং সকল খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিতেন। কাহাকেও জয়ন্তের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না। শার্দ্দূলবীর্য্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলে জয়ন্ত তাহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ করিত, কিন্তু অরবিন্দ তাহাকেও কক্ষামধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। জয়ন্ত নিজ বিপদের কথা-স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিত।

দশম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। কুশরাজ প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। জয়ন্ত প্রকোষ্ঠের বাহির হইবার জন্য ব্যাকুলতা-প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু অরবিন্দ তখনও তাহাকে বাহির হইতে দিলেন না।

একদিন অরবিন্দ জয়ন্তকে বলিলেন,—"মহারাজ, সাবধান হইয়া থাকিবেন; আমি কোন প্রয়োজনে বাহিরে যাইতেছি, শীঘ্রই ফিরিব। রাজার সঙ্গে মৃত মহারাজের মহাশত্রু রণবীর আসিয়াছে। এখানে বসিয়া নীরবে ঈশ্বরের নাম-স্মরণ করুন, কোথাও যাইবেন না।"

এই বলিয়া অরবিন্দ চলিয়া গেলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পরে ফিরিলেন। তাঁহার স্কন্ধে একবোঝা শুষ্ক তৃণ।

জয়ন্ত তদ্দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"এ কি, এত খড় কি হইবে? আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আর তুমি কি না খাদ্য না আনিয়া খড় আনিলে?"

"আপনার খাদ্যও আনিয়াছি।"—এই বলিয়া অরবিন্দ খড়ের বোঝা ফেলিয়া দিয়া একটি থলিয়ার মধ্যহইতে কয়েকখানি রোটিকা ও খানিকটা মাংস বাহির করিলেন। তাহার পর কহিলেন,—"মহারাজ, আগামী কল্য রাত্রিতে যদি আপনি ব্রহ্মাবর্ত্তের রাজদুর্গে বসিয়া নৈশভোজ-গ্রহণ করিতে পান তো কেমন হয়?"

জয়ন্ত। ব্রহ্মাবর্ত্তে? ব্রহ্মাবর্ত্তে? অরবিন্দ, বল কি—ব্রহ্মাবর্ত্তে? সত্য কি কল্য-রাত্রিতে আমরা ব্রহ্মাবর্ত্তে যাইব? কি আনন্দ, কি আনন্দ! ভদ্রবীর্য্য আসিয়াছেন কি? রাজা কি যাইতে দিবেন?

অর। চুপ, চুপ করুন, মহারাজ! ভদ্রবীর্য্য আসেন নাই। আমাদেরই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া এ স্থান-ত্যাগ করিতে হইবে। আপনি যদি চুপচাপ না থাকেন, বুদ্ধি-বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে।

"স্বদেশে যদি ফিরিতে পাই, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

"প্রথমে আহার করুন।"

"কিন্তু তুমি কি করিবে? এবার আর আমি কোনপ্রকার নির্বুদ্ধিতা-প্রকাশ করিব না। তবে আমি শার্দ্দূলবীর্য্যের সহিত শেষ-সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে চাই।"

"না, তাহা পাইবেন না, তাহা হইলে আমরা পলায়নের অবকাশ পাইব না। আপনি অসুস্থ আছেন জানিয়াই এই দুরাত্মারা নিশ্চিন্ত আছে।"

"শার্দ্দূল-বীর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না, এ বড় দুঃখ। যাহা হউক, দেশে ফিরিয়া আর্য্যা গৌতমী, আর্য্য নক্রবিক্রমের আলিঙ্গন-লাভ করিয়া সকল কষ্টের উপশম করিব। মহাকার্ম্মুকও আবার আমার কাছে আসিবে। তবে, অরবিন্দ, বিলম্ব করিও না, শীঘ্র এ পাপপুরী-পরিত্যাগ করিয়া চল।"

অতিশয় উত্তেজনাবশতঃ জয়ন্ত ভাল করিয়া আহার করিতে পারিল না। অরবিন্দ ক্ষিপ্রহস্তে তাবৎ আয়োজন সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার কটিদেশে তরবারি ঝুলাইলেন। জয়ন্তের কটিবন্ধনীতেও তাহার ছুরিকা কোষবদ্ধ করিয়া দিলেন। কিছু খাদ্য একটী

থলিয়ার মধ্যে লইলেন। তাহার পর খড়গুলি বিছাইয়া জয়ন্তকে তাহার মধ্যে শায়িত করিয়া বোঝার ন্যায় বাঁধিয়া ফেলিলেন। পরে জয়ন্তকে কহিলেন,—"মহারাজ, আপনার নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে কি?"

জ। না।

অ। তবে শুনুন, আমি অশ্বদ্বয়কে তৃণাহার করাইতে তৃণ লইয়া যাইতেছি। আপনি কোন কারণেই বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। এ রহস্য নহে, জীবন-মরণ-ব্যাপার। এই বলিয়া অরবিন্দ জয়ন্তসুদ্ধ খড়ের বোঝা মস্তকে করিয়া প্রথমে অশ্বশালার দিকে গেলেন। পথে একজন কুশবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে, তুমিই যে তৃণ-বহন করিতেছ? ব্যাপার কি?"

অরবিন্দ। কি করি, উপায় নাই; অশ্বপালদ্বয় হত হইয়াছে। জীবদ্বয়কে বাঁচাইতে হইবে তো?

অশ্বশালায় পঁহুছিয়া অরবিন্দ তৃণ-স্তূপ মস্তকে লইয়া অশ্বদ্বয়ের মুখ ধরিয়া প্রাসাদ-তোরণ-পর্য্যন্ত গেলেন। আজ রাজপ্রাসাদে মহাভোজ হইতেছে। সকলেই সেই ভোজের জন্য ব্যস্ত, তথাপি অরবিন্দ সকল দিক্ দেখিয়া প্রাসাদ-ত্যাগ করিলেন। তাহার পর, জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ, বিশেষ কষ্ট হইতেছে কি?"

"একটু হইতেছে। এখন তুমি আমাকে বাহির করিয়া দিলে, ক্ষতি কি?"

"একটু ধৈর্য্য ধরুন, শীঘ্রই মুক্ত হইবেন।" এই বলিয়া তিনি তৃণরাশি একটী অশ্বের পৃষ্ঠে বাঁধিলেন, দ্বিতীয় অশ্বটিতে স্বয়ং আরোহণ করিয়া ছুটিয়া চলিলেন।

জয়ন্তের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। ঠিক সেই সময়ে অরবিন্দ অশ্বের গতি সংযত করিল। তাহার পর জয়ন্তকে তৃণ-মুক্ত করিয়া দিল। সে দেখিল, তখন গোধূলি-কাল; পক্ষীরা স্ব স্ব নীড়ে ফিরিয়া মধুর কূজন করিতেছে। জয়ন্ত বলিল,—"আঃ বাঁচিলাম! কি স্নিগ্ধ সমীরণ বহিতেছে!"

অরবিন্দ। এখনও আমরা নিরাপদ্ নহি, এই পাষণ্ডের রাজ্য-সীমা-অতিক্রম করিতে না পারিলে, আমরা নিরাপদ্ নহি। মহারাজ, অশ্বারোহণ করুন, এখন আমাদের প্রাণপণে ছুটিতে হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জয়ন্ত সংপ্রতি ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে, সুতরাং পথে যে তাহার কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান যাইবে না। অরবিন্দ দেখিলেন যে, জয়ন্তের অশ্বটিও একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পথিমধ্যে একদল বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের কাছে কয়েকটি অশ্ব ছিল, অরবিন্দ তাঁহাদের একটী অশ্বের সহিত জয়ন্তের ক্লান্ত অশ্বটির বিনিময় করিয়া লইলেন। পরে পুনরায় জয়ন্তকে লইয়া দ্রুত ধাবিত হইলেন।

তাহার পর অরবিন্দ যখন জয়ন্তকে লইয়া মহাকার্ম্মুকের দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন সে অতিক্লান্তিহেতু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অরবিন্দ আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জয়ন্ত সেই আনন্দে যোগ দিতে পারিল না। মহাকার্ম্মুক-জননী তাহার শুশ্রূষার ভার-গ্রহণ করিলেন। অরবিন্দের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল।

অনেকক্ষণ শুশ্রূষা করার পর জয়ন্তের নিদ্রাকর্ষণ হইল। তখন অরবিন্দও নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার পদতলে শুইলেন।

প্রভাতে জয়ন্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এ কি, কে তাহার কাছে বসিয়া রহিয়াছে?—মহাকার্ম্মুক! জয়ন্ত ক্রমশঃ বুঝিতে পারিল যে, সে তাহার স্বদেশে ফিরিয়াছে এবং তাহার প্রিয় সঙ্গী মহাকার্ম্মুক এখন তাহার নিকটেই উপবিষ্ট, তখন সে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইল।

ক্লান্ত অরবিন্দ তখনও নিদ্রিত। জয়ন্ত উঠিয়া বসিয়া মহাকার্ম্মুকের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার প্রজাবর্গ সংবাদ পাইল যে, তাহাদের বালক-নৃপতি দেশে ফিরিয়াছেন। উচ্চপদান্বিত প্রজাবর্গ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ সমবেত হইলেন। তখন জয়ন্তকে মহাকার্ম্মুকের সাহায্যে বেশ-পরিধান করিয়া সভামধ্যে যাইতে হইল। প্রথমে সে নক্রবিক্রমের অন্বেষণ করিল। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গল-লগ্ন হইল, কহিল,—"আমি ও অরবিন্দ এখন নিরাপদ্ হইয়াছি। আর্য্যা গৌতমী কেমন আছেন?

নক্র। জয় ভগবান্! বৎস, তোমাকে নিরাপদ্ দেখিয়া এবং আমার পুত্র তাহার কর্ত্তব্য-পালন করিয়াছে জানিয়া আমি অপরিসীম আনন্দ-লাভ করিলাম।

জয়। আর্য্যা গৌতমী ভাল আছেন তো?

নক্র। হাঁ, এখন তিনি আপনার বিপন্মুক্তির কথা শুনিয়া সুস্থা হইয়াছেন, কিন্তু মহারাজ, আপনি আমার গল-লগ্ন হইয়া থাকিলে, অন্য প্রজারা কি ভাবিবেন?

তখন জয়ন্ত একটু লজ্জিত হইয়া অন্য সমস্ত প্রজাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা তাহাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন, সে পূর্ব্বাপেক্ষা নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কারাদি করিতে লাগিল। পরে সে এক অলিন্দে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার

সাধারণ প্রজাদিগকেও দর্শন দিল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া সোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে বীরবর ভল্লুবীর্য্য উপস্থিত হইলেন। জয়ন্ত তাঁহাকে দেখিয়া এইবার প্রকৃতই পুলকিত হইল। ভল্লুবীর্য্যও রাজদর্শনে উচ্ছলিত ভক্তিসহকারে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহারাজ, এখন কে শত্রু কেই বা মিত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন তো?"

জয়ন্ত তখন লজ্জিত হইয়া প্রকৃত রাজমিত্রের কাছে পূর্ব্বকৃত অপরাধহেতু ক্ষমা-ভিক্ষা করিল। এখন সে বিনীত হইতে শিখিয়াছে।

ক্রমে আর্য্যা গৌতমীও দর্শন দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জয়ন্তের তাবৎ রাজ-গাম্ভীর্য্য ঘুচিয়া গেল, সে যে বালক, সেই বালকেরই ন্যায় তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইল।

বশিষ্ঠ তখন একতারা-সহযোগে এই গানটি গায়িতে লাগিলেন—

জয়, জয়, ভগবন্, তুমি দাও সুখ-দুখ,—
কভু জয়, কভু পরাজয়।
কর, দেব, এ আশিস্,—নাহি হই ম্লানমুখ,
দুখে বুক যবে তমোময়।
দাও যবে তব প্রীতি, কভু যেন নাহি ভুলি
সেবিতে ও পাদপদ্মদ্বয়।
অমৃত বা হলাহল, যাহা দিবে হাতে তুলি',
পিয়িতে তা' নাহি করি' ভয়,—
হাসিমুখে করি' পান হই যেন সুখমন—
ও চরণে; গাই তব জয়।
করি শেষে এ মিনতি—যতদিন রহে প্রাণ
ও শ্রীপদে লগ্ন যেন রয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি ঘটনামাত্র জানাইব। মহাকার্ম্মুকের দুর্গ জয়ন্তের পক্ষে এক্ষণে তত নিরাপদ্ নহে, তাই তাহাকে অন্য একটি দূরবর্ত্তী দুর্গে লইয়া রাখা হইল। তাহার সঙ্গে তাহার প্রিয়জনেরা অবশ্য গেলেন,—আর্য্যা গৌতমী, নক্রবিক্রম, মহাকার্ম্মুক, অরবিন্দ প্রভৃতি তাহার সঙ্গেই রহিলেন।

কুশরাজ জয়ন্তকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ভল্লুবীর্য্যের চাতুর্য্যে তাহাকে জয়ন্তের দুর্গে বন্দী হইতে হইল। জয়ন্তের পিতৃশত্রু রণবীর সেই যুদ্ধে নিহত হইল। এই সংগ্রামে অরবিন্দ যুদ্ধ করিয়া সেনানীর পূর্ণ-মর্য্যাদা-লাভ করিলেন। তিনি জয়ন্তকে পক্ষীর ন্যায় যেন উড়াইয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার উপাধি হইল—গরুড়-বীর্য্য।

অরবিন্দ রণস্থলহইতে প্রত্যাগত হইয়া জয়ন্তকে এই যুদ্ধ-বার্ত্তা-প্রদান করিতেছিলেন; তিনি যখন বলিলেন,—"কুশরাজ এক্ষণে আপনার দুর্গে বন্দী," তখন জয়ন্ত হাসিয়া বলিল,—"এখন তাহার আমার দুর্গের আতিথ্য প্রীতিকর বোধ হইতেছে কি? যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল।"

বশিষ্ঠ নিকটেই ছিলেন, বলিলেন,—"বিজিত শত্রুর পরাভবে প্রতিহিংসামূলক আমোদপ্রকাশ না আর্য্যোচিত, না বীরোচিত। তদ্ভিন্ন যিনি জয়দাতা, সেই রাজ-রাজকে স্মরণ করিয়াছেন কি, মহারাজ?"

জয়ন্ত লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষকাল ব্রহ্মাবর্ত্তের রাজদুর্গে অবরুদ্ধ থাকিবার পর, কুশরাজ তাঁহার মুক্তির মূল্যস্বরূপ কিছু দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু যতদিন না কত দিতে হইবে, তাহা স্থির হয়, ততদিন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইলেও, তাহার পুত্রদ্বয়কে ব্রহ্মাবর্ত্তের দুর্গে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

জয়ন্ত এখন ব্রহ্মাবর্ত্তে ফিরিয়াছে। সে এখন অনেকটা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অবকাশ পাইয়াছে, তবে সে যখন দুর্গ-বহির্ভাগে যায়, তখন তাহার সঙ্গে তাহার দেহরক্ষক থাকে।

কুশ-রাজকুমারদ্বয় দুর্গে আসিল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার-বিচিত্রবীর্য্য যেমন পরুষপ্রকৃতি, উদ্ধত, অসহিষ্ণু ও স্বার্থপর ছিল, এখনও তেমনই আছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াও সে নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিল না। নানাপ্রকারে ঔদ্ধত্য-প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার এক-একসময়ের আচরণ জয়ন্তের পক্ষে দুর্ব্বিষহ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু বশিষ্ঠ ও বাদরায়ণের শিক্ষাগুণে সে বারবার তাহাকে ক্ষমা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সেই দুর্ব্যবহার অন্যে সহ্য করিবে কেন? নক্র-বিক্রমের আদেশে তাহাকে কিয়ৎকাল একটী কক্ষ্যামধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। জয়ন্তের তাহার প্রতি ঘৃণা বা ক্রোধ জন্মিল না, বরং সে তাহাকে মুক্ত করিতে গেল। বিচিত্রবীর্য্য তাহারও প্রতি কি একটা দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ

করিল। জয়ন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যখন তাহার মনে হইল, বিচিত্রবীর্য্য রাজকুমার; এই দারুণ শীতে একটা অন্ধকারময় আর্দ্র কক্ষ্যায় আবদ্ধ থাকিলে, তাহার নিশ্চয় কোন-প্রকার অসুখ হইবে, তখন সে নিজ অবমাননা ভুলিয়া গেল। পুনরায় গিয়া বিচিত্রবীর্য্যের কক্ষ্যা-উন্মোচন করিয়া তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এখন বিচিত্রবীর্য্যের কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইয়াছে, সে শীঘ্রই নম্র হইল। এবং তাহার সহিত সে কক্ষ্যার বাহিরে আসিয়া একস্থানে বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিল। পরে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইলে, জয়ন্ত তাহাকে লইয়া শুইতে গেল।

জয়ন্ত শত্রুর নিকটহইতে দুর্ব্ব্যবহার পাইয়াও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছিল; ফলে সেই পুণ্যকার্য্যজনিত আত্মপ্রসাদহেতু নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল। তাহার মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটিল, তাহার অধরে মধুর হাস্যের লাস্য-লীলা হইতে লাগিল।

ভীরুস্বভাব শার্দ্দূল-বীর্য্যের কথা বলা হয় নাই। সে দুর্গে পঁহুছিয়া কাঁদিয়াই আকুল হইতে লাগিল। জয়ন্ত তাহাকে নানা-প্রকারে সান্ত্বনা-প্রদান করিতে লাগিল। শত্রুপুত্রের প্রতি তাহার এইপ্রকার মমত্ব ও প্রেম দেখিয়া ভগবৎ-জ্ঞান-গরিষ্ঠ বশিষ্ঠের হৃদয় নির্ম্মলানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল; তিনি বীণা-সহযোগে গায়িলেন—

কি তোমার প্রেম, ওহে প্রেমময়!
শত্রু-মিত্র নাহি মানে, সবে বুকে লয়!
প্রতিদিন করি' পাপ দিই তব মনে তাপ,
দেও না তো অভিশাপ, দেও বরাভয়।
যবে মোরা থাকি সুখে, লই না ও নাম মুখে;
তুমি কিন্তু রাখ বুকে সকল সময়।
ওগো, প্রতিহিংসা নয়, প্রেম ভবে লভে জয়;
জয়ে নহে, তা'র হয় পরাজয়ে জয়!

(ক্রমশঃ।)

বিজ্ঞাপনে জ্ঞান ও অর্থ।

আজিকালি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই খবরের কাগজ পড়িয়া থাকেন; কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলিতে যত খবর, যত মনুষ্যবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তত সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাওয়া যায় না। সুলিখিত বিজ্ঞাপন-মাত্রেই হয় কোন অভিনব দ্রব্যের কিম্বা কোন পুরাতন দ্রব্যের অভিনব সংস্করণের একটী সুখপাঠ্য সমাচার-বহন করিয়া আনে। নীলামের, বাড়ী-ভাড়ার, বাড়ী-বিক্রয়ের, পুস্তকের, পেটেণ্ট ঔষধের, ট্রেণের সময়-পরিবর্ত্তনের, চাকুরীর ইত্যাদি নানা বিজ্ঞাপন অনেক বিষয়ে আমাদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া তুলে।

তাহাছাড়া বিজ্ঞাপনগুলি আজকাল প্রায় প্রত্যেক কারবারেরই মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কেহ যদি কোন কারবারে উন্নতি করিতে চায়, তাহার বিজ্ঞাপন-প্রচার-ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সেই বিজ্ঞাপনটি সুযোগ্যভাবে রচনা ও প্রচারের উপরেই তাহার কার-বারের লাভ-লোকসান অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করে।

ব্যবসায়ীদিগকে বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বে বিস্তর ভাবিতে-চিন্তিতে হয়। সব কাগজে একভাবে, একভাষায়, একভঙ্গীতে বিজ্ঞাপন দিলে, চলে না। বিভিন্ন বস্তুর বিজ্ঞাপন একপ্রণালীতে লিখিলেও, কার্য্যকর হয় না। আবার সময় ও সুযোগ বুঝিয়া বিজ্ঞাপন দিতে হয়। পাঠক সহজে বিজ্ঞাপন পড়িতে চায় না। সুতরাং বিজ্ঞাপন-লেখকের এমন লিপিকুশলতা, এমন বুদ্ধিচাতুর্য্য থাকা চাই, যেন যে বিজ্ঞাপন পড়িতে চায় না, সেও বিজ্ঞাপন পড়িতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞাপন-লেখকের খুব "ফন্দীবাজ" লোক হওয়া চাই, যে যত পুরা-তনকে নূতন আকার দিতে পারে, সে, যদি তাহার সেই সঙ্গে লিপিকুশলতা, চিত্রবিদ্যায় জ্ঞান, রঙ্গবোধ, মানব-স্বভাবজ্ঞতা প্রভৃতি থাকে, তত উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন-লেখক হইয়া উঠিতে পারে।

এ দেশের ব্যবসায়ীরা এখনও বিজ্ঞাপনের সার্থকতা বা মূল্য তেমন বুঝে নাই, তাই এ দেশে বিজ্ঞাপন-লেখক বলিয়া এক-শ্রেণীর লোক আজও দেখা দেন নাই। বিলাতে বিজ্ঞাপন-রচনা-শিক্ষার্থে বিদ্যালয় আছে। বিলাতের বিজ্ঞাপন-লেখকেরা বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, বিজ্ঞাপন-দাতৃদিগের তো কথাই নাই।

বালকের অনেক পাঠককেই হয়ত শীঘ্রই পড়াশুনা-শেষ করিয়া কোন চাকুরীর সন্ধানে ছুটিতে হইবে। তাহারা চেষ্টা করিলে, কেহ কেহ উত্তম বিজ্ঞাপন-লেখক হইয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়েই আমরা এই নববৃত্তিসম্বন্ধে তাহাদিগকে অদ্য ইঙ্গিতমাত্র করিয়া রাখিলাম।

পুরী-সৈকতে।

[সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্তবাবু সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত-মহোদয়-কর্ত্তৃক লিখিত।]

পুরী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখি নাই। পুরীতে আসিয়া জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখিলাম। আমাদের বাড়ী ঠিক তীরের উপরেই ছিল। সারাদিন বসিয়া সাগরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতাম। অনেক জিনিস আছে, যাহা না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। সমুদ্রের রূপ কি তাহা একবার না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না।

আকাশ যেমন অনন্ত, অসীম, সমুদ্র তেমনি অপার, অশেষ। অনন্ত ও অপারের মিলন কেমন, সাগরকূলে না আসিলে, হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সমুদ্রের আর এক সৌন্দর্য্য—তাহার চিরচাঞ্চল্য। যখন যেদিকে চাহিয়া দেখ, স্তরে স্তরে ঢেউগুলি তীরের কাছে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই অবিশ্রান্ত ঢেউএর খেলার মধ্যে কেমন একটী ব্যাকুল মত্ততা ও কোমলতা মিশ্রিত! কোন ঢেউটি সজোরে, সশব্দে তীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, আবার কোন ঢেউটি নিঃশব্দে, অলক্ষিতভাবে সৈকতের সহিত মিশিয়া যায়।

রজনীতে সমুদ্রের সৌন্দর্য্যে আরও মাধুর্য্য। চাঁদের আলো ঢেউগুলির উপর খেলিয়া বেড়ায়, মনে হয়, কোন উজ্জ্বল তরল, পদার্থ জলের উপর ভাসিতেছে। অমাবস্যা-নিশীথে সাগরের শোভা আরও মনোহারিণী, আরও হৃদয়স্পর্শিণী। তরঙ্গগুলি তীরের কাছে আসিয়া যখন স্ফীত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন তাহাদের ফেনা আলোকিত হইয়া উঠে। এ আলোক বিদ্যুতের মতই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তেমন উজ্জ্বল নয়। অন্ধকার-রাত্রিতে তীরের কাছে, যেখানে দেখ, এই চঞ্চলা, দীপ্ত-রেখার খেলা দেখিতে পাইবে।

একদিন দুপুর-বেলায় বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময় flag-staff এর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, তাহাতে কয়েকটি পতাকা ঝোলান হইয়াছে। আমাদের বাড়ী flag-staff-এর নিকটেই ছিল। পূর্ব্বে কোন দিনই তাহাতে পতাকা সংলগ্ন দেখি নাই। হঠাৎ কেন এতগুলি পতাকা ঝোলান হইল, ভাবিতেছি, এমন সময় দূরে—সমুদ্র-বক্ষে একটী ক্ষীণ-ধূম-রেখা দেখিতে পাইলাম। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, একটী জাহাজ আসিতেছে। জাহাজের মাস্তুলের উপরও পতাকা দেখিতে পাইলাম। তীরের flag-staff এর ও জাহাজের পতাকায় অনেক-প্রকার ইঙ্গিত চলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে জাহাজ তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জাহাজের ডেক্ (deck), কেবিন্ (cabin) ও খালাসিদের স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তীরে দাঁড়াইয়া অনেক লোক একদৃষ্টিতে জাহাজ দেখিতেছিল। সন্ধ্যা হইল; নৈশ তিমির সাগর ও উপকূল ঘিরিয়া ফেলিল। জাহাজ অদৃশ্য হইল। কেবল ডেকের কয়েকটি ক্ষীণ আলো সাগরের চঞ্চল বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, তীরে জনতা জমিয়াছে ও কয়েকটি নৌকা আসিয়াছে। শুনিলাম, জাহাজে চাউল-বোঝাই হইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, কুলিগণ চাউলের বস্তা মাথায় তুলিয়া নৌকার দিকে আসিতেছে। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই কুলির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। একের পর অন্য নৌকা-বোঝাই হইল। নৌকা-বোঝাই শেষ হইলে, মাঝিগণ নৌকাগুলিকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া চলিল। উড়িষ্যার মাঝিগণ খুব পটু, নির্ভীক। সাগরের উত্তাল তরঙ্গে তাহাদের কোন ভয় নাই। অবাধে, হাসিমুখে তাহারা কয়েকটা কাঠের টুক্‌রা একত্রে বাঁধিয়া অনেক দূর-পর্য্যন্ত মাছ ধরিতে চলিয়া যায়। তাহারা অতি নিপুণ কৌশলে বড় বড় ঢেউগুলি বাঁচাইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যদি কখনও কোন ঢেউ তাহাদের ভেলার উপর আসিয়া পড়ে ও তাহাদিগকে অতল জলে ফেলিয়া দেয়, তাহারা পরমুহূর্ত্তেই আবার সেই ছোট কাঠের ভেলাটিকে সন্তরণ করিয়া ধরিয়া লইয়া পূর্ব্বের মত নির্ভয়ে অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের মাঝে গন্তব্য দিকে চলিয়া যায়।

যখন প্রায় অধিকাংশ নৌকাগুলি জাহাজে চাউল রাখিয়া আসিয়াছে, এমন সময় জোয়ার আসিল। দেখিতে দেখিতে তরঙ্গমালা স্ফীত, উন্মত্ত হইল। উপকূলে তরঙ্গভঙ্গের শব্দ দ্বিগুণ

বাড়িয়া গেল। নৌকাগুলি ঢেউএর বিপক্ষে আর চলে না। খানিকটা যায়, আবার তখনই তরঙ্গ-তাড়িত হইয়া তীরের দিকে ফিরিয়া আসে। এইরূপে মাঝি ও তরঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইতে লাগিল। একদিকে মাঝিদের কৌশল, অকাতর পরিশ্রম, অন্যদিকে সাগরের অনন্ত শক্তিময় তরঙ্গসমূহ। শেষে কৌশল ও উদ্যমেরই জয় হইল।

নৌকাগুলি ধীরে ধীরে জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝিদের উল্লাস-ধ্বনি তীরের লোকেরা শুনিতে পাইল।

সকল নৌকা জাহাজে চাউল-বোঝাই করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল। আসিল না—কেবল একটী। সেটি জাহাজের কাছে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল—আর সেই সঙ্গে ডুবিয়াছিল, নৌকা-বোঝাই

চাউলের বস্তা। মাঝিগণ সাঁতার দিয়া অন্য নৌকায় উঠিয়াছিল।

চাউল-বোঝাই করিয়া জাহাজ যেমন ধীরে ধীরে আসিয়াছিল, তেমনই ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন স্নান করিতে আসিয়া শুনিলাম, ভাঁটার সময় মাঝিরা পূর্ব্বদিনের জল-নিমগ্ন নৌকা ও চাউলের পুনরুদ্ধার করিবে। দুপুর-বেলায় ভাঁটা আসিল। সাগরের সে দুর্দান্ত-মূর্ত্তি আর নাই। ঢেউগুলি আর বৃহৎ নয়। দলে দলে মাঝিগণ কূলে সমবেত হইল। তাহারা অনেক কাঠের ভেলা সঙ্গে আনিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রত্যেক ভেলায় চারিজন মাঝি উঠিয়া যেস্থানে নৌকা-ডুবি হইয়াছিল, সেই দিকে ভেলা বাহিয়া চলিল। সমুদ্রের শান্ত বক্ষে ভেলাগুলি নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝিদের কাছে বড় বড় বড়্শী-সংলগ্ন লম্বা দড়ি ছিল। যেখানে নৌকা ডুবিয়াছিল, কয়েকজন মাঝি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সেখানে ডুব দিল। ডুবুরিদের হাতে সেই রজ্জু-সংলগ্ন বড়্শী। ডুব দিবার অনতিকাল পরেই তাহারা ভাসিয়া উঠিল। কেহ কোন চাউলের বস্তায় বড়্শী বিঁধিতে পারিয়াছে, কেহ পারে নাই। বিদ্ধ বস্তার দড়ি ভেলার সহিত বাঁধিয়া দিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তীরের

দিকে ভেলা লইয়া চলিল। তীরের কাছে যেখানে জলের ভিতর দাঁড়ান যায়, সেখানে আসিয়া মাঝিগণ জলে নামিল। তাহার পর, দড়ি ধরিয়া তীরের অভিমুখে চলিল। এইরূপে একের পর অন্য জলনিমগ্ন চাউলের বস্তাগুলির উদ্ধার করিল। নৌকাও ঠিক ঐপ্রকারে তীরে টানিয়া আনিল। কিন্তু নৌকা টানিবার সময় সকল ভেলা একত্রে বাঁধা হয় ও প্রায় একশত মাঝি নৌকা-সংলগ্ন দড়ি টানিতে থাকে।

কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে আনিয়াছিলাম—গোটাকতক ঝিনুক ও মানসপটে আঁকিয়া আনিয়াছিলাম—পারাবারের চিরচঞ্চল, চিরনূতন, মহৎ, ভাস্বর চিত্র।

"কিউলিনান"-হীরক

ট্রান্সভালে একটী খুব বড় হীরা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার ওজন প্রায় ১২০৯৬ রতি! টমাস, সি, কিউলিনানের ধারণা হয় যে, কিম্বারলীর মত ট্রান্সভালেও হীরকের খনি আছে। যে স্থানটীতে তিনি হীরক-খনির অবস্থান-নির্দ্দেশ করেন, তাহা মিন্‌হিয়ার জোয়াকিম প্রিন্সলু-নামক এক বৃদ্ধ বুয়ার-কৃষকের সম্পত্তি। জোয়াকিম সে সম্পত্তি প্রথমে চারি-লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিতে সম্মত ছিল। কিন্তু তখন কিউলিনানের হাতে টাকা ছিল না।

তিনি ধনীদিগের নিকটে গেলেন। তাঁহারা ট্রান্সভালে হীরক-

খনির অস্তিত্বের কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, এমন কি সরকারী ভূতত্ত্ববিদ্—ডাক্তার জি, এ, মোলেনগ্রাফও কিউলিনানকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িলেন না।

কিউলিনান নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। শেষে তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব-বিক্রয় করিয়া আটলক্ষ আশীহাজার টাকা-সংগ্রহ করিলেন। বুড়া জোয়াকিম জমীর দাম অনেক চড়াইয়া দিল। কিউলিনান তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া জমিটি খরিদ করিলেন।

তাহার পর, নির্দ্দিষ্ট স্থানটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। যতদিন না হীরা বাহির হইল, ততদিন তাঁহার উদ্বেগের অবধি ছিল না। প্রথমে কিউলিনান সেই স্থানে কয়েকখানি পদ্মরাগমণি ও হীরকাকরে প্রাপ্তব্য অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তর পাইলেন। দ্বিতীয়বার খনন করিয়া তিনি এগারখানি হীরা পাইলেন, তাহার মধ্যে একখানির ওজন ৬৪ রতি ছিল।

পরে একদিন তাঁহার খনির কার্য্যাধ্যক্ষ—কাপ্তেন ফ্রেডারিক ওয়েল্‌স্, একস্থানে দেখিতে পান যে, স্ফটিকের মত কি চক্‌চক্ করিতেছে। তিনি ভাল করিয়া দেখিলেন, উহা একখানি হীরা! ঐ হীরাই এখন কিউলিনান-হীরক নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ঐ হীরকের তুলনায় ভারত-সম্রাটের মুকুট-মণি অতি তুচ্ছ। এক্ষণে ঐ হীরকখানি ইংলণ্ডের কোন এক ব্যাংকে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্যাংকে, তাহা সাধারণকে জানান হয় নাই, চোরে চুরী করিতে পারে। খরিদ্দারদিগকে ঐ হীরকের নকলখানি দেখান হয়। কোন বড়দরের খরিদ্দার আসিলে, উহা যে ব্যাংকে রাখা হইয়াছে, সেই ব্যাংককে অনেক টাকা পারিশ্রমিক দিয়া স্বত্বাধিকারিগণ উহা বাহির করিয়া দেখান। এপর্য্যন্ত উহার চারিজন খরিদ্দার জুটিয়াছে এবং উহার মূল্য পাঁচকোটী ছয়লক্ষ টাকা-হইতে আটকোটী ছিয়ানব্বইলক্ষ টাকা-পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

মধুর মহত্ত্ব।

["অর্ঘ্য"-সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু অমূল্যচরণ সেন-মহোদয়-কর্ত্তৃক রচিত।]

জামালপুরের হাঁসপাতালে আজ খুব ভিড়। জমিদার-বাবুদের বড় 'ল্যাণ্ডো'-গাড়ীখানা লতা-পাতা-ফুলে সজ্জিত হইয়া হাঁসপাতালের দরোজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হাঁসপাতালের সম্মুখের ময়দানে লোক আর ধরিতেছে না। হাঁসপাতালের উঠানে একদল ছেলে সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের সকলের হাতেই একটা করিয়া নীল নিশান।

জামালপুর সহর নহে, তবে একটা খুব বড়গোছের গ্রাম বটে। সেখানকার হাঁসপাতালে আজ এত ধূমধাম কেন? একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ব্যাপার কি, ব'ল্‌তে পারেন? হাঁসপাতাল এত সরগরম কেন?" বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আপনি কি কিছু শোনেন নি? আপনি কি এ গ্রামে থাকেন না?" আমি বলিলাম,—"না। জা'ন্‌লে, আপনাকে জিজ্ঞাসাই বা ক'র্‌ব কেন?"

তখন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিল,—"তবে শুনুন। সে আজ দুইমাসের কথা আমাদের জমীদার-বাবুর বাগান-বাড়ীতে হঠাৎ একদিন রাত্রিতে আগুন লাগে। বাগান-বাড়ী গ্রামের একপ্রান্তে; লোকালয়হইতে অনেকটা দূরে। তাহার তিনদিকে খোলা ধানের ক্ষেত, আর একদিকে গ্রামের গোচারণের মাঠ। বাগান-বাড়ীর একটু দূরে কেবল একঘর কৃষকের বাস।

জ্যৈষ্ঠমাসের রাত্রি। অমন খোলামাঠের মাঝে একটু হাওয়া নাই। কৃষকদের বাড়ীর একমাত্র ছেলে—মধু তাই তাহাদের বাড়ীর উঠানে পায়চারি করিতেছিল। হঠাৎ চারিদিক্ আলোয় আলোময় দেখিয়া সে তাহার পিতাকে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"বাবা, বাবা, উঠে এস! জমীদার-বাবুদের বাগান-বাড়ীতে বুঝি আগুন লেগেছে। আমি দেখি গে।"

হাতে একটা বাঁশের লাঠি লইয়া এবং মালকোঁচা করিয়া কাপড় পড়িয়া মধু একদৌড়ে জমীদার-বাবুর বাগান-বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। আসিয়া দেখিল, বাগান-বাড়ীতে দুইজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান নিজেদের মালপত্র সরাইতেছে। তিন-চারিজন দাসী কান্নাকাটি করিতেছে। নবীন-খানসামা পুকুরহইতে কলসী কলসী জল আনিয়া আগুনে দিতেছে বটে, কিন্তু সে ভয়ানক আগুনের কাছে অতটুকু সামান্য জল কি করিবে!

ক্রমে দুই-একজন করিয়া গ্রামবাসী উপস্থিত হইতে লাগিল। কাহারও হাতে একটা কলসী, কাহারও হাতে একটা লাঠি। চাষাদের মধুর সেদিকে লক্ষ্য নাই, সেও নবীনের সঙ্গে আগুনে জল দিতেছিল। হঠাৎ একজন দাসী জমীদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিতে আনিতে বলিল,—"ওগো কে কোথায় আছ, খোকাবাবু ঐ পশ্চিমের ঘরের মধ্যে রয়েছেন! ঘরের চালে এতক্ষণ আগুন লেগেছে। আমি জোর ক'রে মা-ঠাকরুণকে বা'র ক'রে এনেছি। কিন্তু ধোঁয়ায় খোকাবাবুকে দে'খ্‌তে না পেয়ে আর আগুনের তাতে দিশেহারা হ'য়ে এদিকে এসে পড়েছি। ওগো, কে আছ গো, তোমরা খোকাকে রক্ষে কর।"

উপস্থিত লোকদিগের কাহারও মুখে কথাটি নাই। সকলেই পশ্চিমের ঘরের পাশের জলন্ত ঘরখানির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সেদিকে যাইতে কাহারও সাহস হইতেছিল না।

হঠাৎ দেখা গেল, একটা ভিজা কাঁথা গায়ে জড়াইয়া চাষাদের মধু সেই পশ্চিমের ঘরের দিকে ছুটিল। তাহার পিছনে পিছনে দুই-চারিজন লোক লাফাইয়া গেল বটে, কিন্তু আগুনের তাতে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। ১৬ বছরের ছেলে মধুর সাহস

দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে যে ফিরিবে না,—ইহাও বলিতে তাহারা ক্ষান্ত হইল না।

কিন্তু এ কি! চোখের পলক দুই-চারিবার পড়িয়াছে কি না সন্দেহ—ইহারই মধ্যে নিজের ভিজে কাঁথাখানি খোকাবাবুর গায়ে জড়াইয়া দিয়া মধু পশ্চিমের ঘরহইতে বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। কিন্তু কয়েক পা আসিতে না আসিতে মধু মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাঙ্গণে পতিত হইল। মধুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের ঘরের চাল হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে বলিল,—"ভগবান বাছাদের রক্ষে ক'রেছেন।"

মূর্চ্ছিত মধুর কোলহইতে সকলে ধীরে ধীরে খোকাবাবুকে বাহির করিয়া লইল এবং মধুকেও কোলপাথারি করিয়া পুকুর-ধারে শোয়ান হইল। এদিকে জমীদার-গৃহিণী আপনার পাঁচবছরের শিশু-সন্তানকে কোলে লইয়া বলিলেন,—"কে আমার ছেলেকে রক্ষা ক'রেছে, সে কোথায়? তা'কে আমি পুরস্কার দিব।" সমবেত জনতার মধ্যহইতে এক বৃদ্ধ অগ্রবর্ত্তী হইয়া মাথা নামাইয়া বলিল,—"মা! পরাণ-চাষার একমাত্র ছেলে—মধু আপনার সন্তানকে বাঁচিয়েছে; কিন্তু সে বুঝি আর বাঁচে না।" জমিদার-গৃহিণী বলিলেন,—"সে সোণারচাঁদ ছেলে কোথায়? কে ব'ল্লে, সে চাষাদের ছেলে? রাজ-রাজড়ার ঘরেও এমন ছেলে মেলে না। বাপসকল, তোরা এই আমার পাল্কী নিয়ে এখনই মধুকে আমার হাঁসপাতালে রেখে আয়। আর ডাক্তারকে আমার নাম ক'রে ব'ল্বি, তিনি যেন খুব যত্ন করেন,—বলিস্, মধু আমার পেটের ছেলে, সে বাঁ'চ্লে আমি হাজারটাকা বক্শিস্ দেব। খবরদার, এখনি যা, আর দেরী করিস নে।"

গ্রামের জনকয়েক মাতব্বরগোছের লোক মধুকে হাঁসপাতালে দিয়া আসিল। ডাক্তারবাবু সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"বাঁ'চ্বার আশা নাই; তবে চেষ্টার কসুর ক'র্ব না। এমন বীর বালককে যদি বাঁ'চাতে পারি ত সেই আমার পুরস্কার, অন্য কিছু চাই না।"

জমীদারবাবু জমীদারীর কাজে সদরে গিয়াছিলেন। বাগান-বাড়ীতে আগুন লাগার খবর পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিলেন। বাড়ীতে না গিয়া তিনি বরাবর হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলেন। জমীদারবাবু কোন কথা-জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"বাঁচিতে পারে, এমন বোধ হচ্চে। তবে আরও ৫।৬ দিন না গেলে, নিশ্চয় কিছু বল্তে পারি নে।"

জমীদারবাবু ডাক্তারবাবুর নিকটহইতে বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন,—পরাণ ও তাহার পত্নী অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জমীদারবাবুকে দেখিয়া পরাণ বলিল,—"বাবু! আপনি দেশে ছিলেন না; খোকাবাবুকে যে আপনার কাছে ফিরে দিতে পেরেছি, এতেই আমাদের সুখ। আমার ছেলে মধু মানুষের যা' কর্ত্তব্য, তাই করেছে, তার জন্যে অত ব্যস্ত হ'বেন না। ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, মধু বেঁচে উ'ঠ্বে।"

জমীদারবাবু তখনই পরাণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"মধু আমার যা' করেছে, তা' আমি কোনকালে ভুল্তে পার্ব না। মধু যে কাজ করেছে, তা'তে শুধু যে তোমার মুখই উজ্জ্বল হয়েছে, তা নয়, আমার এই ক্ষুদ্র জমীদারীটুকুও গৌরবে ফুলে উঠেছে। মধু আজ সমস্ত জামালপুরের গৌরব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দেখ্ছ না, শুন্ছ না—সমস্ত গ্রামটা আজ 'মধু'ময় হয়ে উঠেছে। চারিদিকে 'মধু'রই কথা, 'মধু'রই গৌরব-গান। পরাণ, আজথেকে তুমি যেখানে থাক, তা'র আর খাজনা লাগ্বে না। আজথেকে তুমি আমার বন্ধু। আর আমার বাগান-বাড়ী ও ৪০বিঘা জমি আমি মধুর নামে লেখা-পড়া ক'রে দিচ্ছি। সে যদি বাঁচে ত ভোগ কর্বে, নইলে তোমার।" এই বলিয়া জমীদারবাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

একসপ্তাহ-বাদেই হাঁসপাতালের ডাক্তার বলিলেন,—"মধু বাঁচ্বে, তাহার আর কোন ভয় নাই। পোড়া ঘাগুলো সেরে উ'ঠ্লেই তা'কে ছেড়ে দেব।"

খবর শুনিয়া সেইদিনই জমীদার-বাড়ীতে কাঙ্গালী-বিদায় হইল। সমস্ত গ্রামে একটা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাপর্য্যন্ত হাঁসপাতালের নিকট দিয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময়ে ডাক্তারবাবুর নামে জয়ধ্বনি করিয়া গেল।

আর আজ যে এই ধূমধাম হইয়াছে, এও সেই মধুর জন্য। মধু এখন বেশ আরাম হইয়া উঠিয়াছে। আজ সে বাড়ীতে যাইবে। তাই আজ তাহাকে বাড়ীতে লইবার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।"

বৃদ্ধের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমিও সেই বীরবালককে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল না। একটু পরেই দেখিলাম, নববস্ত্র-পরিহিত, পুষ্পমাল্য-শোভিত এক বালকের হস্ত ধরিয়া ডাক্তারবাবু গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন এবং আপনিও উঠিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

আমার চক্ষু সার্থক হইল। মধু নিজের প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ বাঁচাইয়াছে,—এ বড় কম কথা নহে। এমন আত্মত্যাগ যে করিতে পারে, হউক সে বালক,—সেই-ই প্রকৃত বীর, সে-ই প্রকৃত মানুষ। সহস্র সহস্র যুদ্ধ-জয়ের গৌরবও ইহার কাছে মাথা হেঁট করে।

ছেলেরা ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিতে লাগিল এবং নিশান উড়াইয়া তাহারা গাড়ীর অগ্র-পশ্চাৎ চলিল। যতদূর দেখা যায়, আমি মধুকে দেখিতে লাগিলাম।

'বালকে'র পাঠকগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মধুর মত কাজ করে, তবে সেও মধুর মত সম্মান পাইবে।

*লেসিংএর উপদেশ।

১। গর্দ্দভ ও নেক্‌ড়ে।

এক খঞ্জ গর্দ্দভ অতি কষ্টে চলিতে চলিতে এক নেক্‌ড়ের সহিত পথে সাক্ষাৎ পাইল। সে নেক্‌ড়েকে কহিল, "ওহে বন্ধু, আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়া অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে।"

নেক্‌ড়ে উত্তর করিল, "আহা তাই নাকি? তবে ত তোমার এই যন্ত্রণার লাঘব করাই আমার কর্ত্তব্য!"

এই বলিয়া নেক্‌ড়ে একলম্ফে গর্দ্দভের উপর লাফাইয়া তাহাকে নিহত করিল।

—নির্দ্দয় ব্যক্তির নিকট দয়ার আশা বিড়ম্বনা।

২। অনুতপ্ত নেক্‌ড়ে।

এক নেক্‌ড়ে মৃত্যুকালে তাহার অসৎ জীবনের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দুঃখিত হইল; কিন্তু বলিল,—

"যদিও আমি অন্যান্য দুর্ব্বল জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি আমি সাধারণ পশুর মত অত দূর নির্দ্দয় নই। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, একদিন একটী দল-ভ্রষ্ট মেষ-শাবককে আমি হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। আর এক-দিন একটী মেষকে দয়া করিয়া মারি নাই।"

এক শৃগাল এই কথা শুনিয়া উত্তর করিল, "হাঁ, হাঁ এ সমস্তই সত্য বটে, কিন্তু আমারও স্পষ্ট মনে আছে যে, সে সময়টায় তোমার গলায় হাড় ফুটিয়াছিল এবং তাহারই যন্ত্রণায় আহার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলে!"

—চুরি করিবার সুযোগের অভাবে অনেক চোরই সাধু সাজিয়া থাকে।

৩। কৃষক ও চাতক-পক্ষী।

বসন্তকালের রাত্রে এক কৃষক চাতক-পক্ষীর গান শুনিতেছিল। হঠাৎ তাহা বন্ধ হওয়ায় সে কহিল "গাও, গাও, আরও গাও; থামিয়ো না।"

চাতক-পক্ষী উত্তর করিল, "হায়! ব্যাঙেরা যেরকম ডাকিতেছে, তাহাতে আমার আর গান গাহিবার মোটেই ইচ্ছা হইতেছে না। তুমি কি তাহাদের বিকট স্বর শুনিতে পাইতেছ না?"

কৃষক উত্তর করিল, "হাঁ পাইতেছি বটে, কিন্তু সে কেবল তোমার গান থামিয়াছে বলিয়া!"

—নিজের করুণার দ্বারা আমরা অপরের কাঠিন্যকে ঢাকিয়া দিতে পারি।

৪। উট-পক্ষী ও তাহার সমালোচকবর্গ।

একটী ধাবমান্ উট-পক্ষীকে দেখিয়া এক হরিণ মনে করিল, "উট-পক্ষী, দেখিতেছি, তেমন শীঘ্র দৌড়াইতে পারে না। হয়ত পাখা-দু'টা মেলিলে, উহা আরও দ্রুত দৌড়িতে পারে।"

কিছুক্ষণ পরে এক ঈগল-পক্ষী তাহাকে দেখিয়া কহিল, "উট-পক্ষী দৌড়াইতেছে বটে, কিন্তু তেমন দ্রুত নহে।"

—অনেকে মনে করেন যে তাঁহার ন্যায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে অন্যজন অশক্ত।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

ভুলো

ভুলো আজ মহাভাবনায় পড়িয়াছে! তাহার মুনিবমহাশয়ের আজ কি হইয়াছে? আজ তাহার সহিত আলাপ-মিলাপ কিছুই করিতেছেন না কেন? এত ব্যস্ত, এত উদ্বিগ্ন, এত অপ্রসন্ন কেন? কেন সে কি কেহ নয়?—তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিলেই তো হয়! সে তাহার মুনিবমহাশয়ের উদ্বেগ দূর করিতে—সাহায্য করিতে ইচ্ছুক; তিনি কেন আজ তাহাকে কোন কথা বলিতে চান না? সে কতবার তাঁহার কাছে লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া গিয়াছে,—তাঁহার ভাবনা-উদ্বেগের কথা তাহাকে জানাইতে অনুরোধ—অনুনয়পর্য্যন্ত করিয়াছে, কিন্তু তিনি আজ কেন তাহার উপর এত বিরূপ হইয়াছেন যে, কথাটিপর্য্যন্ত না কহিয়া "ভুলো! যা, নীচে যা" বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন?

ভুলো অভিমানে দোতলার সিঁড়ির তলায় বিরসবদনে বসিয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল, এমন সময়ে উপরকার ঘরে—গিন্নির ঘরে শুনিল, কে কাঁদিতেছে,—"ওয়া, ওয়া ওয়া!"

ভুলোর সব অভিমান ঘুচিয়া গেল, সে চারলাফে উপরকার সেই ঘরের দ্বারে পহুঁছিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। দ্বার রুদ্ধ ছিল, কে খুলিয়া দিল। দেখিল কর্ত্তা, মুখখানি হাসি হাসি! কর্ত্তা ভুলোকে এতক্ষণের পর আদর করিল। ভুলো মহাপ্যায়িত! ঘন ঘন লাঙ্গুল-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু অচেনা একজন স্ত্রীলোকের কোলে ও কে? মা-ঠাকুরুণই বা শুয়ে কেন? অচেনা স্ত্রীলোকটির কোলের অচেনা মানুষটি ফের কাঁদিল,—"ওয়া ওয়া, ওয়া!" মা-ঠাকুরুণ তাহার প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া

* Esop-এর ন্যায় Lessing-এর বহু কাহিনী বা Fables প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি অনূদিত হইল।

লেখক।

অচেনা স্ত্রীলোকটিকে কাতরস্বরে কি বলিলেন; অচেনা স্ত্রীলোকটি সেই অচেনা ক্ষুদে মানুষটিকে মা-ঠাকুরুণের কাছে শোওয়াইয়া দিল; মা-ঠাকুরুণের চোখের চাহনীতে কত আদরমাখা, ভুলোও আগন্তুককে চাটিয়া আদর করিতে গেল।

"আরে মোলো, দূর দূর! কোথাকার হতভাগা কুকুর রে! এখনি ছেলেকে কাম্‌ড়ে দিয়েছিল আর কি! বেটার হিংসে হয়েছে। ওগো তুমি কুকুরটাকে বিদেয় কর।"

গিন্নি কর্ত্তাকে এই কথা বলিলেন। ভুলো অপ্রতিভ হইয়া কর্ত্তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা বলিল,—"ভুলো, এখন নীচে যাও।" ভুলো প্রভুর চিরবাধ্য; সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া নীচে নামিয়া

ভাবিতে লাগিল,—গৃহিণীর তাহার প্রতি এরূপ আচরণের কারণ কি? অনেক ভাবিল, হেতু-নির্ণয় করিতে পারিল না। বেচারা ক্ষুণ্ণমনে নীচে বসিয়া রহিল। শেষে সে স্থির করিল যে, সে আগন্তুকের প্রতি সমাদর-প্রদর্শন করিয়া তাহার অন্নদাতা ও অন্নদাত্রীর স্নেহাকর্ষণের চেষ্টা আর একবার করিয়া দেখিবে। সন্ধ্যা-বেলা সে গিয়া আর একবার নবাগতকে চুম্বন করিবার চেষ্টা করিল। ফলে তাহাকে সেই অচেনা স্ত্রীলোকটির কাছে প্রহারিত হইয়া নীচে নামিতে হইল।

কর্ত্তা আসিলে, গৃহিণী বলিলেন,—"তোমাকে ব'ল্‌'চি কুকুরটাকে বিদেয় করে দাও, তুমি শু'ন্‌চো না; ফের সন্ধ্যেবেলা লক্ষীছাড়া কুকুরটা খোকাকে কামড়া'তে এসেছিল।"

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তা মুখটা একটু কাঁচুমাচু করিলেন, বলিলেন,—"আচ্ছা তা'ই হ'বে, ওকে বিক্রী ক'রে ফে'লব।"

আজ যিনি আসিয়া 'খোকা'-নামে অভিহিত হইতেছেন, এত দিন ভুলো তাঁহারই স্থানাধিকার করিয়াছিল। এখন তাঁহার শুভাগমনহেতু ভুলোকে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। কিন্তু ভুলো বেচারা আর তাঁহার স্থানাধিকার করিয়া থাকিতে চাহে না, তাঁহার পাদ-প্রান্তে পড়িতে থাকিতে চাহে, তাঁহার সেবা করিতে চাহে। গৃহিণী সে কথা বুঝিলেন না, সুতরাং কর্ত্তাও বুঝিলেন না। একদিন এক ক্রূরমূর্ত্তি লোক ভুলোকে ক্রয় করিয়া গলায় শিকলী বাঁধিয়া হিঁচ্‌ড়াইতে হিঁচ্‌ড়াইতে লইয়া গেল! ভুলো তাহার মা-ঠাকুরুণকে একদিন সর্পাঘাতহইতে বাচাইয়াছিল; আর একদিন চোরে আর একটু হইলে তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরী করিয়া লইয়া যাইত,—ভুলো চীৎকার করিয়া কর্ত্তাকে সজাগ করিয়া দেওয়াতে চোর পলাইয়া যায়।

হায় রে মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা!

নতুন মুনিবের বাড়ীতে ভুলো বড় কষ্টে আছে। সমস্ত দিন-রাত শিকলে বাঁধা থাকে। খাওয়া, শোওয়া সকল বিষয়েই তাহার অসুবিধার অবধি নাই; আর খা'বে কি? কুঁড়ের মত বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার খাওয়া হজমই হয় না। শরীরের সমস্ত গাঁঠে যেন মর্চ্চ্যা ধরিয়া গিয়াছে। হাজার কাঁদুক, কেহ আসিয়া তাহাকে পাঁচ-মিনিটের জন্যও ছাড়িয়া দেয় না। সে জীবন্মৃত হইয়া আছে।

আজ তাহার মনে কি একটা নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে

শরীরে যেন বল আসিয়াছে—মনে যেন উৎসাহ জন্মিয়াছে। সে জানে না, কিন্তু আজ তাহার পুরাতন মুনিবেরা খোকাকে ঝীএর কাছে রাখিয়া কোথায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন। ঝী খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া নীচে চাকরদের কাছে বসিয়া রাজ্যের গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। খোকার ঘুম ভাঙিয়াছে, সে কাঁদিয়াছে, কাহারও সাড়া পায় নাই, দোল্‌নাহইতে নামিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঘরের মেঝ্যায় পড়িয়া গিয়াছে। ভাগ্যিস্ সে ঘরে গালিচা পাতা ছিল, তাই তত লাগে নাই, খোকা সিঁড়িদিয়া নামিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে—ঠিক সেই সময়ে—ভুলোর মনে হইল, সে শিকল ছিঁড়িয়া পুরাণো মুনিবের বাড়ী পলাইয়া যাইবে। পুরাতন মুনিবের বাড়ী-হইতে নূতন মুনিবের বাড়ী তত দূর নয়, ভুলো এক হেঁচ্‌কাটানে শিকল ছিঁড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পুরাতন মুনিবের বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। সেথানে পঁহুছিয়া সটান উপরে উঠিয়া গেল। সে যে তাহার চিরপরিচিত গৃহ। সে সোপানের সর্ব্বোচ্চ ধাপে যেই পঁহুছিয়াছে, অমনি খোকা সিঁড়িদিয়া নামিবার চেষ্টাহইতে বিরত হইয়া তাহার সহিত স্বর্গের ভাষায় আলাপ-আরম্ভ করিল, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, তাহার কাণ ধরিয়া—লেজ ধরিয়া টানিল, ভুলো সেই স্নেহের অত্যাচারগুলি নীরবে সহ্য করিল। খোকা খানিকক্ষণ ভুলোর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহার গায়ে মাথা রাখিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। ভুলো চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ঝী তখনও গল্পে মত্ত, এ সকলের কোনই সংবাদ রাখিল না।

রাত সাড়ে আটটার সময় কর্ত্তা-গৃহিণী ফিরিলেন। ঝী জানে, খোকা ঘুমাইতেছে। সেও কর্ত্তাগৃহিণীর সহিত উপরে উঠিতে লাগিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন,—"তুই যে নীচে ছিলি, খোকা কোথায়?"

ঝী। ঘুমুচ্ছে।

সিঁড়ির উপরের ধাপে পঁহুছিয়া কর্ত্তা-গৃহিণী সেই অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিলেন,—ভুলো সিঁড়ি আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে, খোকা তাহার গায়ে মাথা রাখিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। ভুলো তাই মুনিবকে দেখিয়া দাঁড়াইল না—কেবল লেজটি সন্তর্পণে নাড়িয়া আনন্দপ্রকাশ করিল।

ভুলোর পুরাতন মুনিব, ভুলোর নূতন মুনিবের নিকটহইতে ভুলোকে, যে মূল্যে তাহাকে বেচিয়াছিলেন তাহার দ্বিগুণ-মূল্যে, আবার কিনিয়া লইলেন। সম্পূর্ণ।

ক্রিকেট্—ব্যাটিং।

ডব্‌লিউ, জি, গ্রেস্‌-নামক সুবিখ্যাত ক্রিকেটার এই একটী বড় স্মরণীয় কথা বলিয়াছেন যে, রাণ-স্কোর করা ব্যাট্‌স্‌ম্যানের কর্ত্তব্য। তাহা নহে; বরং অনেক সময়ে দর্শকদের বোধ হয়, যেন ব্যাট্‌স্‌ম্যানের রাণ-স্কোর করিবার বড় ইচ্ছা নাই। তবে তোমরা যাহাতে,

চার্টারহাউস ক্রিকেট-টীমের মিঃ এম্, এইচ, ডল। ইনি ব্রাডেল্‌কে একঘণ্টার কিছু উপর সময়ের মধ্যে ১৮০টি রাণ্ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

চার্টারহাউস টীমের মিঃ আর, এল, ব্রাডেল্। ইনি ডলকে একঘণ্টার কিছু উপর সময়ের মধ্যে ১৮০টি রাণ্ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

একসময়ে ভিন্সেণ্ট স্কোয়ার-নামক স্থানে চার্টারহাউস ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার ক্রীকেট-টীমদ্বয়ে ম্যাচ খেলা হইতেছিল। তখন এই দুইজন ক্রীকেট-ক্রীড়ক একঘণ্টা পাঁচমিনিটের মধ্যে ১৮০টি রাণ্ করেন। ঐ ম্যাচে ডল সর্ব্বশুদ্ধ ১৯১টি রাণ করিয়াছিলেন। স্কুলের বালকের পক্ষে অতগুলি রাণ্ করা খুব প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

হয় ত তোমরা মনে করিতে পার যে, এই কথা বলিবার দরকার নাই, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেই জানে, কিন্তু বাস্তবিক যতদূর সম্ভব, রাণ-স্কোর করিতে পার, তাই উপযুক্ত ব্যাট্ পছন্দ করা আবশ্যক। যাহাদের পয়সা অল্প, তাহারা ব্যাট্ কিনিয়া

রাখিতে পারিবে না বটে, কিন্তু, সম্ভব হইলে, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজ ব্যবহারার্থে ব্যাট্ কিনিয়া রাখা উচিত। উপযুক্ত ব্যাট্ না পাইলে, এমন হইতে পারে যে, ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যানও রাণ করিতে পারিবে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, একটী ছোট ছেলে একখানি মস্ত বড় ব্যাট্ লইয়া খেলা করিতে যায়; ব্যাট্‌টি যেমন, ছেলেটীর অহংকার তেমনই অসাধারণ, কিন্তু ব্যাট্‌টী বড় ভারী বলিয়া, তাহার খেলা মাটী হইয়া যায়। কেবল তাহা নয়, ছেলেটী যতদিন ঐপ্রকার অনুপযুক্ত ব্যাট্-ব্যবহার করিবে, ততদিন ক্রিকেট্-খেলা ভাল করিয়া শিখিতে পারিবে না। আমি যে ব্যাট্‌টির ব্যবহার করি, তাহা অধিকাংশ খেলোয়াড়দের কাছে ভারী-বোধ হইবে, কিন্তু ঐপ্রকার ব্যাট্ আমার ভাল লাগে। কিন্তু ভারী ব্যাট্-ব্যবহার করা ছেলেদের পক্ষে বিপজ্জনক। উপযুক্ত ব্যাট্ কিনিলে পর, তাহা ভাল করিয়া রাখিতে হইবে। তাহাতে রীতিমত তৈল মাখাতে হইবে, নইলে কাষ্ঠ শুকাইয়া গিয়া শীঘ্র নষ্ট হইবে এবং বলটীতে আঘাত করিবার সময়ে তোমার হাতে চোট লাগিবে। তোমার ব্যাট্ রাখিবার ভার চাকরের হস্তে দিও না, সে কাজ তুমি নিজে করিবে। তুমি যদি ঐরকম কাজ নীচ বা বিরক্তিকর মনে কর, তবে ক্রিকেট্-খেলা একেবারে ছাড়িয়া দেও, তুমি কখনও উপযুক্ত খেলোয়াড় হইতে পারিবে না।

ব্যাট্ করিতে গেলে, কি করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এবিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে আমাদের প্রথম কথা এই যে, ব্যাট্‌স্‌ম্যানের সুবিধামত দাঁড়ান আবশ্যক, নতুবা সে ভাল করিয়া খেলিতে পারিবে না। দ্বিতীয় কথাটী এই যে, পায়ে ভর দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। অনেক ছেলে, বলটী তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিলেই, পা পিছাইয়া দেয়। তাহাদের ভয় হয় যে, বলটী তাহাদের গায়ে আঘাত করিবে। পা পিছাইয়া দিবার ফলে ব্যাট্‌স্‌ম্যান যাহা এড়াইতে চায়, অনেক সময় তাহাই হয়; সে যদি স্থির হইয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে বলটী তাহার পাশদিয়া যাইত, কিন্তু সে ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছে বলিয়া, বলটী তাহার গায়ে বড় আঘাত করে, বড় চোট লাগে। যে ছেলেটী ঐরূপ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সে কখনও ভাল খেলোয়াড় হইতে পারে না। তাই বলিতেছি, এ বিষয়ে বেশ মনোযোগ দিতে হইবে।

অনেক খেলোয়াড় বড় আড়ম্বরের সহিত ব্যাট্ করিতে যায়; ইহা বড় ভুল। আড়ম্বর করিয়া কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্য করা যায় না, এবং তোমার সেই আড়ম্বর যেমন, অকৃতকার্য্য হইয়া তোমার বন্ধুদের নিকট ফিরিয়া আসিতে হইলে, তোমার লজ্জা তেমনই হইবে। বোলার বল দিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, তুমি যদি প্রত্যেক ফিল্‌ডারের অবস্থান বিশেষ করিয়া জানিয়া লও, তবে ভাল হয়, কেননা ফিল্‌ডার যেস্থানে নাই, তুমি সেই স্থানে বলটী ছুড়িয়া দিতে চাও। বোলার যখন বল দিবার জন্য দৌড়িতে আরম্ভ করে, তখন তোমার ব্যাট্ ভূতলহইতে অল্পমাত্র উঠাইয়া বলটীতে আঘাত করিতে উদ্যত হও। এইরূপ প্রস্তুত থাকিলে, তোমার ভাল করিয়া খেলিবার আরও সম্ভাবনা হইবে। কিন্তু ব্যাট্‌টি তোমার মাথার উপর উঠাইয়া ঘুরাণ অনর্থক—এমন কি বড়ই বিপজ্জনক; যে সময়ে তুমি এইরূপে ব্যাট্‌টি ঘুরাইতেছ, সেই সময়ে সম্ভবতঃ বলটি তোমার উইকেটে লাগিবে।

ব্যাট্‌স্‌ম্যান যখন তাহার বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়িয়া ব্যাট্ করিবার জন্য উইকেটের দিকে যাইতেছে, তখন, "সাবধান হও, সাবধান হও"—দর্শকেরা অনেক সময়ে এইরকম কথা বলিয়া উঠে। তাহাদের ইচ্ছা এই যে, ব্যাট্‌স্‌ম্যান প্রথমে রাণ করিতে চেষ্টা না করিয়া উইকেট্-রক্ষা করিয়া যেন সন্তুষ্ট হয়। হয়ত আমাকে কেহ বলিবে, মহাশয়, এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি? এই প্রশ্নটীর উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে, কেননা তাহা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কৌশল ও প্রকৃতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। অনেক ছেলে, উইকেটে আসিয়া উপস্থিত হইলেই যদি হিট্ করিতে আরম্ভ করে, তবে শীঘ্রই আউট্ হয়। পক্ষান্তরে আমার নিয়ম এই, যদি কোনমতে সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি প্রথম বলটী জোর করিয়া হিট্ করিতে ভালবাসি। আমি যদি প্রথম বলটী বাউণ্ডারিতে ছুড়িয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমি আশ্বস্ত হই এবং বোলার বিঘ্ন পায়, ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি। ব্যাট্‌স্‌ম্যান যদি এইরূপে প্রথম বলটী মারিতে পারে, তাহা হইলে বোলিং একেবারে মাটী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমি একটী উদাহরণ দিতেছি। আমি যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন একসময়ে অন্য এক স্কুলের বিপক্ষে খেলিবার সময়ে ৫২টি রাণ করিয়াছিলাম; আউট্ হই নাই। পরবৎসরে আমি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আবার সেই স্কুলের বিপক্ষে খেলিতে যাই। আমি যে বলটী জোর করিয়া মারিতে ভালবাসি, ইহা ঐ স্কুলের বোলারদের বেশ স্মরণে ছিল; ফলে কি হইল? আমি ব্যাট্ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেই, তাহাদের বোলিং একেবারে মাটী হইয়া গেল। আমি পাছে সজোরে বলটী মারি, এই ভয় করিয়া তাহারা যেখানে সেখানে বল ফেলিতে আরম্ভ করিল, কাজেই সেদিন আমার রাণ করিবার চমৎকার সুযোগ হইল। আমার বিবেচনায়, ব্যাট্‌স্‌ম্যানের অভ্যাস হইয়া থাকিলে, ইনিংস এইপ্রকারে আরম্ভ করিলে, অনেক লাভ হইতে পারে। বলটী জোর করিয়া মারিতে গেলে, তোমরা এই একটী প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখিবে যে, বলটী যত উঁচু হইয়া উড়িয়া যায়, ব্যাট্‌স্‌ম্যানের বিপদ্ তত বেশী; ক্যাচ্‌দ্বারা আউট্ হইবার খুব সম্ভাবনা হয়। তাহা হইলেও আমরা অনেকে বলটী উঁচু হইয়া উড়িয়া যাইতে দেখিতে ভাল বাসি বলিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দিতে সঙ্কোচবোধ করি না; এবং বলটী যখন বড় আঘাত পাইয়া গ্রাম-স্কোয়ারের সীমা-অতিক্রমপূর্ব্বক নিরাপদে পাড়ার মধ্যে পড়ে, তখন কে না সন্তুষ্ট হইয়া ইহা তাহার দুঃসাহসের মহাপুরস্কার মনে করিবে?

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি কেবল কএকটী বিষয়েই তোমাদিগকে

পরামর্শ দিতে পারি। আমি আর একটী বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রবন্ধটীর শেষ করিব। ব্যাট্‌ করিবার সময়ে উভয় ব্যাট্‌স্‌ম্যানের একমত হওয়া চাই, তাহা না হইলে তাহারা সহজে রাণ-আউট্‌ হইতে পারে। এ বিষয়ে এদেশীয় ছেলেরা প্রচুর ত্রুটির পরিচয় দেয়। এতদ্বিষয়ে আমার প্রথম কথা এই যে, উভয় ব্যাট্‌স্‌ম্যানের, বলটীতে আঘাত করা হইলেই, দৌড়িতে প্রস্তুত হওয়া দরকার, নতুবা রাণ করিবার অনেক সুযোগ নষ্ট হইবে, কিংবা রাণ করিতে চেষ্টা পাইলে, একজন রাণ-আউট্‌ হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, যে ব্যাট্‌স্‌ম্যান বল মারিতেছে না, সে উইকেটের পিছনে থাকিয়া কি ধ্যান করিতেছে; অন্য উইকেটের কাছে দৌড়িয়া যাইবার জন্য সে কোনমতে প্রস্তুত নহে। যে ছেলেটী এইরূপে অপ্রস্তুত ও অসতর্ক হইয়া থাকে, সে যদি রাণ-আউট্‌ হয়, তবে বড় ভাল হয়; হয়ত তদ্দারা তাহার চেতনা হইবে। ব্যাট্‌স্‌ম্যানের প্রস্তুত ও সতর্ক হওয়া উচিত। আর একটী কথা এই যে, ব্যাট্‌স্‌ম্যানেরা যদি এবিষয়ে চালাকির পরিচয় দেয়, তাহা হইলে ফিল্‌ডারেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, ইহা অনেক সময়ে দেখা যায়। তাহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলটী যেখানে-সেখানে ছুড়িয়া ফেলে, তাই স্কোর আরও শীঘ্র বাড়িয়া যায়। ইহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিও। কিন্তু ব্যাট্‌স্‌ম্যানেরা যাহাতে নিরাপদে ঐরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাই ব্যাট্‌স্‌ম্যানের ডাকিবার নিয়ম যে কি, তাহা জানা অত্যাবশ্যক। ধর, আমি বলটী মারিতেছি, অন্য ব্যাট্‌স্‌ম্যান বোলারের উইকেটের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। এস্থলে বলটী যদি আমার উইকেটের পিছনে ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে, আমাদিগকে রাণ করিতে হইবে কি না, সে-ই তাহা স্থির করিবে। পক্ষান্তরে বলটী যদি আমার পিছনে না যায়, তাহা হইলে, দৌড়িতে হইবে কি না, আমিই তাহা বলিব। এই নিয়ম-রক্ষা করিলে, ব্যাট্‌স্‌ম্যানেরা অনেক বিপদ্‌ এড়াইতে পারিবে। বলিবার যাহার অধিকার আছে, কেবল সেই "হাঁ" বা "না" হাঁকিবে, এবং অন্য ব্যাট্‌স্‌ম্যান তাহার কথা শুনিতে বাধ্য; অন্য ব্যাটস্‌ম্যান যদি অবাধ্য হয়, কিংবা তাহারা দুইজন যদি, রাণ করিতে পারা যায় কি না, খেলিবার সময়ে সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উভয়ের বিপদ্‌ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইবে। সঙ্গীন সময়ে ইতস্ততঃ করা বড়ই বিপজ্জনক; অনেক নির্বোধ খেলোয়াড় ইতস্ততঃ কিংবা তাহাদের সহব্যাট্‌স্‌ম্যানের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। ব্যাট্‌স্‌ম্যানেরা যদি প্রত্যেক বলে "হাঁ" বা "না" হাঁকে, তাহা হইলে তাহারা অনেক বিপদ্‌হইতে রক্ষা পাইবে। এ দেশের ছেলেরা যদি এ বিষয়ে মনোযোগ করে, তাহা হইলে পরম উপকার হইবে।

দর্শন দক্ষতা

চোক আছে, আমরা সকলেই দেখি; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুইজনে এক পথ দিয়া গেলেও, সব জিনিস সমান দেখি না। এখানে কেহ হয়ত বলিবেন যে, যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ, সে সেই বিষয়টি বেশী দেখে। এই উক্তির মূলে কিছু সত্য আছে বটে; কিন্তু আসল কথা এই, কাণ থাকিলেও, লোকে শুনে না; চোক থাকিলেও, লোকে দেখে না; কারণ অনেকেই সকল কার্য্যে সমান মনঃসংযোগ করে না। এমন দেখা গিয়াছে যে, আমি যাহা খুঁজিতেছি, তাহা আমার চোকের সম্মুখে রহিয়াছে, তবু আমি দেখিতে পাইতেছি না। এরূপ হইবার কারণ অমনোযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ইন্দ্রিয়মাত্রেই নানাবিধ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। জ্ঞান কেবল বইএ নাই। জগতের সর্ব্বত্র ছড়ান রহিয়াছে। দক্ষতার সহিত দেখিতে-শুনিতে না জানিলে, আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, বিলাতে অনেক ছাত্রকে তাহাদের মাতা-পিতা বা অভিভাবক দেশ-পর্য্যটনে পাঠান। উদ্দেশ্য তাহারা নানা দেশ দেখিয়া, নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিয়া যেন চাক্ষুষ জ্ঞান-লাভ করিতে পারে। ভারতীয় ছাত্রদিগের জীবনে সে জ্ঞান-লাভ দুরাশামাত্র—কারণ তাহারা অধিকাংশই মধ্যবিত্তের সন্তান, অর্থ-সামর্থ্য বড় নাই। তথাপি আমি যদি দর্শন-দক্ষতালাভ করি, তাহা হইলে আমার ক্ষুদ্র গ্রামটির মধ্যহইতেই বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ করিতে পারি। এই জ্ঞানলাভার্থে আবশ্যক সুধু দর্শনদক্ষতা। দর্শনে মনঃসংযোগ করিলেই দর্শন-দক্ষতা জন্মে, নতুবা চক্ষুসত্ত্বেও আমরা শত পাখী, শত ফুল, শত ফল দেখিব না, তাহাদের নাম, প্রকৃতি, স্বাদ বা গন্ধ কিছুই জানিব না। বই পড়িবার সময় যেমন মনঃসংযোগ আবশ্যক, জগৎকে দেখিবার সময়েও তেমনি মনঃসংযোগ করা আবশ্যক। দেখিয়া যদি পথ চল, কোথায় কি পাওয়া যায়, কোন্‌ রাস্তাটি কোথায়, কোন্‌ জিনিসের কি দর ইত্যাদি জানিবার জন্য লোকের তোষামোদ করিতে হইবে না। পথে দেখিয়া চলিলে, লোক-চরিত্রেও অভিজ্ঞতা জন্মে। কত রকমের লোক কত ভঙ্গীতে কতপ্রকারের কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছে—কাণ দিয়া শুনিলে, তাহাদের মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিলে, মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ হইবে। বড় বড় আবিষ্কারক, বড় বড় উদ্ভাবক কি গুণে আবিষ্কর্ত্তা বা উদ্ভাবক হইয়া উঠেন, তাহা জান কি?—এই পর্য্যবেক্ষণ-পটুতা-গুণে। অতএব তোমরা কেবল গ্রন্থকীট হইবার চেষ্টা না করিয়া

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই;
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

প্রভাত-বর্ণন।

রঙ্গানুকৃতি।

(Parody.)

"পাখী সব, করে রব" ইত্যাদি।

নাই রাত, এঁটো ভাত খায় কাকগুলো
পালঙে ফিরিয়া পাশ অবিনাশ গুলো।
মনসুখ দেয় মুখ মণ্ডলার বাটে,
শিশুগণ দিয়ে মন গুড়-মুড়ি সাঁটে।
ফুটিল পিসির পিঠে, সৌরভ ছুটিল,
পরিমল পেয়ে সব ছেলেরা জুটিল।

দেখে' সে পিঠের, মরি, লোহিত-বরণ
সকল বালক হ'ল পুলকিত মন!
এদিকে কোঁদল হয় পদীর, সদীর,
পাড়ায় পাড়ায়, আহা, রামীর, বামীর!
উঠ, শিশু, কাত হও, কাত হ'য়ে বেশ
চায়ের বাটিতে মুখ করহ নিবেশ!
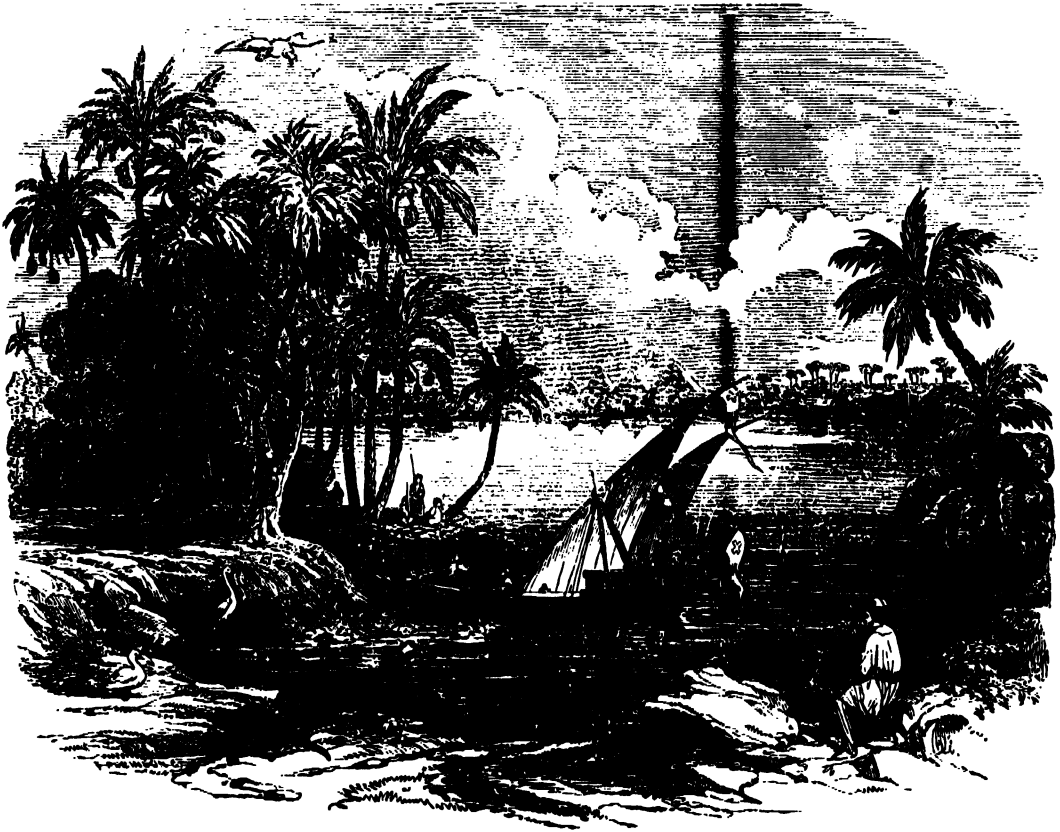
বক্তব্য।

চিত্র-প্রতিযোগিতায় শ্রীমান বিশ্বপতি চৌধুরী প্রথম-স্থানাধিকার করিয়াছে। তাহার চিত্রটি ডিসেম্বরের বালকে প্রকাশিত হইবে।

"বালক"-সম্পাদক।

বালক

মাসিক পত্রিকা।

জে, এম্, বি, ডনক্যান

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

২৩ নং চৌরঙ্গী রোড,

কলিকাতা।

১৯১৩

বালক।

২য় বর্ষ।] ডিসেম্বর, ১৯১৩। [১২শ সংখ্যা।

মার্জ্জনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিচিত্রবীর্য্য ক্রমে ক্রমে বুঝিতে লাগিল যে, ব্রহ্মাবর্ত্তে তাহার কোন প্রভুত্ব খাটিবে না, এখানে সে প্রভু নহে, যাহাকে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করিত না, সেই জয়ন্তই এখানকার প্রভু, এখানে সে ভয় দেখাইলে, কেহই ভয় পাইবে না। প্রথম প্রথম সে জয়ন্তের ও অন্যান্য লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে লাগিল, কিন্তু পরে সে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইতে লাগিল জয়ন্তের ন্যায় সৎস্বভাব ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বালকের সঙ্গ-পরিহার ক্রমে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন সে এখানে সংযত থাকিতে বাধ্য হইয়া উত্তরোত্তর চরিত্রের পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অরবিন্দ একদিন কহিলেন,—"এই রাজকুমারটি কিছুকাল এই স্থানে থাকিলে দেবকল্প হইয়া উঠিবে।"
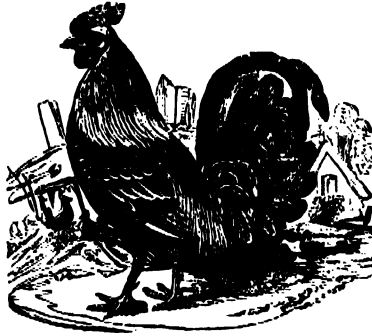
ক্ষুদ্র বালক শার্দ্দূলবীর্য্যের ভয়ভাব অনেকটা ঘুচিয়া গেল। কেবল সেই দুর্গের একটী কুক্কুরকে সে বড় ভয় করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিলেই, সে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিত। অরবিন্দের সহিত তাহার পুনরায় সৌহৃদ্য জন্মিল। নক্র-বিক্রমকে সে আর তত ভয় করে না। মহাকার্ম্মুক কোন আমোদের কথা কহিলে, সে হাসে। আর্য্যা গৌতমীর কোলে গিয়া বসে, তাঁহার আর্য্যগাথাগুলি শুনিয়া, মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিলেও, প্রীত হয়। বশিষ্ঠের ও বাদরায়ণের উপদেশ-বাণী তাহার মর্ম্মস্পর্শ করে। ফলে বালক-চতুষ্টয়ের মধ্যে সে-ই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বর-ভক্ত ও ধর্ম্মভীরু হইয়া উঠিতে লাগিল। সে শারীরিক দৌর্ব্বল্যহেতু কোন ব্যায়ামে বা বহিরঙ্গণ-ক্রীড়ায় যোগ দিতে পারে না, ফলে ঈশ্বরের ধ্যানে ও তাঁহার প্রেমানুচিন্তনে যে বিমলানন্দোপভোগ করা যায়, সে, এই বয়সেই, সেই আনন্দ-সুধা-পানার্থেই অধিকতর আগ্রহ-প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার শারীরিক-অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার তত্ত্বাবধান ও শুশ্রূষা করা আর্য্যা গৌতমীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দিন দিন ক্ষীণ ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ফলে সকলেই তাহার জীবনাশা-পরিত্যাগ করিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য—অরবিন্দ, মহাকার্ম্মুক ও জয়ন্তের সঙ্গগুণে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত সবল, প্রফুল্ল ও শান্তশীল হইতে লাগিল। কিন্তু শার্দ্দূলবীর্য্য ক্রমে ক্রমে শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়া একদিন সেই যে নয়নযুগল মুদ্রিত করিল, আর খুলিল না। এ জগতে মানুষে মানুষের রক্তদর্শন করে, সে শান্ত, দ্বন্দ্ব-কলহের ধার ধারিত না। সে এমন নিরীহ ছিল যে, কাহারও প্রতি কখনও চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারিত না। এ বিরোধময় বিশ্ব তাহার মত নির্ব্বিরোধ বালকের বাসোপযোগী নহে। তাহার ধ্যানস্তিমিত-লোচন যে লোকের অম্লানজ্যোতিঃ-নিরীক্ষণ করিত, এক শিশিরভূষণা উষায় যখন প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ, কেবল দূরে এক নগ-নির্ঝরিণীর মধুর নিক্বণ উঠিতেছে, এবং তাহার শয়নকক্ষ্যায় উষসীর মৃদু-বায়ুহিল্লোলে নিশার স্তিমিত প্রদীপের ক্ষীণালোক যখন নিবিয়া গেল, তখন, সেই সন্ধিক্ষণে, তাহারও প্রাণ-প্রদীপের আলোক নির্ব্বাপিত হইল, সে সেই মহাপুণ্যময় লোকে চলিয়া গেল। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে, যেমন তাহার স্নিগ্ধদ্যুতিঃ অনেক-

ক্ষণ শাখিশিরে, নদীনীরে লীলা করিতে থাকে, তেমনই শার্দ্দূল-বীর্য্য গেল, কিন্তু তাহার সদ্‌গুণের সৌরভ ও স্মৃতি রহিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শার্দ্দূলবীর্য্যের মৃত্যুতে জয়ন্ত হৃদয়ে বড় আঘাত পাইল। তাহার মরণ-পাণ্ডুর মুখখানি জয়ন্তের হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গেল। জয়ন্তের উদাস অন্তঃকরণে এই সময়ে এক সদ্বাসনা জাগিল। সে স্থির করিল যে, বিচিত্রবীর্য্যকে সে ছাড়িয়া দিবে। প্রথমে সে শার্দ্দূলবীর্য্যের শব সসম্মানে তাহার পিতার নিকটে পাঠাইয়া দিল। তাহার পর সে এক মহতী সভার অধিবেশন করিয়া সেই সভায় রাজন্যবর্গ ও প্রজাপুঞ্জের কাছে প্রস্তাব করিল যে, বিচিত্রবীর্য্যকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা সকলে বিস্মিত হইলেন,—"বলেন কি, মহারাজ, ইহার পিতা আপনার প্রতি যে সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন ?"

বাদরায়ণ তখন তাহার হইয়া প্রজাপুঞ্জকে কহিলেন,—"আমরা কেহই নির্দ্দোষ বা নিষ্পাপ নহি, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আমরা পদে পদে দোষ করিতেছি, আমরা যদি অপরাধিগণকে ক্ষমা না করি, তাহা হইলে এই জগতের জনক যিনি, তিনিও আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন না।"

প্রজাবর্গ নতমস্তকে এই সৎপ্রস্তাবের অনুমোদনপূর্ব্বক সানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ফলে বিচিত্রবীর্য্য মুক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

উপসংহার।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর বহুবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এখন জয়ন্ত স্বয়ংই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকাল বড় নির্ব্বিবাদে কাটে নাই। অনেক সমর ও সংগ্রামে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে কখন কেহ অন্যায় বা অত্যাচার করিতে দেখে নাই। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের কাছে অনেককেই নতমস্তক হইতে হইয়াছে।

অরবিন্দ এখন তাঁহার প্রধান সেনাপতি। মহাকার্ম্মুক এখন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। আর্য্যা গৌতমী ও বৃদ্ধ নক্রবিক্রম আর ইহলোকে নাই। বশিষ্ঠও ইহলীলা-সম্বরণ করিয়াছেন। বাদরায়ণ কিন্তু এখনও অতি বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত রহিয়াছেন। দুরাত্মা রক্তমুখ জয়ন্তের সহিত প্রকাশ্যে শত্রুতাসাধন করিতে না পারিয়া গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

কুশরাজের জীবন বড়ই দুঃখে কাটিয়াছিল, তিনি মৃত্যুকালে নিতান্ত দুঃখভারাবনত হইয়া ইহলোক-পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিচিত্রবীর্য্যও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। সেই শোকে তিনি আর কখন মস্তকোত্তলন করিতে পারেন নাই। যে যেমন বুনিবে, সে তেমনি কাটিবে, এতো ধরা কথা। কুশরাজ নির্ব্বংশ হইয়া ইহলোক-ত্যাগ করেন। ফলে জয়ন্তেরই এক সম্পর্কীয় ভ্রাতা সেই রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় এবং জয়ন্তই ছত্রপতি হন।

এখন মহারাজ জয়ন্তের বৃদ্ধাবস্থা। তিনি তাঁহার পুত্র অরিন্দমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকার্য্যহইতে অবসর লইবার কল্পনা করিতেছেন। এতদর্থে তিনি একদিন বাদরায়ণের আশ্রমে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে, গিয়াছেন, এমন সময়ে একটী অতি বৃদ্ধ লোক আসিয়া তাঁহার পাদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিল,—"মহারাজ, আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আপনি না রক্ষা করিলে, আমার আর নিষ্কৃতি নাই।"

"কে তুমি ? ছি, তুমি আমার পিতৃতুল্য লোক, আমার পাদ-প্রান্তে পড়িয়া আমাকে অভিশাপগ্রস্ত করিও না। উঠ, উঠিয়া দাঁড়াও।"

"মহারাজ কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?"

জয়ন্ত কিয়ৎকাল বৃদ্ধের মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"হাঁ, চিনিয়াছি ; আপনি রক্তমুখ। উঠুন, উঠুন, আমার পাদ-প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত করিবেন না। চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। অধীনের প্রণাম-গ্রহণ করুন।"

এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া রক্তমুখের দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রকৃতই অনুতপ্ত চিত্তে কহিতে লাগিল,—"মহারাজ, রাজন্যমাত্রেই এক্ষণে আমার মহাশত্রু, আপনি ছত্রপতি, সমস্ত রাজাই—আপনার শক্তিসামর্থ্যহেতু তত নয়, যত আপনার চরিত্রগুণে—আপনাকে শ্রদ্ধা করে। এই পামর আপনার পিতৃহন্তা, তাই রাজমাত্রেই, আমাকে দেখিতে পাইলে, বিষধর সর্পের ন্যায় মারিয়া ফেলিতে চাহে। যে দেশেই যাই, সেই দেশেই আমার শত্রু। তাই আপনার শরণ লইতে আসিয়াছি। আমি আপনার পিতৃহন্তা, আপনি আমায় ক্ষমা করিতে পারিবেন কি ? মহারাজ, যতদিন শক্তিসম্পন্ন ছিলাম, ততদিন বুঝি নাই যে, পাপ-পাদপের ফল এত কটু, এত তিক্ত, এত বিষময় ; এখন বুঝিয়াছি। তাই আপনার কাছে ক্ষমা ও প্রাণ উভয়ই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

জয়ন্ত। আপনার এত কথা বলিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। আপনাকে আমি বহুকালপূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছি। আপনি আমারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আপনার দ্বারা আমার ক্ষতি তো হয় নাই। উঠুন, ভাল হইয়া বসুন। আমি আপনার পাদ্যার্ঘের আয়োজন করিয়া দিই। কিছু ফলমূল-আহরণ করিয়া আনি। আপনার এ মলিন বেশও পরিত্যাগ করাই।

রক্তমুখ অবাঙ্মুখে জয়ন্তের মুখপ্রতি তাকাইয়া রহিল। তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে এক হৃদয়শূন্যকারী

দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া হতচেতন হইবার উপক্রম হইল। সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া শোওয়াইয়া দিল। তখন সে অক্ষিজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বাদরায়ণ কণ্ঠ কম্পিত করিয়া করিয়া গায়িতে লাগিলেন,—

ক্ষমা চাও? ক্ষমা কর অপরাধী জনে;
কা'রো দোষ করি' রোষ পুষিও না মনে।
বুকে রাখিও না বিষ,—
ও যে বিষ—মহাবিষ,
জ্বালায় গো অহর্নিশ
দারুণ দহনে।
এ ভুবন ভুলে ভরা,—
ভুলিতেই পটু ধরা!
ক'রো না ভ্রূকুটি ত্রুটি হেরি' ভবে কারো-
মহী-মরু-মাঝে ক্ষমা
ফলবতা ভূমিসমা;
ক্ষমাই কৌস্তভ-মণি হৃদয়ে ধারণে!
কত ভুল কর, ভাই,
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই,
যদি ভগবান্ সব করেন গণনা—
তিনি দোষ যা'ন ভুলে,
ল'ন ছেলে কোলে তুলে,
যখন সে পড়ে ঢুলে তাঁ'র শ্রীচরণে।

সম্পূর্ণ।

বাক্সবন্দী।

আমি তখন খুব ছেলেমানুষ; পাঁচ বা সাড়েপাঁচ বছরের ছেলে। সে আজ বাহান্নবৎসরের কথা। বাহান্নবৎসর পূর্ব্বে বড়দিনের এক অধিবাস-সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেছি। বাড়ীতে সেদিন মহাধুম। দাদা-দিদিরা ভাল ভাল পোষাক পরিয়া কেহ বেড়াইতে যাইতেছেন, কেহ গৃহসমাগত বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছেন, কেহ তাহার বন্ধুদের নিকটহইতে বড়দিনে প্রাপ্য শুভেচ্ছাজ্ঞাপক নানারকমের "কার্ড" পাইয়া সানন্দে পড়িতেছেন, কেহ ডুলি খুলিয়া বড়দিনের কেকের ও কমলালেবুর সহিত রসনাকে পরিচিত করিতেছেন। আমিও ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়াছি। কেক-কমলালেবু যথেষ্ট খাইয়াছি, বড়দিনের উপহার দারুময় অশ্বের ইতোমধ্যেই দুইটী পদচ্যুতি ঘটাইয়াছি। এখন কিছু স্বাধীনভাবে বিচরণেচ্ছু হইয়া বাড়ীর পিছনের বাগান দিয়া আস্তাবলে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেখানে ঘোড়ার দানার সিন্দুকটার ডালা বেশ খোলা রহিয়াছে, তাহাতে আধ-সিন্দুক দানা! দেখিয়া সিন্দুকের মধ্যে সপরিচ্ছদ-বুট অবতরণ করিলাম। সিন্দুকটি সেকেলে। ডালাটি মোণখানিকের কম ভারি হইবে না। সিন্দুকের মধ্যে নামিয়া দুই-চারিটি দানা মুখে দিয়া প্রথমে নাচিতে সুরু করিলাম, তাহাতে ডালাটি কি অবস্থায় থাকিল, তাহা লক্ষ্য করিলাম না, পরে সেই মখমলের কোট-প্যাণ্ট পরিয়া যেই তাহার মধ্যে সশব্দে শুইয়া পড়িলাম, অমনি ডালাটি বন্ধ হইয়া গেল। চীৎকার করিতে লাগিলাম, গলাই ভাঙ্গিয়া গেল, কেহই আমার উদ্ধারার্থে আসিল না, কেননা আস্তাবলের পর বাগান, তাহার পর আমাদের বাড়ী। খানিকক্ষণ চেঁচাইয়া চুপ করিলাম। তাহার পর দানার উপর শুইয়া পাএর জোরে ডালাটি তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, অতিকষ্টে একটুখানি ফাঁক করিতে পারিলাম। পা সরাইয়া লইলে, ডালা আবার পড়িয়া গেল। তখন, কি খেয়াল গেল, পকেটে একটী আধখানা 'টল'-গুলি ছিল, ডালাটি জোর করিয়া পা-দিয়া পুনরায় একটু তুলিয়া 'টল'টি ফাঁকের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলাম। ফলে ডালাটি সম্পূর্ণ পড়িতে না পারিয়া একটু ফাঁক হইয়া রহিল। ঐ খেয়ালের জন্যই আমি আজও বাঁচিয়া আছি, নতুবা সেইদিনই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি দমবন্ধ হইয়া মারা পড়িতাম।
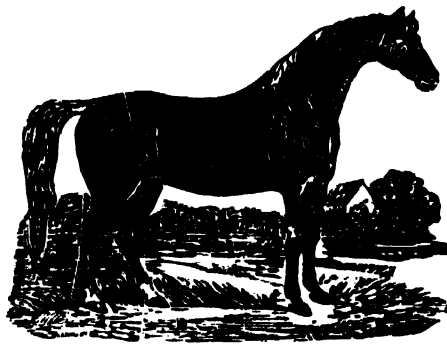
যাহা হউক, পরে কি হইয়াছিল, আমি জানি না; কেননা ২।৩ ঘণ্টা ঐ অবস্থায় থাকিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। পরে দাদার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি।

রাত আন্দাজ ৯৷৹টার সময় আমার খোঁজ হয়। প্রথমে বাড়ীর সর্ব্বত্রই আমাকে খোঁজা হয়, কেহ আমার খোঁজ না পাওয়াতে, বাবা ব্যাকুল হইয়া পুলিশে খবর দেন, আমাদের সমস্ত আত্মীয় ও পরিচিত লোকের বাড়ী লোক পাঠান। কোথাও আমাকে পাওয়া গেল না, ফলে বাড়ীতে একটা কান্না-কাটি পড়িয়া যায়, সে বৎসর বড়দিনের আমোদ আমাদের বাড়ীতে হয় নাই।

সমস্ত রাত কাটিয়া গেল, আমার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না

পরদিন প্রাতে সকলেই আমার জীবনাশা-ত্যাগ করিলেন। আমি এদিকে সেই বাক্সেরই মধ্যে হতচেতন হইয়া আছি, তখনও প্রাণ আছে, কিন্তু মরিবার বড় বিলম্ব নাই। এমন সময়ে এক রগড় হইল। আমাদের একটা বুড়া ঘোড়া ছিল, সে সুবিধা পাইলেই, আমি যে দানার বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম, সেই দানার বাক্সের ডালা মুখদিয়া তুলিয়া দানা-চুরী করিয়া খাইত। প্রভাতেই তাহার সেই সুপ্রবৃত্তিটি জন্মিল, সে খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া ডালাটি খুলিয়া ফেলিল। দূরে একটা সহিস বসিয়া বসিয়া ধূমপান করিতেছিল, সে তাহা দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ অশ্ববরের মাতা-পিতার প্রতি অপভাষাপ্রয়োগ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। ঘোড়া তো ছুটিয়া নিজ কোটরে প্রবিষ্ট হইল, এদিকে সহিস দেখে, বাক্সের মধ্যে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছি। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আরে, ই কিয়া হ্যায়! ইসমে খোঁখাবাবু কিস্ তরেসে ঘুসা—আরে লড়কা তো মর গয়া!" এই বলিয়া সে আমাকে কোলে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া যায়। পরে বহুদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া আমি যেন পুনর্জীবিত হই।

এখন সেই সিন্দুকটির কাঠদিয়া আমি আমার বইএর সেল্‌ফ-তৈয়ার করাইয়াছি। উহা এখনও আমার পাঠ-গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্পূর্ণ।

চিত্রবিদ্যা অর্থকরী কি

ভারতে কেহ ছবি আঁকিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে কি? অনেকের ধারণা এই, কবি, চিত্রকর ও গায়ক ভারতে ভাত করিয়া খাইতে পারেন না, কেননা কবিতার বই কেহ বড় পড়ে না, চিত্রকর ও গায়কের সমঝদারও ভারতে আজিকালি বড় নাই। চিত্রকর ও গায়ক স্ব স্ব প্রতিভার সাহায্যে অন্নের সংস্থান করিতে পারেন কি না, বর্ত্তমান নিবন্ধে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব না। চিত্রকরের চিত্রবিদ্যা তাঁহার উপজীবিকার উপায়স্বরূপ হইতে পারে কি না, কেবল ইহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

আজিকালি কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি সহরহইতে যে সমস্ত গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, কাব্যগ্রন্থ, সংবাদ-পত্র, মাসিক-পত্রিকাদি বাহির হইতেছে, সেগুলির অধিকাংশ সচিত্র। বরং আজিকালি সচিত্র পুস্তকেরই কাট্‌তি বেশী, অন্য পুস্তক, উপাদেয় হইলেও, তত বিক্রীত হয় না। আজিকালি বিজ্ঞাপনগুলিও সচিত্র হইয়া বাহির হইতেছে—থিয়েটারের হাণ্ডবিল, পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সচিত্র না করিলে, চলিতেছে না। এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে, বর্ত্তমানে চিত্রবিদ্যা ভারতে অর্থকরী হইতে পারে। কিন্তু কোন্ শ্রেণির চিত্রকরের চিত্র বিক্রীত হইতে পারে? প্রথম শ্রেণীর তৈল-চিত্রকরের? না, তাহা বোধ হয় না। উচ্চদরের চিত্র বুঝিবার—উহার কদর করিবার লোক ভারতে—শুধু ভারতেই বা কেন, জগতে জনসাধারণের মধ্যে বড় বেশী পাওয়া যায় না; সুতরাং সেরূপ চিত্রকর সৌখীন, সমঝদার লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিবেন, জনসাধারণ তাঁহাকে সমাদর করিবে না। কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর চিত্রকরের কথা বলিতেছি—অর্থাৎ পুস্তক-পুস্তিকা, মাসিক-পত্রিকাদির চিত্রকর—সাধারণেরও সমাদরণীয় হইবেন।

তবে (১) এই সমস্ত চিত্রকরের চিত্রবিদ্যাটি ভাল করিয়া আয়ত্ত করা চাই। প্রতিভাই কোন বিদ্যায় পারদর্শিতা-লাভার্থে প্রচুর নহে। ইস্পাত তরবারির উপাদান বটে, কিন্তু ইস্পাতকে তরবারিতে পরিণত করা চাই। তেমনি কবি বা চিত্রকরের স্বাভাবিক-শক্তি থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাগ্রহণেরও আবশ্যকতা আছে। "অশিক্ষিত পটুত্ব" প্রতিযোগিতায় পরাভূতই হইয়া থাকে।

(২) আধুনিক চিত্রকরের চিত্রবিদ্যার সকল শ্রেণীতেই কিছু-না-কিছু অধিকার থাকা চাই। অর্থোপার্জ্জনেচ্ছু চিত্রকর কেবল তূলী ধরিতে শিখিলে, চলিবে না, তাঁহাকে "বুলি" ধরিতেও শিখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে ফটোগ্রাফী (আলোক-চিত্রণ-বিদ্যা), অঙ্কন ও বর্ণন সকলই শিখিতে হইবে। তাঁহার চিত্রমধ্যে আলোক ও ছায়ার সুসমাবেশ, নৈকট্য ও দূরত্বের জ্ঞান, প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ-জনিত ভূয়োদর্শনের পরিচয় থাকা বিশেষ আবশ্যক।

(৩) নকলনবিশ কবি যেমন সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারে না, নকলনবিশ চিত্রকরও তেমনি যশঃ বা অর্থ কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন না। চিত্রকররূপে যদি তুমি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে তোমার স্বকীয়ত্ব পরিস্ফুট করিতে হইবে। যাহা তোমার কাছে পাওয়া যায়, তাহা যদি অন্যের কাছে সুলভ হয়, তাহা হইলে তোমার মূল্য কমিয়া যাইবে না কি?

(৪) তাহার পর চিত্রকরের উদ্ভাবনী শক্তিও থাকা চাই। "নূতন কিছুর" জন্য আজকাল জগৎ পাগল। জগৎ যাহা চায়, তাহা যে জগৎকে দিতে পারে, সে যে জগতের পৃষ্ঠপোষকতা-লাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আজিকালি বিজ্ঞাপন-প্রচারার্থে প্রচুর অর্থব্যয় করা ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞাপনে যে সমস্ত চিত্র ব্যবহৃত হয়, সে সমুদয় চিত্রের বৈচিত্র্যই প্রধান লক্ষ্য।

অনেকের ধারণা এই, চিত্রকরের লেখা-পড়া না শিখিলেও চলে। কিন্তু একথা সত্য নহে, প্রতিভায় প্রতিভায় স্ব স্ব শক্তির আদান-প্রদান না করিলে, তাঁহারা স্ব স্ব শক্তির সম্যক্ স্ফুরণ করিতে পারেন না। এইরূপে কবি চিত্রকরকে, চিত্রকর কবিকে, ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে, ভাস্কর স্থপতিকে সাহায্য করিয়া থাকেন। বিদ্যার সহিত বিদ্যার বিচিত্র যোগ আছে; সুতরাং নিরক্ষর চিত্রকরের সভ্যতার তরঙ্গতাড়নে তৃণবৎ ভাসিয়া যাইবার ভয় আছে।

উপযুক্ত চিত্রকর মাসে কত টাকা-উপার্জ্জন করিতে পারিবে? ইহা বলা বড় দুরূহ, তবে এখন প্রতিযোগিতা তত প্রখরা নহে, সুতরাং আশা করা যায়, মাসে ২০০্টাকা অনায়াসে উপার্জ্জিত হইতে পারিবে, তবে শিল্পিমাত্রেই দীর্ঘসূত্রী, তাই উহার অপেক্ষা অল্প টাকাও অর্জ্জিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, চিত্রকর যদি অধ্যবসায়ী ও কার্য্যতৎপর হন, তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে ধনী হইয়া উঠিতে পারেন।

পিপীলিকা

বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে শিক্ষক-সভার মাসিক অধিবেশনে একটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-পাঠ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হই। কিন্তু ৪।৫ দিন চেষ্টা করিয়াও কোন একটী উপযুক্ত বিষয় স্থির করিতে পারি নাই। শেষে কেবলই মনে হইতেছিল যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের মত যন্ত্রাগারের সাহায্য না পাইলে, কি কখন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা করা যায়? কখনই নহে; আর কোনরূপ নূতন তথ্য-আবিষ্কার করিতে না পারিলে, প্রবন্ধ-লেখাও বিড়ম্বনা-মাত্র। এইরূপ ভাবিয়া ক্রমে হতাশ হইতেছি, এমন সময়ে দেখি, আমার সযত্ন-রক্ষিত মিষ্টান্নটুকু অসংখ্য ক্ষুদ্র পিপীলিকার অন্যায় আক্রমণে ক্রমেই অদৃশ্য হইবার মত হইতেছে, তখন মিষ্টান্নের পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এইসকল ক্ষুদ্রজীবের ধৃষ্টতা ও অধ্যবসায়ের কথা মনে উদিত হয়। হঠাৎ মনে হয় যে, ইহাদের বিষয়ে আলোচনা করিলে তো একটা কিছু নূতন তথ্য-আবিষ্কার করা যায় এবং এজন্য কোন বহুমূল্য যন্ত্রাগারেরও প্রয়োজন হয় না; অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধের মাল-মসলা-সংগ্রহের জন্য আর আমাকে কোন বেগ পাইতে হয় না। অতি তুচ্ছ, অতি পরিচিত সামান্য পিপীলিকার বিষয়ে আলোচনা করিলেও, বিশ্বপতির অনন্ত সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। বালকের পাঠক-পাঠিকাদিগকে আজ সেই আলোচনার কিয়দংশ উপহার দিতেছি।

জীবের মধ্যে মানুষের সহিত বানরজাতির আকৃতিগত সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজ-গঠন-ক্ষমতা, সুবৃহৎ বাসগৃহ-নির্ম্মাণ-কৌশল, ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য-সংগ্রহ, কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে পশু-পালন, দাস-রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, পিপীলিকাদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান জীব বলিয়া মনে হয়।

আমাদের দেশে যে সকল পিপীলিকাকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের অনেকেরই বাঙ্গালা নাম নাই। তবে যে কয়েকপ্রকারের নাম জানা যায়, তাহা এই—ডেঁয়ো, ডেয়ে, সুড়্‌সুড়ে বা ধাওয়া, নাল্‌শো বা উমো, রাঙী, ক্ষুদে, জিঙে, কাঠ-পিঁপ্‌ড়ে (মেঝেন, মাদারী বা দাপ পিঁপ্‌ড়ে) ও চিড়্‌চিড়ে। ইহাদের মধ্যে ডেয়েদের কাঁকড়ার ন্যায় তীক্ষ্ণ দাড়া আছে, সুড়্‌সুড়েরা কামড়ায় না; রাঙীরা কাম্‌ড়াইলে, জ্বালা করে; জিঙে ও কাঠ-পিপ্‌ড়ে অত্যন্ত বিষাক্ত।

পিপীলিকারা তিন জাতিতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—ডেয়ে সুড়্‌সুড়ে এবং কাঠ-পিঁপ্‌ড়ে। ডেয়েরা দেখিতে অনেকটা বড় ও প্রায় কাল; গৃহে কোনপ্রকার মিষ্টান্ন থাকিলে, উহারা প্রায়ই তাহা খাইতে আসে। সুড়্‌সুড়েরা কামড়ায় না, বড় দ্রুতগামী। কাঠ-পিপ্‌ড়েরা সচরাচর শুষ্ক বৃক্ষের মধ্যে ছিদ্র

করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। জিওা-নামক আর এক-প্রকার পিপীলিকা দেখা যায়, উহারা সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়া শিকার-অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মৃত্তিকাই ইহাদের বাসস্থান। কখন উচ্চস্থানে কিম্বা বৃক্ষের উপরে বাসস্থান-নির্ম্মাণ করে না।

পিপীলিকাদিগের মধ্যেও শিকারী ও এমন কি পশুপালক জাতিরও অভাব নাই। মৃত কীট-পতঙ্গদিগকে যে উহারা অনেকে একত্র হইয়া বহন করে, তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে গরু ও মহিষের ন্যায় কীট বা "পশু"-পালন করিয়া থাকে, তাহা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এই বিষয়েরই আলোচনা করিব।

পশুপালক-পিপীলিকাদিগের মধ্যে ডেয়ে ও নাল্‌শোই প্রধান। সিম, ধুতুরা, কুল প্রভৃতি গাছে ভেড়ার মত শিংযুক্ত একপ্রকার কীটকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। ঐ পোকাগুলির পৃষ্ঠদেশে চীনেদের বেণীর মত দীর্ঘ একটী শিখা থাকে। উহাদিগকে মহিষ-পোকা-নাম দেওয়া গেল। উড়িতে পারিলেও উহারা দল ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করে না। ডেয়েরা উহাদের পুচ্ছের নিকটে শুঁড় বুলাইয়া আদর করে এবং মহিষগুলির প্রদত্ত রস বা দুগ্ধ-পান করিয়া থাকে।

মহিষ-পোকারা যখন উড়িতে পারে, তখন, উৎপাত করিলে, অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই সম্ভব; কিন্তু উড়িয়া যাইতে দেখি নাই। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, দুগ্ধ-দোহন করিলে, মহিষীরা বিরক্ত হয় না এবং ডেয়েরাও উহাদিগকে অযথা বিরক্ত না করিয়া বরং যত্ন করে। যে গাছে উহারা ডিম পাড়ে, সেই গাছের গোড়ায় অথবা নিকটেই ডেয়েরা বাসা করে।

পশুরক্ষা-বিষয়ে নাল্‌শোদের কৌশলই অতি চমৎকার। আম, ক্ষীরকুণ প্রভৃতি বৃক্ষের পাতায় ও ডালের উপরে কখন কখন সাদা রঙের একপ্রকার পোকা বাস করে। নাল্‌শোরা উহাদিগকে পুষিয়া থাকে। পোকাগুলি উড়িতে পারে না; কিন্তু অনেকক্ষণ একস্থানে থাকিতে পছন্দ করে না। এই পোকাগুলিকে পিপীলিকার গরু-নাম দেওয়া গেল।

গরুগুলি বড় অদ্ভুত। সকলেই জানে যে, গরুর কেবল চারিখানি পা থাকে, কিন্তু এই সকল গরুর পা ৬খানি। ইহাদের কাহারও আকৃতি অনেকটা উকুণের মত; আবার কাহারও আকার পিপীলিকার ন্যায়। ইহাদের কপালের উপরে কাল কাল দুইটী চোখ আছে। গরুর "পালানে" ৪টি বাঁট থাকে; তাহা নিম্নমুখে ঝোলে; কিন্তু ইহাদের পুচ্ছের নিকটে পৃষ্ঠের উপরে ঊর্দ্ধদিকে দুইটি বাঁট দেখা যায়। পিপীলিকারা আপনাপন শুঁড়-দিয়া ঐ সকল বাঁটে সুড়্‌সুড়ি দেয়। তখন উহাহইতে এক-এক-ফোঁটা শাদা রস বা দুধ বাহির হয়। পিপীলিকারা ঐ দুধ আনন্দে পান করে।

গরুগুলি বড় অলস বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, উহারা এত অলস যে, গাছের উপরে যেখানে উহাদিগকে রাখা যায়, সেইখানেই আজীবন থাকে এবং গাছের সেই-স্থানের রস-পান করিয়া জীবনধারণ করে। আমি কিন্তু যেসকল পোকা-পরীক্ষা করিয়াছি, উহারা অত অলস নহে। বিরক্ত করিয়া দেখিয়াছি, উহারা বাসস্থান-পরিত্যাগ করে; তবে সহজে "পৈতৃক ভিটা" ছাড়ে না। শীত-প্রধান দেশের পোকারা হয়ত অধিকতর জড় হইবে। উহাদের কোন কোন জাতি যে, একস্থানে সর্ব্বদা থাকিতে পছন্দ করে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

গরুর বাছুর যেমন সর্ব্বদা এদিক্-ওদিক্ করিয়া ছুটাছুটি করে, এইসকল পোকার ছানাগুলিকেও সর্ব্বদা সেইরূপ চলিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ছানাগুলির সঙ্গে সঙ্গে গরুগুলি যাহাতে বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে না পারে, সেইজন্য নাল্‌শোরা একপ্রকার জাল বুনিয়া উহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন বাসায় একটীও গরু নাই। সেইসকল বাসায় পিপীলিকারা বাস করে না। সেগুলি পরিত্যক্ত বাসা। যেসকল বাসায় গরু

দেখা যায়, কেবল সেইসকল বাসায় নাল্‌শোরা বাস করে। ইহা-হইতে স্পষ্ট বোধ হয়, নাল্‌শোদিগের সহিত উহাদিগের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পিপীলিকারা ত অনেক কীটকে খাইয়া থাকে। কিন্তু আপন বাসার মধ্যে পাইয়াও নাল্‌শোরা উহাদিগকে খায় না কেন? বরং মধ্যে মধ্যে দুই-একটি নাল্‌শোকে "গরু" মুখে করিয়া এক বাসাহইতে অন্য বাসায় লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। বিড়ালী আপন ছানাকে মুখে লইয়া অন্যস্থানে রাখে, এরূপ ত দেখা যায়। নাল্‌শোও ঐরূপ করে। গরুগুলি কিন্তু নাল্‌শোদের ছানা নহে। সুতরাং গরুকে বাসায় বহন করার উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? লোকে যেমন গরু, মহিষ প্রভৃতির বাছুর পোষে ও উহাদিগকে বাড়ীতে লইয়া যায় এবং যত্ন করে, নাল্‌শোরাও সেইরূপ করে, কারণ ঐ সকল কীট বড় হইয়া তাহাদিগকে ভবিষ্যতে দুধ যোগাইয়া থাকে। ইহাদের অভাবে নাল্‌শোদের দুগ্ধাভাব হইতে পারে।

বাসার মধ্যে যেখানে যেখানে বড় বড় গরু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, সেই সকল "বাথানে" (প্রশাখা বা পত্রের বোঁটায়) পিপী-লিকারা সর্ব্বদা ঘোরা-ফেরা করে। গরুগুলির বাঁটে সুড়্‌সুড়ি দিয়া দুগ্ধ-দোহন করে। ঐ দুগ্ধ পিপীলিকাদিগের বড় প্রিয় খাদ্য। যখন কোন নাল্‌শোর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়, তখন সে কোন একটি গাভীর (কীটের) বাঁটের নিকটে শুঁড় দিয়া সুড়্‌সুড়ি দেয়। কিছুক্ষণ পরেই গাভীর বাঁটহইতে দুধ বাহির হয়। পিপী-লিকা উহা জিহ্বার সাহায্যে চাটিয়া খায়। একটু চেষ্টা করিলে, সকলেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গাভীগুলি কামধেনু-বিশেষ। পিপীলিকায় পুনঃ পুনঃ দোহন করিলেও, বিরক্তি-প্রকাশ করিয়া উহাদের নিকট-হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা নাল্‌শো ও ডেয়ে-পিপীলিকার "পশু-পালন"-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, কীটগুলির আকার উকুণের ন্যায়; পিপীলিকাদিগের মত ৬খানি পা ও দুইটি শুঁড় আছে। উহাদের পুচ্ছের নিকটে পিঠের উপরে উর্দ্ধমুখী দুইটি বাঁট থাকে। সুড়্‌সুড়ি দিলে, উহাহইতে একপ্রকার মিষ্ট রস বাহির হয়। ঐ রস পিপীলিকাদিগের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। এই সকল "গরু"কে রক্ষা করিবার জন্য নাল্‌শো-পিপীলিকারা এক-প্রকার বাসা-নির্ম্মাণ করে। এই বাসার নির্ম্মাণ-কৌশল অতি চমৎকার।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

'বাব্বি'

'বালামের' গতিকটা বুঝিতে বাখরগঞ্জে গিয়াছিলাম; "সুন্দর বন-ডেস্‌প্যাচ্‌-ষ্টীমারে" কলিকাতায় ফিরিতেছিলাম। বরিশালে এক ভদ্রমহিলা, একটি অনুমান তিনবৎসরের বালককে সঙ্গে লইয়া, ষ্টীমারে উঠিলেন। আমি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী; তিনিও, দেখিলাম, প্রথম শ্রেণীরই টিকিট-ক্রয় করিয়াছেন। সঙ্গে পুরুষ-মানুষ অর্থাৎ তাঁহার আত্মীয় কেহ নাই, কেবল একজন সরকার-গোছের লোক তাঁহার সহযাত্রী। মহিলার বয়ঃক্রম চৌদ্দ কি পনর। যুবতী ঠিক রূপসী নহেন, তথাপি তাঁহার মুখখানিতে কি যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে; তাহা তাঁহার প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত করে না,— মমতা জন্মাইয়া দেয়। তাঁহার চোক ও মুখের ভাব বড় বিষণ্ণতা-ব্যঞ্জক। কিন্তু তাঁহার সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু দেখিলাম না—বিধবা কি?

তিনি আমার ক্যাবিনের নিকটবর্ত্তী একটি ক্যাবিন-অধিকার করিলেন। আমার বড় মুস্কিল হইল। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, জগতের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি আমার বড় ভয়ের বস্তু! তাহাদের সেই অতিকুৎসিত ট্যাঁ ট্যাঁ শুনিলেই, আমার যেন প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে। এই কারণেই এই বত্রিশবৎসর-কাল আমি অবিবাহিত আছি; ওগুলি আমার আটচালায় আসিয়া বাসা বাঁধে, আমার আদৌ ইচ্ছা নহে।

দুপুরবেলাটা বেশ বিনা হাঙ্গামায় কাটিয়া গেল। বিকাল-বেলা, মহাশয়, আমি যা ভয় করি, তা'ই হইল। সকলে 'ডেকে' বেড়াইতেছিলাম, সেই মহিলাও সেই খোকাটিকে লইয়া ডেকের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি তাঁহার নিকটহইতে বহুদূরে বিচরণ করিতেছিলাম। সঙ্গে 'জুজু' দেখিয়া, সে দিক্‌ মাড়াই নাই। একবার সেই মুরুব্বীর হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়িয়া গেল, আর যাই কোথা? সে ভারি আপ্যায়িত হইয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কাছে আসিয়া দুই বাহু-বিস্তার করিয়া হাঁকিল,—"বাব্বি!"

এই রে, তবেই সেরেছে! এত লোক থাকিতে আমিই কি না—"বাব্বি"! শুনিয়া কাণ এবং প্রাণ তব্ হইয়া গেল! মহিলা ছুটিয়া আসিলেন। আমার মুখপ্রতি চাহিয়া যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে সে বিস্ময়ের ভাব কিঞ্চিৎ অপনোদিত হইলে, তিনি সেই গায়ে-পড়া ক্ষুদে ভদ্রলোকটির উদ্দেশে বলি-লেন,—"না, না, উনি 'বাব্বি' ন'ন।"

"হ্যাঁ, বাব্বি!"

বলিয়া শিশু আমার দিকে আরও আগাইয়া আসিল, বাহু বাড়াইল। আমার বত্রিশ-বছরের জীবনে আমি কখন ও জিনিস ছুঁই নাই। ভাল আপদ্ যা' হউক, বিরক্ত হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম।

তাই তো, এ যে 'ভ্যাল্যা' এক লেঠা বাধাইল,—ঠোঁট ফুলাইতে লাগিল! মহিলা একবার করুণদৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া লাগিলাম। জুজু যে জুজুই, সত্য কিছু নয়, তা' সেই প্রথম বুঝিতে পারিলাম। জুজুকে ভয় করিব কি, বুকহইতে আর নামাইতে ইচ্ছা গেল না!

মাত্‌লার জলে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। মণ্টু তখনও আমার গললগ্ন হইয়া আছে। তাহাকে অতি কষ্টে তাহার মাকে ফিরাইয়া দিলাম। তিনি কিছু বলিলেন না, একবার সুধু সকৃতজ্ঞলোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।
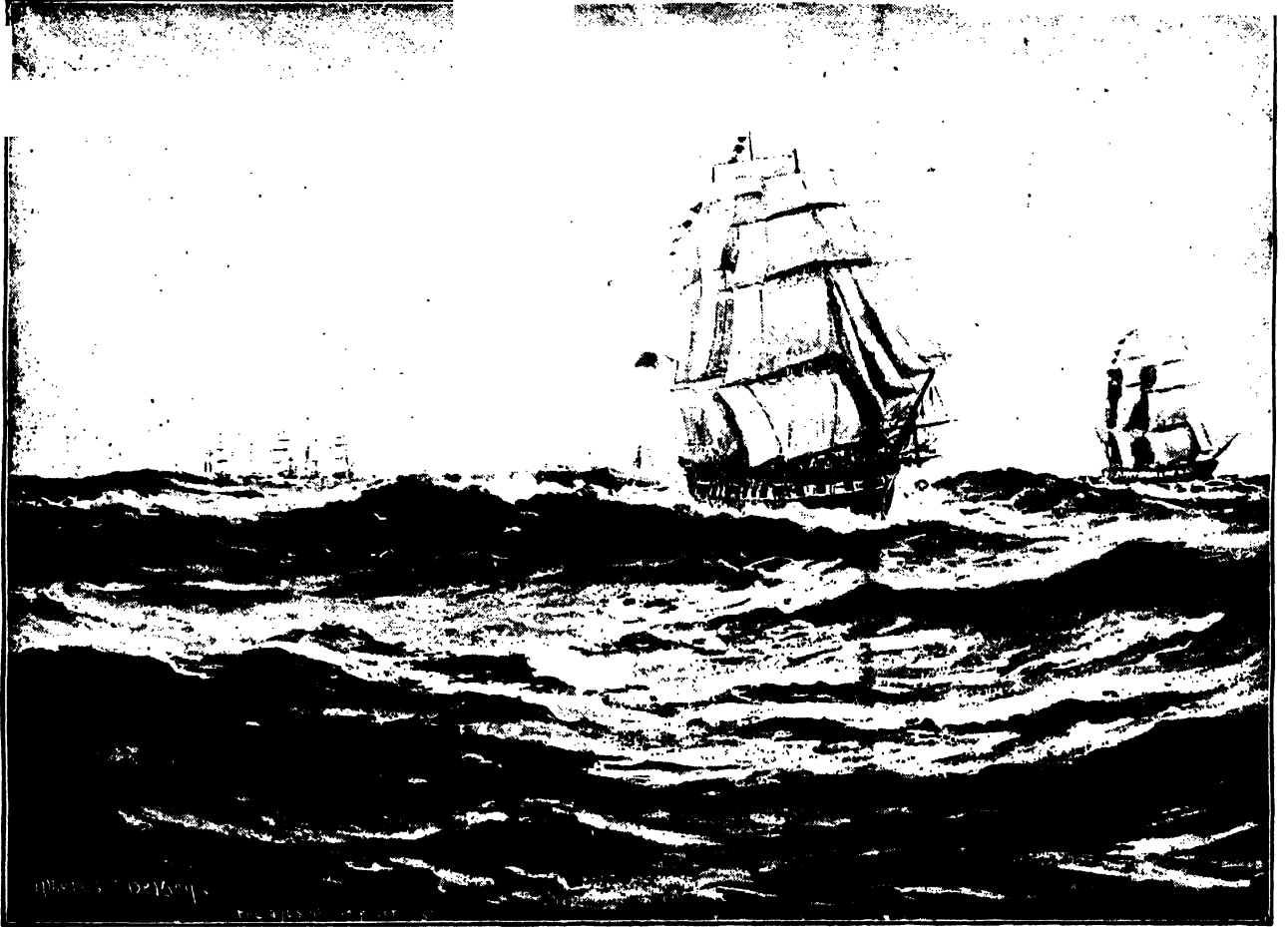
লর্ড নেলসনের সময়ের একখানি গুপ্তচর-পোত, ১৮০৫। এইরূপ পোতগুলিকে "বহরের চক্ষু" এই অভিধা প্রদত্ত হয়।

বালকের উদ্দেশে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন,—"মণ্টু, ঐ দেখ্ ওদিকে কি, চল্, চল্, চল্!"

মণ্টু আমাকে পাইয়া বসিয়াছে, সে শুনিবে কেন? কহিল,—"না, বাব্বি, কোয়ে—বাব্বি কোঁয়ে—।"

সাত জন্মে যা' করি নাই, তা'ই করিতে হইল। কি করি, মহাপ্রভুকে আমার স্কন্ধে ভর করিতে দিলাম।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই বাব্বি আমার সঙ্গে বেশ জমাইয়া ফেলিল। আমি কেনা-গোলামের মত তাহার 'খিজমৎ' খাটিয়া বেড়াইতে

প্রভাতেই মণ্টু-বাবাজী আসিয়া আবার আমাকে দখল করিয়া ফেলিলেন। আমি তখন মহিলার উদ্দেশে কহিলাম,—"আপনার মণ্টু, দেখ্‌চি, আমাদের আর অপরিচিত থা'ক্‌তে দেবে না।"

মহিলা কিছু বলিলেন না, মৃদু হাস্য করিলেন; হাসিটুকুতে বিষাদের অনুরঞ্জন আছে।

তিনি কথা না কহুন, আমি পুনরায় কথা কহিলাম,—"এর বাপ কোথায়?"

মহিলার চোক-দুটি ছল ছল করিতে লাগিল; কহিলেন,—"সম্প্রতি তাঁ'র কাল হয়েছে।"

আমি ব্যথা না বুঝিয়া কথা ঘুরাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, এত লোক থা'ক্‌তে মণ্টু হঠাৎ আমারই এত 'ন্তাওটো' হ'য়ে প'ড়্‌ল কেন, বলুন দেখি?"

মহিলার কণ্ঠ-স্বর কাঁপিয়া উঠিল, কহিলেন,—"আপ্‌নি অনেকটা ওর বাপের মত দে'খ্‌তে, তা'ই বোধ হয়।"

আমি আবার কথা ফিরাইবার উদ্দেশ্যে মণ্টুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—"মণ্টু, মার কাছে যাও।"

"আপনার সঙ্গের লোকটি কি আপনাদের বাড়ীর সরকার?"

"দাদা ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; আমার সঙ্গের লোকটি তাঁ'র পুরাণো আরদালী।"

"আপনারা এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

"কল্‌কেতায়; ওর ঠাকুরমার কাছে। এখন ও' আমাদের কাছেই থা'ক্‌বে।"

"না, বাব্বিল তাচে—তোমা' তাচে না, বাব্বিল তাচে।"
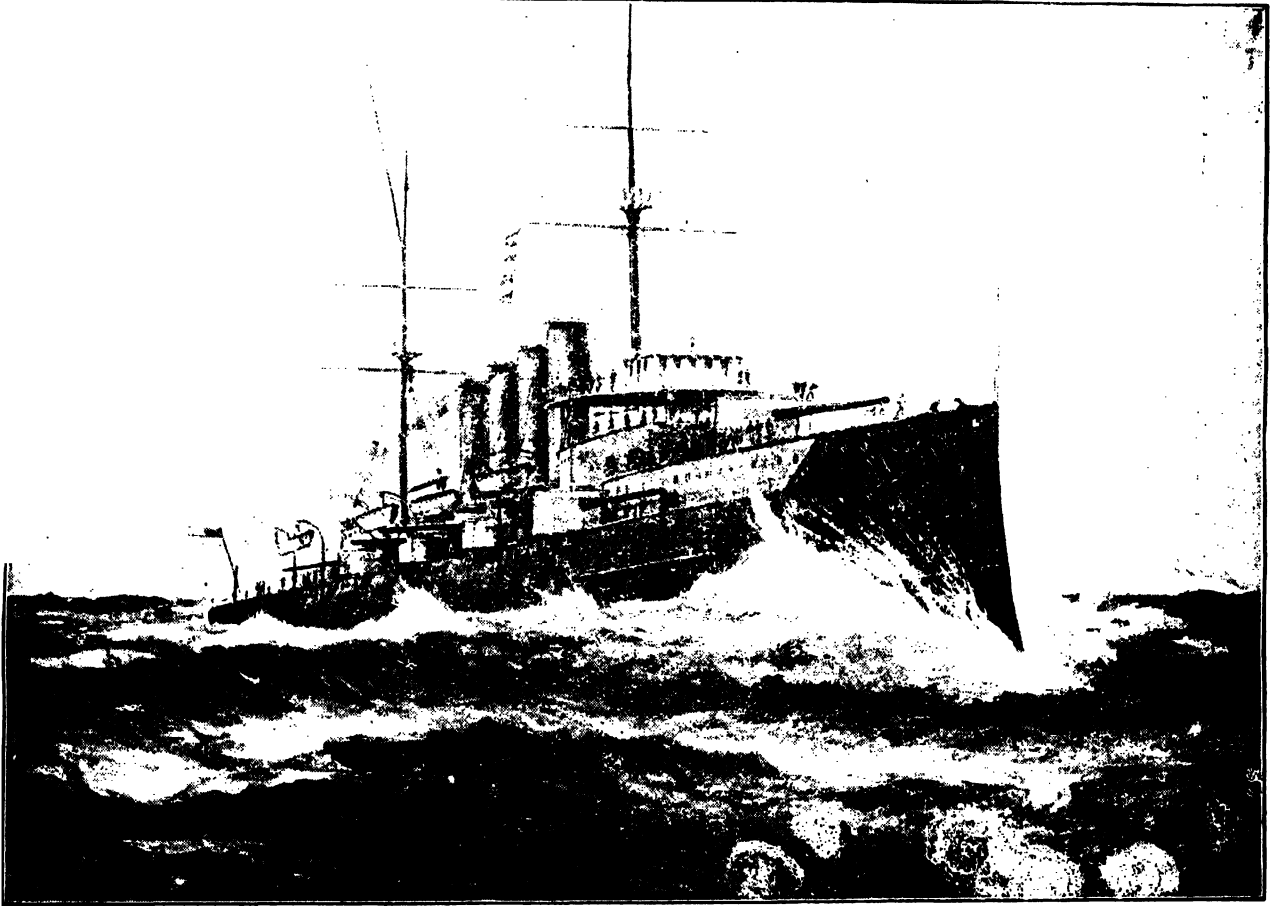
সুবৃহৎ গুপ্তচর-পোত, ১৯০৫।

মহিলার পাণ্ডুগণ্ডযুগল রক্তাভ হইয়া উঠিল, তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, মণ্টু প্রশ্ন করিল,—"কোতা মা?"

"কেন, এই যে মা দাঁড়িয়ে রয়েচেন।"

"মা না, মা না, ও—ও পফুলো-পিছি।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া মহিলার উদ্দেশে কহিলাম,—"মাফ ক'রবেন, আমি জা'ন্‌তুম না। এর মা কোথায়?"

"বৌ-দিদি একে প্রসব ক'রেই মারা পড়েন।"

৩

আর কোন কথা হইল না; আমি খোকাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অবশেষে কয়দিনে এমন হইয়া পড়িল যে, মণ্টু এক মুহূর্ত্তও আমার কাছছাড়া হইতে চায় না। আমাকেই সে তাহার মৃত পিতা মনে করিতে লাগিল। বিপত্নীকের পুত্র অতিমাত্র পিতৃস্নেহাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠে; আমার কাছে সে তাহারই প্রত্যাশায় ফিরিত। ফলে প্রফুল্লনলিনীর আমার কাছে আর

লজ্জা করা চলিল না। কয় দিন একত্র বাসে আমরা পরস্পরের মধ্যে অধিক ব্যবধান রাখিতে পারিলাম না।

৪

কলিকাতায় পঁহুছিয়া মণ্টু কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না। বাব্বি, বাব্বি করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম,—"তুমি এখন পিসিমার সঙ্গে যাও, ঠাকুর-মা তোমায় ডেকেচে—বিয়ে ক'র্‌বে। সন্ধ্যা-বেলায় আমি তোমাকে দে'খ্‌তে যা'ব।" তবে সে গেল।

নলিনীর ঠিকানা লইয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা তাহাদের ওখানে গেলাম। মণ্টু ভারি খুসি! "বাব্বি এয়েতে—পিছি, বাব্বি এ—য়ে—তে। "ঠাকু-মা, বাব্বি এয়েতে!"

সেদিন সে বায়না ধরিল, আমার সঙ্গে ঘুমাইবে। তাহার ঠাকুর-মা অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু তাহার মুখহইতে "বাব্বি-তাচে চোব" এই বুলি ছাড়াইতে পারিলেন না। অগত্যা আমিই তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইলাম। সে ঘুমাইয়া পড়িলে, বাসায় ফিরিলাম।

কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। কাজ ছিল বলিয়া একবার উপরি-উপরি তিন দিন মণ্টুকে দেখিতে যাইতে পারি নাই, সে আমার জন্য 'হেদাইয়া' অসুখে পড়িয়া গেল। 'পিছি' ও 'বাব্বির' একত্রাবস্থান ক্রমশঃ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে—কি করি—আমি তাহার পিসা হইলাম! কিন্তু সে আমাকে এখনও "বাব্বি" বলিয়াই সম্বোধন করে!

সম্পূর্ণ।

'স্যাণ্টা ক্লস্।"

["স্যাণ্টা ক্লস" কে, তাহা না জানিলে হিন্দু বা মুসলমান-বালকেরা এই গল্পটির আনন্দ-উপভোগ পারিবে না। সেণ্ট নিকোলাস রুষিয়ার অভিভাবক-সাধু। পথিকদিগের রক্ষাকর্ত্তা। ছেলেমেয়েদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এখন ইঁহার নাম হইয়াছে—স্যাণ্টা ক্লস! ইনি কিন্তু রুষীয় সেণ্ট নিকোলাস নহেন—কাল্পনিক ব্যক্তি। বুড়া, শুভ্রশ্মশ্রু স্যাণ্টা ক্লস ছেলেদের খেলানার 'কল্পতরু'! তিনি কখন ব্যোমযানে, কখন মটরে, কখন স্লেজে চড়িয়া ছেলেদের জন্য বড়দিনের অধিবাস-সন্ধ্যায় মাথায়, কাঁধে, বগলে, হাতে, যানটির সর্ব্বত্র অসংখ্য খেলানা লইয়া অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হন। ছেলেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু খেলানা পায়। বড়দিনে ছেলেরা যে খেলানা পায়, তাহা স্যাণ্টা ক্লসেরই আনীত উপহার বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান গল্পে স্যাণ্টা ক্লস-বেচারা প্রত্যক্ষ হইয়াছেন!]

'হাতটান'-রোগটা হওয়া-অবধি বরাবরই লালপাগড়ীকে বুড়া-আঙুল দেখাইয়া আসিতেছিলাম, কখন ধরা পড়ি নাই; ধরা যে পড়িব, এ ভয়টা আমার মোটেই হইত না; তবে কখন কখন আমি

স্বপ্নে দেখিতাম বটে যে, লালবাজারথেকে হরিণবাড়ীর ঘুড়ী-গাড়ী চড়িয়া 'শ্বশুর-বাড়ী' চলিয়াছি। কখন কখন তাই মনে হইত, গড়ের মাঠের দখিণ-সীমানায় আমাকে একদিন এই 'সাধু'-জীবনের 'ইতি' করিতে হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরকম, আমাকে অন্য একরকমে 'হাতটান'-রোগটা 'মেরামত' করিতে হইয়াছে।

শীতকাল; পৌষমাস; সেদিন বড়দিনের অধিবাস। পার্ক-ষ্ট্রীটে এক সাহেব-বাড়ীতে নিমন্ত্রণে চলিয়াছি! গিয়া কায়দা করিয়া একটি জানালা খুলিয়া ফেলিলাম; তাহার পর হীরার ছুরী-দিয়া থান-দুই-তিন শার্সিও কাটিয়া ওয়ার করিলাম। তাহার পর আর কি?—ঘরের মধ্যে 'টুপ্' করিয়া শ্রীচরণের ধূলি-প্রদান! জামার পকেট-হইতে একটা মুখোস বাহির করিয়া মুখে পরিলাম, চোরা-বাতি জ্বালিয়া দাঁড়াইয়াছি মাত্র, এমন সময়ে দেখি, আমার দুইপাশে দুই 'লাল-মুখ' দাঁড়াইয়া। তাহারা চকিতের মধ্যে আমার কপালে দুই পাশহইতে দুই পিস্তল ঠেকাইয়া বলিল,—"হেলো, সাণ্টা ক্লস্!"

হেলো, সাণ্টা ক্লস্—কি, রে বাবা? বাপের জন্মে কখন শুনি নাই! আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম। বলিলাম,—"হুজুর, কসুর মাফ কিজিয়ে, ভুলসে আয়া!"

একবেটা রাঙামুখ বলিল,—"নেহি, নেহি, ভুল নেহি হ্যায়, ঠিক হ্যায়; তুম্ স্যাণ্টা ক্লস্ হ্যায়, আজ ক্রিস্মাস্ ইভ হ্যায়—হম্‌লোগ্‌কা ওয়াস্টে কিয়া কিয়া চিজ লায়া? ডিখ্‌লাও—হিঁয়া আও, হিঁয়া আও—হিঁয়া ক্রিশ্‌মাস ট্রি হ্যায় কামেলঙ্, ট্রুট্ অন্!"

কথাগুলি প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছে, তাই ঠিক মনে আছে। ঐ কথা বলিয়া তাহারা দুইজনে আমাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখি, আরও কতকগুলা সাহেব রহিয়াছে—ছোক্‌রা-সাহেব। আমাকে দেখিয়াই অন্য সাহেবগুলা বলিল, —"হু ইজ দিস্?"

আমার যমদু'টো উত্তর দিল,—"স্যাণ্টা ক্লস।" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া একজন বলিল, —"ডেখ্‌তা হ্যায় বড়া-ডিনকা—ওয়ট ইজ ইট?" এই বলিয়া দোস্‌রা সাহেবের দিকে চাহিল, সে বলিল—"পেড়।" "হাঁ, ফেড়! টুম্‌রা প্রে—আই মিন্—সওগাড্ ইস্‌মে টাঙ্। কাম নাও, বি কুইক্, মাই জলি গুড্ ক্লস! আচ্ছা, হাম্ টুম্‌কো মড্‌ট্ করেগা। ডোনো হাট্ উপর উঠাও।"

আমি তাহাই করিলাম। প্রথমে জামার পকেটহইতে পিস্তলটা বাহির হইল। সাহেবটা ভারি চীৎকার করিয়া উঠিল,—"নাইস—উম্‌ডা সওগাড, স্যাণ্টা ক্লস!"

তাহার পর, চোরা-লাণ্ঠন, চাবির থোলো, হীরের ছুরী, মোম, সিঁধকাটি, একে একে সবই বাহির করিয়া সাহেবটা সঙ্গীর হাতে দিতে লাগিল, আর সে সেই গাছের মত আল্‌নাটায় টাঙাইতে লাগিল। দেখিয়া অন্য সব সাহেব-বাচ্ছা, "বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমার মুখের মুখোসও খুলিয়া লওয়া হইল।

সব জিনিস লওয়া হইলে, সাহেবটা আমাকে বলিয়া উঠিল,—"সেলাম হুজুর্—র! আউর টুম্‌কো ডর্‌কার নেহি। চলো টুম্‌কো রাস্তা ডিখ্‌লা ডেগা,—টুম্‌রা যানা, আনাকা মাফিক্ উম্‌ডা হোগা।"

এই বলিয়া দুইজন সাহেব আমার দুইহাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া বাড়ীর হাতায় টানিয়া বাহির করিল; তাহার পর চাকরদের থাকিবার ঘরের দিকে লইয়া চলিল। সেখানে পঁহুছিয়া একজায়গায় থামিল; সমুখেই পাঁচীলের গায়ে একটা সরু গর্ত্ত। দুই সাহেব দুই পিস্তল উঁচাইয়া আঙুল দেখাইয়া হুকুম করিল,—"হিঁয়াসে নিকাল যাও।"

আমি দোহারা, একটু "দোনা-মোনা" করিতে লাগিলাম। দুইটা ঠাণ্ডা পিস্তলের নলীই কপালে আসিয়া ঠেকিল। প্রাণের দায়ে সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিতে গেলাম, ভুঁড়ী আট্‌কাইয়া গেল। অনুনয় করিয়া সাহেব-দু'টাকে বলিলাম,—"হুজুর হিঁয়াসে নেহি জানে স্যাকেগা, বহুত সাজা হুয়া, আউর এসা কাম কভি নেহি করেগা।"

"আলবট্ জানে হোগা! নেহি টো—ডিখ্‌টা হ্যায়?"

পিস্তল দেখাইল। কি করি, আধঘণ্টাটাক ধস্তাধস্তি করিয়া সেই গর্ত্ত-দিয়াই বাহির হইলাম। সর্ব্বাঙ্গ ছিড়িয়া গেল।

আমি এখন সাধু-সন্ন্যাসী লোক, আপনাদের পাঁচজনের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খাই; গিন্নিবান্নিগোছের লোক দেখিলে, আধা-হিন্দী আধা-বাঙ্‌লায় বলি,—"মায়ি, তেরা বেটাকে ভালা হোবে, বেটিকা আচ্ছা সাদি হোবে।"

চুরী সেইদিনহইতে ছাড়িয়াছি।

সম্পূর্ণ।

জয়োপায়।

তুমি যেমন অবস্থাম্বিত, আর একজনও তেমনই অবস্থাম্বিত। তোমার যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, তাহারও তেমনি। তুমি যেমন সুযোগ পাইতেছ, সেও তেমনই সুযোগ পাইতেছে। তত্রাচ তুমি কোন এক উদ্যমে বিফল হইলে, সে সফল হইল। এরূপ হইবার কারণ কি? বাঙ্গালীর ছেলের মুখে একটী বাঁধা-বুলি শুনিতে পাওয়া যায়—অদৃষ্ট।

প্রকৃত কারণ কি, শুন। ও অদৃষ্ট-ফদৃষ্ট কিছু নয়। জয়ের মূলে থাকে—তোমার বীরতা; পরাজয়ের মূলে থাকে—তোমার ভীরুতা। তুমি যেমন ভাব, তেমনই হও। কাজে বিফল হইব ভাবিয়া যদি তুমি কাজ কর, বিফলই হইবে; কাজে সফল হইব ভাবিয়া যদি অনন্যমনে কাজ করিতে থাক—তোমার সমুদয় ইচ্ছা-শক্তিপ্রয়োগ করিতে থাক, তুমি দেখিবে, কর্ম্মই তোমাকে কর্ম্মবুদ্ধি যোগাইতেছে।

এখন তুমি হয়ত প্রশ্ন করিবে, পারিব না ভাবিয়া কি কোন লোক কোন কাজ করে? অনেকে করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই "হ'বে কি হ'বে না" এই সন্দেহ-দোলায় দুলিয়াই শেষ-কালে "হ'বে না"রই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

কাজের সময় যদি তুমি নিবিষ্ট-মনে কাজ করিয়া যাও, বিফলতার ভাবনাকে কিছুতেই মনোমধ্যে স্থান না দেও, দেখিবে, কার্য্যোপযোগিনী বুদ্ধি ও শক্তির যোজনা হইতেছে।

অনেক লোকের স্বভাব, তখনও 'গাছে কাঁঠাল,' এদিকে 'গোঁফে তেল' লাগায়। কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সেই কার্য্যটি কর্ত্তব্য

কি না, ইহাই মাত্র ভাবিয়া স্থির করা উচিত, কার্য্যে হাত দিয়া উহার সফলতা বা বিফলতার চিন্তা একেবারে মনহইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত, তখন কার্য্যটি সমাধা করিবার নিমিত্ত কেবল উপায়-গুলিই চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের মনে রাখা উচিত, ক্রমবিকাশ প্রকৃতির একটী নিয়ম। বীজ একদিনে বৃক্ষ হয় না, বৃক্ষ একদিনে পুষ্প-শোভিত হয় না, ফুল একদিনে ফুটিয়া উঠে না। সকলই ক্রমে ক্রমে হয়। তুমি আজ চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, মনে রাখিও, এই চতুর্দ্দশবর্ষ ব্যাপিয়া তুমি এত বড়টি হইয়াছ—একদিনে হও নাই; বিনা ঝঞ্ঝাটে, বিনা বিপদেও হও নাই। তোমার কার্য্যের ফলও তুমি একদিনে পাইবে না। মনঃসংযোগপূর্ব্বক অধ্যবসায়ের সহিত তুমি তোমার কার্য্যটি করিতে থাক, বিফলতার ভয় করিও না, সাফল্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইও না, যিনি তোমাকে এত বড়টি করিয়াছেন, আরও কত বড় করিবেন, তিনিই—সেই ঈশ্বরই তোমাকে তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার দিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা তুমি, ফলদাতা তিনি। তোমার উচিত কর্ম্মচিন্তা, ফলচিন্তা তাঁহার; তাঁহার চিন্তা তুমি কর কেন?

ব্যাড্‌মিণ্টন

এদেশে অনেক ছেলে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলে, কিন্তু এই খেলাটীর নাম যে কেন ব্যাড্‌মিণ্টন রাখা হইয়াছে, ইহা তাহারা সম্ভবতঃ জানে না। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম-অঞ্চলে লণ্ডন-নগরহইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরস্থিত ব্যাড্‌মিণ্টন-নামে একটী গ্রাম আছে; সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে এই খেলাটী সেখানে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম ব্যাড্‌মিণ্টন রাখা হইয়াছে। যতদূর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয়, ব্যাড্‌মিণ্টন-খেলা ইংলণ্ডে অনুমান ১৮৭৩ বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ব্যাড্‌মিণ্টন-খেলাসম্বন্ধে এদেশে ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটী পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; এদেশের লোকেরা অনাবৃত স্থানে, কিন্তু ইংলণ্ডে লোকে বৃহৎ ঘরে এ খেলা করে। যাহারা কখনও ব্যাড্‌মিণ্টন-খেলা করে নাই, অনেক সময়ে তাহাদের মুখে এইপ্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই খেলাটী কেবল স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত। ঐরূপ মনে করা যে মহাভুল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যাঁহারা ব্যাড্‌মিণ্টন ও টেনিস্ উভয় খেলা জানেন, তাঁহারা সহজে স্বীকার করিবেন যে, ব্যাড্‌মিণ্টন টেনিসের অপেক্ষা কষ্টকর হইতে পারে।

এই খেলাটীর জন্য বেশী জায়গার দরকার নাই বলিয়া, ইহা নাগরিক ছেলেরাও বেশ খেলিতে পারে; তা'ছাড়া ব্যাড্‌মিণ্টন খেলিলে, ছাত্রদিগের শরীরের স্ফূর্ত্তি হইবার প্রচুর সম্ভাবনা হইবে। তাই আমরা এই সামান্য প্রবন্ধটি লিখিতেছি। আমাদের আশা এই যে, অনেক ছেলে ইহা পড়িয়া ব্যাড্‌মিণ্টন খেলিতে আরম্ভ করিবে। দুই বা চারিজন খেলোয়াড় এই খেলা করে, এবং তাহারা যে ইহাতে কৌশল ও বিচার-শক্তি দেখাইবার প্রচুর সুযোগ পায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে জায়গাটী ব্যাড্‌মিণ্টনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাকে ব্যাড্‌মিণ্টন 'কোর্ট্' বলে। যখন কেবল দুইজন খেলোয়াড় খেলা করিতেছে, তখন কোর্ট্‌টা এইরূপে ব্যবস্থিত হয়:—
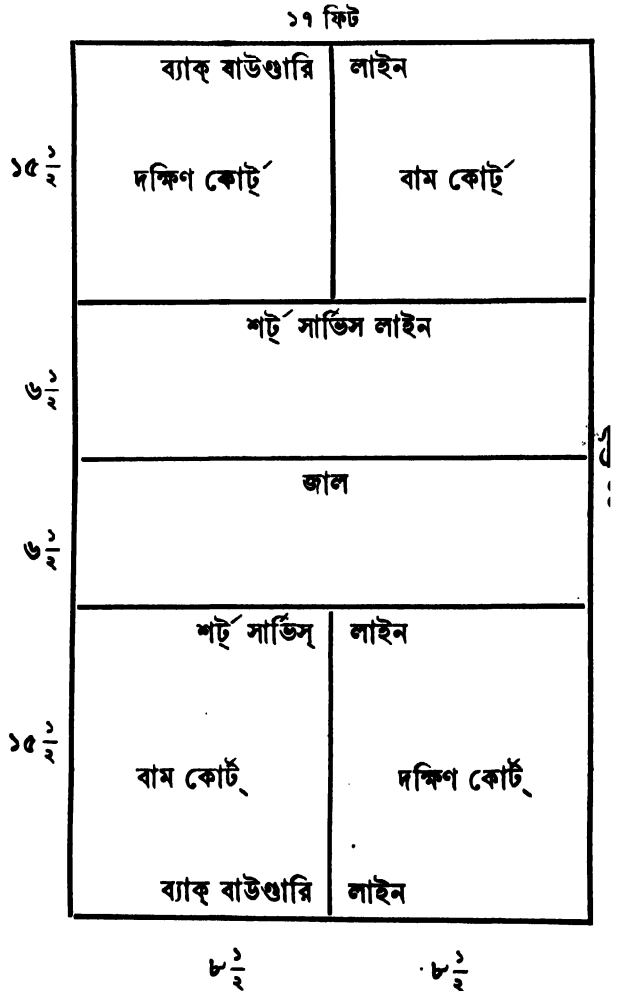
ধর্ম্ম-মার্গ।

শুনেন স্বকর্ণে রাজা প্রজার নালিশ,—
দুঃখ-বেদনায় দেন সান্ত্বনা-মালিশ।
হঠাৎ হ'লেনঃকালা নৃপ কৃপাময়,
দুখে ভরি' গেল তাঁ'র সদয় হৃদয়।
'হায়, মন্ত্রি, কর্ণ নাই, কি করিয়া আর
অভাব ও অভিযোগ শুনিব প্রজার ?'
মৌন হ'য়ে র'ন রাজা বিমর্ষবদনে,
দরদর অশ্রু-ধারা ঝরে দু'নয়নে।

শেষে রাজা হাসি' ক'ন—'পেয়েছি উপায়,
আজিহ'তে কৃষ্ণবাস পরিবে প্রজায়,
যখন কাতর তা'রা হ'বে বেদনায়।
দাও, মন্ত্রি, এই কথা জানায়ে সবায়।'
ভুল না কঙ্কর-কথা ধরমের পথে ;
ইচ্ছা হ'লে, উপায়ও হয় কোন মতে।

এই চিত্রটিই সেপ্টেম্বর-মাসের চিত্র-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছে।

রুচি-বৈচিত্র্য।

১

লক্ষীকান্ত অতি-শান্ত—যাকে বলে 'গোবেচারা',—
বলিষ্ঠ তো নয় মোটেই,—ঘিয়ে ভাজা চেহারা ;
সে কিন্তু প'ড়তে চায় যুদ্ধের বারতা,—
'থার্ম্মাপলী,' 'ওয়াটালু', পাণিপথ-কথা।

২

গণেশের চেহারাটা ঠিক যেন 'চোট্টা',—
'চানা' আর ছাতুখেকো 'খোসকুন্দে খোট্টা' ;
তা'র কিন্তু এই পণ, হ'বেই সে কবি,
লুকাইয়ে নাড়াচাড়া করে তাই 'রবি'।

৩

গম্ভীর-স্বভাব বড় আদক অজিত,—
'মেঘেতে বিজলী-হাসি' প্রত্যক্ষ কচিৎ;
সে কিন্তু প'ড়তে চায়—গল্প মজাদার,
ডি, এল, রায়ের গান, নক্সা 'ফোয়ারার'!

৪

ফটিক রসিক অতি আছে রঙ্গ নিয়ে,
কেহ যদি যায় কাছে, দেয় সে হাসিয়ে;
সে কিন্তু প'ড়তে চায় 'পৃথি-পুরাবৃত্ত;'
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক দুরূহ সাহিত্য!

৫

আছে গদাধর,—ঠিক 'চৌদ্দপোয়া' লম্বা,—
আঙ্‌গুলগুলিন তার 'মর্ত্তমান'-রম্ভা;
সে কিন্তু প'ড়তে চায় দুঃখের আখ্যান,—
যা'তে শেষে নায়কটি কেঁদে 'অক্কা' পান!

৬

হোক ভীরু, হোক বীর, রসিক, ভাবুক,
হোক 'দুঁদে,' হোক ধীর, 'বখাটে', লাজুক,
সকলেই হয় দেখি মোহিত পাঠক,
যখন হাতেতে পড়ে বাঁধান 'বালক'!

——:•:——

সালতামামী।

এই মাসে "বালকের" দ্বিতীয় বর্ষের সালতামামী হইল। বর্ষে বর্ষে কেবল "বালকের"ই যে সালতামামী হইবে, তাহা নহে; প্রত্যেক ব্যবসায়ের, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের বৎসরের শেষে সালতামামী হয়। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান সালতামামীর সময়েই খতান হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়ন বৎসরের শেষেই হয়। যে ছেলে সম্বৎসর ভাল করিয়া পড়া-শুনা করিয়াছে, সে পরীক্ষা দিয়া হাসিমুখে উপরের শ্রেণীতে উঠিয়া যায়, পারিতোষিক পায়; যে ছেলে সম্বৎসর ফাঁকি দেয়, সে "ক্লাশ-প্রমোশন" না পাইয়া কাঁদিতে থাকে। ব্যবসায়ী তেমনই যদি বুঝিয়া-শুঝিয়া কারবার চালায়, বৎসরের শেষে হাসিমুখে লাভের কড়ি গুণিতে থাকে। মানুষের জীবনেও অনেকবার সালতামামী হয়। তন্মধ্যে ছাত্র-জীবনহইতে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার সময়েও একটা সালতামামী হয়। ছাত্রজীবনটা যে ছাত্রোচিতভাবে অতিবাহিত করিয়াছে, সে-ই হাসিমুখে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করে। অবহেলিত-ছাত্রজীবন-যুবক ক্ষুদ্র একটী চাকরীর সন্ধানে আফিসে আফিসে ঘুরিয়া বেড়ায়, পায় না। তখন হয় তো নিজ দুরদৃষ্টের দোষ দেয়, কিন্তু শেক্সপীয়ার তাঁহার ওথেলো-নাটকে "ইয়াগোর" মুখদিয়া যাহা বলাইয়াছেন, আমার সেই কথাটাই খুব সত্য বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন,—"আমরা যে এ এমন, সে তেমন, তাহার কারণ আমাদের মধ্যেই আছে।" হিন্দি-রামায়ণকার কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন—"তুলসী, যখন তুমি জগতে আসিয়াছিলে, তখন জগতের লোক হাসিতেছিল, আর তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিলে; এখন তুমি এমন কাজ করিয়া যাও, যেন জগতের লোক তোমার বিয়োগ-বেদনায় কাঁদিতে থাকে, আর তুমি হাসিতে হাসতে এ জগৎহইতে বিদায়-গ্রহণ করিতে পার।" এই উভয় কবিরই উপদেশ মানবমাত্রেরই শিরোধার্য্য করা উচিত। লাভ সাল-আখিরীর সময়ে করা যায় না, লাভ প্রতিদিন প্রত্যেক দ্রব্য-বিক্রয়ের মুখে করিতে হয়। লোকসানের জমা লোকসান,—শূন্য যতই যোগ কর, শূন্যই হয়, এবং লাভেরই জমা লাভ হয়। অনবরত লোকসান দিলে, লাভ কোথাহইতে হইবে? সুতরাং, তোমরা ছাত্র, তোমাদের প্রত্যেক দিনের শিক্ষার পরিমাণ না করিলে,—যাহাতে চরিত্র, হৃদয়, মন নষ্ট হয়, এমন সমস্ত কার্য্য-পরিহার না করিলে, বৎসরের পর বৎসর দেখিবে, তোমাদের লাভের খাতা শূন্য ও লোকসানের খাতা পূর্ণ হইতেছে। তুমি যেমন ছোটটিহইতে ক্রমশঃ বড়টি হইয়া উঠিতেছ, তেমনি তোমার ক্ষুদ্র দোষ বা ক্ষুদ্র গুণটি ক্রমশঃ বিকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় শেষ-সালতামামী হয়, তখন লাভের খাতায় শূন্য দেখিলে, আর বরাৎ ফিরাইবার কোনই উপায় থাকে না। অতএব এখনহইতে তোমাদের বুঝিয়া চলা উচিত। বিন্দু বিন্দু জলের সমষ্টি সমুদ্র, মুহুর্মুহুঃ কালের সমষ্টি অনন্তকাল। যে মুহূর্ত্তগুলিকে অবহেলা করে না, সেই অনন্তকালের 'নাগা'ল' পায়। মুহূর্ত্তটি ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিও না। মুহূর্ত্তমাত্রকেই যদি লাভের খাতায় জমা করিতে পার, শেষ-সালতামামীর সময় অনুতাপ বা হাহুতাশ করিতে হইবে না; টাকায় টাকা-লাভ করিয়া বগল বাজাইয়া এ বিশ্বহইতে বিদায় লইতে পারিবে।

——•——